বশীর মাহমুদ ইলিয়াস

Website : http://bashirmahmudellias.blogspot.com

ডিজাইন স্পেশালিষ্ট, ইসলাম গবেষক, হোমিও কনসালটেন্ট

উৎসর্গ

আমার হোমিওপ্যাথিক গুরু

ডাঃ মোঃ হেলালউদ্দিন‘কে

## প্রসঙ্গ-কথা

প্রথমেই মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এমন একটি বই লেখার সুযোগ দেওয়ার জন্য যা বিভিন্ন জটিল-কঠিন রোগে আক্রান্ত বিপদগ্রস্ত মানুষ, পশু-পাখি এবং বৃক্ষতরুলতাদের উপকারে আসবে বলে আশা করছি। একিউট ডিজিজ (Acute disease) বা ইমারজেন্সী অসুখ-বিসুখ নিরাময়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অবলম্বন করার কথা বললে কেউ কেউ অবাক হতে পারেন। কেননা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে সমাজে যে-সব মিথ্যা কথা প্রচার করা হয়, তার একটি হলো "হোমিও ঔষধ দেরিতে কাজ করে বা ধীরে ধীরে কাজ করে"। অথচ বাস্তব সত্য হলো, হোমিও ঔষধ পুরোপুরি লক্ষণ মিলিয়ে দিতে পারলে, সেটি বাজারে আসা হাইপাওয়ারের লেটেস্ট এন্টিবায়োটিকের চাইতেও অন্তত একশ গুণ দ্রুত কাজ করে থাকে। হোমিওপ্যাথি একমাত্র বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি। অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতি বিজ্ঞানের নামে প্রতারনা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহারা রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার নামে যদিও খুবই উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকুক না কেন ; আসলে সেগুলো হলো মানুষকে বোকা বানানোর এবং পকেট মারার এক ধরণের অত্যাধুনিক ফন্দি মাত্র। তাদের নানা রকমের চটকদার রঙের এবং ডিজাইনের দামী দামী ঔষধগুলো কোন জটিল রোগই সারাতে পারেনা বরং চিকিৎসার নামে উপকারের চাইতে ক্ষতিই করে বেশী। হোমিওপ্যাথির রয়েছে প্রতিষ্টিত বৈজ্ঞানিক নীতিমালা বিগত দুইশ বছরেও যার কোন পরিবর্তন হয়নি এবং কেয়ামত পযর্ন্ত রদবদল হবে না।

পক্ষান্তরে অন্যান্য চিকিৎসা শাস্ত্রের কোন বৈজ্ঞানিক নীতিমালা নেই। তারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অনুসরণ করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আন্দাজ, অনুমান, কুসংস্কার, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, হোমিওপ্যাথির আংশিক অনুসরণ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে চিকিৎসাকাজ পরিচালনা করে থাকে। অর্থাৎ এতে দশ ভাগ আছে বিজ্ঞান আর নব্বই ভাগ হলো গোজামিল। হোমিওপ্যাথিতে একই ঔষধ দু'শ বছর পূর্বে যেমন কাযর্কর ছিল, আজও তা সমানভাবে কাযর্কর প্রমাণিত হচ্ছে বলেই সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য চিকিৎসা শাস্ত্রের কোন ঔষধই দশ-বিশ বছরের বেশী কাযর্কর থাকে না। একদিন যেই ঔষধকে বলা হয় মহাউপকারী-জীবনরক্ষাকারী-অতিদরকারী, কয়েক বছর পরই তাকে বলা হয় অকাযর্কর-ক্ষতিকর-বর্জনীয়। আজ যেই ঔষধের নাম মানুষের মুখে মুখে ফিরে, কাল সেটি হারিয়ে যায় ইতিহাসের পাতা থেকে। কাজেই আমাদের ভেবে দেখা উচিত যে, যেই সিষ্টেমকে কিছু দিন পরপরই পরিবর্তন-পরিবর্ধন-সংস্কার করতে হয়, তাকে কিভাবে নির্ভরযোগ্য / বিজ্ঞানসম্মত বলা যায় ?
আজ থেকে দুইশত বৎসর পূর্বে মহা চিকিৎসাবিজ্ঞানী জার্মান এলোপ্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যান (এম.ডি.) হোমিওপ্যাথি নামক এমন একটি মানবিক চিকিৎসা বিজ্ঞান আবিষ্কার করেন, যাতে সূঁই দিয়ে শরীরে ঔষধ ঢুকানো, পায়খানার রাস্তা দিয়ে ঔষধ ঢুকানো, সামান্য ব্যাপারে শরীরে ছুরি-চাকু ব্যবহার করা, ঔষধের দাম দিতে না পারায় দরিদ্র মানুষের বিনা চিকিৎসায় ধুকেধুকে মৃত্যুবরণ করা, প্যাথলজীক্যাল টেস্টের নামে অসহায় রোগীদের পকেট কাটা, চিকিৎসার নামে রোগ-ব্যাধিকে যুগের পর যুগ লালন করা প্রভৃতি নিষ্ঠুরতা-অমানবিকতা থেকে মানবজাতি মুক্তি পেতে পারে। এই অসাধ্য সাধন করার কারণে তাকে সারাজীবন তৎকালীন এলোপ্যাথিক ডাক্তারদের অনেক অমানবিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল এবং সে পযর্ন্ত তাকে বৃদ্ধ বয়সে প্রিয় জন্মভূমিও ত্যাগ করতে হয়েছিল।

রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত অসুস্থ মানুষের মর্মান্তিক বেদনাকে যিনি নিজের হৃদয় দিয়ে সবচেয়ে বেশী উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাঁর নাম ডাঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যান। প্রচলিত চিকিৎসা বিজ্ঞানসমুহের ইতিহাস নিয়ে যারা ব্যাপক পড়াশুনা করেছেন, তারা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, তিনি ছিঁলেন পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত জন্ম নেওয়া সর্বশ্রেষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানী। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কারক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান কেবল একজন শ্রেষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানীই ছিলেন না; একই সাথে তিনি ছিলেন মানব দরদী একজন বিশাল হৃদয়ের মানুষ, একজন মহাপুরুষ, একজন শ্রেষ্ট কেমিষ্ট, একজন পরমাণু বিজ্ঞানী, একজন শ্রেষ্ট চিকিৎসক, একজন অণুজীব বিজ্ঞানী, একজন

শ্রেষ্ঠ ফার্মাসিষ্ট, একজন সংস্কারক, একজন বহুভাষাবিদ, একজন দুঃসাহসী সংগঠক, একজন অসাধারণ অনুবাদক, একজন নেতৃপুরুষ, একজন বিদগ্ধ লেখক, একজন সত্যিকারের ধার্মিক ব্যক্তি, একজন পরোপকারী-ত্যাগী মানব, একজন সুযোগ্য শিক্ষক, একজন আদর্শ পিতা, একজন রোমান্টিক প্রেমিক।

তৎকালের চিকিৎসা বিজ্ঞান এতই জঘন্য এবং বর্বরতায় পুর্ণ ছিল যে, হাসপাতাল বা ডাক্তারের চেম্বারকে কশাইখানা বলাই যুক্তিযুক্ত ছিল। সেখানে রোগীদেরকে রাখা হতো ভিজা এবং গরম কক্ষে, অখাদ্য-কুখাদ্য খেতে দেওয়া হতো, দৈনিক কয়েকবার রোগীদের শরীর থেকে রক্ত বের করে ফেলে দিয়ে দুর্বল করা হতো, রোগীদের শরীরে জোঁক লাগিয়ে (Leeching), কাপের মাধ্যমে (cupping) অথবা রক্তনালী কেটে (venesection) রক্তপাত করা হতো, পায়খানা নরম করার ঔষধ (purgatives) খাওয়ানোর মাধ্যমে অনেক দিন যাবত রোগীদের পাতলা পায়খানা করানো হতো, বমি করানো হতো ইত্যাদি ইত্যাদি। সিফিলিসের রোগীদের প্রচুর মার্কারী খাওয়ানোর মাধ্যমে লালা নিঃসরণ (salivation) করানো হতো এবং এতে অনেক রোগীই কয়েক বালতি লালা থুথু আকারে ফেলতো এবং অনেক রোগীর দাঁত পর্যন্ত পড়ে যেতো। অধিকাংশ রোগী (চিকিৎসা নামের) এই কুচিকিৎসা চলাকালীন সময়েই মারা যেতো। শরীরের মাংশ অর্থাৎ টিস্যুকে গরম লোহা অথবা বাষ্প দিয়ে পুড়ানো হতো (cauterization), গরম সুঁই দিয়ে খুচিয়ে চামড়ায় ফোস্কা ফেলা হতো (blistering), লাঠি অথবা পাথরের আঘাতে শরীরে কৃত্রিম ফোঁড়া-ঘা-ক্ষত সৃষ্টি করা হতো এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব ঘা-ক্ষত মাসের পর মাস বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা হতো। উপরে বর্ণিত সকল কিছুই করা হতো মারাত্মক জটিল রোগে আক্রান্ত সংকটাপন্ন রোগীর চিকিৎসা বা রোগমুক্তির নামে (যা আজকের দিনে কোন সুস' মানুষের পক্ষে কল্পনারও বাইরে)।

হোমিওপ্যাথিকে বলা হয় পূর্ণাঙ্গ বা সামগ্রিক (holistic) চিকিৎসা বিজ্ঞান অথবা মনো-দৈহিক গঠনগত (constitutional) চিকিৎসা বিজ্ঞান। অর্থাৎ এতে কেবল রোগকে টার্গেট করে চিকিৎসা করা হয় না বরং সাথে সাথে রোগীকেও টার্গেট করে চিকিৎসা করা হয়। রোগীর শারীরিক এবং মানসিক গঠনে কি কি ত্রুটি আছে, সেগুলোকে একজন হোমিও চিকিৎসক খুঁজে বের করে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করেন। রোগটা কি জানার পাশাপাশি তিনি রোগীর মন-মানসিকতা কেমন, রোগীর আবেগ-অনুভূতি কেমন, রোগীর পছন্দ-অপছন্দ কেমন, রোগী কি কি জিনিসকে ভয় পায়, কি ধরণের স্বপ্ন দেখে, ঘামায় কেমন, ঘুম কেমন, পায়খানা-প্রস্রাব কেমন, পেশা কি, কি কি রোগ সাধারণত বেশী বেশী হয়, অতীতে কি কি রোগ হয়েছিল, বংশে কি কি রোগ বেশী দেখা যায়, রোগীর মনের ওপর দিয়ে কি কি ঝড় বয়ে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি জেনে রোগীর ব্যক্তিত্ব (individuality) বুঝার চেষ্টা করেন এবং সেই অনুযায়ী ঔষধ নির্বাচন করেন। এই কারণে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় এমন রোগও খুব সহজে সেরে যায়, যা অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে কল্পনাও করা যায় না।

একজন হোমিও চিকিৎসক রোগীর শারীরিক কষ্টের চাইতে বেশী গুরুত্ব দেন রোগীর মানসিক অবস্থাকে। কেননা হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, অধিকাংশ জটিল রোগের সূচনা হয় মানসিক আঘাত (mental shock) কিংবা মানসিক অস্থিরতা/উৎকণ্ঠা/দুঃশ্চিন্তা (anxiety) থেকে। মোটকথা মারাত্মক রোগের প্রথম শুরুটা হয় মনে এবং পরে তা ধীরে ধীরে শরীরে প্রকাশ পায়। এজন্য হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলতেন যে, মনই হলো আসল মানুষটা (mind is the man)। তাছাড়া পৃথিবীতে হোমিও ঔষধই একমাত্র ঔষধ যাকে মানুষের শরীর ও মনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আবিষ্কার করা হয়েছে। এই কারণে হোমিও ঔষধ মানুষের শরীর ও মনকে যতটা বুঝতে পারে, অন্য কোন ঔষধের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা রোগ সারাতে না পারলেও প্রতিটি রোগের এক বা একাধিক নাম দিতে প্রাণপাত করে থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা ল্যাটিন বা গ্রীক ভাষায় রোগের এমন কঠিন এবং বিদঘুটে নাম দেন যে, রোগের নাম শুনেই ভয়ে রোগীদের লোম খাড়া হয়ে যায়। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে রোগের নামের এক কানাকড়িও মূল্য

নাই। চিকিৎসা বিজ্ঞানকে যিনি রোগের নামের গোলামী থেকে মুক্তি দিয়েছেন তার নাম হ্যানিম্যান। এই কৃতিত্বের দাবীদার একমাত্র তিনি। তাই এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা রোগের যত কঠিন কঠিন নামই দিক না কেন, তাতে একজন হোমিও ডাক্তারের ভয় পাওয়ার বা দুঃশ্চিন্তা করার কিছু নাই। রোগের লক্ষণ এবং রোগীর শারীরিক-মানসিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ঔষধ দিতে থাকুন। রোগের নাম যাই হোক না কেন, তা সারতে বাধ্য। হ্যানিম্যান তাই শত-সহস্রবার প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। রোগীর মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পযর্ন্ত সমস্ত লক্ষণ সংগ্রহ করুন এবং তার মনের গহীনে অন্তরের অলিতে-গলিতে যত ঘটনা-দুর্ঘটনা জমা আছে, তার সংবাদ জেনে নিন। তারপর সেই অনুযায়ী ঔষধ নির্বাচন করে খাওয়াতে থাকুন। যে-কোন রোগ বাপ বাপ ডাক ছেড়ে পালাবে। রোগের নাম নিয়ে অযথা সময় নষ্ট করার কোন দরকার নাই। হোমিও চিকিৎসায় যদি আপনার রোগ নির্মূল না হয় (অথবা কোন উন্নতি না হয়), তবে হোমিওপ্যাথির ওপর বিশ্বাস হারাবেন না। কেননা এটি হোমিও ডাক্তারের অজ্ঞতা / ব্যর্থতা। হোমিওপ্যাথির কোন ব্যর্থতা নাই। সূর্য পূরব দিকে উদিত হয়ে পশ্চিম দিকে অস্ত যায়- ইহা যেমন চিরন্তন সত্য ; হোমিওপ্যাথির সকল থিওরীও তেমনি চিরন্তন সত্য। এতে কোন অবৈজ্ঞানিক কথা বা বিজ্ঞানের নামে গোজামিলের স্থান নাই।

এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা নানান ধরনের রোগ নির্ণয়ের জন্য নানান রকমের টেস্টের ফ্যাশন চালু করেছেন। আসলেই এলোপ্যাথি একটি ফ্যাশন বা হুজুগ সবর্স্ব চিকিৎসা পদ্ধতি। গত একশ বছর যাবত তারা যে ফ্যাশন চালু করেছে, তা হলো কোন সিরিয়াস রোগী পেলেই তাকে রক্ত দিচ্ছে। ইহার পূরবে প্রায় দুই-তিনশ বছর তাদের ফ্যাশন ছিল কোন সিরিয়াস রোগী পেলেই তারা রোগীদের রগ কেটে (venesection) শরীর থেকে কয়েক লিটার রক্ত ফেলে দিতো। তখন তাদের বিশ্বাস ছিল যে, সকল জটিল রোগের মূল কারণ হলো শরীরে রক্তের পরিমাণ বেশী হওয়া (plethora)। তাদের কয়েকশ বছর ব্যাপী সেই শয়তানী পৈশাচিক চিকিৎসায় কত কোটি কোটি বনি আদম যে অকালে কবরে চলে গেছে ; যাদের তালিকায় সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রী-প্রেসিডেন্ট-রাজা-বাদশা এমনকি খ্রিস্টানদের প্রধান ধমর্গুরু পোপ পযর্ন্ত আছেন। তাদের সেই শয়তানী প্র্যাকটিস বন্ধ করে মানবজাতিকে রক্ষার জন্য মহাত্মা হ্যানিম্যানকে অন্তত ৫০ বছর সারা বিশ্বে প্রচারনা যুদ্ধ চালাতে হয়েছে। সে যাক, স্বয়ং এলোপ্যাথিক বিজ্ঞানীরাই স্বীকার করেন যে, বিভিন্ন রোগ নিণর্য়ের জন্য করা এসব টেস্টের শতকরা ৫০ ভাগ ক্ষেত্রেই ভুল রিপোর্ট আসে। আর রিপোর্ট ভুল হলে রোগের চিকিৎসাও হবে ভুল এবং আপনার মৃত্যু হবে ভুল চিকিৎসায়। আবার কিছু কিছু টেস্ট আছে যাতে আপনার যৌন ক্ষমতা নষ্ট হতে পারে আবার কোন কোন টেস্টের কারণে আপনিসহ আপনার পুরা বংশ যক্ষা রোগীতে পরিণত হতে পারেন। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর তথ্য হলো, অধিকাংশ টেস্টই মানুষের শরীরে ক্যানসার সৃষ্টি করে থাকে। এসব টেস্ট প্রচলনের মূল উদ্দেশ্য হলো বহুজাতিক কোম্পানী এবং ডাক্তারদের পকেট ভারী করা।

হ্যাঁ, কিছু কিছু প্যাথলজীক্যাল বা অন্যান্য টেস্ট হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদেরকেও রোগের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তথ্য পেতে সহায়তা করে থাকে বটে। তবে রোগীকে ধাপ্পা দিয়ে বোকা বানানো কিংবা নিজের পকেট ভারী করার হাতিয়ার হিসাবে এসব টেস্টকে হোমিও ডাক্তাররা ব্যবহার করতে অভ্যস্ত নন। যদিও এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা রোগ নির্ণয়ের জন্য নানা রকমের টেস্টের পদ্ধতি চালূ করেছেন, কিন্তু অতীব দুঃখের / আশ্চরযের বিষয় এই যে, রোগ কি জিনিস তা-ই আজ পযর্ন্ত তারা বুঝতে পারেন নাই। ফলে তারা রোগ নামক এই কিম্ভুতকিমাকার বস্তুকে ভেঙ্গে একেবারে টুকরা টুকরা করে ফেলেছেন ; কেউ নিয়ে আছেন হৃদরোগ, কেউ বাতরোগ, কেউ চর্মরোগ, কেউ যৌনরোগ, স্নায়ুরোগ, হাড্ডিরোগ ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রত্যেকে তার টুকরার পেছনে খাটতে খাটতে জান তেজপাতা করে ফেলেছেন। ফলে রোগ সম্পর্কে তাদের ধারনা জন্মেছে অনেকটা ছোটবেলায় পড়া সেই ঈশপের গল্পের সাত অন্ধের হাতি দেখার মতো। যাদের একজন হাতির পা হাতড়িয়ে ধারণা করেছিল হাতি বুঝি গাছের মতো আবার আরেকজন হাতির লেজ হাতড়িয়ে ধারণা করেছিল যে হাতি বুঝি বাঁশের মতো ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে সত্যিকারের হাতি কেমন

তা যেমন সেই অন্ধরা বুঝতে পারেনি, তেমনি রোগের সত্যিকারের রূপ সম্পর্কেও এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা আজও জানতে পারেনি।

যেহেতু হোমিও ঔষধের মূল্য খুবই কম, সেহেতু হোমিও ঔষধের ব্যবসা তেমন লাভজনক নয়। ফলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা যদি পৃথিবীর সকলের নিকট গ্রহনযোগ্য হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীব্যাপী বহুজাতিক ঔষধ কোম্পানীসমূহের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ঔষধ ব্যবসা মাঠে মারা যাবে। এজন্য বড় বড় ঔষধ কোম্পানীগুলি হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে বদনাম ছড়ানোর জন্য প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে থাকে। পাশাপাশি নিজেদের আজেবাজে সব মারাত্মক ধ্বংসাত্মক ক্ষতিকর ঔষধের কাল্পনিক গুণগান প্রচারে লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় করে সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে টাকার পাহাড় গড়ে তোলে। আমরা অনেকেই জানি না যে, এলোপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজগুলোতে কি পড়ানো হবে, এলোপ্যাথিক পাঠ্য-পুস্তকগুলোতে কি লেখা থাকবে, এলোপ্যাথিক বিজ্ঞানীরা কি কি বিষয় নিয়ে গবেষণা করবেন, এলোপ্যাথিক মেডিক্যাল জানার্লগুলোতে কি কি আবিষ্কারের খবর ছাপানো আর কি কি আবিষ্কারের খরব ছাপানো যাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি সবই নিয়ন্ত্রণ করে এসব নরঘাতক রক্তচোষা বহুজাতিক ঔষধ কোম্পানীগুলো। রোগের জন্য ভুল হোমিও ঔষধ দীর্ঘদিন সেবনেও মারাত্মক কোন ক্ষতি হয় না; পক্ষান্তরে রোগের জন্য প্রযোজ্য সঠিক এলোপ্যাথিক ঔষধও দীর্ঘদিন সেবনে এক বা একাধিক নতুন রোগের সৃষ্টি করে থাকে। ১৯৬৪ সালে যখন এলোপ্যাথিক ঔষধ থেলিডোমাইড (thalidomide) মার্কেটে আসে, তখন দাবী করা হয়েছিল যে, এটি টেনশানের বা মাথা ঠান্ডা রাখার কিংবা নিদ্রাহীনতার জন্য এ যাবত কালের সবচেয়ে ভালো এবং নিরাপদ ঔষধ।

কিন্তু দুই বছরের মাথায় ১৯৬৬ সালে জানা যায় যে, যে-সমস্ত গর্ভবতী মহিলা থেলিডোমাইড খেয়েছেন, তারা হাত এবং পা বিহীন পঙ্গু-বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। পশ্চিম জার্মানীর স্বাস্থ্য বিভাগ একাই থেলিডোমাইড খাওয়ার ফলে দশ হাজার বিকলাঙ্গ শিশুর জন্মের ঘটনা রেকর্ড করেছে। সত্যিকার অর্থে এটি ছিল চিকিৎসার ইতিহাসে সবচেয়ে জঘন্য এবং নির্মম ঘটনা। অস্ট্রিয়ার হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাঃ জর্জ ভিথুলকাস ২০ই জুলাই ২০০০ সালে ডঃ পিটার মোরেলের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, “প্রেসক্রিপশান ভিত্তিক এসব রাসায়নিক ঔষধের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে বিপরযয়কর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে, যা পাশ্চাত্যের লোকদের সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতিকে দ্রুত পরিবর্তন করে ফেলছে। বিষয়টি কয়েক প্রজন্মের মধ্যে প্রকাশ লাভ করবে। আমাদেরকে ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ব্যাপারটি কেবল আমেরিকান জনগণের বেলাতেই নয়; বরং সমগ্র সুসভ্য জগতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যারা (বহুল) প্রচলিত (এলোপ্যাথিক) চিকিৎসা পদ্ধতি বেশী ব্যবহার করছে (ক্যামিকেল ঔষধ এবং টিকা/ ভ্যাকসিন)।

আমেরিকান লোকেরা যেহেতু এগুলো বেশী ব্যবহার করছে, সেহেতু ইহার মারাত্মক কুফল তাদের মধ্যেই প্রথম প্রকাশ পাবে। ক্যানসার, আলজেইমারস ডিজিজ, ডায়াবেটিস, হাঁপানি, নিউরোমাসকুলার ডিজিজ, মাল্টিপল স্কেরোসিস, কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজ, এলার্জিক কন্ডিশানস, প্যানিক এটাক, এঙজাইটিস স্টেটস, ডিপ্রেশান, ফোবিক স্টেটস, মানসিক রোগ প্রভৃতি বিশ্বব্যাপী মহামারী আকারে দেখা দিবে যা দেখে আমাদের ভেতরে কম্পন সৃষ্টি হবে।” ওয়াশিংটন ডিসি-তে আমেরিকান ইনিস্টিটিউট অব হোমিওপ্যাথি’র এক সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন যে, “পৃথিবীর বুকে রোগ নিরাময়ের সব চাইতে শক্তিশালী পন্থা হলো হোমিওপ্যাথি। আমি দেখতে পাচ্ছি সাধারণভাবে মানুষের স্বাস্থ্যের অবস্থা এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে, তাকে পুণরুদ্ধার করার কোন আশাই নাই। একমাত্র হোমিওপ্যাথি তাকে পুণরুজ্জীবিত করার আশা দিতে পারে। যেভাবে পাইকারী হারে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করা হচ্ছে, তাতে ইমিউন সিস্টেম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এতে করে ভয়ঙ্কর সব দুরারোগ্য রোগের আমদানীর দরজা খুলে যাচ্ছে”। দুঃখের বিষয় এই যে, এলোপ্যাথিক কুচিকিৎসায় কেবল যে সাধারণ মানুষ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাই নয় ; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এলোপ্যাথিক ডাক্তার এবং তাদের বউ-ছেলে-মেয়ে-নাতি-পুতিরাও তার করুণ শিকারে পরিণত হচ্ছে।

হোমিওপ্যাথি কেবল রোগের নয়, সাথে সাথে রোগীরও চিকিৎসা করে থাকে। হোমিও ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা বিষক্রিয়া এতই কম যে, নাই বললেই চলে। এন্টিবায়োটিকের মতো ইহারা ব্রেনের, হজম শক্তির কিংবা শরীরের রোগ প্রতিরোধ শক্তির (immune system) ক্ষতি করে না। হোমিওপ্যাথিতে পচানব্বই ভাগ অপারেশনের কেইস শুধু ঔষধেই সারিয়ে তোলা যায়। প্রচলিত সকল চিকিৎসা শাস্ত্রে যাদের পড়াশুনা আছে, তারা দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করেন যে, হোমিওপ্যাথি রোগ-ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর এক বিরাট নেয়ামত। হোমিওপ্যাথি মানুষ, পশু-পাখি, জীব-জন্তু, বৃক্ষতরুলতা সকলের ক্ষেত্রেই সমানভাবে কাযর্কর এবং নিরাপদ। হোমিওপ্যাথিতে রোগের সঠিক মূল কারণটিকে দূর করার চিকিৎসা দেওয়া হয়। হোমিও ঔষধ প্রয়োগ করা হয় খুবই অল্প মাত্রায় যা শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ শক্তিকে বৃদ্ধি করার মাধ্যমে রোগ নিরাময় করে।

নব্বই ভাগ হোমিও ঔষধ তৈরী করা হয় গাছপালা থেকে এবং বাকী দশভাগ ঔষধ তৈরী করা হয়ে থাকে ধাতব পদার্থ, বিভিন্ন প্রাণী এবং রাসায়নিক দ্রব্য থেকে। হোমিও ঔষধ মানুষের জন্মগত নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ শক্তিকে (immune system) সাহায্য / শক্তিশালী করার মাধ্যমে রোগ নিরাময় এবং রোগ প্রতিরোধ করে। পক্ষান্তরে এলোপ্যাথিক ঔষধ ইমিউন সিষ্টেমকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং কখনও কখনও একেবারে সারাজীবনের ধ্বংস করে দেয়। হোমিও ঔষধ দীর্ঘদিন সেবনেও এমন কোন নিভরর্তাশীলতার সৃষ্টি হয় না যাতে পরবর্তীতে সেটি বন্ধ করে দিলে শরীরে কোন সমস্যা দেখা দেয়। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন যে, “কম খরচে এবং (রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে) কম কষ্ট দিয়ে রোগ নিরাময়ের সর্বশেষ এবং সর্বোত্তম চিকিৎসা পদ্ধতি হলো হোমিওপ্যাথি।” সবশেষে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বন্ধু হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর ওসীলায় আমাদের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে পরকালীন কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করুন এই প্রার্থনা করছি।

**ডাঃ বশীর মাহমুদ ইলিয়াস**

ডিজাইন স্পেশালিষ্ট, ইসলাম গবেষক, হোমিও কনসালটেন্ট

E-mail : **Bashirmahmudellias@hotmail.com**

# সূচিপত্র

# ঔষধ নির্বাচন করবেন কিভাবে ?

হোমিওপ্যাথি একটি লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা বিজ্ঞান। মনে রাখতে হবে যে, রোগের লক্ষণগুলোই হলো রোগের প্রকৃত পরিচয় পাওয়ার একমাত্র রাস্তা। তাই রোগের শারীরিক লক্ষণসমূহ, মানসিক লক্ষণসমূহ এবং রোগীর ব্যক্তিগত লক্ষণসমূহ বুঝতে না পারলে কিংবা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলি সংগ্রহ করতে না পারলে, সঠিক ঔষধ নির্বাচন করা সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে হাজার বার ঔষধ পাল্টিয়ে এবং হাজার ডোজ ঔষধ খেয়েও সামান্য ছোটখাট রোগও সারানো যায় না। আবার মারাত্মক অসুখ-বিসুখ কিংবা অনেক বছরেরও পুরনো রোগ-ব্যাধিও মাত্র এক ডোজ ঔষধে নির্মূল হয়ে যায়, যদি লক্ষণের সাথে পুরোপুরি মিলিয়ে ঔষধ দেওয়া যায়। রোগের নাম নয়, বরং রোগ এবং রোগীর সমস্ত লক্ষণসমূহের উপর ভিত্তি করে ঔষধ নির্বাচন করতে হবে। কারণ হোমিওপ্যাথিতে রোগের নামে কোন ঔষধ নাই। একই রোগের জন্য সব রোগীকে একই ঔষধ দিলে কোন কাজ হবে না। যেমন ধরুন ডায়েরিয়ার কথা, ডায়েরিয়ার সাথে যদি পেটে ব্যথা থাকে তবে এক ঔষধ আর যদি পেটে ব্যথা না থাকে তবে অন্য ঔষধ। ডায়েরিয়ার ফলে যদি রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে তবে এক ঔষধ আর যদি দুর্বল না হয় তবে অন্য ঔষধ। ডায়েরিয়া শুরু হওয়ার কারণের ওপর ভিত্তি করেও ঔষধ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে এবং ব্যথা বা পায়খানার রঙ, গন্ধ, ধরণ বা পরিমাণের ওপর ভিত্তি করেও ঔষধ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

আপনার রোগের লক্ষণসমূহ যে-ঔষধের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পাওয়া যাবে, সেটি হবে আপনার উপযুক্ত ঔষধ। মনে করুন আপনার জ্বর হয়েছে ; যদি দেখেন যে আপনার জ্বরের দুইটি লক্ষণ ব্রায়োনিয়া ঔষধটির সাথে মিলে যায়, অন্যদিকে তিনটি লক্ষণ বেলেডোনা ঔষটির সাথে মিলে যায়, তাহলে বেলেডোনাই হবে আপনার উপযুক্ত ঔষধ। আবার শারীরিক লক্ষণের চাইতে মানসিক লক্ষণের গুরুত্ব বেশী। কাজেই যদি দেখেন যে, আপনার শারীরিক লক্ষণসমূহ রাস টক্স ঔষধটির সাথে মিলে যায় কিন্তু মানসিক লক্ষণ একোনাইট ঔষধটির সাথে মিলে যায়, তাহলে একোনাইট ঔষধটি-ই আপনার খাওয়া উচিত। হোমিওপ্যাথিতে একবারে একটির বেশী ঔষধ খাওয়া নিষিদ্ধ।

মনে করুন, আপনার আমাশয় হয়েছে। তো আমাশয় হলে সাথে পেট ব্যথাও থাকে এবং কয়েকবার পায়খানা করলে শরীরে দুর্বলতাও এসে যায়। এক্ষেত্রে এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা আপনাকে তিনটি ঔষধ দিবে; একটি আমাশয়ের জন্য, একটি পেটব্যথার জন্য এবং স্যালাইন দিবে দুর্বলতার জন্য। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে যদি ঠিকমতো লক্ষণ মিলিয়ে দিতে পারেন তবে একটি ঔষধেই আপনার আমাশয়, পেট ব্যথা এবং দুর্বলতা সেরে যাবে। এজন্য তিনটি ঔষধ লাগবে না। ভাষাজ্ঞানের অভাবে অবুঝ শিশুরা এবং পশুপাখিরা তাদের অনেক কষ্টদায়ক রোগ লক্ষণের কথা বলতে পারে না। রোগের যন্ত্রণায় বেঁহুশ ব্যক্তিও তাদের কষ্টের কথা বলতে পারে না। এইসব ক্ষেত্রে আমাদেরকে বুদ্ধি খাটিয়ে রোগীর লক্ষণসমূহ আন্দাজ করে নিতে হবে। প্রতিটি রোগের সাথে যতগুলো ঔষধের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার সবগুলো প্রথমে পড়ে নিন এবং তারপর যে ঔষধটি আপনার রোগ লক্ষণের সাথে সবচেয়ে বেশী মিলে যায়, সেটি খাওয়া শুরু করুন।

হোমিও চিকিৎসার আরেকটি অসুবিধা হলো ঘনঘন রোগের লক্ষন পরিবর্তন হয়ে যায় এবং তখন ঔষধও পরিবর্তন করতে হয়। যেমন ধরুন, আপনি জ্বরের জন্য লক্ষণ অনুযায়ী ব্রায়োনিয়া (গলা শুকনা, পায়খানা শক্ত) খেলেন। দুয়েকদিন বা দুয়েকবার খাওয়ার পর দেখলেন যে, আপনার জ্বর অর্ধেক ভালো হয়ে গেছে এবং জ্বরের লক্ষণ পাল্টে গিয়ে সালফারের লক্ষণ (পায়ের তালুতে জ্বালাপোড়া) এসে গেছে। আবার দুয়েকদিন বা দুয়েকবার সালফার খাওয়ার পর দেখলেন যে, আপনার জ্বর বারোআনা ভালো হয়ে গেছে এবং জ্বরের লক্ষণ পাল্টে গিয়ে মার্ক

সলের লক্ষণ (রাতে বৃদ্ধি, প্রচুর ঘাম, মুখে দুর্গন্ধ) এসে গেছে। আবার দুয়েকদিন বা দুয়েকবার মার্ক সল খাওয়ার পর দেখলেন যে, আপনার জ্বর ষোলআনা ভালো হয়ে গেছে ; কাজেই ঔষধ পুরোপুরি বন্ধ করে দিন। হ্যাঁ, এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। কাজেই ঔষধ খাওয়ার পাশাপাশি আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে, রোগের লক্ষণ পাল্টে গিয়ে অন্যকোন ঔষধের লক্ষণ এসে গেছে কিনা। সেক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষণ অনুযায়ী নতুন অন্যকোন ঔষধ খাওয়া শুরু করতে হবে।

## ঔষধ কেনার নিয়ম-কানুন ?

জার্মানী, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড, পাকিস্তান, ভারত প্রভৃতি দেশে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ তৈরী হয়ে থাকে। বাংলাদেশেও প্রায় আটাত্তরটির মতো হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতকারী কোম্পানী আছে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কেনার সময় দোকানদারকে বলবেন জার্মানীর অথবা আমেরিকান ঔষধ দেওয়ার জন্য। কেননা জার্মানীর এবং আমেরিকান ঔষধের কোয়ালিটির ওপর সবারই আস্থা আছে। হোমিওপ্যাথিক মূল ঔষধটি তৈরী করা হয় তরল আকারে। কিন্তু সেগুলো রোগীদের দেওয়া হয়ে থাকে পানিতে মিশিয়ে, (চিনির) বড়িতে মিশিয়ে, দুধের পাউডারে মিশিয়ে কিংবা অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি মূল ঔষধটিও দেওয়া হয়। তবে সরাসরি মূল ঔষধটি কেনা বা খাওয়া উচিত নয়। কেননা এতে ঔষধ বেশী খাওয়া হয়ে যায়; ফলে তার সাইড-ইফেক্টও বেশী হতে পারে। তাছাড়া শিশির কর্ক টাইট করে লাগাতে ভুলে গেলে ঔষধ উড়ে যায় এবং মুখ খুলে বা শিশি ভেঙ্গে মাটিতে পড়ে গেলে সেগুলো আর উঠানো যায় না। কাজেই ঔষধ চিনির বড়িতে কেনা এবং খাওয়াই বুদ্ধিমানের পরিচায়ক। এক ড্রাম, দুই ড্রাম, হাফ আউন্স, এক আউন্স ইত্যাদি পরিমাণে ঔষধ ক্রয় করবেন।

ঔষধ কেনার সময় এই ভাবে বলতে হবে যে, ডাক্তার সাহেব ! আমাকে অমুক ঔষধটি অমুক শক্তিতে (যেমন Nux vomica 30) বড়িতে এক ড্রাম দেন। (কারণ হোমিওপ্যাথিক ঔষধের যারা ব্যবসা করেন তারা সবাই গভার্নমেন্ট রেজিষ্টার্ড হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার।)

## হোমিও ঔষধের মেয়াদ থাকে কত দিন ?

মূল হোমিও ঔষধ যা তরল আকারে তৈরী করা হয়ে থাকে, তার কোন এক্সপাইরি ডেট নাই অর্থাৎ এগুলো কখনও নষ্ট হয় না। কেননা মূল হোমিও ঔষধটি ইথাইল এলকোহল বা রেকটিফাইড স্পিরিটে তৈরী করা হয়ে থাকে। আর এলকোহল বা স্পিরিট যেহেতু কখনও নষ্ট হয় না, সেহেতু মূল হোমিও ঔষধও কখনো নষ্ট হয় না। এগুলো আপনি কেয়ামত পযর্ন্ত নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু মূল ঔষধটি যখন আপনি চিনির বড়িতে, পাউডারে বা পানিতে মিশিয়ে কিনে আনবেন, সেটি আপনি অনন্তকাল ব্যবহার করতে পারবেন না। কেননা সেগুলো কয়েক বছর পরেই নষ্ট হয়ে যায়। যেমন - আপনি একটি ঔষধ চিনির বড়িতে কিনে আনলেন এবং পাঁচ বছর পরে দেখলেন সাদা চিনির বড়িগুলি হলুদ বা লাল বা কালো হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে ঔষধগুলি ফেলে দেওয়া উচিত ; কেননা এগুলো যে নষ্ট হয়ে গেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

## কত শক্তির ঔষধ খাওয়া উচিত ?

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শক্তিগুলো হলো ৩, ৬, ১২, ৩০, ২০০, ১০০০ (বা 1M), ১০০০০ (বা 10M), ৫০০০০ (বা 50M), ১০০,০০০ (বা CM) ইত্যাদি। সবচেয়ে নিম্নশক্তি হলো মাদার টিংচার বা কিউ (Q) এবং ইহার শক্তিকে ধরা হয় শূণ্য (zero)। তাদের মধ্যে ৩, ৬, ১২, ৩০ কে বলা হয় নিম্নশক্তি আর ২০০ শক্তিকে বলা হয় মধ্য শক্তি। পক্ষান্তরে ১০০০, ১০০০০, ৫০০০০ এবং ১০০০০০ কে ধরা হয় উচ্চ শক্তি হিসাবে। নতুন রোগ বা ইমারজেন্সী রোগের ক্ষেত্রে নিম্নশক্তি এবং মধ্যশক্তির ঔষধ সবচেয়ে ভালো কাজ করে। পক্ষান্তরে উচ্চ শক্তির ঔষধ প্রয়োগ করতে হয় অনেক দিনের পুরনো রোগে অর্থাৎ ক্রনিক ডিজিজে। হোমিওপ্যাথির আবিষ্কারক ডাঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের মতে, ৩০ শক্তি হলো স্ট্যান্ডার্ড শক্তি। হ্যাঁ, ঔষধের প্রধান প্রধান লক্ষণসমূহের অনেকগুলো যদি রোগীর মধ্যে নিশ্চিত পাওয়া যায়, তবে এক হাজার (1M) বা দশ হাজার (10M) শক্তির ঔষধও খেতে পারেন। সাধারণত যে-কোন রোগে নিম্ন শক্তির ঔষধ খেলে কয়েক মাত্রা খাওয়া লাগতে পারে কিন্তু উচ্চ শক্তির ঔষধ খেলে এক মাত্রাই যথেষ্ঠ।

কিন্তু উচ্চ শক্তির ঔষধ অপ্রয়োজনে ঘনঘন খেলে মারাত্মক বিপদ হতে পারে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া উচ্চ শক্তির ঔষধ খাওয়া উচিত নয়। কেননা সেক্ষেত্রে ঔষধের নির্বাচন ভুল হলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। একই শক্তির ঔষধ সাধারণত একবারের বেশী খাওয়া উচিত নয়। অনেক সময় দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার খেলেও উপকার হয়। কিন্তু ইহার পর আর ঐ শক্তির ঔষধে তেমন কোন উপকার হয় না। **হ্যানিম্যানের নির্দেশ হলো, প্রতিবার ঔষধের শক্তি বৃদ্ধি করে খেতে হবে। আপনার কাছে যদি একাধিক শক্তির ঔষধ না থাকে, তবে একমাত্রা (এক ফোটা বা ৪/৫ টি বড়ি) ঔষধকে আধা বোতল পানিতে মিশিয়ে প্রতিবার খাওয়ার পূর্বে জোরে দশবার ঝাঁকি দিয়ে ঔষধের শক্তি বাড়িয়ে খান।** (সাধারণত হাফ লিটার বা তার চাইতেও ছোট বোতল ব্যবহার করা উচিত। সাধারণত একই বোতল একবারের বেশী ব্যবহার করা উচিত নয়। তবে অন্য কোন বোতল না থাকলে সেটিকে অবশ্যই সাবান দিয়ে এবং গরম পানি দিয়ে ভালো করে অনেকবার ধুয়ে নেওয়া উচিত।)



## ঔষধ কি পরিমাণ খেতে হবে ?

পূর্ণ বয়স্কদের ক্ষেত্রে ঔষধ বড়িতে খেলে সর্বোচ্চ ৪/৫ (চার/পাঁচ) টি বড়ি করে খাবেন এবং তরল আকারে মূল ঔষধটি খেলে এক ফোটা করে খাওয়াই যথেষ্ট। তের বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের ক্ষেত্রে ঔষধ বড়িতে খেলে ২/৩ (দুই/তিন) টি বড়ি করে খাবেন এবং তরল আকারে মূল ঔষধটি খেলে আধা ফোটা করে খাবেন। পক্ষান্তরে দুয়েক দিন বা দুয়েক মাসের একেবারে ছোট নবজাতক শিশুকে ঔষধ বড়িতে খাওয়ালে ১/২ (এক/দুইটি) টি বড়ি করে খাওয়াবেন এবং তরল আকারে মূল ঔষধটি খাওয়ালে এক ফোটার চার ভাগের এক ভাগ খাওয়ানোই যথেষ্ট। (এক ফোটা ঔষধকে এক চামচ পানির সাথে ভালো করে মিশিয়ে তার অর্ধেকটি ফেলে দিয়ে বাকী অর্ধেকটি খেলেই আধা ফোটা ঔষধ খাওয়া হবে। তেমনিভাবে এক ফোটা ঔষধকে এক চামচ পানির সাথে ভালো করে মিশিয়ে তার চার ভাগের তিন ভাগ ফেলে দিয়ে বাকীটুকু খেলেই এক ফোটার চার ভাগের এক ভাগ ঔষধ খাওয়া হবে।) কখনও ভাববেন না যে, এতো কম করে ঔষধ খাওয়ালে রোগ সারবে কিনা ?
মনে রাখবেন ঔষধ বেশী খাওয়ালে বরং রোগ বেড়ে যেতে পারে। এজন্য বিশেষত শিশুরা মারাত্মকভাবে অসুস্থ হলে তাদেরকে নির্ধারিত পরিমাণের চাইতে বেশী ঔষধ খাওয়াবেন না, তাহলে তাদের রোগ বেড়ে গিয়ে জীবন নিয়ে

টানাটানি শুরু হতে পারে। হোমিও ঔষধ খাওয়ার সবচেয়ে ভালো পন্থা হলো ৪-৫টি বড়ি / ১ ফোটা ঔষধ আধা লিটার বিশুদ্ধ পানির সাথে মিশিয়ে নির্দিষ্ট সময় পরপর সেখান থেকে এক চামচ করে পানি খাওয়া এবং প্রতিবার খাওয়ার পূর্বে জোরে ১০টি ঝাঁকি দিয়ে নেওয়া।

## ঔষধ কিভাবে খেতে হবে ?

ঔষধ খেতে হবে প্রধানত মুখ দিয়ে। যত ইমারজেন্সী সমস্যাই হোক না কেন, মুখে খেলেই চলবে। ঔষধের নির্বাচন যদি সঠিক হয়, তবে নিশ্চিত থাকতে পারেন যে সেটি মুখে খেলেও একেবারে হাই পাওয়ারের ইনজেকশানের চাইতেও অন্তত একশগুণ দ্রুত কাজ করবে। ইনজেকশান দেওয়া, পায়খানার রাস্তা দিয়ে ঔষধ ঢুকানো বা এই জাতীয় কোন শয়তানী সিষ্টেমের হোমিওপ্যাথিতে স্থান নেই। যদি রোগীর দাঁত কপাটি লেগে থাকে বা বমির জন্য ঔষধ গিলতে না পারে, তবে ঔষধ মুখে বা ঠোটের ফাঁকে রেখে দিলেই চলবে। আবার ঔষধকে একটি বোতলে নিয়ে একটু পানির সাথে মিশিয়ে জোরে কয়েকটা ঝাঁকি দিয়ে তার বাষ্প নিঃশ্বাসের সাথে টেনে নিলেও কাজ হবে। আরেকটি পন্থা আছে, তাহলো ঔষধকে একটু পানিতে মিশিয়ে পরিষ্কার চামড়ার ওপর মালিশ করা (যেখানে কোন চর্মরোগ নেই)। যে-সব শিশু বুকের দুধ খায়, তাদের যে-কোন রোগ-ব্যাধিতে তাদেরকে ঔষধ না খাইয়ে বরং তাদের মা-কে খাওয়ালেও কাজ হবে। শিশুরা বা মানসিক রোগীরা যদি ঔষধ খেতে অস্বীকার করে, তবে তাদেরকে না জানিয়ে দুধ, পানি, ভাত, চিড়া, মুড়ি, বিস্কিট, ইত্যাদির সাথে মিশিয়ে ঔষধ খাওয়াতে পারেন। তাতেও কাজ হবে।

## ঔষধ কতক্ষণ পরপর খেতে হবে ?

অধিকাংশ নতুন রোগ (acute disease) একমাত্রা হোমিও ঔষধেই সেরে যায়; যদি ঔষধের লক্ষণ আর রোগের লক্ষণ একশ ভাগ মিলিয়ে সঠিক শক্তিতে ঔষধ দেওয়া যায়। কাজেই দ্বিতীয়বার ঔষধ খাওয়ার প্রয়োজন হয় না। ঔষধের এমন অসাধারণ ক্ষমতাকে প্রথম প্রথম অনেকের কাছে যাদুর মতো মনে হতে পারে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দিনে তিন-চার বার করে দুই-তিন দিন বা তারও বেশী দিন খাওয়া লাগতে পারে। ঔষধ খাওয়ার পর যখনই দেখবেন যে, রোগের অবস্থা উন্নতি হইতেছে সাথে সাথে ঔষধ খাওয়া বন্ধ করে দেবেন। আবার যখন দেখবেন যে, রোগের উন্নতি থেমে গেছে অর্থাৎ রোগের অবস্থা আবার খারাপের দিকে যাইতেছে, তখনই ঔষধের আরেকটি মাত্রা খেয়ে নিবেন। তাই বলা যায়, একমাত্রা ঔষধ খাওয়ার পর যদি দশ মিনিট আপনার রোগ ভাল থাকে, তবে দশ মিনিট পরে আরেক মাত্রা ঔষধ খাবেন। পক্ষান্তরে একমাত্রা ঔষধ খাওয়ার পর যদি দশ ঘণ্টা আপনার রোগ ভাল থাকে, তবে দশ ঘণ্টা পরেই আরেক মাত্রা ঔষধ খেতে পারেন। আবার একমাত্রা ঔষধ খাওয়ার পর যদি দশ বছরও আপনার রোগ ভাল থাকে, তবে দশ বছর পরেই দ্বিতীয় মাত্রা ঔষধ খাওয়া উচিত হবে। হোমিওপ্যাথিতে এমন কোন হাস্যকর নিয়ম নেই যে, আপনার রোগ থাকুক বা না থাকুক ঔষধ রোজ তিনবেলা করে সাতদিন খেতেই হবে। অনেকেই বলেন যে, "আমি এক ডোজ ঔষধ খেয়ে পরে আবার খাওয়ার কথা ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু পরদিন দেখলাম আমার রোগ ভালো হয়ে গেছে ; আমি তো অবাক !"

## ঔষধের কাজের জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ?

সাধারণত রোগ যত কষ্টদায়ক হয়, ঔষধ তত দ্রুত কাজ করে। যেমন তীব্র পেট ব্যথা, আঘাতের ব্যথা বা বুকের ব্যথায় দুই থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঔষধের কাজ শুরু হবে। যদি না হয়, তবে আরেক মাত্রা ঔষধ খেয়ে আরো পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে পারেন। তাতেও কাজ না হলে ঔষধ পরিবর্তন করে লক্ষণ মিলিয়ে অন্য ঔষধ খাওয়া শুরু করুন। অস্ট্রিয়ান হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানী জর্জ ভিথুলকাসের মতে, ইমারজেন্সী পরিস্থিতিতে ঔষধে কাজ না করলে ঘণ্টায় বিশ বার ঔষধ পরিবর্তন করতে পারেন। তবে সাধারণ ক্ষেত্রে ঔষধের কাজ বুঝার জন্য চার/পাঁচ ঘণ্টা অপেক্ষা করা উচিত। যেমন কারো সাতদিন যাবত সর্দি বা কাশি লেগে আছে, এসব ক্ষেত্রে ১০ মিনিটে রোগমুক্ত হওয়ার আশা করা ঠিক হবে না। বরং রোজ তিন/চার বার করে (কমপক্ষে) তিনদিন ঔষধ খাওয়ার গাইড লাইন অনুসরণ করা যেতে পারে। তবে ইমারজেন্সী সমস্যায় ঔষধের একশানের আশায় ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করে রোগের যন্ত্রনা ভোগ করা কিছুতেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

## কিভাবে বুঝতে পারব যে, ঔষধের নির্বাচন ভুল হয়েছে ?

ঔষধ খাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেও যদি তার কোন ইতিবাচক ফল শরীরে বা মনে প্রকাশ না পায়, তবে বুঝতে হবে যে ঔষধটির নির্বাচন ভুল হয়েছে অর্থাৎ রোগ এবং রোগীর লক্ষণের সাথে ঔষধের লক্ষণ সম্পূর্ণভাবে মিলে নাই। এইক্ষেত্রে নতুন করে চিন্তা করে অন্য একটি ঔষধ নির্বাচন করুন যার সাথে রোগ এবং রোগীর লক্ষণসমূহের ভালো মিল আছে।

## ঔষধ নির্বাচন ঠিক আছে কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না ?

যদি দেখেন যে, লক্ষণ অনুযায়ী ঔষধের নির্বাচন সঠিক হয়েছে কিন্তু একমাত্রা খাওয়ানোর পরে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হলেও কোন কাজ হচ্ছে না অথবা একটু উন্নতি হয়ে তারপর থেমে গেছে। এইক্ষেত্রে আরেক মাত্রা ঔষধ খেয়ে নিন, তাতে কাজ হতে পারে। এমনকি প্রয়োজনে একটু পরে তৃতীয় আরেক মাত্রা খেয়ে দেখতে পারেন। কেননা অনেক সময় দেখা যায় একটি ঔষধ প্রথমবার খাওয়ার পরে কোন কাজ করে নাই কিন্তু একই ঔষধ একই শক্তিতে একই পরিমাণে দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার খাওয়ার পরে কাজ শুরু হয়। আরেকটি সমাধান হলো, কয়েকটি বড়িকে আধা গ্লাস পানিতে মিশিয়ে চামচ দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে সেখান থেকে কিছুক্ষণ পরপর এক চুমুক করে পান করুন। এতে কাজ হতে পারে; কেননা মাঝে মধ্যে দেখা যায় একই ঔষধ শুকনা বড়িতে খাওয়ায় কাজ হয় না কিন্তু পানিতে মিশিয়ে খেলে কাজ করে। সর্বশেষ সমাধান হলো ঔষধের শক্তি বাড়িয়ে খাওয়া, কেননা রোগের শক্তির চাইতে ঔষধের শক্তি কম হলে সেটি রোগকে নির্মূল করতে পারে না। যেমন আপনি হয়ত ৬ শক্তির ঔষধ খাচ্ছিলেন, তার বদলে ৩০ শক্তিতে খাওয়া শুরু করুন।

## ঔষধ খেয়ে রোগ বেড়ে গেলে কি করব ?

ঔষধ খাওয়ার পরে রোগ বেড়ে গেলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই; কেননা ইহা একটি শুভ লক্ষণ। ঔষধ খাওয়ার পরে রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হলো ঔষধের নির্বাচন সঠিক হয়েছে, রোগের শক্তির চাইতে ঔষধের শক্তি একটু বেশী হয়েছে আর এই কারণে আপনার রোগ নিশ্চিতভাবে সেরে যাবে। যারা খুব সেনসিটিভ রোগী তাদের ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে ঔষধ খাওয়ার পরে অল্প সময়ের জন্য রোগের লক্ষণ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। দুই কারণে ঔষধ খাওয়ার পরে রোগ বেড়ে যেতে পারে - ঔষধের শক্তি দরকারের চাইতে বেশী হলে কিংবা ঔষধের পরিমাণ দরকারের চাইতে বেশী হলে। যেমন - ৬ শক্তি যেখানে যথেষ্ট সেখানে ২০০ শক্তি খাইলে অথবা ২ টি বড়ি খাওয়া যেখানে যথেষ্ট সেখানে ৫/১০টি বড়ি খাইলে। সে যাক, ঔষধ খেয়ে রোগ বেড়ে গেলে সাথে সাথে ঔষধ খাওয়া বন্ধ করে দিন। অল্প সময়ের মধ্যে রোগের তীব্রতা কমতে শুরু করবে। রোগের তীব্রতা কমে আসার পরেই কেবল প্রয়োজন হলে আবার এক ডোজ ঔষধ খেতে পারেন। হ্যাঁ, ঔষধের কারণে রোগ বেড়ে গেলেও তাতে রোগীর কষ্ট তেমন একটা বাড়ে না কিংবা বলা যায় তাতে রোগীর কোন ক্ষতি হয় না।

## ঔষধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া এবং বিষক্রিয়া ?

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কম বা সাইড ইফেক্ট নাই বলে যে একটি কথা প্রচলিত আছে, এটি পুরোপুরি সত্য নয়। কেননা যুক্তির কথা হলো, যার ইফেক্ট আছে তার সাইড ইফেক্টও আছে ; যার একশান আছে তার রিয়েকশান থাকাটাই যুক্তিসঙ্গত। সংক্ষেপে বলা যায়, নিম্নশক্তি এবং মধ্যমশক্তিতে (৩, ৬, ৩০, ২০০) ভুল ঔষধ যদি কেউ দু-চার-দশ মাত্রাও খেয়ে ফেলেন, তাতেও বড় ধরণের কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। পক্ষান্তরে উচ্চ শক্তিতে (১০০০ থেকে উপরের শক্তি) ভুল ঔষধ যদি একমাত্রাও খেয়ে ফেলেন, তাতেও বড় ধরণের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ভুল ঔষধ সেবনের ফলে কোন সমস্যা দেখা দিলে দ্রুত হোমিওপ্যাথিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। তাছাড়া হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা বই দেখে সেই ঔষধের ক্রিয়ানাশক (antidote) ঔষধ খেয়ে নিতে পারেন। অনেকের মতে, বোরিকের অথবা ক্লার্কের মেটেরিয়া মেডিকা সবচেয়ে ভালো এবং সহজবোধ্য।



## খাবার-পানীয় সংক্রান্ত নির্দেশনা ?

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবনকালীন সময়ে খাবার-পানীয় সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কোন নিষেধাজ্ঞা নাই। অর্থাৎ এটা খাওয়া যাবে না, ওটা খাওয়া যাবে না - এরকম কোন বাধাধরা নিয়ম নাই। নিয়ম যা আছে তা হলো, খালিপেটে ঔষধ খাওয়া ভালো। তাই বলে ভরাপেটে ঔষধ খেলে যে, ঔষধে কাজ করবে না এমন নয়। খালিপেটে ঔষধ খেতে ভুলে গেলে ভরাপেটেই খেয়ে নিন, কোন অসুবিধা নেই। (বিঃ দ্রঃ- কাঁচা পেয়াজ, কাঁচা মরিচ, আদা, লেবু, চা, কফি, মদ, খাবার স্যালাইন ইত্যাদি ঝাঝালো খাবার অনেক সময় কিছু কিছু হোমিও ঔষধের একশান নষ্ট করে দেয়। কাজেই এগুলো বর্জন করাই উত্তম অথবা হোমিও ঔষধ খাওয়ার অন্তত এক ঘণ্টা আগে কিংবা এক ঘণ্টা পরে সেগুলো খেতে পারেন।)

## অন্য ধরণের ঔষধ এক সাথে খাওয়া যাবে ?

এলোপ্যাথিক, ইউনানী, আয়ুর্বেদীয় প্রভৃতি যে-কোন ঔষধের সাথে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খেতে পারেন। এতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সাথে সেগুলোর আন্তক্রিয়া (interaction) হওয়ার তেমন কোন সম্ভাবনা নেই। মাত্রাতিরিক্ত রিফাইন করার কারণে হোমিও ঔষধের বস্তুগত অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় এবং সেগুলো শক্তিতে পরিণত হয়ে যায়। আর বাস্তবতা হলো বস্তু এবং শক্তির মধ্যে সাধারণত রিয়েকশন হয় না। হ্যাঁ, যদি কখনও হোমিও ঔষধ অন্যান্য ঔষধের সাথে রিয়েকশান করে থাকেও, তবে সেটা হাজারে দু'এক ক্ষেত্রে। বাস্তবে অনেকেই জন্মনিয়ন্ত্রণ, ডায়াবেটিস, হাই ব্লাড প্রেসার ইত্যাদির এলোপ্যাথিক ঔষধের সাথে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খেয়ে থাকেন। তাতে হোমিও ঔষধের কাজে কোন বাধা সৃষ্টি হয় না। তবে সতর্কতা হিসেবে হোমিও ঔষধটি অন্যান্য ঔষধ খাওয়ার অন্তত আধা ঘণ্টা আগে খেয়ে নেওয়া ভালো হবে।

## ভুল ঔষধের ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায় কি ?

মনে করুন, আপনি ডায়েরিয়ার জন্য একটি ঔষধ খেলেন। তাতে ডায়েরিয়া তো ভালো হলোই না, বরং মাথাব্যথা শুরু হয়ে গেছে। এই ধরণের ঘটনায় বুঝতে হবে যে, আপনার ঔষধ নির্বাচন সঠিক হয়নি। এখন ভুল ঔষধের উৎপাত থেকে বাঁচার জন্য একই ঔষধ পূর্বের তুলনায় অর্ধেক কমিয়ে পুণরায় আরেক মাত্রা খান। তাতে ভুল ঔষধ খাওয়ার সাইড ইফেক্ট থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন। যেমন প্রথম বার যদি পাঁচটি বড়ি খেয়ে থাকেন তবে দ্বিতীয়বার দুইটি বড়ি খান কিংবা প্রথমবার যদি এক চুমুক ঔষধ খেয়ে থাকেন তবে দ্বিতীয়বার আধা চুমুক খান। তাছাড়া ক্যামেফারা (Camphora) নামক হোমিও ঔষধটিও খেতে পারেন। কেননা এটি শতকরা নব্বই ভাগ হোমিও ঔষধের একশান নষ্ট করে দিতে পারে।

## ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, সতর্কতা এবং নিষেধাজ্ঞা ঃ-

☆ কষ্টিকাম (*Causticum*) ঔষধটিকে কখনও ফসফরাসের (*Phosphorus*) আগে বা পরে ব্যবহার করবেন না।

☆ বিশেষত *Sulphur, Silicea, Psorinum, Phosphorus, Lachesis, Kali carb, Graphities, Carcinosinum, Zincum* নামক ঔষধগুলি ভুলেও উচ্চশক্তিতে খাবেন না। কেননা এতে রোগ বেড়ে যেতে পারে মারাত্মকভাবে এবং তাছাড়াও অন্য ধরণের বিরাট ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। এজন্য প্রথমে নিম্নশক্তিতে (৩০, ২০০) ব্যবহার করে উপকৃত হলেই কেবল প্রয়োজনে উচ্চশক্তিতে প্রয়োগ করতে পারেন।

☆ লাইকোপোডিয়াম (*Lycopodium*) নিম্নশক্তিতে দীর্ঘদিন ভুল প্রয়োগে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। এমনকি মৃত্যু পযর্ন্ত হতে পারে।

☆ হ্যানিম্যানের মতে, সালফারের (*Sulphur*) পূর্বে ক্যালকেরিয়া কার্ব (*Calcarea Carbonica*) ব্যবহার করা উচিত নয়। (এতে শরীর মারাত্মক দুর্বল হয়ে যেতে পারে।)

☆ মার্ক সল (*Mercurius solbulis*) এবং সিলিশিয়া (*Silicea*) ঔষধ দুটির একটিকে অপরটি (কাছাকাছি সময়) আগে বা পরে ব্যবহার করা উচিত নয়।

☆ জ্বরের উচ্চ তাপের সময় নেট্রাম মিউর (*Natrum mur*) ঔষধটি প্রয়োগ করা নিষেধ।

☆ ক্যাল্কেরিয়া কার্ব (*Calcarea Carbonica*) ঔষধটি সালফার বা নাইট্রিক এসিডের (*Nitricum acidum*) পূর্বে ব্যবহার করা নিষেধ।

☆ লিডাম (*Ledum*) খেয়ে সৃষ্ট দুর্বলতার চিকিৎসায় চায়না ব্যবহার করা ক্ষতিকর।

☆ ক্যাল্কেরিয়া কার্ব (*Calcarea Carbonica*) এবং ব্রায়োনিয়া (*Bryonia*) শত্রুভাবাপন্ন (*inimical*) ঔষধ। কাজেই এই দুটিকে কাছাকাছি সময়ে একটির আগে বা পরে অন্যটিকে ব্যবহার করা নিষেধ।

☆ কোন রোগীর যদি নিদ্রাহীনতা থাকে তবে তাকে রাতের বেলা সালফার (*Sulphur*) দিতে পারেন। পক্ষান্তরে যেই রোগী ভালো ঘুমায়, তাকে সকাল বেলায় সালফার খাওয়ানো উচিত। কেননা রাতের বেলা সালফার দিলে তার ঘুমে অসুবিধা হতে পারে। নাক্স ভমিকা (*Nux vomica*) রাতে এবং সালফার সকালে দিতে পারেন যদি তাদের সম্পূরক (complementary) ক্রিয়া প্রত্যাশা করেন।

☆ বাম ফুসফুসের ব্যথায় ফসফরাস (*Phosphorus*) ঔষধটি ঘন ঘন প্রয়োগ করা বিপজ্জনক। কেননা এতে রোগীর তাড়াতাড়ি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।

☆ মেডোরিনাম (*Medorrhinum*) ঔষধটি হৃরোগীদেরকে কখনও উচ্চশক্তিতে দিতে নাই। এতে করে তার হৃদরোগ বৃদ্ধি পেয়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে। প্রথমে ২০০ শক্তিতে প্রয়োগ করে তারপর সহ্য শক্তি অনুযায়ী উপরের শক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

☆ কলিনসোনিয়া ক্যান (Collinsonia canadensis) ঔষধটি হৃদরোগীদের ক্ষেত্রে কখনও নিম্নশক্তিতে প্রয়োগ করতে নাই।

☆ Apis, Lac defloratum, Gossipium, Pulsatilla, Pinus lamb  ইত্যাদি ঔষধ গর্ভবতীদের দেওয়া নিষেধ। কেননা এতে গর্ভ নষ্ঠ হয়ে যেতে পারে।

☆ সিলিশিয়া (*Silicea*) ঔষধটি কারো কোন অপারেশনের ছয়মাসের মধ্যে ব্যবহার নিষিদ্ধ। অন্যথায় সেখানে ঘা / পূঁজ হয়ে জোড়া ছুটে যেতে পারে।

☆ কয়েকদিন যাবত অচেতন রোগীদেরকে জিংকাম মেট (Zincum metallicum) দিতে হয়। কিন্তু ভুলেও এক মাত্রার বেশী দিবেন না।

## Essential homeopathic medicines (জরুরি হোমিওপ্যাথিক ঔষধসমূহ) :-

জরুরি দশ-পনেরটি হোমিও ঔষধের নাম (সাথে প্রধান প্রধান লক্ষণসহ) দেওয়া হলো যেগুলো কিনে এনে সব সময় ঘরে জমা করে রাখা উচিত। তাহলে প্রয়োজনের সময় রাত-বিরাতে আর ঔষধ কেনার জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে হবে না এবং ছোট-খাটো ব্যাপারে ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে যাওয়ার ঝামেলা থেকেও বেঁচে যাবেন। প্রতিটি ঔষধ ৩০ শক্তিতে বড়িতে এক ড্রাম (অথবা দুই ড্রাম) করে কিনে রাখুন। সাধারণত হোমিও ফার্মেসীগুলোতে ৫০টির মতো হোমিও ঔষধের শিশি রাখার মতো ছোট্ট বাক্স পাওয়া যায়। এরকম একটি বাক্স কিনে তাতে ঔষধের শিশিগুলি রাখুন।

(১) Aconitum napellus :-

যে-কোন রোগই হউক না কেন (জ্বর-কাশি-ডায়েরিয়া-আমাশয়-নিউমোনিয়া-পেটব্যথা-হাঁপানি-মাথাব্যথা-বুকেব্যথা-শ্বাসকষ্ট-বার্ড ফ্লু-বুক ধড়ফড়ানি প্রভৃতি), **যদি হঠাৎ শুরু হয় এবং শুরু থেকেই মারাত্মকরূপে দেখা দেয় অথবা দুয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেটি মারাত্মক আকার ধারণ করে**, তবে একোনাইট ঔষধটি হলো তার এক নাম্বার ঔষধ। একোনাইটকে তুলনা করা যায় ঝড়-তুফান-টর্নেডোর সাথে.....প্রচণ্ড কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। একোনাইটের রোগী রোগের যন্ত্রণায় একেবারে অস্থির হয়ে পড়ে। রোগের উৎপাত এত বেশী হয় যে, তাতে **রোগী মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে।** রোগী ভাবে সে এখনই মরে যাবে।

(২) Bryonia alba : ব্রায়োনিয়ার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **রোগীর ঠোঁট-জিহ্বা-গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে,** প্রচুর পানি পিপাসা থাকে, রোগী অনেকক্ষণ পরপর একসাথে প্রচুর ঠান্ডা পানি পান করে, **নড়াচড়া করলে রোগীর কষ্ট বৃদ্ধি পায়**, রোগীর মেজাজ খুবই বিগড়ে থাকে, **কোষ্টকাঠিন্য দেখা দেয় অর্থাৎ পায়খানা শক্ত হয়ে যায়**, প্রলাপ বকার সময় তারা সারাদিনের পেশাগত কাজের কথা বলতে থাকে অথবা বিছানা থেকে নেমে বাড়ি যাওয়ার কথা বলে, শিশুদের কোলে নিলে তারা বিরক্ত হয়, মুখে সবকিছু তিতা লাগে। যে-কোন রোগই হউক না কেন, যদি উপরের লক্ষণগুলোর অন্তত দু-তিনটি লক্ষণও রোগীর মধ্যে পাওয়া যায়, তবে ব্রায়োনিয়া সেই রোগ সারিয়ে দিবে। ব্রায়োনিয়া ঔষধটি নিউমোনিয়ার জন্য আল্লাহ্র একটি বিরাট রহমত স্বরূপ। সাধারণত নিম্নশক্তিতে খাওয়ালে ঘনঘন খাওয়াতে হয় কয়েকদিন কিন্তু (১০,০০০ বা ৫০,০০০ ইত্যাদি) উচ্চশক্তিতে খাওয়ালে দুয়েক ডোজই যথেষ্ট।

(৩) Rhus toxicodendron : রাস টক্সের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **প্রচণ্ড অস্থিরতা, রোগী এতই অস্থিরতায় ভোগে যে এক পজিশনে বেশীক্ষণ স্থির থাকতে পারে না**, রোগীর শীতভাব এমন বেশী যে তার মনে হয় কেউ যেন বালতি দিয়ে তার গায়ে ঠান্ডা পানি ঢালতেছে, **নড়াচড়া করলে (অথবা শরীর টিপে দিলে) তার ভালো লাগে অর্থাৎ রোগের কষ্ট কমে যায়**, স্বপ্ন দেখে যেন খুব পরিশ্রমের কাজ করতেছে। বর্ষাকাল, ভ্যাপসা আবহাওয়া বা ভিজা বাতাসের সময়কার যে-কোন জ্বরে (বা অন্যান্য রোগে) রাস টক্স এক নাম্বার ঔষধ। রাস টক্স খাওয়ার সময় ঠান্ডা পানিতে গোসল বা ঠান্ডা পানিতে গামছা ভিজিয়ে শরীর মোছা যাবে না। বরং এজন্য কুসুম কুসুম গরম পানি ব্যবহার করতে হবে। কেননা ঠান্ডা পানিতে গোসল করলে রাস টক্সের একশান নষ্ট হয়ে যায়। (☆ ব্রায়োনিয়া এবং রাস টক্সের প্রধান দুটি লক্ষণ মনে রাখলেই চলবে ; আর তা হলো - নড়াচড়া করলে ব্রায়োনিয়ার রোগ বেড়ে যায় এবং রাস টক্সের রোগ হ্রাস পায় / কমে যায়।)

(৪) Lycopodium clavatum : লাইকোপোডিয়ামের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **রোগের মাত্রা বিকাল ৪-৮টার সময় বৃদ্ধি পায়**, এদের রোগ ডান পাশে বেশী হয়, রোগ ডান পাশ থেকে বাম পাশে যায়, **এদের পেটে প্রচুর গ্যাস হয়**, এদের সারা বৎসর প্রস্রাবের বা হজমের সমস্যা লেগেই থাকে, এদের দেখতে তাদের বয়সের চাইতেও বেশী বয়স্ক মনে হয়, **এদের স্বাস্থ্য খারাপ কিন্তু ব্রেন খুব ভালো,** এরা খুবই সেনসিটিভ এমনকি ধন্যবাদ দিলেও কেঁদে ফেলে ইত্যাদি ইত্যাদি। উপরের লক্ষণগুলোর দু'তিনটিও কোন রোগীর মধ্যে থাকলে লাইকোপোডিয়াম তার যে-কোন রোগ (জ্বর-কাশি-ডায়েরিয়া-আমাশয়-নিউমোনিয়া-পেটব্যথা-হাঁপানি-মাথাব্যথা-বুকেব্যথা-শ্বাসকষ্ট-বার্ড ফ্লু-বুক ধড়ফড়ানি-চুলপড়া-ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি) সারিয়ে দেবে।

(৫) Belladonna : তিনটি লক্ষণের উপর ভিত্তি করে বেলেডোনা ঔষধটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, যথা- উত্তাপ, লাল রঙ এবং জ্বালা-পোড়া ভাব। যদি **শরীরে বা আক্রান্ত স্থানে উত্তাপ বেশী থাকে, যদি আক্রান্ত স্থান লাল হয়ে যায়** (যেমন- মাথা ব্যথার সময় মুখ লাল হওয়া, পায়খানার সাথে টকটকে লাল রক্ত যাওয়া), **শরীরে জ্বালা-পোড়াভাব থাকে**, রোগী ভয়ঙ্কর সব জিনিস দেখে, ভয়ে পালাতে চেষ্টা করে, অনেক সময় মারমুখী হয়ে উঠে ইত্যাদি ইত্যাদি। **জ্বরের সাথে যদি রোগী প্রলাপ বকতে থাকে**, তবে বেলেডোনা তাকে উদ্ধার করবে নিশ্চিত। উপরের লক্ষণগুলো কোন রোগীর মধ্যে পাওয়া গেলে যে-কোন রোগে (জ্বর-কাশি-ডায়েরিয়া-আমাশয়-রক্তআমাশয়-পেটব্যথা-মাথাব্যথা-বুকেব্যথা-শ্বাসকষ্ট-বার্ড ফ্লু- বুক ধড়ফড়ানি প্রভৃতি) বেলেডোনা প্রয়োগ করতে পারেন।

(৬) Arsenicum album : আর্সেনিকের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো রোগীর মধ্যে **প্রচণ্ড অস্থিরতা (অর্থাৎ রোগী এক জায়গায় বা এক পজিশনে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। এমনকি গভীর ঘুমের মধ্যেও সে নড়াচড়া করতে থাকে।)**, **শরীরের বিভিন্ন স্থানে ভীষণ জ্বালা-পোড়া ভাব, অল্প সময়ের মধ্যেই রোগী দুর্বল-কাহিল-নিস্তেজ হয়ে পড়ে**, রোগীর বাইরে থাকে ঠান্ডা কিন্তু ভেতরে থাকে জ্বালা-পোড়া, অতিমাত্রায় মৃতুভয়, **রোগী মনে করে ঔষধ খেয়ে কোন লাভ নেই- তার মৃত্যু নিশ্চিত**, গরম পানি খাওয়ার জন্য পাগল কিন্তু খাওয়ার সময় খাবে দুয়েক চুমুক। **বাসি-পচাঁ-বিষাক্ত খাবার খেয়ে যত মারাত্মক রোগই হউক না কেন, আর্সেনিক খেতে দেরি করবেন না।** ফল-ফ্রুট খেয়ে (ডায়েরিয়া, আমাশয়, পেট ব্যথা ইত্যাদি) যে-কোন রোগ হলে আর্সেনিক হলো তার এক নম্বর ঔষধ।

(৭) Arnica montana : **যে-কোন ধরনের আঘাত, থেতলানো, মচকানো, মোচড়ানো, ঘুষি, লাঠির আঘাত বা উপর থেকে পড়ার** কারণে ব্যথা পেলে আর্নিকা খেতে হবে। শরীরের কোন একটি অঙ্গের বেশী ব্যবহারের ফলে যদি তাতে ব্যথা শুরু হয়, তবে আর্নিকা খেতে ভুলবেন না। **আক্রান্ত স্থানে এমন তীব্র ব্যথা থাকে যে, কাউকে তার দিকে আসতে দেখলেই সে ভয় পেয়ে যায়** (কারণ ধাক্কা লাগলে ব্যথার চোটে তার প্রাণ বেরিয়ে যাবে)। **রোগী ভীষণ অসুস্থ হয়েও মনে করে তার কোন অসুখ নেই, সে ভালো আছে।** উপরের লক্ষণগুলোর কোনটি থাকলে যে-কোন রোগে আর্নিকা প্রয়োগ করতে পারেন।

(৮) Mercurius solubilis : মার্ক সল ঔষধটির প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **প্রচুর ঘাম হয় কিন্তু রোগী আরাম পায় না**, ঘামে দুর্গন্ধ বা মিষ্টি গন্ধ থাকে, **কথার বিরোধীতা সহ্য করতে পারে না**, ঘুমের মধ্যে মুখ থেকে লালা ঝরে, পায়খানা করার সময় কোথানি, পায়খানা করেও মনে হয় আরো রয়ে গেছে, **অধিকাংশ রোগ রাতের বেলা বেড়ে যায়।** রোগী ঠান্ডা পানির জন্য পাগল। ঘামের কারণে যাদের কাপড়ে হলুদ দাগ পড়ে যায়, তাদের যে-কোন রোগে মার্ক সল উপকারী। এটি আমাশয়ের এক নম্বর ঔষধ। উপরের লক্ষণগুলো থাকলে যে-কোন রোগে মার্ক সল প্রয়োগ করতে পারেন।

(৯) Gelsemium sempervirens : জেলসিমিয়ামের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **রোগীর মধ্যে ঘুমঘুম ভাব থাকে বেশী, রোগী অচেতন-অজ্ঞান-বেহুশের মতো পড়ে থাকে**, দেখা যাবে গায়ে প্রচণ্ড জ্বর অথচ রোগী নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে, মাথা ঘুড়ানি থাকে, শরীর ভারভার লাগে, **মাত্রাতিরিক্ত দুর্বলতার কারণে রোগী নড়াচড়া করতে পারে না এবং একটু নড়াচড়া করতে গেলে শরীর কাঁপতে থাকে**, ওপর থেকে পড়ে যাওয়ার ভয় এবং হৃৎপিন্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়, সাহসহীনতা, শরীরের জোর বা মনের জোর কম হওয়া, ইত্যাদি লক্ষণ আছে।

পরীক্ষার বা ইন্টারভিউর পূর্বে বেশী উৎকন্ঠিত হলে Argentum nitricum অথবা Gelsemium (শক্তি কিউ, ৩,৬, ১২,৩০) এক ঘন্টা পরপর খেতে থাকুন।

(১০) Hepar sulph : হিপার সালফের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো এরা সাংঘাতিক সেনসেটিভ (over-sensitiveness), এতই সেনসেটিভ যে রোগাক্রান্ত স্থানে সামান্য স্পর্শও সহ্য করতে পারে না, এমনকি কাপড়ের স্পর্শও না। কেবল মানুষের বা কাপড়ের স্পর্শ নয়, এমনকি ঠান্ডা বাতাসের স্পর্শও সহ্য করতে পারে না। সাথে সাথে শব্দ (গোলমাল) এবং গন্ধও সহ্য করতে পারে না। হিপারের শুধু শরীরই সেনসেটিভ নয়, সাথে সাথে মনও সেনসেটিভ। অর্থাৎ মেজাজ খুবই খিটখিটে।

(১১) Phosphorus : ফসফরাসের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো এই রোগীরা খুব দ্রুত লম্বা হয়ে যায় (এবং এই কারণে হাঁটার সময় সামনের দিকে বেঁকে যায়), অধিকাংশ সময় রক্তশূণ্যতায় ভোগে, রক্তক্ষরণ হয় বেশী, অল্প একটু কেটে গেলেই তা থেকে অনেকক্ষণ রক্ত ঝরতে থাকে, **রোগী বরফের মতো কড়া ঠান্ডা পানি খেতে চায়,** মেরুদন্ড থেকে মনে হয় তাপ বেরুচ্ছে, একা থাকতে ভয় পায়, **হাতের তালুতে জ্বালাপোড়া** ইত্যাদি ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে যে-কোন রোগে ফসফরাস প্রয়োগ করতে হবে।

(১২) Nux vomica : **যারা অধিকাংশ সময়ে পেটের অসুখে-বদহজমে ভোগে,** বদমেজাজী, ঝগড়াটে, **বেশীর ভাগ সময় শুয়ে-বসে কাটায়,** কথার বিরোধীতা সহ্য করতে পারে না এবং **অল্প শীতেই কাতর হয়ে পড়ে,** এটি তাদের (জ্বর-কাশি-ডায়েরিয়া-আমাশয়-রক্তআমাশয়-পেটব্যথা-মাথাব্যথা-বুকেব্যথা-শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি) ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে। অধিকাংশ রোগ রাতের বেলা বেড়ে যায়। পান-সিগারেট-মদ-গাজা-ফেনসিডিল-হিরোইন দীর্ঘদিন সেবনে শরীরের যে ক্ষতি হয়, নাক্স ভমিকা তাকে পুষিয়ে দিতে পারে। পাশাপাশি এটি মদ-ফেনসিডিলের নেশা ছাড়তে ব্যবহার করতে পারেন। এটি জ্বর, আমাশয়, পেটব্যথা, নিদ্রাহীনতা, কোষ্টকাঠিন্য, গ্যাস্ট্রিক আলসার, হিস্টেরিয়া, খিচুনি, ধনুস্টংকার, পাইলস, দুর্বলতা, ক্ষুধাহীনতা, প্যারালাইসিস, ধ্বজভঙ্গ বা যৌন দুর্বলতা প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

(১৩) Pulsatilla pratensis : পালসেটিলার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **গলা শুকিয়ে থাকে কিন্তু কোন পানি পিপাসা থাকে না,** ঠান্ডা বাতাস-ঠান্ডা খাবার-ঠান্ডা পানি পছন্দ করে, **গরম-আলো-বাতাসহীন বদ্ধ ঘরে রোগীনী বিরক্ত বোধ করে** ইত্যাদি ইত্যাদি। **আবেগপ্রবন, অল্পতেই কেঁদে ফেলে এবং যত দিন যায় ততই মোটা হতে থাকে, এমন মেয়েদের ক্ষেত্রে পালসেটিলা ভালো কাজ করে।** এসব লক্ষণ কারো মধ্যে থাকলে যে-কোন রোগে পালসেটিলা খাওয়াতে হবে। বাতের ব্যথা ঘনঘন স্থান পরিবর্তন করলে পালসেটিলা খেতে হবে (যেমন- সকালে এক জায়গায় ব্যথা তো বিকালে অন্য জায়গায়।)। মাসিক বন্ধ থাকলে পালসেটিলা সেটি চালু করতে পারে। **ঘি-চবি জাতীয় খাবার খেয়ে যে-কোন রোগ হলে পালসেটিলা অবশ্যই খাবেন।** এটি নারী-পুরুষ উভয়ের যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি করতে পারে। গর্ভবতী মেয়েদের প্রায় সকল সমস্যাই পালসেটিলা দূর করে দিতে পারে। **প্রসব ব্যথা বাড়িয়ে দিয়ে পালসেটিলা প্রসবকাজ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করতে পারে।** পালসেটিলা বুকের দুধ বৃদ্ধি করতে পারে। এমনকি গর্ভস্থ শিশুর পজিশন ঠিক না থাকলে তাও ঠিক করে দেওয়ার মতো অলৌকিক ক্ষমতা পালসেটিলার আছে।

(১৪) Cantharis : জ্বালা-পোড়া এবং ছিড়ে ফেলার মতো ব্যথা হলো ক্যান্থারিসের প্রধান লক্ষণ। **প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া এবং ঘনঘন প্রস্রাবের সমস্যায় ইহা একটি যাদুকরী ঔষধ। ভীষণ জ্বালাপোড়া থাকলে যে-কোন রোগে ক্যান্থারিস ব্যবহার করতে পারেন। এটি জলাতঙ্ক রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।** এটি যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি করে থাকে ভীষণভাবে। কোন জায়গা পুড়ে গেলে একই সাথে খাওয়ান এবং পানির সাথে মিশিয়ে পোড়া জায়গায় লাগান। এটি পেটের মরা বাচ্চা, গর্ভফুল বের করে দিতে পারে এবং বন্ধ্যাত্ব নির্মূল করতে পারে।

(১৫) Colocynthis : **পেটের ব্যথা যদি শক্ত কোন কিছু দিয়ে পেটে চাপ দিলে অথবা সামনের দিকে বাঁকা হলে কমে যায়, তবে কলোসিন্থ আপনাকে সেই ব্যথা থেকে মুক্ত করবে।** কলোসিনে'র ব্যথা ছুরি মারার মতো খুবই মারাত্মক ধরণের অথবা মনে হবে যেন দুটি পাথর দিয়ে পেটের নাড়ি-ভূড়িগুলোকে কেউ পিষতেছে। যে-কোন রোগের সাথে যদি এরকম চিড়িক মারা পেট ব্যথা থাকে, তবে কলোসিন্থে সেই রোগ সেরে যাবে (হউক তা ডায়েরিয়া-আমাশয় অথবা টিউমার)। রেগে যাওয়া, অপমানিত হওয়া, ঝগড়া-ঝাটি, ফল-ফ্রুট খাওয়া, ঠান্ডা পানি পান করা ইত্যাদি কারণে ডায়েরিয়া হলে তাতে কলোসিন্থ খেতে হবে।

(১৬) Thuja occidentalis : **যে-কোন টিকা (বিসিজি, ডিপিটি, পোলিও, এটিএস ইত্যাদি) নেওয়ার কারণে জ্বর আসলে অথবা অন্য যে-কোন (মামুলি অথবা মারাত্মক ধরণের) রোগ হলে সেক্ষেত্রে থুজা একটি অতুলনীয় ঔষধ।** যে-কোন টিকা নেওয়ার সময় পাশাপাশি রোজ তিনবেলা করে থুজা খান, তাহলে সেই টিকার ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে বাঁচতে পারবেন। জ্বরের মধ্যে কেউ যদি 'উপর থেকে পড়ে যাওয়ার' স্বপ্ন দেখে, তবে সেটি যেই নামের জ্বরই হোক না কেন, থুজা তাকে নিরাময় করে দিবে। আঁচিল বা মেঞ্জের এক নম্বর ঔষধ হলো থুজা। গনোরিয়া রোগে এবং মাসিকের সময় ব্যথা হলে থুজা সবচেয়ে ভালো ঔষধ। **প্রস্রাবের অধিকাংশ সমস্যা থুজায় নিরাময় হয়ে যায়।** নরম টিউমার ইহাতে আরোগ্য হয়। **যে-সব রোগ বর্ষাকালে বা ভ্যাপসা আবহাওয়ার সময় বৃদ্ধি পায়, সে-সব রোগে থুজা খান।**

(১৭) Hypericum perforatum : যে-সব আঘাতে কোন স্নায়ু ছিড়ে যায়, তাতে খুবই মারাত্মক ব্যথা শুরু হয় যা নিবারণে হাইপেরিকাম খাওয়া ছাড়া গতি নেই। **শরীরের সপর্শকাতর স্থানে {যেমন- ব্রেন বা মাথা, মেরুদন্ড, (পাছার নিকটে) কণ্ডার হাড়ে, আঙুলের মাথায়, অণ্ডকোষে ইত্যাদিতে} আঘাত পেলে বা কিছু বিদ্ধ হলে, তাতে হাইপেরিকাম খেতে দেরি করবেন না।** আঘাত পাওয়ার স্থান থেকে প্রচণ্ড ব্যথা যদি চারদিকে ছড়াতে থাকে বা খিঁচুনি দেখা দেয় অথবা **শরীর ধনুকের ন্যায় বাঁকা হয়ে যায় (ধনুষ্টঙ্কার),** তবে হাইপেরিকাম ঘনঘন খাওয়াতে থাকুন। (তবে যে-সব ক্ষেত্রে পেশী এবং স্নায়ু দুটোই আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে বলে মনে হয়, তাতে আর্নিকা এবং হাইপেরিকাম একত্রে মিশিয়ে খেতে পারেন।) হাইপেরিকাম খেতে পারলে আর এটিএস ইনজেকশন নেওয়ার কোন দরকার হবে না।

(১৮) Chamomilla : **যদি ব্যথার তীব্রতায় কোন রোগী দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূণ্য হয়ে পড়ে, তার ভদ্রতাজ্ঞানও লোপ পেয়ে যায়, সে ডাক্তার বা নার্সকে পযর্ন্ত গালাগালি দিতে থাকে; তবে তাকে ক্যামোমিলা খাওয়াতে হবে।** ক্যামোমিলা হলো অভদ্র রোগীদের ঔষধ। **স্কুলের শিক্ষকদের হাতে শিশুরা মার খাওয়ার ফলে, অপমানিত হওয়ার কারণে, শারীরিক-মানসিক নিরযাতনের ফলে কোন রোগ হলে ক্যামোমিলা খাওয়াতে ভুলবেন না।** যারা ব্যথা একদম সহ্য করতে পারে না, ক্যামোমিলা হলো তাদের ঔষধ। যে-সব মেয়েরা প্রসব ব্যথায় পাগলের মতো হয়ে যায়, তাদেরকে এটি খাওয়াতে হবে। গরম কিছু খেলে যদি দাঁত ব্যথা বেড়ে যায়, তবে ক্যামোমিলা প্রযোজ্য। ডায়েরিয়া বা আমাশয়ের পায়খানা থেকে যদি পঁচা ডিমের গন্ধ আসে, তবে এটি খাওয়াতে হবে। **শিশুদের দাঁত ওঠার সময়ে পেটের অসুখ হলে ক্যামোমিলা খাওয়াবেন। কোন শিশু যদি সারাক্ষণ কোলে ওঠে থাকতে চায়, তবে তাকে যে-কোন রোগে ক্যামোমিলা খাওয়ালে তা সেরে যাবে।**

(১৯) Plantago Major : **দাঁত, কান এবং মুখের ব্যথায় প্লানটাগো মেজর এমন চমৎকার কাজ করে যে, তাকে এক কথায় যাদু বলাই যুক্তিসঙ্গত।** একদিন পত্রিকায় দেখলাম, একজন প্রখ্যাত সাংবাদিকের দাঁতব্যথা সারাতে না পেরে ডেন্টিস্টরা শেষ পর্যন্ত একে একে তাঁর ভালো ভালো চারটি দাঁতই তুলে ফেলেছেন। আহা ! বেচারা ডেন্টিস্টরা যদি প্লানটাগো'র গুণের কথা জানত, তবে প্রবীণ এই সাংবাদিকের দাঁতগুলো শহীদ হতো না।

(২০) Ledum palustre : **সূচ, আলপিন, তারকাটা, পেরেক, টেটা প্রভৃতি বিদ্ধ হলে ব্যথা কমাতে এবং ধনুষ্টঙ্কার / খিচুনি ঠেকাতে লিডাম ঘনঘন খাওয়ান।** পক্ষান্তরে ধনুষ্টঙ্কার দেখা দিলে বা আক্রান্ত স্থান থেকে তীব্র ব্যথা শরীরের বিভিন্ন দিকে যেতে থাকলে এবং শরীর ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে গেলে হাইপেরিকাম (Hypericum perforatum) ঘনঘন খাওয়াতে থাকুন। চোখে ঘুষি বা এই জাতীয় কোনো আঘাত লাগলে লিডাম এক ঘণ্টা পরপর খেতে থাকুন। **ইদুর এবং পোকার কামড়ে লিডাম খেতে হবে।** এটি উকুনের একটি শ্রেষ্ট ঔষধ, তেল বা পানির সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। বাতের ব্যথায় উপকারী বিশেষত যাদের পা দুটি সব সময় ঠান্ডা থাকে। আঘাতের স্থানে কালশিরা পড়া ঠেকাতে অথবা কালশিরা পড়লে তা দূর করতে লিডাম খেতে পারেন।

(২১) Camphora : ক্যাম্ফরা হলো শেষ মুহূর্তের ঔষধ। **কোন রোগের কারণে অথবা কোন দুর্ঘটনার ফলে যদি কেউ মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে যায়,** তবে তাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে ঘনঘন ক্যাম্ফরা খাওয়াতে থাকুন। **যখনই কেউ অজ্ঞান হয়ে যায়, হাত-পা বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে যায় কিন্তু তারপরও সে কাপড়-চোপড় গায়ে দিতে চায় না, রক্তচাপ কমে যায়, কপালে ঠান্ডা ঘাম দেখা দেয়,** নিঃশ্বাস গভীর হয়ে পড়ে, তখন বুঝতে হবে তার মৃত্যু খুবই নিকটে। সেক্ষেত্রে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে ঘনঘন ক্যামফরা খাওয়াতে থাকুন। **অন্যকোন হোমিও ঔষধে রিয়েকশন করলে ক্যামফরা খেতে থাকুন ; কেননা এটি শতকরা নব্বই ভাগ হোমিও ঔষধের একশান নষ্ট করে দিতে পারে।** হঠাৎ কোনো কারণে হৃৎপিন্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে বা অত্যধিক বুক ধড়ফড়ানি শুরু হলে ক্যাম্ফরা পাঁচ মিনিট পরপর খাওয়াতে থাকুন। এটি পুরুষদের যৌনশক্তি বৃদ্ধি করতে পারে।

(২২) Teucrium Marum verum : টিউক্রিয়াম হলো সবচেয়ে নিরাপদ এবং কাযর্কর ক্রিমির ঔষধ। ছেলে-বুড়ো সকলেই এটি খেতে পারেন। রোজ দুই/তিন বার করে দুই/তিন দিন খাওয়া উচিত। নাক বন্ধ হয়ে থাকলে, নাকের পলিপ (নরম টিউমার) এবং জরায়ুর পলিপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে টিউক্রিয়াম প্রযোজ্য।

(২৩) Allium cepa : পেয়াজের রস থেকে তৈরী করা এলিয়াম সেপা নামক ঔষধটি, ক্লার্কের মতে, হোমিওপ্যাথিতে সর্দির সবচেয়ে ভালো ঔষধ। সর্দির সাথে জ্বর, মাথাব্যথা অথবা স্বরভঙ্গ থাকলেও এটি খেতে পারেন।

(২৪) Eupatorium perfoliatum : ইউপেটোরিয়াম পারফো নামক ঔষধটি প্রধানত ডেঙ্গু জ্বরে ব্যবহৃত হয়। তবে যে-কোন জ্বরে এটি খেতে পারেন যদি তাতে ডেঙ্গু জ্বরের মতো প্রচণ্ড শরীর ব্যথা থাকে। জ্বরের মধ্যে যদি **শরীরে এমন প্রচণ্ড ব্যথা থাকে যেন মনে হয় কেউ শরীরের সমস্ত হাড় পিটিয়ে গুড়োঁ করে দিয়েছে। পানি বা খাবার যাই পেটে যায় সাথে সাথে বমি হয়ে যায়।** আইসক্রীম বা ঠান্ডা পানি খেতে ইচ্ছে হয়। রোগী খুবই অস্থির থাকে, এক মুহূর্ত স্থির হয়ে বসতে পারে না। ইনফ্লুয়েঞ্জা বা সিজনাল ভাইরাস জ্বরেও যদি প্রচণ্ড শরীর ব্যথা থাকে তবে ইউপেটোরিয়াম খেতে হবে।

(২৫) Calcarea Phosphorica : ক্যালকেরিয়া ফস শিশু এবং বৃদ্ধদের জন্য পৃথিবীর সেরা একটি ভিটামিন। মায়ের পেট থেকে শুরু করে মৃত্যু পযর্ন্ত এটি খেয়ে যাওয়া উচিত। সাত দিন বা পনের দিন পরপর একমাত্রা করে খাওয়া উচিত। **গর্ভকালীন সময়ে খেলে আপনার সন্তানের হাড়, দাঁত, নাক, চোখ, ব্রেন ইত্যাদির গঠন খুব ভালো হবে এবং আপনার সন্তান ঠোক কাটা, তালু কাটা, হাড় বাঁকা, খোঁজা, বামন, বুদ্ধি প্রতিবন্ধি প্রভৃতি দোষ নিয়ে জন্মনোর হাত থেকে রক্ষা পাবে**। এটি শিশুদের নিয়মিত খাওয়ালে তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং অসুখ-বিসুখ কম হবে। যে-সব শিশুদের মাথার খুলির হাড় ঠিক মতো জোড়া লাগেনি, তাদেরকে অবশ্যই ক্যালকেরিয়া ফস খাওয়াতে হবে। নাকের, পায়খানার রাস্তার এবং জরায়ুর পলিপ বা নরম টিউমার এই ঔষধে দুর হয়ে যায়। হাড় ভেঙে গেলে ক্যালকেরিয়া ফস দ্রুত জোড়া লাগিয়ে দেয়। কোন শিশু বিরাট বড় মাথা নিয়ে জন্মালে (hydrocephalus) অথবা জন্মের পরে মাথা বড় হয়ে গেলে, ক্যালকেরিয়া ফস তার এক নম্বর ঔষধ। রোগের কথা চিন্তা করলে যদি রোগের উৎপাত বেড়ে যায়, তবে তাতে এই ঔষধ প্রযোজ্য। **এটি টনসিলের সমস্যা এবং মুখের ব্রণের সেরা ঔষধ।** যাদের ঘনঘন সর্দি লাগে, তারা অবশ্যই এই ঔষধ খাবেন। ডায়াবেটিসের এটি একটি শ্রেষ্ট ঔষধ। শিশুদের দাঁত ওঠার সময় অবশ্যই ক্যালকেরিয়া ফস খাওয়ানো উচিত। এটি নারী-পুরুষদের যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে থাকে।

(২৬) Cocculus Indicus : **ককুলাস হলো মাথা ঘুরানির এক নম্বর ঔষধ।** ককুলাসের প্রধান লক্ষণ হলো মাথার ভেতরটা ফাঁপা বা হালকা মনে হয়। সড়ক-রেল-সমুদ্র ভ্রমণজনিত সমস্যায় (মাথাঘুরানি-বমিবমি ভাব ইত্যাদিতে) এটি খেতে পারেন। ঠিক মতো ঘুম না হলে অথবা রাত জেগে কাজ করার ফলে পরদিন যে-সব সমস্যা হয়, তাতে ককুলাস সবচেয়ে ভালো কাজ করে। তেল বা পানির সাথে মিশিয়ে চুলে মেখে কিছুক্ষণ পর চুল ধুয়ে ফেললে অথবা পাতলা চিরুনি দিয়ে আচড়ালে উকুঁন সাফ হয়ে যাবে।



## Abortion / miscarriage (গর্ভপাত, গর্ভ নষ্ট হওয়া) ঃ- গর্ভস্থ ভ্রুণের (শিশুর)

শারীরিক বৃদ্ধি পূর্ণতা পাওয়ার পূর্বেই প্রসব হওয়াকে গর্ভপাত বা গর্ভ নষ্ট হওয়া বলে। বিশেষত গর্ভধারণের ২০ সপ্তাহ পার হওয়ার পূর্বেই ডেলিভারি হওয়াকে। ইহা আঘাত, ইনফেকশান, ভয় পাওয়া, জরায়ুর ত্রুটি, ঔষধের রিয়েকশান ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে হতে পারে।

Caulophyllum : কলোফাইলাম গর্ভপাতের একটি উত্তম ঔষধ যাতে ভুয়া প্রসব ব্যথা দেখা দিলে এটি প্রয়োগ করতে হয়। যাদের প্রতিবারই একটি নির্দিষ্ট সময়ে গর্ভ নষ্ট হয়ে যায় তারা একমাস পূর্ব থেকেই অগ্রিম এই ঔষধটি খাওয়া শুরু করতে পারেন (শক্তি ৬)।

Sepia : হেরিং বলতেন যে, ঘনঘন গর্ভপাতে অভ্যস্থ নারীদের অবশ্যই সিপিয়া খাওয়া উচিত। সাধারণত পঞ্চম মাসে অথবা পঞ্চম মাসের পরে গর্ভ নষ্ট হলে তাতে সিপিয়া প্রযোজ্য। সিপিয়ার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো তলপেটে বল বা চাকার মতো কিছু একটা আছে বলে মনে হয়, পায়খানার রাস্তা ভারী বোধ হয়, তলপেটে নিচের দিকে ঠেলামারা ব্যথা হয়, রোগী তলপেটের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পায়খানার রাস্তা দিয়ে সব বেরিয়ে যাবে এই ভয়ে দুই পা দিয়ে চেপে ধরে রাখে, স্বামী-সন্তান্তচাকরি-বাকরির প্রতি আকর্ষণ কমে যায় ইত্যাদি।

Sabina : এটি গর্ভধারণের তৃতীয় মাসের এবরশান ঠেকানোর ক্ষেত্রে একটি ভালো ঔষধ। ইহা রক্তক্ষরণের মাধ্যমে শুরু হয় এবং পরে কোমরের পিছন থেকে সামনের দিকে ব্যথা ছড়াতে থাকে। রক্তের রঙ হালকা লাল এবং

কখনও চাকা চাকা। রক্তক্ষরণ হয় একটু পরপর জোয়ার-ভাটার মতো। রোগী গরম ঘর এবং গরম বাতাসে অসুবিধা বোধ করে।

Cinamomum : যে ক্ষেত্রে কেবল রক্তক্ষরণ ছাড়া গর্ভপাতের অন্য কোন লক্ষণ নাই, তাতে সিনামমাম প্রযোজ্য। তাতে রক্তের রঙ থাকে উজ্জ্বল লাল এবং পরিশ্রম করলে রক্তক্ষরণ বৃদ্ধি পায়।

Arnica montana : তলপেটে আঘাত পাওয়ার কারণে যদি গর্ভ নষ্ট হওয়ার আলামত দেখা দেয়, তবে আর্নিকা আপনাকে রক্ষা করবে। হ্যাঁ, মারাত্মক ধরণের ইনফেকশন বা সেপটিক সমস্যার কারণেও যদি গর্ভপাতের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তাতেও আর্নিকা প্রযোজ্য।

Secale cornatum : সিকেলী কর ঔষধটি প্রথম দিকের যে-কোন গর্ভপাত বিশেষত তৃতীয় মাসের গর্ভপাতে প্রযোজ্য। এতে কালচে রঙের পাতলা রক্তক্ষরণ হয়। প্রসব ব্যথার মতো তলপেটে ঠেলামারা ব্যথা থাকে। রোগীর শরীর ঠান্ডা থাকে কিন্তু সে পাখা দিয়ে বাতাস করার জন্য বলতে থাকে।

Belladonna : গর্ভপাতে বেলেডোনা'র লক্ষণ হলো উজ্জ্বল লাল রঙের এবং গরম রক্তক্ষরণ হবে, কোমরে ব্যথা, মাথা ব্যথা এবং জরায়ুতে অস্বসি-কর টাটানি।

Cimicifuga / Actea racemosa : একটিয়া রেস্থির গর্ভপাতের ব্যথা তলপেটের একদিক থেকে অন্যদিকে দৌড়াঁতে থাকে। যে-সব মহিলার বাতের সমস্যা বেশী, তাদের ক্ষেত্রে ইহা ভালো কাজ করে।

Viburnum opulus : ভাইবারনাম ওপুলাস গর্ভপাতের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ যাতে তীব্র ব্যথা থাকে এবং ব্যথা কিছুক্ষণ পরপর বৃদ্ধি পায়। এটি গর্ভপাতের প্রথম দিকে ব্যবহার করলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। নড়াচড়ায় রোগীর অবস্থা খারাপ হয় এবং বিশ্রামে থাকলে ভালো হয়।

Chamomilla : রাগ করার কারণে, ঝগড়া-ঝাটির কারণে বা ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণে গর্ভপাতের সূচনা হলে ক্যামোমিলা খাওয়ান।

Kali carbonicum : সাধারণত গর্ভধারণের দ্বিতীয় মাসে গর্ভপাত হলে তাতে ক্যালি কার্ব প্রযোজ্য। ক্যালি কার্বের প্রধান লক্ষণ হলো **ভীষণ দুর্বলতা, বেশী বেশী ঘামানো এবং কোমর ব্যথা**। এছাড়া চোখের ওপরের পাতা ফোলা থাকে, ঘুমের মধ্যে পায়ে টাচ করলে চমকে ওঠে, যৌনমিলনের পরে চোখে সমস্যা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

## Abscess (ফোড়া) :-

ফোড়া হলো শরীরের একটি নির্দিষ্ট স্থান ফোলে লাল হয়ে পরবর্তীতে পুঁজ বের হওয়ার নাম। ইহাতে ব্যথা থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। অনেকে মনে করেন যে, সকল ফোড়াকেই পাকিয়ে পুঁজ বের করে ফেলে দেওয়া উচিত; নতুবা শরীরের ক্ষতি হবে। আসলে এই ধরণের চিন্তার পেছনে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। বিষয়টি আপনি ঔষধের ওপর ছেড়ে দিবেন। ঔষধই নির্ধারণ করবে ফোড়াকে পাকিয়ে সারাবে নাকি না পাকিয়েই সারিয়ে দিবে। আপনার কাজ কেবল লক্ষণ মিলিয়ে ঔষধ খাওয়া।

Belladonna : বেলেডোনা ঔষধটি ফোড়ার প্রথম দিকে ব্যবহার করতে হবে যখন ফোড়া মাত্র উঠেছে, আক্রান্ত স্থানটি **গরম হয়ে আছে এবং লাল হয়ে ব্যথা করছে**। বেলেডোনা ফোড়াতে পুঁজ হওয়া বন্ধ করে তাকে পাকতে দিবে না এবং তাকে বিসমিল্লাতেই খতম করে দিবে।

Hepar sulphur : হিপার সালফার হলো ফোড়া সবচেয়ে বিখ্যাত হোমিও ঔষধ। যে-সব ফোড়ায় সাংঘাতিক ব্যথা থাকে; ব্যথার কারণে স্পর্শ করা যায় না, তাতে হিপার ব্যবহার করতে ভুলবেন না। ফোড়া পাকাতে চাইলে নিম্নশক্তিতে (৩,৬) খান আর ফোড়া না পাকিয়ে সারাতে চাইলে উচ্চশক্তিতে (১০০০) খান।

Arnica montana : যে-কোন ঘা কিংবা ফোড়ায় আর্নিকার প্রধান লক্ষণ হলো মাত্রাতিরিক্ত ব্যথা। **তাতে স্পর্শ করলে এমনই প্রচণ্ড ব্যথা হয় যে, রোগী তার দিকে কাউকে আসতে দেখলেই ভয় পেয়ে যায়** এবং সাবধানতা অবলম্বন করে যাতে ফোড়া-ঘায়ে কোন ধাক্কা না লাগে। যাদের শরীরে **ছোট ছোট ফোড়া একটার পর একটা উঠতেই থাকে** এবং সেগুলোতে প্রচণ্ড ব্যথা থাকে, তারা আর্নিকা খেতে ভুলবেন না। কোন স্থানে আঘাত লেগে যদি ঘা হয় বা ফোড়া হয়, তবে আর্নিকা সেবন করা উচিত। আর্নিকা কেবল ব্যথার ঔষধ নয় বরং এটি একই সাথে ঘা/পুঁজ ও সারিয়ে দেয় অর্থাৎ এন্টিবায়োটিকের কাজও করে থাকে।

Silicea : যেই ফোড়া পেকে অনেকদিন থেকে পুঁজ পড়তেছে কিন্তু সারতেছে না অথবা খুবই ধীরে ধীরে সারতেছে, এমন অবস্থায় সিলিশিয়া ঔষধটি প্রযোজ্য। সিলিশিয়ার পুঁজ থাকে পানির মতো পাতলা।

Mercurius solubilis : যে ফোড়া বা ঘায়ে পুঁজ হয়ে গেছে, তাতে মার্ক সল প্রযোজ্য। মার্ক সলের ব্যথা রাতের বেলা বৃদ্ধি পায়। দাঁতের মাড়িতে ঘা বা ফোড়া হলে মার্ক সলের কথা এক নাম্বারে চিন্তা করতে হবে। মার্ক সল নিম্নশক্তিতে খেলে সেটি ফোড়াকে পাকিয়ে সারাবে আর উচ্চশক্তিতে খেলে না পাকিয়ে সারিয়ে থাকে।

Lachesis : ফোড়ার রঙ যদি একটু নীলচে-লাল হয়, তবে ল্যাকেসিস হলো তার সবচেয়ে উপযুক্ত ঔষধ।

Echinacea angustifolia : ইচিনেশিয়া'কে বলা হয় হোমিওপ্যাথিক এন্টিবায়োটিক। যে-কোন ফোড়া বিশেষ করে মারাত্মক ধরণের ফোড়ায় নিশ্চিন্তে এই ঔষধটি ব্যবহার করতে পারেন।

Nitric acid : অতীতে যাদের সিফিলিস (syphilis) হয়েছিল অথবা সিফিলিস আক্রান্ত পিতা-মাতার সন্তানদের ফোড়া-ঘা ইত্যাদিতে নাইট্রিক এসিড ঔষধটি অসাধারণ।

Pyrogenium : যখন কোন ফোড়া বা ঘা দীর্ঘদিনেও সারতে চায় না কিংবা যাদের শরীরে সারা বছরই ফোড়া উঠতে থাকে, তারা পাইরোজেন ঔষধটি কয়েক সপ্তাহ খান। এটি আপনার পুরো শারীরিক সিষ্টেমকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দিবে। ফলে দু'দিন পরপর ফোড়া উঠার সমস্যা চলে যাবে।

## Abulia, Lack of confidence (আত্মবিশ্বাসের অভাব, ইচ্ছাশক্তির বিকলতা) :

যাদের নিজের যোগ্যতার উপর বিশ্বাস কমে গেছে, মনের জোর কমে গেছে বা আত্মবিশ্বাস হ্রাস পেয়েছে, তারা Silicea নামক ঔষধটি Silicea (10M) পনের দিন পরপর খান। (যেমন একজন চৌকস উকিল যিনি

প্রচণ্ড দক্ষতায় যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে প্রতিপক্ষের উকিলকে পরাস্ত করে অধিকাংশ মামলায় বিজয় ছিনিয়ে আনতেন, তিনি এখন আদালতে দাড়াঁতেই ভয় পান। ভাবেন আগের মতো হয়তো এখন আর পারবেন না।)

## Accident (দুর্ঘটনা) ঃ -

☆ কোনো স্থান কেটে গেলে রক্তপাত বন্ধ করতে এবং চামড়া জোড়া লাগাতে Calendula Officinalis (শক্তি Q) ঔষধটি তুলায় লাগিয়ে আক্রান্ত স্থানে প্রয়োগ করুন। কেটে যাওয়া স্থানে পূঁজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে Hepar sulph (শক্তি ২০০) তিনবেলা করে খান যতদিন ক্ষত না শুকায়।

☆ ধারালো অস্ত্রের আঘাতে অনেকটুকু কেটে গেলে, গভীরভাবে কেটে গেলে, মসৃনভাবে কেটে গেলে Staphisagria নামক ঔষধটি আল্লাহর নাম নিয়ে তিনবেলা করে কিছুদিন খেয়ে যান। যাদু আর কাকে বলে দেখতে পাবেন !

☆ রাতের বেলা হঠাৎ মৃত্যু ভয় নিয়ে ঘুম ভেঙ্গে গেলে (এখনই মারা যাবো এমন আশঙ্কা করলে, হার্টের অসুখ থাক বা না থাক) Arnica montana ঘনঘন খেতে থাকুন। এটি হার্ট এটাক ঠেকানোর শ্রেষ্ট ঔষধ।

☆ হঠাৎ কোন আনন্দ, বিস্ময় বা ভাবাবেগের কারণে কোনো রোগ দেখা দিলে Coffea cruda একমাত্রা খাওয়ান।

☆ হঠাৎ কোনো কারণে হৃৎপিন্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে বা অত্যধিক বুক ধরফড়ানি শুরু হলে Camphora পাঁচ মিনিট পরপর খাওয়াতে থাকুন।

☆ হঠাৎ কারো হার্ট ফেলের উপক্রম হলে বা হার্ট ফেল করলে Crataegus oxyacantha বা Arnica montana খাওয়াতে থাকুন।

☆ কোনো স্থান আগুনে পোড়ার সাথে সাথে Urtica urens অথবা Picric Acid রোজ চারবেলা করে খেতে থাকুন। পাশাপাশি পানির সাথে মিশিয়ে পোড়া স্থানে প্রয়োগ করুন।

☆ আগুনে পোড়ার পর অত্যধিক অস্থিরতা দেখা দিলে এবং ফোস্কা পড়লে Causticum রোজ চার বার করে খেতে থাকুন। পোড়া এবং ফোস্কার সাথে অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা থাকলে ক্যান্থারিস (Cantharis) ঘন ঘন খাওয়াতে থাকুন।

☆ অগ্নিদগ্ধ স্থানে পূঁজ উৎপন্ন হলে Picric Acid বাহ্য প্রয়োগ করুন এবং তিন/ চার বার করে খেতে থাকুন।

☆ হঠাৎ কোনো কারণে (দুর্ঘটনা-দীর্ঘ রোগ ভোগ) কারো শরীর ঘেমে ঠান্ডা হয়ে মরে মরে অবস্থা হয়ে গেলে Carvo vegetabilis অথবা Camphora ঘনঘন খাওয়াতে থাকুন।

☆ শরীরের কোনো স্থানে, কোমরে বা পেশীতে টান পড়লে Arnica montana অথবা Bellis perennis একমাত্রা করে দুই ঘণ্টা পরপর খাওয়াতে থাকুন।

☆ প্রচণ্ড গরমের সময় বা ঘামানো শরীরে ঠান্ডা কোন খাবার খেয়ে যে-কোন রোগই হউক না কেন, Bellis perennis আপনাকে সেই রোগ থেকে মুক্ত করবে।

☆ শরীরের কোনো স্থানে আঘাত লেগে চামড়ার নীচে কালশিরা পড়ে গেলে Arnica montana অথবা Ledum palustre তিনবেলা করে খেতে থাকুন।

☆ শিশুরা সাবান, চুন প্রভৃতি খেয়ে মুখ পুড়ে ফেললে অথবা চোখে চুন , সোডা বা ঝাঝালো জাতীয় কিছু পড়লে Causticum ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াতে থাকুন।

☆ কেহ বৈদ্যুতিক শক খেলে Phosphorus দশ মিনিট পরপর খেতে থাকুন।

☆ গলায় মাছের কাঁটা ফুটলে Silicea তিনবেলা করে দুই-তিন দিন খাওয়ান। প্রয়োজনে কয়েকদিন পরে আবারো একই নিয়েমে খাওয়ান। হাতে পায়ে কিছু বিধে সেখানে থেকে গেলে এবং পরবর্তীতে সেখানে চামড়ার নিচে শক্ত চাকা হলে উপরের নিয়মে Silicea ঔষধটি খান।

☆ সূচ, আলপিন, টেটা প্রভৃতি বিদ্ধ হলে ব্যথা কমাতে এবং ধনুষ্টঙ্কার ঠেকাতে Ledum palustre দুই/তিন ঘণ্টা পরপর চারমাত্রা খাওয়ান। পক্ষান্তরে ধনুষ্টঙ্কার দেখা দিলে বা আক্রান্ত স্থান থেকে তীব্র ব্যথা শরীরের বিভিন্ন দিকে যেতে থাকলে এবং শরীর ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে গেলে Hypericum perforatum ঘনঘন খাওয়াতে থাকুন।

☆ চোখে ঘুষি বা এই জাতীয় কোনো আঘাত লাগলে Ledum palustre তিন ঘণ্টা পরপর খেতে থাকুন।

## Acne vulgaris (ব্রণ) :-

শরীরে যৌবনের সূচনা হলে প্রায় অধিকাংশ ছেলে-মেয়ের মুখেই ব্রণের উৎপত্তি হয়। কখনও কখনও তা বুকে-পিঠেও দেখা দেয় এবং মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করে।

Calcarea phosphorica : ক্যালকেরিয়া ফস হলো ব্রণের সবচেয়ে কমন এবং সবচেয়ে কাযর্কর ঔষধ। রোজ দুইবেলা করে এক বা দুই সপ্তাহ খান।

Kali bromatum : ক্যালি ব্রোম মুখের, বুকের, কাধের এবং ঘাড়ের ব্রণ নিরাময়ে একটি সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ (৩০ শক্তি)। ব্রিটিশ হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাঃ ক্লার্কের মতে, খুব কম ব্রণই আছে যা ক্যালি ব্রোমে নিরাময় হয় না।

Bellis perennis : বেলিস পিরেনিস ব্রণের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ যদি তাতে জ্বালা-পোড়া থাকে।

Thuja occidentalis : থুজা ব্রণের আরেকটি ভালো ঔষধ বিশেষত সেগুলো যদি টিকা নেওয়ার কারণে হয়ে থাকে।

Asterias rubens : ব্রণের মাথা যদি কালো এবং গোড়া লাল হয়, তবে তাতে এসেটেরিয়াস রুবেন্স প্রযোজ্য।

## Addiction (মাদকাসক্তি, মদ-গাঁজা-ফেনসিডিল-হিরোইন-প্যাথিডিন ইত্যাদির নেশা)

ঃ- মদ, গাঁজা, হিরোইন, ফেনসিডিল ইত্যাদি নেশাকর ড্রাগ যারা দীর্ঘদিন থেকে খেয়ে আসছেন, তাদের পক্ষে এগুলো হঠাৎ করে বন্ধ করা সম্ভব নয়। কারণ এতে শরীরে কিছু মারাত্মক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এই জন্য এসব

ড্রাগ সেবনের পরিমাণ প্রতি সপ্তাহে একটু একটু করে কমিয়ে দিতে হবে। এভাবে আস্তে আস্তে তাদের পরিমাণ কমাতে কমাতে একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে। পাশাপাশি ড্রাগের পরিমাণ কমানোর ফলে শরীরে যে-সব অসুবিধার সৃষ্টি হয়, সেগুলো দূর করার জন্য ঔষধ খেতে হবে। দীর্ঘদিন নেশা করার পর চেষ্টা-তদ্বির করে পরবর্তীতে সেটি বন্ধ করতে সক্ষম হলেও সেই নেশার প্রতি অনেক বছর পরও একটা মারাত্মক আকর্ষণ থেকেই যায়। ফলে সুযোগ পেলে সেই নেশা আবারও শুরু করে দিতে পারেন। এজন্য নতুন কোন ভালো বিষয়ে নেশা সৃষ্টি করা দরকার। যেমন স্বামী-স্ত্রী-সন্তানদের ভালোবাসা, জ্ঞান অর্জনের নেশা, ইবাদত-বন্দেগী, ভিডিও গেম, মানবসেবা, ছবি আঁকা, কমপিউটার, ফটোগ্রাফি, তাবলীগ, ইন্টারনেট ব্রাউজিং ইত্যাদি ইত্যাদির নেশা সৃষ্টির মাধ্যমে অতীতকে ভুলে থাকার চেষ্টা করতে হবে।

Avena Sativa : হিরোইন, প্যাথেডিনের নেশা দূর করতে এভেনা সেটাইভা একটি শ্রেষ্ট ঔষধ। যারা হিরোইন বেশী পরিমাণে খান, তারা ধীরে ধীরে ইহার মাত্রা কমিয়ে আনুন এবং পাশাপাশি এভেনা স্যাটাইভা পনের ফোটা করে রোজ তিনবেলা করে খেতে থাকুন। পক্ষান্তরে যারা অল্প পরিমাণে হিরোইন-প্যাথেডিন নেন, তারা এগুলো পুরোপুরি বন্ধ করে দিন এবং তার বদলে এভেনা স্যাটাইভা পঞ্চাশ ফোটা করে রোজ তিনবেলা খান। এতে কোন শারীরিক সমস্যা হবে না। সাধারণত এসব মাদকদ্রব্য হঠাৎ করে বন্ধ করে দিলে শরীরে যে-সব মারাত্মক সমস্যা (withdrawal symptoms) দেখা দেয়, এভেনা সেটাইভা সেগুলোকে সফলতার সাথে সামাল দিতে পারে। এটি মাদার টিংচার (Q) শক্তিতে এবং আধা গ্লাস হালকা গরম পানিতে মিশিয়ে খাবেন।

Asarum europaeum : এসারাম ইউরো শরীরের ওপর মদ-ফেনসিডিলের প্রভাব কমিয়ে মদ্যপানের নেশা ছাড়তে সাহায্য করতে পারে। নিম্নশক্তিতে (Q, ৩, ৬ ইত্যাদি) ৫ থেকে ১৫ ফোটা করে রোজ তিনবার খেতে পারেন। হ্যাঁ, প্যাথেডিন, হিরোইনের নেশা ছাড়াতেও এটি একই মাত্রায় ব্যবহার করতে পারেন।

Nux vomica : মদ-ফেনসিডিল দীর্ঘদিন সেবনে শরীরের যে ক্ষতি হয়, নাক্স ভমিকা তাকে পুষিয়ে দিতে পারে। পাশাপাশি এটি মদ-ফেনসিডিলের নেশা ছাড়তে ব্যবহার করতে পারেন। মাত্রা হবে নিম্নশক্তিতে (Q, ৩, ৬ ইত্যাদি) ৫ থেকে ১০ ফোটা করে রোজ তিনবার।

Sulphuricum acidum : সালফিউরিক এসিড ঔষধটি মদ-ফেনসিডিলের নেশা ছাড়তে একটি অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ঔষধ। সাধারণত দু'চার দিন খাওয়ার পর থেকেই মাদকাসক্ত ব্যক্তি মদ-ফেনসিডিলের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। নিম্নশক্তিতে (Q, ৩, ৬ ইত্যাদি) ৫ থেকে ১০ ফোটা করে রোজ তিনবার দুই থেকে কয়েক সপ্তাহ খেতে পারেন। **এমনকি নেশায় আসক্ত ব্যক্তি যদি ঔষধ খেতে না চায়, তবে তার মদ বা ফেনসিডিলের সাথে মিশিয়ে খাওয়ালেও কাজ করবে**। তাছাড়া পানি, চা, দুধ ইত্যাদির সাথেও মিশিয়ে খাওয়াতে পারেন।

Natrum Phosphoricum : নেট্রাম ফস ঔষধটি মরফিন, প্যাথেডিন এবং হিরোইনের নেশা বন্ধ করতে সাহায্য করে থাকে। নেট্রাম ফস নিম্মশক্তিতে (Q, ৩, ৬) দশ ফোটা করে রোজ তিনবার করে খেতে থাকুন এবং উল্লেখিত নেশাসমূহ প্রতি সপ্তাহে ধীরে ধীরে কমাতে থাকুন। তারপর এক সময় একেবারে বন্ধ করে দিন। দীর্ঘদিন সেবনের পর এসব নেশাদ্রব্য বন্ধ করলে শরীরের যে-সব সমস্যা হতে পারে, নেট্রাম ফস সেগুলোকে দূর করে দিবে।

Staphisagria : বিড়ি-সিগারেট অর্থাৎ ধূমপানের নেশা ছাড়াতে স্টেফিসেগ্রিয়া একটি শ্রেষ্ট ঔষধ। এটি ধূমপানের প্রতি আকর্ষণ কমিয়ে দিয়ে সেটি বন্ধ করতে সাহায্য করে। এটি Q, ৩, ৬, ৩০ ইত্যাদি যে-কোন শক্তিতে খেতে পারেন ; তবে যত নিম্নশক্তিতে খাওয়া যায় তত উত্তম। রোজ পাঁচ ফোটা করে সকাল-সন্ধ্যা দু'বার। টেবেকাম (tabacum)

নামক ঔষধটিও ধূমপানের নেশা দূর করতে সাহায্য করে। এটিও একই নিয়মে খেতে পারেন। ধূমপানের নেশা ছাড়াতে আরেকটি উৎকৃষ্ট ঔষধ হলো চায়না (China officinalis).

## Alopecia areata, Baldness, Hair-Loss (টাক, চুল পড়া) :-

টাক যেমন বিভিন্ন কারণে পড়ে, তেমনি এগুলো সারাতেও বিভিন্ন ঔষধের প্রয়োজন হয়ে থাকে। এসব ঔষধ একাধিক্রমে কয়েক মাস ব্যবহার করতে হয়।

Arnica montana : আর্নিকা ঔষধটির টাকে চুল গজানোর ক্ষমতা আছে। এটি নিম্নশক্তিতে (Q, ৩, ৬) তেলের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করুন অথবা সরাসরি টাক পড়া স্থানে মালিশ করতে পারেন।

Thuja occidentalis : টাকের একটি মূল কারণ হলো টিকা (বিসিজি, ডিপিটি, এটিএস, পোলিও, হেপাটাইটিস, এটিএস ইত্যাদি) নেওয়া। টিকা নিলে কেবল খুসকিই হয় না বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে চুল পাতলা হয়ে যায় এবং পাতলা হতে হতে টাক পড়ে যায়। কাজেই কোন টিকা নেওয়ার দুয়েক মাস থেকে দুয়েক বছরের মধ্যে খুসকি দেখা দিলে প্রথমেই থুজা নামক ঔষধটি খেতে হবে। বিশেষ করে খুসকির সাথে যাদের শরীরে আঁচিলও আছে, তাদের প্রথমেই কয়েক মাত্রা থুজা খেয়ে নেওয়া উচিত।

Jaborandi : জ্যাবোরেন্ডি ঔষধটি টাকে চুল গজানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়। এটি দীর্ঘদিন ব্যবহারে কিংবা খাওয়ার ফলে সাদা চুলও কালো হয়ে যায়। এটিও নিম্নশক্তিতে (Q, ৩, ৬) তেলের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করুন অথবা সরাসরি টাক পড়া স্থানে মালিশ করতে পারেন।

Lycopodium clavatum : লাইকোপোডিয়াম টাকের একটি শ্রেষ্ট ঔষধ বিশেষত চারদিকে চুল কিন্তু মাঝখানে টাক এমন টাকের ক্ষেত্রে। লাইকোর প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো সারা বৎসর প্রস্রাবের বা হজমের সমস্যা লেগেই থাকে, **পেটে গ্যাস হয় প্রচুর**, দেখতে তাদের বয়সের চাইতেও বেশী বয়স্ক মনে হয়, স্বাস্থ্য খারাপ কিন্তু ব্রেন খুব ভালো ইত্যাদি ইত্যাদি। ১০,০০০ (10M) শক্তিতে পনের দিন পরপর একমাত্রা করে খান।

Selenium : সেলিনিয়াম টাকের একটি ভালো ঔষধ তাদের জন্য **যাদের কোষ্টকাঠিন্য আছে,** যারা অল্প পরিশ্রমেই একেবারে কাহিল হয়ে পড়েন এবং যাদের মনে যৌন চিন্তা বেশী কিন্তু যৌনশক্তি দুর্বল।

Natrum muriaticum : মহিলাদের সন্তান প্রসব পরবর্তী সময়ে শরীরের যে-কোন স্থান থেকে চুল পড়ে গেলে নেট্রাম মিউর খাওয়ান।

Fluoricum acidum : ফ্লোরিক এসিড টাকে চুল গজানোর ক্ষেত্রে একটি ভালো ঔষধ বিশেষত যারা খুব ফূর্তিবাজ লোক তাদের জন্য। ১০,০০০ (10M) শক্তিতে পনের দিন পরপর একমাত্রা করে খান কয়েকবার। পরবর্তীতে আরো উচ্চ শক্তিতে খেতে হতে পারে।

Phosphoricum acidum : **শোক, দুঃখ, বিরহ, প্রেমে ব্যর্থতা, মারাত্মক ধরণের অসুখে (যেমন-টাইফয়েড) ভোগে শরীরের বারোটা বেজে যাওয়া** ইত্যাদি কারণে চুল পড়ে গেলে ফসফরিক এসিড ঔষধটি নিম্নশক্তিতে দীর্ঘদিন খেলে চুল গজিয়ে থাকে। পরবর্তীতে ফসফরিক এসিড উচ্চ শক্তিতে খেতে হতে পারে।

Vinca minor : ভিনকা মাইনর বেশ কিছু দিন খেলে টাকের মধ্যে চিকন চিকন ছোট ছোট চুল গজাতে দেখা যায়।

## Amenorrhea (মাসিক বন্ধ থাকা, ঋতুস্রাব না হওয়া) :-

সাধারণত পনের বছর বয়স থেকে মেয়েদের মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হয় এবং পঞ্চাশ বছর বয়সের দিকে তা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণত গর্ভকালীন অবস্থায় এবং শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় পিরিয়ড বন্ধ থাকে। এই দুই সময় ছাড়া অন্য সময়ে মাসিক বন্ধ থাকলে তার পেছনে কোন রোগ আছে বলে ধরে নিতে হবে।

Pulsatilla pratensis : মাসিক বন্ধের চিকিৎসায় হোমিও ঔষধগুলোর মধ্যে পালসেটিলার স্থান এক নম্বরে। এটি স্নেহপরায়ন, কথায় কথায় কেদে ফেলে, খুব সহজেই মোটা হয়ে যায়....এই ধরণের মেয়েদের বেলায় ভালো কাজ করে। মাত্রা হবে নিম্নশক্তিতে (Q, ৩, ৬ ইত্যাদি) ৫ থেকে ১০ ফোটা করে রোজ তিনবার।

Senecio aureus : শরীরে রক্ত কম থাকলে অর্থাৎ যারা রক্তশূণ্যতায় ভোগছেন, তাদের জন্য সিনিসিও অরিয়াস ভালো কাজ করে। এদের হাত-পা সব সময় ঠান্ডা এবং ঘামে ভিজা ভিজা থাকে।

Thlaspi bursa pastoris : বারসা পেসটোরাই মাসিক বন্ধের চিকিৎসায় একটি শ্রেষ্ট ঔষধ। বিশেষত খেতে হবে নিম্নশক্তিতে (Q) ৫ থেকে ১০ ফোটা করে রোজ তিনবার।

Calcarea carbonica : **মোটা, স্থুলকায়, থলথলে শরীরের মেয়েদের** ক্ষেত্রে ক্যালকেরিয়া কার্ব ভালো কাজ করে বিশেষত যদি সাথে কিছুটা রক্তশূণ্যতাও থাকে। এদের মাথা সহজেই ঘেমে যায়, অল্পতেই বুক ধড়ফড় করে এবং মাথা ব্যথা অথবা কাশি সারা বছর লেগেই থাকে।

Aconitum napellus : ভয় পেয়ে মাসিক বন্ধ হয়ে গেলে একোনাইট খেতে হবে।

Ferrum metallicum : ফেরাম মেট-এর লক্ষণ হলো দুর্বলতা, সাদাটে মুখ, **বুক ধড়ফড়ানি, মুখ-চোখ ফোলা ফোলা**, চোখের চারদিকে কালি পড়ে গেছে, দেখতেই মনে হয় অসুস্থ।

Sepia : মাসিক বন্ধের চিকিৎসায় সিপিয়ার লক্ষণ হলো পেটের মধ্যে চাকা বা বলের মতো কিছু একটা আছে বলে অনুভূত হয়। শারীরিক দুর্বলতা থাকে প্রচুর এবং সংসারের প্রতি কোন আকর্ষণ থাকে না।

Bryonia alba : যাদের মাসিকের সময়ে মাসিক না হয়ে বরং নাক থেকে রক্তক্ষরণ হয় এবং প্রচণ্ড মাথা ব্যথা হয়, তাদের বেলায় ব্রায়োনিয়া প্রযোজ্য।

Lachesis : ল্যাকেসিসের লক্ষণ হলো পিরিয়ড শুরু হলে নাক থেকে রক্তক্ষরণ এবং মাথা ব্যথা ভালো হয়ে যায়।

Graphites : যে-সব মহিলা দিন দিন কেবল মোটা হতে থাকে, যাদের মাসিকের রক্তক্ষরণের পরিমাণ খুবই অল্প, যাদের সারা বছর কোষ্টকাঠিন্য লেগে থাকে, তাদের বেলায় গ্রেফাইটিস প্রযোজ্য।

Kali phosphoricum : একেবারে নার্ভাস ধরণের মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাদের শরীরের অবস্থা বেশ খারাপ, ভীষণ বদমেজাজী, অতিরিক্ত শারীরিক-মানসিক পরিশ্রমে যাদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে।

Cimicifuga/ Actea racemosa : এটি নার্ভাস ধরণের মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিশেষত যারা ঘন ঘন বাতের ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে থাকেন। মনে আনন্দ নাই এবং সবকিছুরই খারাপ দিকটা আগে চিন্তা করেন।

Natrum muriaticum : যাদের ঋতুস্রাবে রক্তক্ষরণ হয় খুবই অল্প এবং যাদের পিরিয়ড প্রতিবারই কিছুদিন পিছিয়ে যায়, তাদের মাসিক বন্ধ হলে নেট্রাম মিউর প্রযোজ্য। এদের মুখ হয় সাদাটে এবং ফোলা ফোলা এবং বেশী বেশী লবণ বা লবণযুক্ত খাবার খাওয়ার প্রতি তীব্র আকর্ষণ থাকে।

Kali Carbonicum : যে-রোগীর লক্ষণ নেট্রাম মিউরের মতো অথচ নেট্রাম মিউরে কোন কাজ হয় না, সেক্ষেত্রে ক্যালি কার্ব দিতে হবে।

## Aphthous, stomatitis, mouth ulcer (মুখের ঘা) :-

মুখের ভেতরে গালের মধ্যে বা জিহ্বার উপরে-নীচে ছোট ছোট ব্যথাযুক্ত ঘা হয়। একবার হয়, সেরে যায়, কিছুদিন পর আবার হয়। এভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ চলতে থাকে। এগুলোর কারণে খাওয়া-দাওয়া করা খুবই কষ্টদায়ক হয়ে পড়ে।

Natrum muriaticum : ক্লার্কের মতে, নেট্রাম মিউর মুখের ঘায়ের একটি শ্রেষ্ট ঔষধ। এদের জিহ্বা থাকে মানচিত্রের মতো খাঁজ কাটা এবং স্থানে স্থানে লাল দাগ বিশিষ্ট।

Borax : বোরাক্স হলো মুখের ঘায়ের এক নাম্বার ঔষধ। ইহার প্রধান লক্ষণ হলো নীচে নামতে ভয় পায়। শিশুকে হাত দিয়ে উপরে ধরে তারপর আস্তে আস্তে নীচে নামান, দেখবেন ভয় পায় কিনা। যদি ভয় পায় তবে কেবল মুখের ঘা নয়, শিশুর যে-কোন শারীরিক-মানসিক রোগই বোরাক্সে সেরে যাবে।

Sanicula : মুখের ঘায়ে সেনিকিউলা'র লক্ষণ হলো তাতে গরম পানি খেয়ে মুখ পুড়ে যাওয়ার মতো জ্বালা-পোড়া ভাব থাকে এবং গরম কোন খাবার-পানি খেলে খুবই অসুবিধা হয়। **যাদের শারীরিক অবস্থা খারাপ এমনকি গ্রীষ্মকালেও যাদের হাত-পা ঠান্ডা থাকে**, তাদের ক্ষেত্রে এটি ভালো কাজ করে।

Hydrastis canadensis : হাইড্রাসটিস মুখের ঘায়ের আরেকটি শ্রেষ্ট ঔষধ বিশেষত যাদের মুখের, চোখের বা ঘায়ের রং হলদেটে থাকে অর্থাৎ জন্ডিসের ভাব আছে।

Hydrocotyle asiatica : হাইড্রোকোটাইল আরেকটি ভালো ঔষধ বিশেষত যাদের নিজেদের বা বংশগত সিফিলিসের ইতিহাস আছে।

Arsenicum album : মুখের ঘায়ের রঙ যদি নীলচে রঙের হয় এবং তাতে জ্বালা-পোড়া ভাব থাকে, তবে আর্সেনিক তার উপযুক্ত ঔষধ।

## Appendicitis (এপেন্ডিসাইটিস) :

সাধারণত নাভীর নীচে ডানপাশে তলপেটের তীব্র ব্যথাকে এপেন্ডিসাইটিস বলা হয়। এই পজিশনে এপেন্ডিক্স (Appendix) নামে একটি কেঁচোর মতো একটি অংশ আছে ; ইহাতে ইনফেকশন / প্রদাহ হওয়াকেই এপেন্ডিসাইটিস বলা হয়। ইহার প্রধান লক্ষণ হলো প্রথমে ব্যথা (তলপেটের ডানপাশে), তারপরে হয় বমি এবং শেষে হয় জ্বর। সমস্ত পেটই এতো সেনসেটিভ হয় যে, হালকাভাবে স্পর্শ করলেও রোগী ব্যথা পায়। এপেন্ডিসাইটিসের একটি প্রধান লক্ষণ হলো, রোগীর পেটে জোরে চাপ দিয়ে হঠাৎ চাপ ছেড়ে দিলে (Rebound tenderness) রোগী প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করে থাকে। সে যাক, এলোপ্যাথিক

ডাক্তাররা ৯৯% ভাগ ক্ষেত্রেই অপারেশান ছাড়া এপেন্ডিসাইটিস সারাতে পারে না কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে ১০০% ভাগ কেইস-ই বিনা অপারেশানে সারানো যায়।

Bryonia alba : এপেন্ডিসাইটিসের সবচেয়ে ভালো ঔষধ হলো ব্রায়োনিয়া। কেননা - চাপ ছেড়ে দিলে ব্যথা হয়- এই অদ্ভুত লক্ষণটি ব্রায়োনিয়ায় আছে। সাধারণত ৫০,০০০ (বা 50M), ১০০,০০০ (বা CM) ইত্যাদি উচ্চ শক্তিতে এক মাত্রা খাওয়ানোই যথেষ্ট ; কিন্তু নিম্ন শক্তিতে খেলে রোজ কয়েকবার করে কয়েকদিন খাওয়ানো লাগতে পারে।
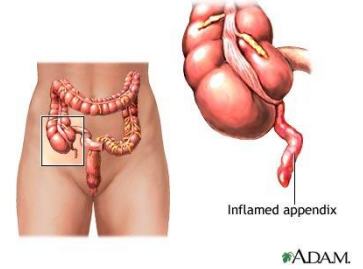
Iris tenax : ইরিস টেনক্সকে বলা হয় হোমিওপ্যাথিতে এপেন্ডিসাইটিসের একেবারে স্পেসিফিক ঔষধ। কেননা ইহা যত মানুষের শরীরে পরীক্ষা করা হয়েছে, তাদের প্রত্যেকেরই তলপেটের ডানপাশে তীব্র ব্যথার লক্ষণ পাওয়া গেছে।

☆ ব্যাপারটি এমন নয় যে, আপনি কেবল ব্রায়োনিয়া আর ইরিস টেনক্স নিয়ে পড়ে থাকবেন। এই দুটি ছাড়াও যদি অন্য কোন ঔষধের লক্ষণ রোগীর মধ্যে পাওয়া যায়, তবে সেটি প্রয়োগেও এপেন্ডিসাইটিস অবশ্যই আরোগ্য হবে। তবে কথা হলো ব্রায়োনিয়া এবং ইরিস টেনক্স ঔষধ দুটির কথা প্রথমেই মাথায় রাখতে হবে।

**Appetite disorder (ক্ষুধার সমস্যা) :** ক্ষুধার সমস্যা দুই ধরণের হতে পারে। ক্ষুধা একেবারে কম হওয়া যেমন একটি রোগ তেমনি ক্ষুধা খুব বেশী হওয়াটাও রোগের মধ্যে পড়ে।

Iodium : আয়োডিয়াম ঔষধটি রাক্ষসের মতো ক্ষুধা তৈরী করতে পারে। আয়োডিয়ামের লক্ষণ হলো প্রচুর খায় কিন্তু তারপরও দিনদিন শুকিয়ে যেতে থাকে এবং গরম সহ্য করতে পারে না। যাদের ক্ষুধা খুব বেশী তারা এটি খেলে ক্ষুধা কমে আসবে। অন্যদিকে যাদের ক্ষুধা খুবই কম তারা খেলে ক্ষুধা বেড়ে যাবে। খেতে হবে নিম্নশক্তিতে (Q, ৩, ৬) পাঁচ ফোটা করে রোজ তিনবার।

Alfalfa : আলফালফা ঔষধটি নিয়মিত অনেকদিন খেলে ক্ষুধা, ঘুম, ওজন, হজমশক্তি ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। নিম্নশক্তিতে (Q) দশ ফোটা করে রোজ তিনবার করে খেতে পারেন। দ্রুত ওজন বাড়াতে চাইলে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ-ষাট ফোটা করে খেতে পারেন। তবে কোন সমস্যা হলে কমিয়ে খাওয়া উচিত। ইহার স্বাদ যেহেতু খারাপ সেহেতু শিশুদেরকে চিনি বা গুড়ের সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে পারেন।

Nux vomica : নাক্স ভমিকা ঔষধটি ক্ষুধা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী ঔষধ। যারা পরিশ্রমের কাজ কম করে কিন্তু টেনশন বেশী করে, দিনের বেশীর ভাগ সময় চেয়ারে বসে থাকে, সারা বছরই পেটের গন্ডগোল লেগেই থাকে, শীত সহ্য করতে পারে না.....এই ধরণের লোকদের ক্ষেত্রে নাক্স ভমিকা ভালো কাজ করে।

Calcarea carbonica : ক্যালকেরিয়া কার্ব নামক ঔষধটি হলো হোমিওপ্যাথিতে সবচেয়ে ভালো ভিটামিন। এটি ক্ষুধাহীনতা, অজীর্ণ, বদহজম, পেটের আলসার, ঘনঘন অসুখ-বিসুখ হওয়া, শারীরিক দুর্বলতা, স্নায়বিক দুর্বলতা, ব্রেনের দুর্বলতা, অপুষ্টি ইত্যাদি সমস্যা দূর করতে পারে।

## Anaemia (রক্তশূণ্যতা) :-

রক্তশূণ্যতা মানে শরীরে রক্ত না থাকা নয় বরং রক্ত প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকা। পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার না খাওয়া, ঋতুস্রাবের সাথে বেশী রক্ত যাওয়া, গর্ভধারণ, কোন মারাত্মক দুর্ঘটনা বা অসুখে রক্ত নষ্ট হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে শরীরে রক্তের পরিমাণ কমে যেতে পারে। শরীরে রক্তশূণ্যতা দেখা দিলে চেহারা মলিন-ফ্যাকাসে হয়, দুর্বলতা, ক্লান্তি, বুকে ব্যথা, বুক ধড়ফড় করা, ঘনঘন শ্বাস নেওয়া, জন্ডিস, হাত-পায়ে অবশ অবশ ভাব এবং সুই ফোটানো ব্যথা, মাথা ঘুরানি, স্মরণশক্তি কমে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দিয়ে থাকে। রক্তশূণ্যতার চিকিৎসায় ঔষধ খেতে হবে নিম্নশক্তিতে (Q, ৩, ৬, ৩০) রোজ তিনবার করে অনেক দিন। ঔষধ খাওয়ার পাশাপাশি দুধ, ডিম, লাল গোশত, ফল-মুল, শাক-সবজি ইত্যাদি পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে প্রচুর পরিমাণে।

Ferrum metallicum : ফেরাম মেট হোমিওপ্যাথিতে রক্তশূণ্যতার এক নম্বর ঔষধ। ইহার লক্ষণ হলো সাধারণভাবে মুখের রঙ থাকে ফ্যাকাসে-সাদাটে কিন্তু একটু আবেগপ্রবন হলেই মুখের রঙ লাল হয়ে যায়। তাছাড়া হাত-পা-মুখে ফোলা ফোলা ভাব থাকে এবং অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কেউ কেউ খাওয়ার পরে বমি করে দেয়। ইহারা সর্বদা শীতে কাঁপতে থাকে এবং সন্ধ্যার দিকে জ্বরে ভোগে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে Ferrum phosphoricum নামক ঔষধটি ফেরাম মেটের চাইতে ভালো কাজ করে থাকে। সুসলারের মতে, প্রথমে খেতে হবে Calcarea phosphorica এবং পরে খাওয়া উচিত Ferrum phosphoricum নামক ঔষধটি।



Lecithinum : ডিমের কুসুম থেকে তৈরী লিসিথিন নামক হোমিও ঔষধটি রক্তশূণ্যতার একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। বিশেষত যাদের রক্তে হিমোগ্লোবিনের (Haemoglobin) মাত্রা কম থাকে। অনেক চিকিৎসা বিজ্ঞানীর মতে, এটি ব্লাড ক্যান্সার, থেলাসেমিয়া ইত্যাদি মারাত্মক রোগে দারুণ কাজ করে থাকে।

Pulsatilla pratensis : অতিরিক্ত আয়রন জাতীয় ঔষধ খাওয়ার কারণে রক্তশূণ্যতার সৃষ্টি হলে পালসেটিলা প্রযোজ্য। যে-সব মেয়েরা কথায় কথায় কেঁদে ফেলে, মুক্ত বাতাস পছন্দ, পিপাসা কম, গ্যাসট্রিক আলসার এবং মাসিকের গন্ডগোল সারা বছরই লেগে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে পালসেটিলা উপকারী।

Cinchona / China officinalis : শরীর থেকে প্রয়োজনীয় তরল পদার্থ বের হয়ে যাওয়ার কারণে রক্তশূণ্যতা দেখা দিলে চায়না খাওয়াতে হবে। যেমন কোন ভাবে শরীর থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হওয়া, শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো, দীর্ঘদিনের ডায়েরিয়া, মাত্রাতিরিক্ত যৌনকর্ম বা বীর্যপাত, মাসিকের সময় বেশী রক্তপাত ইত্যাদি ইত্যাদি। চায়নার লক্ষণ হলো মাথা ভারী ভারী লাগে, চোখের পাওয়ার কমে যায়, অল্পতেই বেহুঁশ হয়ে পড়া, কানের ভেতরে ভো ভো শব্দ হওয়া, হজমশক্তি কমে যাওয়া, পেটে প্রচুর গ্যাস হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

Chininum arsenicosum : চিনিনাম আর্স ঔষধটিও রক্তশূণ্যতা নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে বিশেষত যেখানে দুর্বলতা, ক্লান্তি, মাথা ব্যথা, অতিরিক্ত ঘামানো ইত্যাদি লক্ষণ বেশী থাকে। পারনিসিয়াস এনিমিয়া (pernicious anaemia) নামক বুড়ো লোকদের মারাত্মক রক্তশূণ্যতাতেও এটি মাঝে মাঝে বেশ উপকার করে থাকে।

Alfalfa : আলফালফা নামক ঔষধটি রক্তশূণ্যতায় খেতে পারেন। এটি ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, হজম শক্তি বৃদ্ধি করে এবং শরীরের ওজন বৃদ্ধি করে। অপুষ্টিজনিত রক্তশূণ্যতায় একটি উৎকৃষ্ট ভিটামিন হিসাবে এটি সবাই ইচ্ছে করলে সারা জীবন খেতে পারেন। কেননা ইহার কোন ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নাই।

Aceticum Acidum : এসিটিক এসিডের রক্তশূণ্যতার লক্ষণ হলো মুখের বা ত্বকের রঙ হয় মোমের মতো চকচকে এবং প্রচুর পানি পিপাসা থাকে।

Calcarea carbonica : শিশু-কিশোর-তরুণ-যুবক-বৃদ্ধ যে-কোন বয়সের লোকদের রক্তশূণ্যতা নিরাময়ের ক্ষেত্রে ক্যালকেরিয়া কার্ব একটি দারুণ ঔষধ। শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মানুষের ক্ষেত্রে এটি আশাতীত উপকার করে থাকে। ক্যালকেরিয়া কার্বের লক্ষণ হলো এরা খুব সহজে মোটা হয়ে যায়, শরীরের চাইতে পেট মোটা থাকে, থলথলে নরম শরীর, প্রস্রাব-পায়খানা-ঘাম সব কিছু থেকে টক গন্ধ আসে, হাতের তালু মেয়েদের হাতের মতো নরম (মনে হবে হাতে কোন হাড়ই নেই), মাথা ঘামায় বেশী, মুখমন্ডল ফোলাফোলা ইত্যাদি ইত্যাদি।

Nux vomica : দীর্ঘস্থায়ী পেটের সমস্যার (বদহজম) কারণে রক্তশূণ্যতা দেখা দিলে নাক্স ভমিকা প্রযোজ্য।

Plumbum metallicum : রক্তশূণ্যতার সাথে যদি দীর্ঘ দিনের কোষ্টকাঠিন্য/শক্ত পায়খানার সমস্যা থাকে, তবে প্রথমেই প্লামবাম ঔষধটি খাওয়ার কথা চিন্তা করতে হবে। এতে এমন পেট ব্যথা থাকে, যাতে মনে হবে পেটের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কেউ যেন সুতো দিয়ে বেঁধে পিঠের দিকে টানতেছে।

Arsenicum Album : ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড ইত্যাদি মারাত্মক রোগে ভোগার কারণে প্রচুর রক্ত নষ্ট হয়ে রক্তশূণ্যতার সৃষ্টি হলে তাতে আর্সেনিক প্রযোজ্য। আর্সেনিকের লক্ষণ হলো মারাত্মক দুর্বলতা, হাত-পায়ে পানি নামা, খুব দ্রুত শুকিয়ে যাওয়া (emaciation), বুক ধড়ফড়ানি, টক খাওয়ার আগ্রহ বেড়ে যাওয়া, পিপাসা বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি।

Picricum Acidum : রক্তশূণ্যতায় পিক্রিক এসিডের লক্ষণ হলো ভীষণ দুর্বলতা, সারা শরীরে ক্লান্তি এবং ভার ভার অনুভুত হওয়া, মেরুদন্ডের বরাবরে জ্বালাপোড়া ধরণের ব্যথা, উত্তেজিত হলে সকল কষ্ট বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি।

Helonias dioica : হেলোনিয়াস রক্তশূণ্যতা নিরাময়ে একটি ভালো ঔষধ বিশেষত সে-সব মহিলাদের জন্য যারা জরায়ু সংক্রান্ত রোগে ভোগছেন, যারা অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে কঙ্কালে পরিণত হয়েছেন। ইহার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হলো রোগের কথা ভাবলে রোগ বেড়ে যায় এবং রোগের কথা ভুলে থাকলে ভালো থাকে।

Aletris farinosa : এটিও মহিলাদের রক্তশূণ্যতার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বিশেষত উঠতি বয়সী মেয়েদের এবং গর্ভবতীদের। তাছাড়া সে-সব মহিলারা জরায়ু সংক্রান্ত কোন রোগে ভোগছেন, তাদের রক্তশূণ্যতায়ও এটি একটি ভালো ঔষধ।

Natrum muriaticum : নেট্রাম মিউর রক্তশূণ্যতার একটি ভালো ঔষধ। রোগীর চেহারা থাকে ফ্যাকাসে, **ভালো খাওয়া-দাওয়া করে কিন্তু দিনদিন শুকিয়ে কঙ্কালে পরিণত হয়, ঘনঘন মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হয়,** পায়খানা অধিকাংশ সময় শক্ত থাকে, মাসিকের রক্তক্ষরণ হয় খুবই অল্প, বুক ধড়ফড়ানি, মাঝে মাঝে হার্টবিট মিস হয়, মেজাজ হয় খিটখিটে, শুচিবায়ু গ্রস্ত স্বভাব।

Kali carbonicum : ক্যালি কার্বের প্রধান লক্ষণ হলো দুর্বলতা, বেশী বেশী ঘামানো এবং কোমর ব্যথা। এছাড়া চোখের ওপরের পাতা ফোলা থাকে, ঘুমের মধ্যে পায়ে টাচ করলে চমকে ওঠে, যৌনমিলনের পরে চোখে সমস্যা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

Kali phosphoricum : ক্যালি ফস রক্তশূণ্যতা এবং দুর্বলতার একটি অন্যতম শ্রেষ্ট ঔষধ। ইহার রোগীরা অত্যন্ত সেনসিটিভ এবং বদমেজাজী হয়ে থাকে। মাত্রাতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের কারণে কঙ্কালে পরিণত হয়েছেন। তাছাড়া হঠাৎ স্পর্শ করলে চমকে ওঠে, যৌনমিলনের পরে দুর্বল হয়ে পড়ে ইত্যাদি লক্ষণও থাকে।

## Angina pectoris, cardiac pain, chest pain (হৃৎপিন্ডের ব্যথা, হৃদশূল, বুকের ব্যথা) :-

সাধারণত হৃৎপিন্ডের পেশীতে অক্সিজেন সাপ্লাই কমে গেলে তাতে এক ধরণের মারাত্মক ব্যথা, শ্বাসকষ্ট অনুভুত হয়। এটি কোন রোগ নয় বরং অন্য কোন হৃৎরোগের একটি লক্ষণ। ব্যথা বুকের বাম পাশে দেখা দেয় এবং সেখান থেকে বাম হাতে, ঘাড়ে, চোয়ালের দিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে। হৃৎপিন্ডের ব্যথা সাধারণত খুব অল্প সময় স্থায়ী হয় এবং ব্যথা এতো প্রচণ্ড হয় যে রোগীর ধারণা জন্মে যে, সে এখনই মারা যাবে ; তার দিন ফুরিয়ে এসেছে। শারীরিক পরিশ্রম, মানসিক উত্তেজনা, খুবই ঠান্ডা আবহাওয়া ইত্যাদি কারণে বুকের ব্যথা শুরু হয়। আসল হৃৎরোগ নিরাময় না হওয়া পযর্ন্ত বুকের ব্যথা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি মেলে না। বুকের ব্যথার ঔষধ অবশ্যই খুব ঘনঘন (পাঁচ মিনিট পরপর) খাবেন।

**Arnica montana :** আর্নিকা বুকে ব্যথার সবচেয়ে ভালো ঔষধ। যাদের ঘনঘন বুকে ব্যথা উঠে অথবা যাদের একবার হার্ট এটাক (স্ট্রোক) হয়েছে, তাদের সব সময় আর্নিকা ঔষধটি পকেটে নিয়ে চলাফেরা করা উচিত। এটি আপনাকে হার্ট এটাকে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে যাওয়া বা অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবে।

**Latrodectus mactans :** এনজিনা পেক্টোরিসের সবচেয়ে ভালো ঔষধ হলো লেট্রোডেক্টাস ম্যাকটেনস (Latrodectus mactans) বিশেষত ব্যথা যখন বাম হাতের দিকে ছড়াতে থাকে। মনে হয় কেউ যেন শক্ত হাতে গলা চেপে ধরেছে ; দম বন্ধ হয়ে এখনই মারা যাবে।

**Amylenum nitrosum :** এটি হৃৎপিন্ডের ব্যথার সবচেয়ে কমন ঔষধ। এটি হৃৎপিন্ড এবং শরীরের ওপরের অংশের রক্তনালীকে প্রসারিত করার মাধ্যমে বুকের ব্যথা নিরাময় করে।

**Glonoine :** গ্লোনইন হলো বুকের ব্যথার এক নাম্বার ঔষধ যা সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষণ ছাড়াই দেওয়া যায়। পাশাপাশি এটি হাই ব্লাড প্রেসারেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ।

**Crataegus oxyacantha :** এটি হৃৎপিন্ডের রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ অথাৎ হৃদপিন্ডের দুবলতার একটি শ্রেষ্ট টনিক এবং এনজাইনারও একটি ভালো ঔষধ।

**Cactus grandiflorus :** ইহাও হৃৎপিন্ডের ব্যথার একটি উল্লেখযোগ্য ঔষধ। ইহার প্রধান লক্ষণ হলো মনে হবে হৃৎপিন্ডকে কেউ তার লোহার হাত দিয়ে এমনভাবে চেপে ধরেছে যে, সেটি নড়াচড়া করতে পারছে না।

(তাছাড়া Actea racemosa / Cimicifuga, Spigelia anthelmia, Naja tripudians, Kalmia latifolia এবং Spongia tosta ঔষধগুলোও হৃৎপিন্ডের ব্যথার জাদরেল ঔষধ। এতগুলো ঔষধের নাম বলার উদ্দেশ্য হলো বিপদের সময় যেটি হাতের কাছে পান, তাই দিয়েই যেন রক্ষা পেতে পারেন।)

**Animal and birds diseases (পশু-পাখিদের রোগ) :** হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মাধ্যমে বাক শক্তিহীন পশু-পাখিদের রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা করতে হলে আপনাকে অনেক বুদ্ধি খাটাতে হবে। কেননা মানুষ তার কষ্টের কথা বলতে পারে, বোবা মানুষ বলতে না পারলেও ঈঙ্গিতে অনেক কিছু বুঝাতে পারে কিন্তু পশু-পাখিরা তার কোনটাই পারে না। লক্ষণ দেখে, চিন্তা করে, যুক্তি খাটিয়ে পশু-পাখিদের রোগ লক্ষণ আপনাকে বের করতে হবে। মানুষের মতো পশু-পাখিদের বেলাতেও শারীরিক লক্ষণের চাইতে মানসিক লক্ষণকে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে এবং যদি মানসিক লক্ষণ সংগ্রহ করতে পারেন, তবে তার ওপর ভিত্তি করে ঔষধ নির্বাচন করতে হব। যেমন- মনে করুন আপনার পোষা বিড়ালটিকে আপনি ধমক দেওয়ার পর থেকে সে চুপচাপ হয়ে গেছে, আপনার কাছে আসে না, দুষ্টুমি করে না, খেলাধুলা করে না, তাহলে বুঝতে হবে সেটি খুবই অভিমানী / আবেগপ্রবন (Emotional / impulsive)। ফলে তার শারীরিক-মানসিক যেসব ঔষধ অভিমানী বা আবেগপ্রবন লোকদের -কোন রোগে তাকে যে- সেগুলো ,ক্ষেত্রে প্রযোজ্যথেকে মানানসই একটি ঔষধ নির্বাচন করে খাওয়াতে হবে। যদি দেখেন যে, আপনার পোষা কুকুরটি বাড়িতে কোন অপরিচিত লোককে ঢুকতে দেখলে আক্রমণ করতে যায় এবং খুবই উৎপাত করে, তাহলে বুঝতে হবে সে সন্দেহবাতিক স্বভাবের (suspicious / mistrustful)। এভাবে সুক্ষ্মদৃষ্টিতে লক্ষ্য করে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে যে, আপনার পশু বা পাখিটি আনন্দিত না বিষন্ন, শান্ত না অস্থির, উদার না কৃপণ, বন্ধুবৎল না হিংসুটে, সাহসী না ভীতু, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নাকি নোংরা স্বভাবের ইত্যাদি ইত্যাদি। পশু-পাখিদেরকে ঔষধ খাওয়ানোর নিয়ম মানুষের মতোই, তবে শারীরিক আকৃতি অনুযায়ী পরিমাণে কম-বেশী খাওয়াতে পারেন। নীচে আমি পশু-পাখিদের রোগব্যাধির চিকিৎসার কৌশল বর্ণনা করেছি যা আপনাদের কাজে আসবে –

☆ প্রথম কথা হলো আধুনিক যুগের ৯৫% রোগের মূল কারণ হলো টিকা (Vaccine)। মানুষ যেমন এলোপ্যাথিক ঔষধ কোম্পানীর অপপ্রচারের শিকার হয়ে ভূড়িভূড়ি টিকা নিতে থাকে, তেমনি তাদের গৃহপালিত পশুপাখিদেরকেও - টিকা নেওয়ার পর থেকে পশুটি এই ,ঘনঘন টিকা দিতে থাকে। কাজেই যদি জানতে পারেন যে রোগে আক্রান্ত হয়েছে, তবে অবশ্যই তাকে থুজা (Thuja occidentalis) খাওয়াতে হবে। মনে করুন, আপনার কুকুরটি টিকা নেওয়ার পর থেকে মৃত বাচ্চা জন্ম দেওয়া শুরু করেছে, তাকে অবশ্যই থুজা খাওয়াতে হবে।

☆ যেমন কোন ঘা / ক্ষত শুকাতে অনেক দেরী হলে তাকে সিলিশিয়া (Silicea) খাওয়াতে হবে। ইহা মানুষের বেলায় যেমন, তেমনি পশু-পাখিদের বেলাতেও প্রযোজ্য। ৩০ বা ২০০ শক্তিতে রোজ ২ বার করে ৩ দিন।

☆ যেমন মনে করুন, একটি পশুর পশম ধরে টানতে সে ব্যথায় ককিয়ে ওঠে অথবা ভীষণ রেগে যায়, তবে বুঝতে হবে তার চামড়া বা শরীর খুবই স্পর্শকাতর বা ব্যথাযুক্ত হয়ে গেছে। এই ক্ষেত্রে তাকে হিপার সালফ (Hepar sulph) খাওয়াতে হবে। হিপার সালফের একটি প্রধান লক্ষণ হলো সে এতই উত্তেজিত থাকে যে, কাউকে খুন করা তার কাছে কোন ব্যাপারই না (murder in cool head)।

☆ মানুষ অপমানিত হয়ে কোন রোগে আক্রান্ত হলে যেমন স্ট্যাফিসেগ্রিয়া (Staphisagria) খাওয়াতে হয়, তেমনি কোন আদরের গৃহপালিত পশুও যদি গৃহকর্তা কর্তৃক অপমান বা দুর্ব্যবহারের পরে কোন রোগে আক্রান্ত হলে তাদেরকেও স্ট্যাফিসেগ্রিয়া ঔষধটি খাওয়াতে হবে।

☆ কোন পশু-পাখির মধ্যেও যদি যৌন দুর্বলতা (impotence) অথবা মাত্রাতিরিক্ত যৌন উন্মাদনা (Satyriasis) দেখেন, তবে তাদেরকেও সেই ঔষধ দিতে হবে যা মানুষের বেলায় প্রযোজ্য।

☆ স্তন্যপায়ী পশুদের স্তনের প্রদাহে (mastitis) বেলেডোনা (Belladonna) সবচেয়ে ভাল কাজ করে। যদি অনেকদিনের পুরনো প্রদাহ হয় সেক্ষেত্রে কোনায়াম (Conium maculatum) প্রয়োগ করুন।

☆ জার্মান হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাঃ বনিংহুসেন (এম.ডি.) পশু-পাখিদের চিকিৎসায় উচ্চ শক্তির ঔষধ ব্যবহার করতেন। নীচে তার কয়েকটি রোগীলিপি আপনাদের অবগতির জন্য দিলাম :-

১. একটি মাদী ঘোড়ার বাচ্চা হওয়ার সাতদিন পরও রক্তক্ষরণ হইতেছিল । স্যাবাইনা (Sabina), সিকেলি কর (Secale cornatum) ঔষধ দুইটি প্রয়োগের পর সমস্যাটি চলে যায়।

২. একটি মাদী ঘোড়া যৌন উত্তেজনার কারণে ছটফট করছিল । প্লাটিনাম (Platinum metallicum) খাওয়ানোর পর তার অস্থিরতা চলে যায়।

৩. একটি ঘোড়ার গলার গ্ল্যান্ড ফোলে যায় (টনসিল), যার কষ্ট সন্ধ্যার দিকে বৃদ্ধি পেত । হিপার সালফ (Hepar sulph) প্রয়োগে সেটি সেরে যায়।

৪. আরেকটি ঘোড়া চুলকানির কারণে দেওয়ালে শরীর ঘষতে ছিল। সালফার (Sulphur) দেওয়াতে তার সমস্যা ভালো হয়ে যায়।

৫. আরেকটি বাছুর অনেকদিন যাবত পঙ্গু / প্যারালাইসিস হয়েছিল, দাঁড়াতে পারত না, সন্ধ্যার দিকে তার অবস্থা সবচেয়ে বেশী খারাপ হইত। নাক্স ভমিকা (Nux vomica), ব্রায়োনিয়া (Bryonia alba) দুই দিন পর পর দেওয়াতে সেটি সুস্থ হয়ে যায়।

## এনথ্রাক্স (Anthrax) ঃ **এনথ্রাক্স রোগটি আসলে (introduction) কি ?**

সম্প্রতি আমাদের দেশে এনথ্রাক্স (Anthrax) রোগটির প্রাদুভাব দেখা দিয়েছে এবং অনেক এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে যাতে মানুষের মধ্যে ভীতির সৃষ্ঠি হয়েছে। গ্রীক শ্বদ এনথ্রাক্স (Anthrax) এর মানে হলো কয়লা (coal) ; এনথ্রাক্সে আক্রান্ত ব্যক্তির চামড়ায় কয়লার মতো কালো রঙের ক্ষত / ঘা হয় বিধায় এই রোগের এমন নাম হয়েছে। রোগে এনথ্রাক্স হলো আমাদের গৃহপালিত প্রাণীদের একটি ছোয়াচেঁ রোগ যা ব্যাসিলাস এনথ্রাসিস (Bacillus anthracis) নামক ব্যাকটেরিয়ার আক্রমনে হয়ে থাকে। এই ব্যাকটেরিয়ার মোট উনাননব্বইটি প্রজাতি (**strains**) আবিষ্কৃত হয়েছে ; যেমন- এমিস প্রজাতি (**Ames strain**), ভলাম প্রজাতি (**Vollum strain**), স্টার্ন প্রজাতি (*Sterne* strains) ইত্যাদি। তাদের মধ্যে ভলাম ওয়ান-বি (Vollum 1B) নামক প্রজাতিটি উইলিয়াম এ. বয়েলস (William A. Boyles) নামক একজন বিজ্ঞানীর শরীর থেকে সণাক্ত করা হয়েছিল, যিনি আমেরিকার সেনাবাহিনীর জীবাণূঅস্ত্র কারখানায় গবেষণার সময় এনথ্রাস্কে আক্রান্ত হন। সাধারণত মাঠে-ময়দানে ঘুরেফিরে খায় এমন জন্তুদের (grazing animals) মধ্যে এই রোগটি বেশী হতে দেখা যায়। এটি মানুষ এবং পশু উভয়কে সমানভাবে আক্রমণ করে থাকে। এনথ্রাক্সের জীবাণু সাধারণত তার চারদিকে ডিমের খোসার মতো (spores) একটি আবরণ তৈরী করে তার ভেতরে অবস্থান করে। ফলে সেগুলো এমনকি খারাপ পরিবেশেও অনেক বছর এমনকি সত্তর পর্যন্ত বেচেঁ থাকতে দেখা গেছে। এই কারণে এনথ্রাক্সে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী কোন মানুষ বা পশুকে যেখানে কবর দেওয়া হয়, সেখানকার মাটিতে ইহার

জীবাণু থেকে যায় অনেক যুগ পযর্ন্ত। স্বাস্থ্য-সচেতনতা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির কারণে মানবসমাজে যদিও এনথ্রাক্সের উৎপাত অনেক অনেক কমে গেছে ; কিন্তু বড় বড় জঙ্গলের ভেতরের জংলী জানোয়ারদের মধ্যে এটা এখনও প্রচুর মাত্রায়ই বিদ্যমান আছে। মূলতঃ পশুদের থেকে এটি মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করে থাকে। এই রোগটি প্রধানত কৃষক, খামারের মালিক-শ্রমিক, কসাই, পশুদের চামড়া-পশম-হাড্ডি ব্যবসায়ী ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত লোকদের মধ্যে অধিক হারে বিস্তার লাভ করে থাকে। তবে এই ভয়ঙ্কর জীবাণুটি বর্তমানে যেহেতু জীবাণু অস্ত্র (biological weapons) হিসেবে অনেক দেশই তৈরী করছে, কাজেই ভবিষ্যতে কোন দেশ যুদ্ধের সময় তার শত্রুদের ওপর ছেড়ে দিলে (bioterrorism) তখন হয়ত সকল পেশার লোকেরাই সমানভাবে এনথ্রাক্সে আক্রান্ত হবে।

**এনথ্রাক্সে রোগে কি হয়ে (symptoms) থাকে ?**

এনথ্রাক্সে যত ধরণের সমস্যা দেখা দেয়, তার প্রায় সবগুলোই মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনতে পারে। সাধারণত এই রোগের জীবাণু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার এক থেকে তিন দিনের মধ্যে চামড়ায় একটি চুলকানীযুক্ত ছোট্ট পানিযুক্ত ফোষ্কা (vesicle) ওঠে এবং ধীরে ধীরে তা বড় আকৃতির বিষাক্ত ফোড়ায় (malignant pustule) পরিণত হয়। কারো কারো ক্ষেত্রে তেমন কোন সমস্যা থাকে না আবার কারো কোরো ক্ষেত্রে উচ্চতাপযুক্ত জ্বর (high fever) এবং রক্ত দূষিত (septicemia) হয়ে মৃত্যু ঘটতে পারে। এনথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত গোশত খাওয়ার পরে গলায় একটি ক্ষতের (ulcer) সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং ক্ষেত্রবিশেষে রক্তবমি, মারাত্মক ডায়েরিয়া, পাকস্থলীতে মারাত্মক প্রদাহের (fatal gastroenteritis) সৃষ্টি হয়। আবার নিঃশ্বাসের সাথে জীবাণূ প্রবেশ করলে সাধারণত গলাব্যথা-স্বরভঙ্গ (laryngitis), বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট এবং রক্তক্ষরণযুক্ত ফুসফুসের প্রদাহ (hemorrhagic bronchopneumonia) হতে পারে। ইতিহাসে ইহাকে পশম বাছাকারীদের রোগ (Woolsorters' disease) নামে অভিহিত করা হতো ; কেননা যারা জন্তুদের পশম বাছাই এবং বিন্যাসের কাজ করত, তারাই নিঃশ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসের এনথ্রাক্সে (Inhalational anthrax) আক্রান্ত হতো। অল্পকিছু ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের প্রদাহ (meningitis) হয়ে প্রাণনাশ হতে পারে।

**রোগ নির্ণয় (diagnosis) করব কিভাবে ?**

সাধারণত ক্ষত থেকে রস নিয়ে, কফ, থুতু, পায়খানা, মেরুদন্ডের ভেতরের তরল (**cerebrospinal fluid**) ইত্যাদি অনুবীক্ষণ যন্ত্রে নিয়ে পরীক্ষা করলে তাতে এনথ্রাক্সের জীবাণু পাওয়া যায়। তাছাড়া একসাথে অগণিত মানুষ যখন আক্রান্ত হতে থাকে, তখন পরীক্ষা না করেও শুধু লক্ষণ দেখেই রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

**এনথ্রাক্সের চিকিৎসা (treatment) কি ?**

হোমিওপ্যাথিতে আছে বেশ কিছু ঔষধ যারা সফলভাবে এনথ্রাক্স নির্মূল করে থাকে। তাদের মধ্যে আছে এনথ্রাসিনাম (Anthracinum), আর্সেনিক এলবাম (Arsenicum Album), পাইরোজিনাম (Pyroginum), ক্রোটেলাস হরিডাস (Crotalus Horridus), ল্যাকেসিস (Lachesis), ইচিনেশিয়া (Echinacea angustifolia), টেরেনটুলা কিউবেনিস (Tarentula Cubensis) ইত্যাদি। এদের মধ্যে এনথ্রাসিনাম (Anthracinum) নামক ঔষধটির কথা প্রথমে চিন্তা করতে হবে। এনথ্রাক্স রোগের জীবাণু নিঃসৃত বিষ থেকে প্রস্তুত করা এই ঔষধটি একই সাথে এনথ্রাক্সের চিকিৎসায় একটি শ্রেষ্ট ঔষধ এবং প্রতিষেধক বা টিকা (Vaccine) হিসাবেও সমানভাবে কাযর্কর। ফ্রান্সের বিজ্ঞানী লুই পাস্তর (**Louis Pasteur**) এনথ্রাক্সের টিকা আবিষ্কারেরও অন্তত পঞ্চাশ বছর পূর্বে আমেরিকান হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাঃ কন্সট্যান্টাইন হেরিং (Dr. Constantine Hering, MD) এনথ্রাসিনাম (Anthracinum) নামক এই অসাধারণ হোমিও ঔষধটি আবিষ্কার করেন। কেউ এনথ্রাক্সে আক্রান্ত হলে এনথ্রাসিনাম (Anthracinum) নামক হোমিও ঔষধটি (৩০

অথবা ২০০ শক্তিতে) ৪ (চার) ঘণ্টা পরপর খেতে থাকুন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একজন হোমিও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করুন। অন্যদিকে নিজের বাড়িতে অথবা মহল্লায় এই রোগ ছড়িয়ে পড়লে তা থেকে বাঁচার জন্য এনথ্রাসিনাম (Anthracinum) নামক ঔষধটি (টিকা হিসাবে) সপ্তাহে একমাত্রা (এক ফোটা অথবা ১০টি বড়ি) করে খেতে থাকুন। এই মুহূর্তে তাই এনথ্রাসিনাম (Anthracinum) নামক হোমিও ঔষধটি প্রত্যেকেরই কিনে ঘরে সংরক্ষণ করে রাখা উচিত। গৃহপালিত পশু-পাখিদেরকেও একই নিয়মে ঔষধ খাওয়াতে হবে।

**রোগের ভবিষ্যৎ (Prognosis) কি ?**

ঐতিহাসিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী এনথ্রাক্সের আক্রান্তদের মৃত্যুহার ৯২% কিন্তু যদি সময় মতো চিকিৎসা অবলম্বন করা হয় তবে ৪৫%। চর্ম এনথ্রাক্সের (cutaneous anthrax) খুব কম ক্ষেত্রেই মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনে যদি সময়মতো চিকিৎসা করা হয়। কত তাড়াতাড়ি চিকিৎসা শুরু হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে পাকস্থলীর এনথ্রাক্সে (Gastrointestinal anthrax) মৃত্যুর হার ২৫% থেকে ৬০% হতে পারে।

**আর কি কি করা (Precaution) যেতে পারে ?**

এনথ্রাক্সে আক্রান্ত হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসা নিতে হবে। আর যারা আক্রান্ত হন নাই, তারা পশুদের চামড়ায় বা গোয়ালঘরে নিদ্রা যাবেন না, হঠাৎ মারা গেছে বা অসুস্থ এমন কোন পশুর গোশত খাবেন না, গলাব্যথা বা টনসিলের ব্যথা হলে সাথে সাথে চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হউন। এনথ্রাক্সের টিকা (vaccine) নেওয়া থেকে সকলেরই বিরত থাকা উচিত। কেননা বিসিজি, ডিপিটি, হাম, পোলিও, এটিএস, মেনিনজাইটিস, হেপাটাইটিস প্রভৃতি টিকার যে-সব মারাত্মক ক্ষতিকর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া আজ পযর্ন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে আছে টিকা নেওয়ার সাথে সাথে তাৎক্ষণিক মৃত্যু (SIDS), ক্যান্সার, ব্রেন ড্যামেজ, শারীরিক প্রতিবন্ধিত্ব, বুদ্ধি প্রতিবন্ধি (autism), ব্রেন টিউমার, গুলেন-বেরি সিনড্রোম, হার্ট ফেইল্যুর, এলার্জি, হাঁপানি, বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্ম (birth defect), ডায়াবেটিস প্রভৃতি। কাজেই এনথ্রাক্সের টিকা থেকেও এসব রোগ অবশ্যই হবে। কেননা সকল টিকার প্রস্তুত প্রণালী এবং উপাদান তো একই (আর তা হলো প্রাণনাশী ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাস)।

**Antibiotic (এন্টিবায়োটিক)** ঃ- কেবল সেই সব ঔষধকেই এন্টিবায়োটিক বলা হয় যারা রোগের সাথে সম্পর্কিত জীবাণুকে হত্যা বা জীবাণুর বংশবৃদ্ধি বন্ধ করতে পারে। সত্যি বলতে কি, এন্টিবায়োটিক গ্রুপের ঔষধসমূহ আবিষ্কৃত হওয়ার কারণেই এলোপ্যাথি এখনও দুনিয়ায় টিকে আছে। সে যাক, হোমিওপ্যাথিতে এন্টিবায়োটিক নামে ঔষধের কোন গ্রুপ নাই বটে ; তবে বেশ কিছু হোমিও ঔষধ আছে যাদেরকে লক্ষণ মিলিয়ে প্রয়োগ করতে পারলে দেখা যাবে, এরা বাজারের যে-কোন হাই-পাওয়ারের এন্টিবায়োটিকের চাইতেও ভালো এবং দ্রুত কাজ করছে। যেমন - Aconitum napellus, Arsenic album, Belladonna, Baptisia, Phosphorus, Lachesis, Ferrum Phosphoricum, Pulsatilla, Hepar sulph, Mercurius solubilis, Arnica, Veratrum album, Kali bichromicum, Pyrogenium কিংবা Echinacea angustifolia ঔষধগুলিকে বিপদজ্জনক পরিস্থিতিতে হোমিও এন্টিবায়োটিকরূপে ব্যবহার করতে পারেন। এদের বাইরেও আরো অনেক হোমিও ঔষধ আছে, যাদেরকে লক্ষণ মিলিয়ে প্রয়োগ করলে এন্টিবায়োটিকের মতো ফল পাবেন। সাধারণত মারাত্মক কোন জীবাণুর আক্রমণ (infection) নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূল করতে যে-কোন হাই-পাওয়ারের এন্টিবায়োটিকেরও দুই থেকে তিন দিন সময় লেগে যায় ; কিন্তু যদি ঠিক-ঠাক মতো লক্ষণ মিলিয়ে হোমিও ঔষধগুলো উচ্চ শক্তিতে প্রয়োগ করতে পারেন, তবে দেখবেন দু'য়েক ঘণ্টার মধ্যেই যে-কোন মারাত্মক ইনফেকশানও কন্ট্রোলে এসে যায়।

আরেকটি কথা হলো এন্টিবায়োটিকগুলো সাধারণত ব্যাকটেরিয়া (bacteria) নিধন করতে পারে কিন্তু ভাইরাস (virus) দমন করতে পারে না ; কিন্তু হোমিও ঔষধগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারলে সেগুলো ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাস-ফাংগাস সবই মুহূর্তের মধ্যে বিনাশ করে দিবে। এলোপ্যাথিতে যদিও অল্পকিছু এন্টিভাইরাল ঔষধও আছে, কিন্তু দাম এতো বেশী যে তাতে রোগীদের ভিটেমাটি বিক্রি করা লাগতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক কাজ না করলে রক্তের কালচার টেস্ট (CS - Culture & Sensitivity) করে জানতে হয়, কোন জাতের-বেজাতের জীবাণু আক্রমণ করেছে এবং কোন এন্টিবায়োটিকে তাকে মারা সম্ভব ! কিন্তু হোমিও ঔষধগুলো ঠিকমতো লক্ষণ মিলিয়ে দিতে পারলে জীবাণু নিশ্চিতই বিনাশ হবে, তাদের জাত-কুল জানা যাক আর না যাক। তাছাড়া হাই-পাওয়ারের এন্টিবায়োটিকগুলোর সাইড-ইফেক্ট এতই মারাত্মক যে, তাতে যে-কারো অকাল মৃত্যুও হয়ে যেতে পারে। এগুলো মস্তিষ্ক (brain) বা স্নায়ুতন্ত্রের (nervus system) এবং হাড়ের মেরুমজ্জার (bone-marrow) এতই ক্ষতি করে যে, তাতে যে-কেউ প্যারালাইসিস, ব্রেন ড্যামেজ, ব্লাড ক্যানসার, সারাজীবনের জন্য কংকালসার (emaciation) হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু হোমিও ঔষধগুলোর মধ্যে এমন জঘন্য ধরনের কোন সাইড-ইফেক্ট নাই ; এমনকি ছোট্ট শিশুরাও যদি ভুল ঔষধ খেয়ে ফেলে তাতেও না। আরেকটি কথা হলো, এন্টিবায়োটিকগুলো ক্ষতিকর জীবাণুর সাথে সাথে আমাদের শরীরের অনেক উপকারী জীবাণুকেও বিনাশ করে দেয় ; কিন্তু হোমিও ঔষধগুলো উপকারী জীবাণু হত্যা করে না। এজন্য অনেক বিজ্ঞানী এন্টিবায়োটিককে মনে করেন আন্দাজে বোমা মারার সমান ; যাতে দুশমনও মরে আবার নিরীহ মানুষও মরে আবার কখনও কখনও বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়-স্বজনও মরে সাফ হয়ে যায়।

(১) Aconitum napellus :-
যে-কোন রোগই হউক না কেন, **যদি সেটি হঠাৎ শুরু হয় এবং শুরু থেকেই মারাত্মকরূপে দেখা দেয় অথবা দুয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেটি মারাত্মক আকার ধারণ করে**, তবে একোনাইট হলো শ্রেষ্ট এন্টিবায়োটিক। রোগের উৎপাত এত বেশী হয় যে, তাতে **রোগী মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে।**

(২) Bryonia alba : যদি **রোগীর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে, নড়াচড়া করলে রোগীর কষ্ট বৃদ্ধি পায়, পায়খানা শক্ত হয়ে যায়** ইত্যাদি লক্ষণ থাকে, তবে হোক না তা টাইফয়েড-নিউমোনিয়া-এপেন্ডিসাইটিস বা আরো মারাত্মক কোন ইনফেকশান, ব্রায়োনিয়া হবে তার শ্রেষ্ট এন্টিবায়োটিক। উচ্চ শক্তিতে (১০০০, ১০০০০, ৫০০০০) এক ডোজ ব্রায়োনিয়া খাইয়ে দিন ; সম্ভবত দ্বিতীয় ডোজ খাওয়ানোর আর প্রয়োজন হবে না।

(৩) Belladonna : যে-কোন রোগে যদি **সারা শরীরে বা আক্রান্ত স্থানে উত্তাপ বেশী থাকে, যদি আক্রান্ত স্থান লাল হয়ে যায়, শরীর জ্বালা-পোড়া করতে থাকে**, তবে বেলেডোনা হলো তার শ্রেষ্ট এন্টিবায়োটিক। যে-কোন রোগের সাথে **যদি রোগী প্রলাপ বকতে থাকে (অর্থাৎ এলোমেলো কথা বলতে থাকে)**, তবে বুঝতে হবে যে রোগীর ব্রেনে ইনফেকশান হয়েছে এবং এসব ক্ষেত্রে বেলেডোনা হলো তার সেরা এন্টিবায়োটিক।

(৪) Arsenicum album : যে-কোন রোগে বা ইনফেকশনের সাথে যদি রোগীর মধ্যে **প্রচণ্ড অস্থিরতা (অর্থাৎ রোগী নড়াচড়া ছাড়া থাকতে পারে না), শরীরের বিভিন্ন স্থানে ভীষণ জ্বালা-পোড়া ভাব, অল্পতেই রোগী দুর্বল-কাহিল-নিস্তেজ হয়ে পড়ে**, অতিমাত্রায় মৃত্যুভয়, **রোগী মনে করে ঔষধ খেয়ে কোন লাভ নেই- তার মৃত্যু নিশ্চিত** ইত্যাদি লক্ষণ থাকে, তবে আর্সেনিক হলো তার শ্রেষ্ট এন্টিবায়োটিক।

(৫) Baptisia tinctoria : যদিও ব্যাপটিশিয়া ঔষধটি হোমিওপ্যাথিতে টাইফয়েড জ্বরের চিকিৎসায় বেশী ব্যবহৃত হয় কিন্তু এই ঔষধটির লক্ষণসমূহ পাওয়া গেলে যে-কোন মারাত্মক ধরনের ইনফেকশনে এটি চমৎকার এন্টিবায়োটিকের

কাজ দেবে। ব্যাপটিশিয়ার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো অবশ অবশ ভাব, এখনই প্যারালাইসিস হয়ে যাবে এমন ভয় হওয়া, **চেতনা আধা লোপ পাওয়া** (অনেকটা মাতালদের মতো), **সারা শরীরে যেন ঘা হয়ে গেছে এমন ব্যথা, মুখ থেকে এবং নিঃশ্বাসে মরা লাশের গন্ধ**, ঘুমঘুম ভাব, কথা শেষ করার আগেই ঘুমিয়ে পড়ে, মনে হয় তার শরীর টুকরা টুকরা হয়ে সারা ঘরে ছড়িয়ে আছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৬) Ferrum phosphoricum : ফেরাম ফস ঔষধটি যে-কোন নতুন ইনফেকশানে ব্যবহার করে দারুণ ফল পাবেন। ইনফেকশনের মূল ঝামেলা হলো স্থানীয় রক্ত সঞ্চয় (Local congestion) এবং ফেরাম ফস কনজেশান দূর করতে সেরা ঔষধ। **সাধারণত অন্যকোন ঔষধের লক্ষণ পাওয়া না গেলে যে-কোন ইনফেকশনে ফেরাম ফস** একটি উৎকৃষ্ঠ এন্টিবায়োটিকের কাজ দেবে।

(৭) Hepar sulph : হিপার সালফ চর্ম (skin) এবং কোমল কলাতন্তু (soft tissue) একটি শ্রেষ্ঠ এন্টিবায়োটিক। সাধারণত ফোড়া (abscess), দাঁতের গর্তের (caries) ইনফেকশান, ইরিসিপেলাস (erysipelas), কান পাকা (otitis media) ইত্যাদি রোগে ইহার প্রয়োগ বেশী হয়ে থাকে। পাশাপাশি ফুসফুসের রোগেও এটি একটি সেরা এন্টিবায়োটিক। কাশি, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, হুপিং কাশি ইত্যাদি রোগেও হিপারের কথা এক নাম্বারে মনে রাখা দরকার। হিপার সালফের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **আক্রান্ত স্থানে এতো ব্যথা থাকে যে স্পর্শই করা যায় না এবং ঠান্ডা বাতাসে রোগের মাত্রা বৃদ্ধি পায়**।

(৮) Arnica montana : আমরা সবাই জানি যে, আঘাতের ব্যথার জন্য আনির্কা একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। কিন্তু আনির্কা যে একটি শক্তিশালী এন্টিবায়োটিক বা জীবাণু বিনাশী ঔষধ তা আমরা অনেকেই জানি না। টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, হুপিং কাশি ইত্যাদির মতো মারাত্মক ইনফেকশনেও লক্ষণ থাকলে চোখ বুজে আনির্কা দিতে পারেন। সাধারণত **যে-কোন ধরনের আঘাত, থেতলানো, মচকানো, মোচড়ানো, ঘুষি, লাঠির আঘাত বা উপর থেকে পড়ার** কারণে কোন ইনফেকশান বা ক্ষত হলে ; এমনকি গ্যাংগ্রিন হলেও আনির্কা হবে তার শ্রেষ্ঠ এন্টিবায়োটিক। আনির্কার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **আক্রান্ত স্থানে এমন তীব্র ব্যথা থাকে যে, কাউকে তার দিকে আসতে দেখলেই সে ভয় পেয়ে যায়** (কারণ ধাক্কা লাগলে ব্যথার চোটে তার প্রাণ বেরিয়ে যাবে), **রোগী ভীষণ অসুস্থ হয়েও মনে করে তার কোন অসুখ নেই, সে ভালো আছে** ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৯) Mercurius solubilis : মার্ক সল একটি বহুমুখী কার্যসম্পন্ন (multi-functional) হোমিওপ্যাথিক এন্টিবায়োটিক। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **প্রচুর ঘাম হয় কিন্তু রোগী আরাম পায় না**, ঘামে এবং মুখে দুর্গন্ধ থাকে, পায়খানা করার সময় কোথানি লাগে, **অধিকাংশ রোগ রাতের বেলা বেড়ে যায়** ইত্যাদি ইত্যাদি। মারকারী গ্রুপের অন্যান্য ঔষধগুলিও একই রকম এন্টিবায়োটিক ক্ষমতাসম্পন্ন ঔষধ। যেমন- **Mercurius Corrosivus**, **Mercurius Dulcis**, **Mercurius Iodatus Flavus**, **Mercuric Potassium Iodide**, **Mercurius Vivus** ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রয়োজনের সময় যে-টাই হাতের কাছে পান, ব্যবহার করতে পারেন।

(১০) Lycopodium clavatum : লাইকোপোডিয়াম একটি প্রথম শ্রেণীর হোমিওপ্যাথিক এন্টিবায়োটিকের মর্যাদা রাখে। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **রোগের মাত্রা বিকাল ৪-৮ টার সময় বৃদ্ধি পায়**, এদের রোগ ডান পাশে বেশী হয়, **এদের পেটে প্রচুর গ্যাস হয়**, এদের সারা বৎসর প্রস্রাবের বা হজমের সমস্যা লেগেই থাকে, এদের দেখতে তাদের বয়সের চাইতেও বেশী বয়স্ক মনে হয়, **এদের স্বাস্থ্য খারাপ কিন্তু ব্রেন খুব ভালো**, এরা খুবই সেনসিটিভ এমনকি ধন্যবাদ দিলেও কেদে ফেলে ইত্যাদি ইত্যাদি।

(১১) Veratrum album : রোগী যে-কোন মুহূর্তেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে পারে এমন মারাত্মক ধরণের ইনফেকশনে ভিরেট্রাম এলবামের উপর নির্ভর করতে পারেন। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **রোগী খুব তাড়াতাড়ি দুর্বল হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে, ঠান্ডা ঘাম ঝরে এবং নিঃশ্বাসেও ঠান্ডা বাতাস** বেরোয়, চামড়া নীল বা বেগুনী রঙ

ধারন করে, চামড়া ঠান্ডা এবং কুচঁকে (কুঞ্চিত) যায়, শরীরের কোথাও চাপ দিলে সেখানে গর্ত হয়ে যায়, **হাত-পা-মুখ বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে যায়** ইত্যাদি ইত্যাদি।

(১২) Kali bichromicum : ক্যালি বাইক্রোম হলো নাক-কান-গলার রোগের একটি শ্রেষ্ঠ এন্টিবায়োটিক। ইহার প্রধান লক্ষণ হলো **কফ, থুথু, বমি, নাকের শ্লেষ্মা ইত্যাদি খুবই আঠালো হয় এবং কোন কাঠিতে (বা আঙুলে) লাগিয়ে টানলে রশির / সুতোর মতো লম্বা হয়ে যায়**, ব্যথা আঙুলের মাথার মতো খুবই অল্প জায়গায় হয়ে থাকে, ব্যথা ঘন ঘন জায়গা বদল করে, ঘায়ের / ক্ষতের চেহারা থাকে খাচকাটা ধারালো ইত্যাদি ইত্যাদি।

(১৩) Ipecac : ইপিকাক সাধারণত পেটের অসুখ এবং ফুসফুসের অসুখের একটি সেরা এন্টিবায়োটিক। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো বমি থাকে অথবা **বমিবমি ভাব থাকে এবং জিহ্বা পরিষ্কার থাকে**।

(১৪) Pulsatilla pratensis : পালসেটিলাকে বলা যায় একটি বহুমুখী কার্যসম্পন্ন (multi-functional) হোমিওপ্যাথিক এন্টিবায়োটিক। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো গলা শুকিয়ে থাকে কিন্তু **কোন পানি পিপাসা থাকে না**, ঠান্ডা বাতাস-ঠান্ডা খাবার-ঠান্ডা পানি পছন্দ করে, **গরম-আলো-বাতাসহীন বদ্ধ ঘরে রোগীনী বিরক্ত বোধ করে, আবেগপ্রবন, অল্পতেই কেঁদে ফেলে এবং যত দিন যায় ততই মোটা হতে থাকে** ইত্যাদি ইত্যাদি।

(১৫) Cantharis : ক্যান্থারিস প্রধানত মূত্রতন্ত্রের ইনফেকশনের জন্য একটি শ্রেষ্ঠ এন্টিবায়োটিক। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো জ্বালা-পোড়া এবং ছিড়ে ফেলার মতো ব্যথা। **কাজেই ভীষণ জ্বালাপোড়া থাকলে যে-কোন রোগে ক্যান্থারিস ব্যবহার করতে পারেন। এটি জলাতঙ্ক রোগের জন্যও একটি শ্রেষ্ট এন্টিভাইরাল ঔষধ**। অল্প থেকে বেশী যে-কোন ধরনের পোড়ার (burn) ব্যথা এবং ইনফেকশান দূর করতে ক্যান্থারিসের জুড়ি নাই।

(১৬) Eupatorium perfoliatum : ইউপেটোরিয়াম পারফো নামক ঔষধটি আরেকটি উৎকৃষ্ঠ এন্টিবায়োটিক। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **শরীরে এমন প্রচণ্ড ব্যথা থাকে যেন মনে হয় কেউ শরীরের সমস্ত হাড় পিটিয়ে গুড়োঁ করে দিয়েছে, পানি বা খাবার যাই পেটে যায় সাথে সাথে বমি হয়ে যায়** ইত্যাদি ইত্যাদি।

(১৭) Echinacea angustifolia : ইচিনেশিয়া'কে বলা হয় একেবারে হোমিওপ্যাথিক এন্টিবায়োটিক। যে-কোন ধরনের পুরনো বা দীর্ঘমেয়াদী ইনফেকশানে ইচিনেশিয়া ব্যবহার করতে পারেন। যেমন - অনেক দিনের পুরনো ঘা, কাশি, জ্বর ইত্যাদি যা অন্যান্য অনেক ঔষধ প্রয়োগেও পুরোপুরি সারেনি।

(১৮) Pyrogenium : পাইরোজিনিয়াম একেবারে আগাগোড়াই এন্টিবায়োটিক গুণসম্পন্ন ঔষধ ; কেননা এটি তৈরীই করা হয়েছে জীবাণু থেকে (nosode)। যে-কোন ধরনের নতুন বা পুরনো, স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী ইনফেকশানে পাইরোজিনিয়াম ব্যবহার করতে পারেন।

**Anxiety, Tension (দুশ্চিন্তা, উৎকন্ঠা, টেনশান, উদ্বেগ) : -** এংজাইটি হলো দুশ্চিন্তা বা টেনশান যাতে কেউ হঠাৎ ভীত হয়ে পড়ে, অসহায় বোধ করে, শারীরিক বা মানসিকভাবে অস্থিরতায় ভোগেন, ভবিষ্যৎ ভেবে অনিশ্চয়তা বোধ করে, ক্লান্ত-শ্রান্ত-অবসন্ন হয়ে পড়ে। এংজাইটির পেছনে কখনও কারণ থাকতে পারে আবার কখনও কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এংজাইটির ফলে হঠাৎ রক্তচাপ বেড়ে যায়, বুক ধড়ফড়ানি শুরু হয়, ঘনঘন শ্বাস নেওয়া, ঘাম হতে থাকে, নাক-মুখ-কান লাল এবং গরম হয়ে যায়, ঘুমে বাধা সৃষ্টি হয়, পেট ব্যথা, মাথা ব্যথা, মাথা ঘুরানি, কান্নাকাটি করা, কথা বলতে তোতলামি করা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

Aconitum napellus : এংজাইটি বা টেনশান যদি হঠাৎ দেখা দেয় এবং সাথে যদি 'এখনই মরে যাব' এমন ভয় হতে থাকে, তবে একোনাইট খেতে হবে।

Argentum nitricum : বড় কোন ঘটনার আগে টেনশান হতে থাকলে আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম খেতে হবে। যেমন পরীক্ষা, ইন্টারভিউ, অনেক মানুষের সামনে বক্তৃতা দেওয়া, সামাজিক অনুষ্টানে যোগ দেওয়া, দাঁত উঠানোর জন্য ডেন্টিস্টের কাছে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। টেনশানের কারণে ডায়েরিয়া হওয়া এবং মিষ্টি জাতীয় খাবার বেশী খাওয়ার অভ্যাস্ত এই ঔষধের দুটি বড় লক্ষণ।

Arsenicum album : আর্সেনিক উদ্বেগ-উৎকন্ঠার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ তাদের জন্য যারা কোন কিছু এলোমেলো দেখলে রেগে যান, ছোট-খাটো ব্যাপারেও ভীষণ সিরিয়াস, খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্বভাবের, সবকিছু নিজের কন্ট্রোলে রাখতে বদ্ধপরিকর। এরা দুশ্চিন্তায় খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে কিন্তু তারপরও অস্থিরতার কারণে এক স্থানে বা এক পজিশনে বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারে না।

Calcarea carbonica : যারা দীর্ঘদিন রোগে ভোগে বা অতিরিক্ত পরিশ্রম করে ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে পড়েছেন, যারা উচুঁ জায়গাকে ভয় পান, যারা সর্বদা ভয়ে থাকেন যে সামনে বিরাট বিপদ আসন্ন, তাদের এঙজাইটিতে ক্যালকেরিয়া কার্ব প্রযোজ্য।

Gelsemium sempervirens : জেলসিমিয়ামের সব লক্ষণই আর্জেন্টাম নাইট্রিকামের মতো। তবে এতে দুর্বলতা, সারা শরীরে কাঁপুনি, তন্দ্রা বা ঘুমঘুম ভাব বেশী থাকে। তাছাড়া ওপর থেকে পড়ে যাওয়ার ভয় এবং হৃৎপিন্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় ইত্যাদি লক্ষণ আছে।

Ignatia amara : সাধারণত শোক, দুঃখ, বিরহ, বিচ্ছেদ, হতাশা, সমালোচনা, একাকিত্ব ইত্যাদি আবেগজনিত কারণে এংজাইটি হলে ইগ্নেশিয়া ঔষধটি দারুণ কাজে দিবে। উপরোক্ত আবেগজনিত কারণে অনিদ্রা, পেট ব্যথা, মাথা ব্যথা, ডায়েরিয়া, মাথা ঘুরানি, কান্নাকাটি ইত্যাদি যে-কোন সমস্যা দেখা দিলে ইগ্নেশিয়া আপনাকে তা থেকে সহজেই মুক্তি দিবে।

Kali phosphoricum : যারা দীর্ঘদিন যাবত এংজাইটিতে ভোগছেন এবং ইহার ফলে তাদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে আর মন্তমেজাজও খিটখিটে হয়ে গেছে, তাদের জন্য ক্যালি ফস ঔষধটি আল্লাহ্‌র একটি রহমত স্বরূপ।

Natrum muriaticum : যারা অল্পতেই মনে আঘাত পায়, যাদের মাথায় অপ্রীতিকর চিন্তা সারাক্ষণ ঘুরপাক খায়, দুঃশ্চিন্তা করলে যাদের মাথা ব্যথা শুরু হয়, যাদের সান্ত্বনা দিলে উল্টো আরো খেপে যায়, তাদের এংজাইটিতে নেট্রাম মিউর ভালো কাজ করে।

Pulsatilla pratensis : যারা অল্পতেই কেঁদে ফেলে এবং নানানভাবে সান্ত্বনা দিলে ভালো থাকে, তাদের টেনশানে পালসেটিলা প্রযোজ্য।

## Arsenic poisoning (আর্সেনিকের বিষক্রিয়া) :-

আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন জেলায় অগণিত মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। পাশাপাশি যারা বেঁচে আছে তারাও সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাচ্ছ। সাধারণত টিউবয়েলের বা গভীর নলকুপের পানির

সাথে এসব আর্সেনিক মানুষের শরীরে ঢুকে এবং তারপর প্রথমে হাতে-পায়ে ক্ষত হয়, তারপর গ্যাংগ্রিন হয় এবং তারপর ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করে।

প্রচলিত এলোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে গ্যাংগ্রিন বা ক্যানসারের কোন ভালো চিকিৎসা নাই। অপারেশন করে কেটে ফেলাই তাদের একমাত্র চিকিৎসা। কিন্তু অপারেশনে গ্যাংগ্রিন তো সারেই না; বরং ধীরে ধীরে তা আরো মারাত্মক আকার ধারণ করতে থাকে। এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা গ্যাংগ্রিন হলে প্রথমে আঙ্গুল কেটে ফেলে দেয়। তারপর গ্যাংগ্রিন যখন আরো বাড়তে থাকে, তখন ডাক্তাররা পায়ের গোড়ালী পযর্ন্ত কেটে ফেলে দেয়। তারপর হাটু পযর্ন্ত এবং শেষে কোমর পযর্ন্ত কেটে ফেলে দেয়। এই ধরণের বর্বর চিকিৎসার কারণে গ্যাংগ্রিনের যে-কোন রোগী সাধারণত অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। অথচ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় বিনা অপারেশনে শুধু ঔষধের মাধ্যমে আর্সেনিকের বিষক্রিয়াজনিত সমস্যাগুলি খুব সহজেই নিরাময় করা যায়। কিন্তু না জানার কারণে এসব অসহায় রোগীদের অনেকেই হোমিও চিকিৎসা করাতে আসেন না।

Arsenicum album : আর্সেনিকের বিষক্রিয়াজনিত সমস্যাগুলির জন্য সবচেয়ে ভালো ঔষধ হলো আর্সেনিক এলবাম। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **ছুরি মারার মতো ভয়ঙ্কর ব্যথা, আক্রান্ত স্থান কালচে রঙ ধারণ করে, ভীষণ জ্বালাপোড়া ভাব**, অস্থিরতা, ওজন কমে যাওয়া, ভীষণ দুর্বলতা ইত্যাদি। ব্যথা সাধারণত মধ্যরাতে বৃদ্ধি পায় এবং গরম শেক দিলে কমে যায়। রোগী মৃত্যুর ভয়ে কাতর হয়ে পড়ে। সাধারণত উচ্চ শক্তিতে খাওয়া উচিত এবং বিনা প্রয়োজনে ঘনঘন খাওয়া উচিত নয়।

Lachesis : **আক্রান্ত স্থান নীলচে অথবা বেগুনি রঙ ধারণ করে**, অল্প একটু কাটা থেকে প্রচুর রক্ত যায়, বেশী ভাগ ক্ষেত্রে **রোগ প্রথমে শরীরের বাম পাশে আক্রমণ করে এবং সেখান থেকে ডান পাশে চলে যায়**, সাংঘাতিক ব্যথার কারণে আক্রান্ত স্থান স্পর্শই করা যায় না, **ঘুমের মধ্যে রোগের মাত্রা বৃদ্ধি পায়**, বেশী বেশী কথা বলে, হিংসুটে স্বভাবের ইত্যাদি লক্ষণে ল্যাকেসিস প্রযোজ্য।

Crotalus Horridus : এটি শরীরের ভিজা অংশের ক্ষতে-গ্যাংগ্রিনে প্রায়ই কাজে লাগে ; যেমন জিহ্বা, টনসিল ইত্যাদিতে। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **দাঁতের মাড়ি-নাক-পাকস্থলী-ফুসফুস-মুত্রনালী-জরায়ু ইত্যাদি থেকে রক্ত ক্ষরণ**, এমনকি পশমের গোড়া থেকেও রক্ত ক্ষরণ হয়, ঘনঘন জন্ডিসে ভোগে, মুখমন্ডল ফোলাফোলা, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, রোগ প্রথমে শরীরের ডান পাশে আক্রমণ করে ইত্যাদি।

Secale cornutum : বৃদ্ধ বয়সের ক্ষত বা গ্যাংগ্রিনে এটি বেশী ফলপ্রদ। মৌমাছির হুল ফোটানোর মতো ব্যথা এবং **গরমে সব সমস্যা বৃদ্ধি পায় আর ঠান্ডা প্রয়োগে আরাম লাগে**। চামড়া থাকে কুচঁকানো এবং শুকনো। আক্রান্ত অঙ্গ থাকে ঠান্ডা কিন্তু কাপড়-চোপড় দিয়ে আবৃত করা সহ্য হয় না। ক্ষুধা থাকে খুবই বেশী এবং সামান্য একটি ক্ষত থেকে পাঁচ-সাত দিন পযর্ন্ত রক্ত ঝরতে থাকে।

Carbo vegetabilis : বার্ধক্যজনিত ক্ষত বা গ্যাংগ্রিন, লালচে-বেগুনি রঙের, আক্রান্ত অঙ্গ বরফের মতো ঠান্ডা। দীর্ঘদিন রোগ ভোগার কারণে দুর্বল-অবসন্ন হওয়া রোগী, **পেটে প্রচুর গ্যাস হয়, জীবনীশক্তি ক্ষয় পাওয়া কংকালসার ব্যক্তি, খোলা বাতাসের জন্য পাগল** ইত্যাদি ইত্যাদি লক্ষণে কার্বো ভেজ প্রযোজ্য।

Arnica montana : সাধারণত আঘাত পাওয়ার পরে সেই স্থানে গ্যাংগ্রিন দেখা দিলে তাতে আর্নিকা সেবন করা উচিত।

Hepar sulph : হিপার সালফের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো এরা সাংঘাতিক সেনসেটিভ (over-sensitiveness), এতই সেনসেটিভ যে রোগাক্রান্ত স্থানে সামান্য স্পর্শও সহ্য করতে পারে না, এমনকি কাপড়ের স্পর্শও না। কেবল মানুষের বা কাপড়ের স্পর্শ নয়, এমনকি ঠান্ডা বাতাসের স্পর্শও সহ্য করতে পারে না। সাথে সাথে শব্দ (গোলমাল) এবং গন্ধও সহ্য করতে পারে না। হিপারের শুধু শরীরই সেনসেটিভ নয়, সাথে সাথে মনও সেনসেটিভ। অর্থাৎ মেজাজ খুবই খিটখিটে। কাটা-ছেড়া-পোড়া ইত্যাদি ঘা/ক্ষত শুকাতে হিপার বেশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে মনে রাখতে হবে যে, হিপারের পূঁজ হয় পাতলা। যেখানে আঠালো পূঁজ বা কষ বের হয়, সেখানে হিপারের বদলে ক্যালি বাইক্রোম (Kali bichromicum) ব্যবহার করতে হবে। সাধারণত উচ্চশক্তি ব্যবহার করতে হয়।

Silicea : সিলিসিয়া ঔষধটি যাদের হাড়ের বৃদ্ধিজনিত সমস্যা আছে অর্থাৎ রিকেটগ্রস্থ লোকদের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে। এই ঔষধে **মেরুদন্ডের সাথে সম্পর্কিত কোন না কোন রোগ লক্ষণ থাকবেই**। সিলিশিয়ার রোগীরা হয় শীতকাতর, রিকেটগ্রস্থ, এদের জন্মগত হাড়ের সমস্যা থাকে, মারাত্মক ধরণের বাতের সমস্যা থাকে, অমাবশ্যা-পূর্ণিমায় রোগের মাত্রা বেড়ে যায়, **মনের জোর বা আত্মবিশ্বাস কমে যায়** ইত্যাদি ইত্যাদি। সিলিশিয়ার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো শরীর বা মনের জোর কমে যাওয়া, আঙুলের মাথায় শুকনা শুকনা লাগা, আলো অসহ্য লাগা, **কোষ্টকাঠিন্য,** ঘনঘন মাথা ব্যথা হওয়া, চোখ থেকে পানি পড়া, মুখের স্বাদ নষ্ট হওয়া, মাংস-চর্বি জাতীয় খাবার অপছন্দ করা, **আঙুলের মাথা অথবা গলায় আলপিন দিয়ে খোচা দেওয়ার মতো ব্যথা,** পাতলা চুল, **অপুষ্টি** ইত্যাদি। সিলিশিয়ার পূঁজ থাকে পানির মতো পাতলা।

## Convulsion, Epilepsy, Seizure (খিচুঁনি, তড়কা, আক্ষেপ, মৃগী রোগ, সন্ন্যাস রোগ) :-

মৃগী রোগ বা খিঁচুনি হলো মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক গোলযোগ (হতে পারে লোড শেডিং কিংবা ভল্টেজের উঠানামা) যাতে আক্রান্ত ব্যক্তি কিছু সময়ের জন্য তার চেতনা হারিয়ে ফেলে এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে খিচুঁনি / আক্ষেপ (convulsion) দেখা দেয়। যাতে সারা শরীর ধনুকের ন্যায় বাঁকা হয়ে যায়, গোঙানি বা অনিচ্ছাকৃত চীৎকার করতে থাকে, হাত-পা-আঙ্গুল ক্রমাগত বাঁকা এবং সোজা হতে থাকে, দাঁত দিয়ে জিহ্বা কামড়ে ধরে, মুখ দিয়ে ফেনা বের হতে থাকে, অনিচ্ছাকৃতভাবে মল-মুত্র বের হয়ে যাওয়া এবং শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় (grand mal seizure)।

মৃগীর আক্রমণ শেষ হওয়ার পরে সাধারণত রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে এবং গভীর ঘুমে ডুবে যায়। রোগের আক্রমণের সময় সে যা যা করেছে, তার কিছুই মনে করতে পারে না। মৃগীরোগের আরো যে-সব লক্ষণ প্রকাশ পায় তা হলো চোখে উল্টাপাল্টা দেখা, কানে উল্টাপাল্টা কিছু শোনা, অল্প সময়ের জন্য আচার-আচরণ পরিবর্তন হওয়া, নির্দিষ্ট একটি অঙ্গে ঝাকুনি দেওয়া, হঠাৎ করে ঘামতে থাকা, এক মুহূর্তের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলা, বমিবমি লাগা, অকারণে ভয় ভয় লাগা, উপরের দিকে আড়চোখে তাকানো, মুখের পেশীর সঙ্কোচন্তপ্রসারণ ইত্যাদি ইত্যাদি (petit mal seizure)। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাথায় আঘাত পাওয়া, মসি-ষ্কে ইনফেকশান, ব্রেন টিউমার, রক্তনালীর রোগ, মাদকাসক্তি, শরীরে খনিজ লবণের ভারসাম্যহীনতা, সীসার বিষক্রিয়া প্রভৃতি কারণে মৃগী রোগ হতে দেখা যায়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃগী রোগের পেছনে কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। মৃগীর আক্রমণ দুয়েকদিন পরপর হতে পারে আবার অনেক বছর পরপরও হতে পারে; তবে বিষয়টি চলতে থাকে সারা জীবন ধরে। এমনকি ঘুমের

মধ্যেও ইহার আক্রমণ হতে পারে। সাধারণত শারীরিক উত্তেজনা, উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি, হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ শোনা, আবেগ-উত্তেজনা ইত্যাদির ফলে মৃগীর আক্রমণ শুরু হয়।

কোন কোন রোগী কিছু সতর্কীকরণ লক্ষণের (aura) মাধ্যমে বুঝতে পারে যে, এখনই মৃগীর আক্রমণ শুরু হতে যাচ্ছে ; আবার অনেক রোগীই সতর্কীকরণ লক্ষণ না পাওয়ায় আগেভাগে বুঝতে পারে না। সতর্কীকরণ লক্ষণের মধ্যে আছে ভয় লাগা, পেটের মধ্যে অস্বস্তি লাগা, চোখে সর্ষে ফুল দেখা, মাথাঘুরানি, অদ্ভূত গন্ধ পাওয়া ইত্যাদি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃগীর আক্রমণ হয় অল্প সময়ের জন্য। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের খিচুঁনি থাকতেও পারে আবার না ও থাকতে পারে, কিছু সময়ের জন্য ঝিমানি আসে অথবা মাথা এলোমেলো-হতবুদ্ধি হয়ে যায়। বিভিন্ন ধরণের লক্ষণের উপর ভিত্তি করে মৃগী রোগকে কয়েকটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়ে থাকে। মৃগীর আক্রমণ হলে তাতে হস্তক্ষেপ করা যাবে না; তবে রোগী যাতে আগুনে পুড়ে, পানিতে ডুবে অথবা ধারালো কোন অস্ত্রের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। পাশাপাশি রোগীর শ্বাস নিতে অসুবিধা হলে মুখের ফেনা পরিষ্কার করে, জিহ্বা নাড়াচাড়া করে, রোগীর মাথায় বালিশ দিয়ে, রোগীকে সুবিধামতো কাত-চিৎ করে ইত্যাদির মাধ্যমে শ্বাস নিতে সাহায্য করতে হবে।

এই রোগীদের আগুনের কাছে বা পানিবদ্ধ স্থানে একাকী অবস্থান করা বিপজ্জনক। সর্বদা সাথে একটি ডাক্তারী সার্টিফিকেট বা 'মৃগী রোগী' লেখা একটি লকেট গলায় ঝুলিয়ে রাখা উচিত। মৃগীর আক্রমণ যদি পাঁচ মিনিটের বেশী স্থায়ী হয় অথবা জ্ঞান ফিরার পূর্বেই আবার খিচুঁনি শুরু হয় কিংবা খিচুঁনি শেষ হওয়ার পরেও রোগী বেহুশ হয়ে পড়ে থাকে, তবে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। নিয়মিত ব্যায়াম করা, প্রচুর বিশ্রাম নেওয়া এবং মানসিক চাপমুক্ত থাকা মৃগীর উৎপাত কমাতে যথেষ্ট সাহায্য করে। রোগের অন্তর্নিহিত কারণটি সনাক্ত করতে পারলে এবং সে অনুযায়ী সঠিক হোমিও ঔষধ প্রয়োগ করা গেলে, মৃগী রোগ সম্পূর্ণ স্থায়ীভাবে নিরাময় করা সম্ভব। অন্যথায় ঔষধ প্রয়োগে কেবল রোগের তীব্রতা কমিয়ে রাখা যাবে। (বিঃ দ্রঃ- মৃগী রোগ ছাড়াও অন্য যে-কোন কারণেই খিচুঁনি হোক না কেন, তাতে এই অধ্যায়ে বর্ণিত ঔষধগুলোর কোন একটি লক্ষণ মিলিয়ে খাওয়াতে থাকুন।) একই ঔষধ দীর্ঘদিন না খেয়ে বরং লক্ষণ অনুযায়ী কয়েকটি ঔষধ সিলেক্ট করে একটির পর আরেকটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খান।

Bufo rana : ব্যাঙের বিষ থেকে তৈরী করা এই ঔষধটি মৃগী রোগের একটি শ্রেষ্ট ঔষধ। মৃগী রোগের খিচুঁনি যারা দেখেছেন তারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে, রোগীর তখনকার অঙ্গভঙ্গি এবং লাফালাফির সাথে ব্যাঙের আকৃতি এবং লম্ফজম্ফের একটা অদ্ভূত মিল আছে। যে-সব যুবক-যুবতী অতিরিক্ত যৌনকর্ম অথবা হস্তমৈথুনের কারণে মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, তাদের জন্য বিউফো এক নাম্বার ঔষধ। বিউফোর লক্ষণ হলো মৃগীর আক্রমণের শুরুতে চীৎকার দেওয়া, মুখমন্ডল লাল হওয়া এবং **মৃগীর আক্রমণ চলে যাওয়ার পরে ঘুমিয়ে যাওয়া**। মাঝরাতে, মাসিকের সময়, অমাবশ্যা এবং যৌন উত্তেজনার সময় মৃগীর আক্রমণ বেশী হয়। **রাতে ঘুমের মধ্যে মৃগীর আক্রমণ বেশী হয়** এবং রোগীর ঘুম ভাঙতেও পারে আবার নাও ভাঙতে পারে। তবে ঘুম থেকে ওঠার পরে তার প্রচণ্ড মাথাব্যথা শুরু হয়। রোগী ঠান্ডা বাতাস অপছন্দ করে কিন্তু গরম রুমে আবার রোগের উৎপাত বৃদ্ধি পায়।

Cuprum Metallicum : কিউপ্রাম মেট মৃগী রোগের সবচেয়ে শক্তিশালী ঔষধ। ইহার প্রধান লক্ষণগুলো হলো চক্ষুগোলক উপরের দিকে উল্টে যায়, **হাতের বৃদ্ধাগুলির আক্ষেপ, মাথা এবং পায়ের পাতাসহ সমস্ত শরীর পেছনের**

**দিকে বেকে যায়, খিচুনি প্রথম শুরু হয় হাতের আঙুল অথবা পায়ের আঙুলে এবং পরে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে,** দুটি আক্রমণের মধ্যবর্তী সময়ে রোগী খুব অস্থির থাকে। ভয় পেলে এবং **পানিতে ভিজলে মৃগীর আক্রমণ হয়**। ক্রোধ, বদমেজাজ, অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টা ইত্যাদি এই ঔষধের মানসিক লক্ষণ।

Oenanthe crocata : ওইন্যান্থ ক্রোকেটা মৃগীর শ্রেষ্ট ঔষধগুলির মধ্যে একটি। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো হঠাৎ সম্পূর্ণ অচেতন হওয়া, মুখ দিয়ে ফেনা ওঠা, মুখমণ্ডল লাল এবং ফোলা ফোলা, দাঁত কপাটি লাগা এবং হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া। **মৃগীর আক্রমণের সময় যাদের বমি হয় অথবা কানের পর্দায় সমস্যা হয় অথবা পুরুষাঙ্গ শক্ত হয়ে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।**

Hydrocyanic acid : হিউজের মতে, হাইড্রোসায়ানিক এসিড মৃগীর একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং স্প্যাসিফিক ঔষধ। নতুন রোগের ক্ষেত্রে এটি সর্বোত্তম ঔষধ। এতে অজ্ঞান হওয়া, মুষ্টিবদ্ধ হাত, **কিছু গিলার সময় ভেতরে গরগর শব্দ হওয়া,** শরীর পাথরের মতো ঠান্ডা হওয়া, দাঁত কপাটি লাগা, মুখ থেকে ফেনা নির্গত হওয়া, ঢোক গিলতে না পারা প্রভৃতি সব লক্ষণই আছে। মৃগীর আক্রমণের পরে ঘুমঘুম ভাব এবং ভীষণ দুর্বলতা-অবসন্নতা-ক্লান্তি আছে।

Artemisia vulgaris : ভয় পেয়ে, মনের আবেগ-উত্তেজনা থেকে, মাথায় আঘাত পাওয়া, মাসিকের গন্ডগোল, শিশুদের দাঁত ওঠার সময় প্রভৃতি কারণে মৃগীর আক্রমণ হলে আর্টিমিসিয়া ভালগেরিস প্রযোজ্য। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণগুলো হলো **ঘনঘন মৃগীর আক্রমণ হওয়া, এমনকি দিনে কয়েকবার**, আক্রমণ শেষে গভীর ঘুম পাওয়া এবং দুর্গন্ধযুক্ত (রসুনের মতো) প্রচুর ঘাম হওয়া। হালকা মাত্রার মৃগীতেও এটি ফলদায়ক (petit mal seizure)। এটি শিশু এবং আসন্ন যৌবনা তরুণীদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্যকর।

Cicuta virosa : সিকিউটা মৃগীর ভাল ঔষধগুলোর মধ্যে একটি। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণগুলো হলো **খিচুনির সময় মাথা পেছন দিকে বাঁকা হওয়া,** অদ্ভূত ধরণের জিনিস খাওয়া ইচ্ছা হওয়া (যেমনকয়লা), এক দৃষ্টিতে কোন দিকে তাকিয়ে থাকা, **মাথা এক দিকে কাত হওয়া বা মোচড় দেওয়া**, সারাদিন বাম হাতে ঝাকুনি দেওয়া ইত্যাদি।

Kali bromatum : পুরুষদের বেলায় অতিরিক্ত যৌনকর্ম বা হস্তমৈথুন থেকে মৃগী রোগ হলে এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে মাসিকের সময় অথবা মাসিকের কিছু পূর্বে মৃগীর আক্রমণ হলে তাতে ক্যালি ব্রোম প্রযোজ্য। **এদের শরীরের ব্রণ থাকে প্রচুর, স্মরণশক্তি দুর্বল, হাত দুটি সর্বদা কোন না কোন কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়।**

Indigo : সাধারণত কৃমির উৎপাতের কারণে মৃগীর খিচুঁনি হলে ইন্ডিগো ভালো কাজ করে। ঘনঘন মৃগীর আক্রমণ হলে ইন্ডিগো ব্যবহার করে তার মাত্রা অনেক কমিয়ে আনা যায়। ইন্ডিগোর রোগীদের মৃগীর আক্রমণের পূর্বে মেজাজ থাকে ভীষণ খারাপ আবার মনের দুঃখে তারা রাতের পর রাত একা একা কাঁদে কিন্তু আক্রমণে পরে তারা ভীতু হয়ে যায়। এদের আক্রমণ শুরু হয় ঠান্ডা থেকে অথবা ভয় পেলে। ইহার সতর্কীকরণ লক্ষণ (aura) পেটের উপরের অংশে শুরু হয়ে মাথার দিকে গরম ভাপ উঠতে থাকে এবং মাথার ভেতরে ঢেউ খেলানোর মতো অনুভব হয়। কখনও কখনও চোখে ঝাপসা দেখে। যে-কোন কৃমির ঔষধই গর্ভবতীদের খাওয়ানো নিষিদ্ধ, তেমনি এটিও।

Calcarea carbonica : ক্যালকেরিয়া কার্বের রোগীদের পা দুটি থাকে ঠান্ডা, মাথা অর্থাৎ কপাল ঘামে বেশী, **হাত দুটি থাকে নরম তুলতুলে, এদের ঘাম-পায়খানা-প্রস্রাব সবকিছু থেকে টক গন্ধ আসে এবং এদের স্বাস্থ্য থাকে থলথলে মোটা।** ইহার সতর্কীকরণ লক্ষণ (aura) পেটের উপরের অংশে শুরু হয়ে উপরের দিকে ছড়াতে থাকে অথবা তলপেটের দিকে ছড়াতে থাকে এবং ইহার পরই খিচুঁনি শুরু হয়। কখনও কখনও মনে হয় হাতের ওপর একটি ইদুর দৌড়াচ্ছে।

Causticum : মাসিক অনিয়মিত হওয়ার কারণে মৃগী রোগ হলে অথবা মেয়েদের প্রথম মাসিক শুরু হওয়ার বয়সে মৃগী রোগ হলে কষ্টিকাম প্রযোজ্য। তাছাড়া খোলা বাতাসে হাটার সময় পড়ে যায় আবার সাথে সাথেই ঠিক হয়ে যায়। অমাবশ্যার সময় যদি মৃগীর আক্রমণ হয় তবে কষ্টিকাম উপকারী। ঘুমের ভেতরে মৃগীর আক্রমণ হয় এবং **অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রস্রাব বেরিয়ে যায়।** ইহার মানসিক লক্ষণ হলো **অন্যের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারে না।**

Camphora : ক্যাম্ফরা মৃগী পুরোপুরি নির্মূল করতে না পারলেও মৃগীর আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতে পারে এবং আক্রমণের সময়কাল কমিয়ে আনতে পারে। এতে সারা শরীরের সাথে সাথে **এমনকি জিহ্বা, চোখ এবং মুখের পেশীতেও খিচুঁনি হওয়ার** লক্ষণ আছে। আক্রমণের পরে বেহুঁশের মতো ঘুমাতে থাকে এবং **হাত-পা-মাথা বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে যায়।**

Silicea : সিলিসিয়া ঔষধটি যাদের হাড়ের বৃদ্ধিজনিত সমস্যা আছে অর্থাৎ **রিকেটগ্রস্থ লোকদের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে।** ইহার সতর্কীকরণ লক্ষণ (aura) পেটের উপরের অংশে শুরু হয়ে থাকে এবং শরীরের বাম পাশে শীত শীত বোধ হওয়া বা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া এই ঔষধের একটি উল্লেখযোগ্য সতর্কীকরণ লক্ষণ। মানসিক চাপ বা আবেগ-উত্তেজনার কারণে আক্রমণের সূচনা হয় এবং **অমাবশ্যা-পূর্ণিমায় আক্রমণের মাত্রা বেড়ে যায়।** এই ঔষধের মেরুদন্ডের সাথে সম্পর্কিত কোন না কোন রোগ লক্ষণ থাকবেই।

Nux vomica : **যারা অধিকাংশ সময়ে বদহজমে ভোগে,** বদমেজাজী এবং অল্প শীতেই কাতর হয়ে পড়ে, এটি তাদের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে। ইহার সতর্কীকরণ লক্ষণ (aura) পেটের উপরের অংশে শুরু হয়ে থাকে এবং **মুখের ওপর পোকা হাটতেছে এমন মনে হয়।**

Plumbum metallicum : প্লামবামের মৃগীর আক্রমণের সূচনা হয় হাই তোলা অথবা মাথাঘুরানির মাধ্যমে এবং **আক্রমণের শেষে মনের অবস্থা হয় কিংকর্তব্যবিমূঢ়** অর্থাৎ রোগীর আক্কল-বুদ্ধি ফিরে পেতে অনেক সময় লাগে। আক্রমণের পরে মাথা ডান দিকে কাত হয়ে থাকে। মাথার রক্তনালীর রোগ এবং ব্রেন টিউমারের কারণে মৃগী হলে এটি প্রযোজ্য। **সাথে যদি পুরনো কোষ্টকাঠিন্য এবং পেট ব্যথার সমস্যা থাকে, তবে অবশ্যই প্লামবাম প্রয়োগ করতে হবে।**

Sulphur : কোন চর্মরোগ (যা থেকে পূঁজ বের হতো) কড়া ঔষধ ব্যবহার করে চাপা দেওয়ার ফলে মৃগী রোগ হলে সালফার প্রযোজ্য। সালফার সেই চর্মরোগ ফেরত আনবে এবং ভেতর থেকে সারিয়ে তুলবে এবং সাথে সাথে মৃগীকেও বিদেয় করবে। **কাজেই মৃগী দেখা দেওয়ার পূর্বে যাদের নানা রকম চর্মরোগ হওয়ার ইতিহাস আছে,** তাদের প্রথমেই কিছুদিন সালফার খেয়ে নেওয়া উচিত। তাছাড়া সালফারের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলোর মধ্যে আছে

সকাল ১১টার দিকে ভীষণ খিদে পাওয়া, শরীর গরম লাগা, রোগ রাতে বৃদ্ধি পাওয়া, রোগ গরমে বৃদ্ধি পাওয়া, মাথা গরম কিন্তু পা ঠান্ডা, মাথার তালু-পায়ের তালুসহ শরীরে জ্বালাপোড়া ইত্যাদি।

Hyoscyamus niger : হায়োসায়েমাসের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলো হলো **মুখের পেশীতে খিচুঁনি বেশী হওয়া,** অট্টহাসি-চীৎকার-হৈহুল্লোর করতে ইচ্ছে হওয়া, দুঃখবোধ, মানুষকে সন্দেহ করা, নগ্ন হওয়ার ইচ্ছা ইত্যাদি।

Agaricus muscarius : এগারিকাসের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **মৃগীর আক্রমণের পরে মাথায় নানা রকমের চিন্তার জোয়ার এসে যায়,** বকবকানি, দীর্ঘস্থায়ী মাথা ঘুরানি, খোলা বাতাসে হাটার সময় মৃগীর আক্রমণ হওয়া।

Belladonna : বেলেডোনা মৃগীর প্রথম দিকের আক্রমণে বেশী প্রযোজ্য। তাপ, লাল রঙ এবং জ্বালাপোড়া হলো বেলেডোনার তিনটি প্রধান লক্ষণ। যদি সারা শরীর গরম হয়ে যায়, মুখ লাল হয়ে যায় এবং শরীরে জ্বালাপোড়া হয়, তবে বেলেডোনা দিতে হবে। **আলো, নড়াচড়া, গোলমাল এবং ঝাকুনিতে রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।**

Absinthium : **এবসিনথিয়ামের প্রধান লক্ষণ হলো কম্পন; জিহ্বা, হৃৎপিন্ড প্রভৃতি কাঁপতে থাকে**। মুখ বিকৃত করা, জিহ্বা কামড়ে ধরা, মুখে রক্তযুক্ত ফেনা, পুরোপুরি অজ্ঞান হওয়া, হঠাৎ করে তীব্র মাথা ঘুরানি, **আক্রমণের পরে বুদ্ধিহীনতা এবং স্মরণশক্তি নষ্ট হওয়া** প্রভৃতি লক্ষণ এতে আছে।

Cimicifuga / Actea racemosa : সিমিসিফিউগার সতর্কীকরণ লক্ষণ (aura) হলো **মাথার ভেতরে ঢেউ খেলানোর অনুভুতি হওয়া**। অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে আছে বিষন্নতা বা মনমরা ভাব, ঘাড়ের পেছনে ব্যথা, বিভিন্ন জয়েন্টে বাতের সমস্যা বেশী হওয়া ইত্যাদি।

Ammonium Bromatum : এমন ব্রোমের সতর্কীকরণ লক্ষণ (aura) হলো **অজ্ঞান হওয়ার অথবা দম বন্ধ হওয়ার অনুভুতি যা পেটের ওপরের অংশে শুরু হয়ে বুকের দুই পাশে এবং গলার দিকে যেতে থাকে**। নখের নীচে অস্বস্তি বোধ হয় যা কামড় দিলে কমে যায়।

Argentum nitricum : **ভয় পেয়ে বা মাসিকের সময় মৃগীর আক্রমণ হলে তাতে আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম প্রযোজ্য**। মৃগীর আক্রমণের কয়েক দিন অথবা কয়েক ঘণ্টা পূর্ব থেকেই চোখের তারা প্রসারিত হয়ে থাকে, আক্রমণের পরে রোগী খুবই অস্থির থাকে এবং তার হাত কাঁপতে থাকে, কঙ্কালসার, শিশুকে মনে হয় বৃদ্ধের মতো, **জোরে হাঁটার ইচ্ছা, মিষ্টি জাতীয় খাবারের প্রতি ভীষণ লোভ** ইত্যাদি।

Asterias rubens : এটি মৃগীর একটি প্রাচীন ঔষধ। মুখ লাল হয়ে যায়, মাথা গরম হয়ে যায় এবং **মনে হয় মাথার চারদিকের বাতাস গরম হয়ে গেছে**। পায়খানা শক্ত থাকে এবং মাথার ভিতরে ইলেকট্রিক শকের মতো ব্যথা হয়।

Cuprum aceticum : ইহার সতর্কীকরণ লক্ষণ (aura) **হাটুতে শুরু হয়ে তলপেটের দিকে যায়** এবং তখন রোগী অচেতন হয়ে পড়ে।

## Asthma, bronchial asthma, allergic asthma, Infantile asthma, Bronchitis (হাঁপানি) :-

হাঁপানি হলো কিছুদিন পরপর বারে বারে আসা শ্বাসকষ্টের নাম যাতে শ্বাসনালী চিকন হওয়ার কারণে শ্বাস নেওয়ার অথবা ছাড়ার সময় হিস হিস শব্দ হয়। হাঁপানির সাথে কখনও কখনও কাশি থাকে এবং আঠালো কফ উঠে। হাঁপানির আক্রমণ যখন তীব্র হয়, তখন লক্ষণ অনুযায়ী ঔষধ খেয়ে জীবন বাঁচাতে হবে। তারপর যখন হাঁপানির আক্রমণ চলে যায়, তখন হাঁপানির কারণ অনুযায়ী মূল ঔষধ খেয়ে তাকে স্থায়ীভাবে নির্মূল করতে হবে। হাঁপানিকে স্থায়ীভাবে নিরাময় করা অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে অসম্ভব হলেও একজন সুদক্ষ হোমিও চিকিৎসকের পক্ষে অসম্ভব নয়। হাঁপানির নাম (bronchial asthma, allergic asthma, Infantile asthma, exercise- induced asthma, Bronchitis) যা-ই হোক না কেন, ঔষধ খেতে হবে লক্ষণ অনুসারে। হাঁপানিকে স্থায়ীভাবে সারানোর ক্ষমতা পৃথিবীতে একমাত্র হোমিও ঔষধেরই আছে। হ্যাঁ, ঔষধ বা অন্য যে-সব জিনিস বা খাবারের কারণে হাঁপানি বেড়ে যায়, সেগুলো বাদ দিয়ে চলতে হবে। যেমন - বেশী পরিশ্রম, আবেগপ্রবন / উত্তেজিত হওয়া, নির্দিষ্ট কোন একটি ঔষধ (যেমন- বাতের ঔষধ), বিড়াল-কুকুরের পশম, ফুলের রেণু, গরুর মাংস, ইলিশ মাছ, চিংড়ি মাছ, কচুঁ শাক, মিষ্টি কুমড়া, বেগুন, ডাল ইত্যাদি ইত্যাদি।

☆ প্রথমত হাঁপানির সাথে যদি কাশি থাকে, তবে "কাশি" অধ্যায়ে বর্ণিত লক্ষণ অনুযায়ী ঔষধ খেয়ে সেটি নিরাময় করুন। তারপর হাঁপানির তীব্রতা কমে আসলে স্থায়ীভাবে সারানোর জন্য প্রায়ই নীচের ঔষধগুলো খাওয়ানো লাগতে পারে।

Arsenicum Iodatum : শীতকাতর রোগী কিন্তু গরমে হাঁপানীর কষ্ট বৃদ্ধি পায়, লক্ষণে আর্সেনিকাম আয়োডেটাম খেতে হবে ।

Causticum : হাঁপানী রোগী একমাত্র দাড়িয়ে থাকলে আরাম পায়, লক্ষণে কষ্টিকাম প্রযোজ্য।

Psorinum : শুয়ে থাকলে এবং দুই হাত ছড়িয়ে রাখলে হাঁপানীর কষ্ট কমে এবং হাত বুকের কাছে আনলে কষ্ট বৃদ্ধি পায়, লক্ষণে সোরিনাম খেতে হবে।

**Pothos Foetida** : ধুলোবালির কারণে যদি হাঁপানীর আক্রমণ হয় অথবা হাঁপানীর উৎপাত বৃদ্ধি পায়, তবে চোখ বুজে পোথোজ খেতে পারেন।

Aconitum napellus :-
হঠাৎ হাঁপানীর আক্রমণের অল্পক্ষণের মধ্যেই যখন সেটি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, তখন খাওয়াতে পারলে একোনাইট কাজ করবে যাদুর মতো। **হাঁপানীর আক্রমণ এত মারাত্মক হয় যে তাতে রোগী মৃত্যুর ভয়ে শংকিত হয়ে পড়ে।**

Kali Carbonicum – ক্যালি কারব-এর প্রধান লক্ষণ হলো হাঁপানীর আক্রমণ ভোর ৩টা থেকে ৫টার সময় বৃদ্ধি পায়, রোগী হুইল চেয়ারে বসে দোল খেলে হাঁপানীর কষ্ট কমে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

Belladonna : যদি **শরীরে বা আক্রান্ত স্থানে উত্তাপ বেশী থাকে, যদি আক্রান্ত স্থান লাল হয়ে যায়** (যেমন- মাথা ব্যথার সময় মুখ লাল হওয়া), **শরীরে জ্বালা-পোড়াভাব থাকে** ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে বেলেডোনা প্রয়োগ করতে পারেন। বেলেডোনা সাধারণত মোটাসোটা, শক্তিশালী, ফূর্তিবাজ রোগীদের বেলায় ভালো কাজ করে।

Aspidosperma : সাধারণত শ্বাসকষ্টের সময় যদি মুখ লাল হয়ে যায় অথবা নীল হয়ে যায়, তবে তাতে এসপিডসপারমা উপকারী। আবার শ্বাসকষ্ট যদি কোন হৃদরোগের কারণে হয় (যেমন- হৃদপিন্ড বড় হয়ে যাওয়া, হৃদপিন্ডে চর্বি জমা, হার্টের ভাল্বের সমস্যা), তবে তাতেও ইহা প্রয়োগ করতে পারেন।

Bacillinum : অতীতে যাদের যক্ষ্মা হয়েছিল অথবা যাদের পিতা-মাতা-ভাই-বোন বা স্বামী-স্ত্রীর যক্ষ্মা বা হাঁপানি ছিল, তাদেরকে বেসিলিনাম না খাইয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাঁপানি স্থায়ীভাবে সারানো যায় না। বেসিলিনামের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো ঘনঘন সর্দি লাগা, **ভীষণ ক্ষুধা, প্রচুর খায় কিন্তু তারপরও দিনদিন শুকিয়ে যায়, ভ্রমণ করতে খুবই পছন্দ করে, খোলা বাতাসের জন্য পাগল**, এক জায়গায় বেশী ক্ষণ থাকতে - এক কাজ বেশী ক্ষণ করতে ভালো লাগে না, রাতের বেলা হাঁপানি বেড়ে যায়। এটি ২০০, ১০০০ এবং ১০,০০০ শক্তিতে একমাস পরপর মোট ৩ মাত্রা খাওয়া উচিত।

Medorrhinum : অতীতে যাদের গনোরিয়া (Gonorrhoea) হয়েছিল অথবা যাদের পিতা-মাতা-স্বামী-স্ত্রীর গনোরিয়া ছিল, তাদেরকে মেডোরিনাম না খাইয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাঁপানি স্থায়ীভাবে সারানো যায় না। মেডোরিনামের প্রধান লক্ষণ হলো **পেট নীচের দিকে এবং পিঠ উপরের দিকে দিয়ে শুইলে (নামাযের সেজদার পজিশনে) এবং জিহ্বা বের করে রাখলে হাঁপানি কমে এবং এরা গরম সহ্য করতে পারে না।** এটি ২০০, ১০০০ এবং ১০,০০০ শক্তিতে একমাস পরপর মোট ৩ মাত্রা খাওয়া উচিত।

Syphilinum : অতীতে যাদের সিফিলিস হয়েছিল অথবা যাদের পিতা-মাতা-স্বামী-স্ত্রীর সিফিলিস ছিল, তাদেরকে সিফিলিনাম না খাইয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাঁপানি স্থায়ীভাবে সারানো যায় না। সিফিলিনামের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **রাতের বেলা সকল রোগ বৃদ্ধি পায়, বাতের সমস্যা লেগেই থাকে, দাঁত দ্রুত ক্ষয় হয়ে যায়,** মদ বা অন্যান্য মাদক দ্রব্যের প্রতি আসক্তি, স্মরণশক্তি দুর্বল, বেশী বেশী হাত ধোয়ার অভ্যাস, দুরারোগ্য কোষ্টকাঠিন্য ইত্যাদি। এটি ২০০, ১০০০ এবং ১০,০০০ শক্তিতে একমাস পরপর মোট ৩ মাত্রা খাওয়া উচিত।

Natrum Sulphuricum : যে-সব হাঁপানি ভিজা আবহাওয়ার সময় অথবা বর্ষাকালে বেড়ে যায়, তাতে নেট্রাম সালফ প্রযোজ্য। এটি ৩০ শক্তি থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে শক্তি বাড়িয়ে খাওয়া উচিত।

Magnasium Sulphuricum : যে-সব শিশু বা যুবক-যুবতী নিজেদেরকে পরিত্যক্ত -অপ্রয়োজনীয় -অনাকাঙ্খিত (rejected / deserted) মনে করে, তাদের যে-কোন রোগে ম্যাগ সালফ প্রয়োগ করতে হবে। যেমন - ইয়াতীম (orphan) শিশু, যেই শিশুকে তার মাতা গর্ভপাত ( abortion attempted) করতে চেয়েছিলেন, ধর্ষিতা যুবতী (raped) ইত্যাদি ইত্যাদি।

Thuja occidentalis : টিকা (vaccines) হলো হাঁপানি হওয়ার একটি সবচেয়ে বড় কারণ। যেমন- বিসিজি, ডিপিটি, হাম, পোলিও, এটিএস, হেপাটাইটিস ইত্যাদি ইত্যাদি। টিকা নেওয়ার কারণে হাঁপানি হলে সেক্ষেত্রে থুজা একটি শ্রেষ্ট ঔষধ। সুতরাং **যে-সব হাঁপানি রোগী অতীতে এসব অথবা অন্য কোন টিকা নিয়েছেন, তাদেরকে অবশ্যই ৫/৬ মাত্রা থুজা খাওয়াতে হবে। যারা শীত সহ্য করতে পারে না এবং উপর থেকে পড়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে,** তাদের ক্ষেত্রে থুজা প্রযোজ্য। বদ্ধমুল ধারনা (fixed ideas) লক্ষণ থাকলে থুজা প্রয়োগ করতে হবে। যেমন - একজন রোগী দুয়েক চাপ ইনহেলার নিলে উপকার পায়, এমনকি ইনহেলারের ভেতরে কোন ঔষধ না থাকলেও উপকার হয়। এটি ৩০ অথবা ২০০ শক্তিতে দশ দিন পরপর খাওয়া উচিত।

**ATS (এ.টি.এস.) ঃ -** কাটা-ছেড়া , পোঁড়া , অপারেশন ইত্যাদি যে সব ক্ষেত্রে ধনুষ্টংকার প্রতিরোধের জন্য এলোপ্যাথিতে এ.টি.এস. ইনজেকশন দেওয়া হয়, তার পরিবর্তে Arsenicum album কিংবা Ledum palustre (শক্তি ৬,১২,৩০,২০০) তিনবেলা করে দুদিন খান। তবে আর এ.টি.এস. ইনজেকশন নিতে হবে না। শরীরের সপর্শকাতর স্থানে আঘাতের কারণে যদি প্রচণ্ড ব্যথা সেখান থেকে চারদিকে ছড়াতে থাকে বা খিঁচুনি দেখা দেয় বা শরীর ধনুকের ন্যায় বাঁকা হয়ে যায় (ধনুষ্টঙ্কার), তবে Hypericum (শক্তি ৩০,২০০) আধা ঘণ্টা পরপর খাওয়াতে থাকুন।

## Autism, Gifted baby, Children of special need (বুদ্ধি প্রতিবন্দি) :-

দুর্ভাগ্যজনকভাবে সারা বিশ্বের মতো আমাদের দেশেও ইদানীং অটিজম আক্রান্ত শিশুদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অটিজম শিশুদের এমন একটি মানসিক রোগ যাতে তারা কথা, কাজ-কর্ম বা খেলাধুলা ইত্যাদির মাধ্যমে অন্য শিশুদের সাথে সম্পর্ক তৈরী করতে পারে না। কেবল শিশু নয়, বড়দের সাথেও তারা সম্পর্ক গড়তে পারে না। মোটকথা ইহারা সামাজিকতা আয়ত্ত করতে পারে না। সারাক্ষণ নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সদা সর্বদা কল্পনার এক অবাস্তব জগতে ডুবে থাকে তারা। নানা রকমের কাল্পনিক শব্দ শোনে, কাল্পনিক দৃশ্য দেখে। কিছু বিষয়কে তারা খুবই পছন্দ করে এবং দিনরাত সেগুলো নিয়েই পড়ে থাকে। আবার কিছু বিষয়কে তারা ভয় পায়, সহ্য করতে পারে না। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের বিচার-বুদ্ধির কোন উন্নতি হয় না। ডাক্তারী ভাষায় এদেরকে বলা হয় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু (special need children) বা কোন একটি বিষয়ে অত্যধিক ঝোঁকসম্পন্ন শিশু (gifted baby)। সাধারণভাবে এদেরকে বুদ্ধিপ্রতিবন্দি হিসেবে গণ্য করা হয়। শেষকথা হলো সারা জীবনই পরিবার, সমাজ এবং দেশের জন্য তারা একটি বোঝা হয়ে বেঁচে থাকে। তার চাইতেও দুঃখজনক ব্যাপার হলো, এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা এবং মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞরা অটিজমের কোন কাযর্কর চিকিৎসা নাই বলে ঘোষণা দিয়ে থাকেন। ফলে অভিবাবকরা হতাশ হয়ে সন্তানের রোগমুক্তির আশা ত্যাগ করেন। অপদার্থ সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবে ভেবে চোখের পানি ফেলা ছাড়া পিতা-মাতার আর কিছুই করার থাকে না। অথচ আমরা অনেকেই জানি না যে, উপযুক্ত হোমিও চিকিৎসা অবলম্বন করলে খুব সহজেই অটিজম আক্রান্ত শিশুদেরকে সুস্থ করে তোলা যায়। হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানী এবং হোমিও ডাক্তারদের লেখায় অটিজমের অগণিত কেইস হিস্ট্রি দেখা যায়, যাদেরকে তারা সফলভাবে রোগমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।

ব্রিটিশ হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাঃ বার্নেটের লেখায় দেখা যায় যে, আজ থেকে একশ বছরেরও বেশী সময় পুর্বে তিনি এমনকি মধ্যবয়স্ক অটিজমের রোগীকেও সুস্থ করতে সক্ষম হয়েছেন। সাম্প্রতিক গবেষণাগুলোতে ব্যাপকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ডিপিটি, পোলিও, হাম, হেপাটাইটিস, এমএমআর প্রভৃতি টিকার (vaccine) পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় শিশুরা অটিজমে আক্রান্ত হয়। পক্ষান্তরে টিকার বিষক্রিয়ায় যে-সব রোগ হয়, তাদের চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সাফল্য একটি ঐতিহাসিক সত্য। ইন্টারনেটে যে-কেউ একটু খোঁজ নিলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নিয়ে অটিজম থেকে মুক্ত হওয়া অসংখ্য শিশুদের কেইস হিস্ট্রি দেখতে পাবেন। যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার কমপিউটার বিজ্ঞানী এমি ল্যানস্কি-র (**Amy L. Lansky, Ph. D**) শিশু সন্তান যখন দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধি অটিজমে আক্রান্ত হয়, তখন বিশ্বখ্যাত সব সাইকিয়াট্রিস্ট, নিউরোলজিষ্টরা কয়েক বছর চেষ্টায়ও তাকে সুস্থ করতে ব্যর্থ হয়। তারা ঘোষণা করে যে, এই রোগের কোন চিকিৎসা নাই।

কিন্তু এমি লিনস্কির বিশ্বাস হয় নাই যে, দুনিয়াতে অটিজমের কোন চিকিৎসাই নাই। পরবর্তীতে স্থানীয় একজন বিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক মাত্র ছয় মাসের চিকিৎসায় শিশুটিকে অটিজম থেকে সম্পর্ণরূপে মুক্ত করেন। এই ঘটনার পর এমি ল্যানস্কি নাসার চাকুরি ছেড়ে দিয়ে হোমিওপ্যাথির উপর একটি ডিপ্লোমা কোর্স করে বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়ার অটিজমসহ দুরারোগ্য রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করেছেন। তার মতে, "হোমিওপ্যাথিতে প্রচলিত কিছু থিউরীকে আপাত দৃষ্টিতে অবৈজ্ঞানিক মনে হয় ; কিন্তু হোমিওপ্যাথি যে কাজ করে আমার ছেলেই তার জ্বলন্ত প্রমাণ"। বস্তুত হোমিওপ্যাথিক ঔষধে এমন সব জটিল শারীরিক-মানসিক রোগও আরোগ্য হয়, যাকে অন্যান্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে একেবারে অসম্ভব-অবিশ্বাস্য মনে করা হয়ে থাকে। এজন্য হোমিওপ্যাথিক ডাক্তাররা বিশ্বাস করেন যে, হোমিওপ্যাথি হলো অসম্ভবকে সম্ভব করার চিকিৎসা বিজ্ঞান। পরিশেষে অটিজম আক্রান্ত শিশুদের পিতা-মাতার প্রতি আমার আহ্বান থাকবে, তারা যেন কালবিলম্ব না করে তাদের সন্তানকে কোন হোমিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে ন্যস্ত করেন।

**চিকিৎসা ঃ-** **আসলে অটিস্টিক শিশুদের একটি একটি লক্ষণ খুঁজে খুজেঁ চিকিৎসা করার চাইতে বরং সামগ্রিক দৈহিক-মানসিক লক্ষণ সমষ্টির ভিত্তিতে চিকিৎসা করতে হবে। হ্যাঁ, লক্ষণ সমষ্টির ভিত্তিতে অনেক ঔষধের লক্ষণই আসতে পারে একথা সত্য (এবং সে অনুযায়ী সে-সব ঔষধ অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে), তবে কিছু কিছু ঔষধ আছে যাদের লক্ষণ বেশীর ভাগ অটিস্টিক শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। এদের মধ্যে আছে** Stramonium, Hyoscyamus, Belladonna, Mercurius, Cuprum metallicum, Veratrum Album, Zincum metallicum, Opium, Saccharum Officinale, Carcinosin, Cicuta Virosa, Iodium, Baryta Carbonica, Thyroidinum **ইত্যাদি ।**

Thuja occidentalis : **থুজা নামক হোমিও ঔষধটি মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহ্‌র একটি বিরাট রহমত স্বরূপ। কেননা আধুনিক যুগের শতকরা ৯৫ ভাগ রোগেরই মূল কারণ হলো টিকা** (vaccines) **এবং টিকার ক্ষতিকর ক্রিয়া নষ্ট করার সবচেয়ে ভালো ঔষধ হলো থুজা। বিশেষ করে অটিজমেরও সবচেয়ে বড় কারণ হলো এই টিকাসমূহ ; প্রধানত ডিপিটি** (DPT), **এমএমআর** (MMR), **বিসিজি** (BCG)। **টিকার ধ্বংসাত্মক ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিজ্ঞানীরা যতই হুশিয়ারী উচ্চারণ করুক না কেন, এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা তাতে ডেমকেয়ার। তাদের মতে, টিকাতে ক্ষতির চাইতে উপকার বেশী। তাই মানবজাতীর বৃহত্তর কল্যাণে (?) টিকা কর্মসূচী চালিয়ে যেতে হবে। ফলে প্রতিদিনই নতুন নতুন টিকা বাজারে আসছে। নতুন নতুন ধ্বংসাত্মক ভাইরাস (টিকার মাধ্যমে) শিশুদের শরীরে ঢুকে যাচ্ছে। চতুরমুখী প্রচার-প্রপাগান্ডার মাধ্যমে পাবলিকের ব্রেনওয়াশিং চলছে। স্বাস্থ্যসেবার নামে রোগের সেবা চলছে। রোগ নির্মূলের নামে রোগ বিস্তার করা হচ্ছে। মানবজাতিকে সুস্থ করার নামে অসুস্থ করা হচ্ছে। সে যাক, থুজার লক্ষণ অন্য কোন অধ্যায়ে দেখে নিবেন এবং কোন টিকার ক্ষতিকর ক্রিয়া বিনষ্ট করার জন্য কোন ঔষধ খাওয়াতে হবে তা টিকা অধ্যায়ে বলা আছে ।**

**Stramonium :** স্ট্র্যামোনিয়ামের প্রধান লক্ষণ হলো (মানবজাতির যাহা মূল ভয়) একা থাকার ভয় বা নিঃসঙ্গতার ভয় এবং অন্ধকারকে ভয় পাওয়া (আর এই কারণেই মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বাস করে)। শিশুরা ভীত-শঙ্কিত অবস্থায় ঘুম থেকে জেগে ওঠে ,গোঙাতে থাকে ,কাউকে চিনতে পারে না ,সামনে যাকে পায় তাকেই আকড়ে ধরে, এমনকি আসবাবপত্রকেও আকড়ে ধরে, চেনা জিনিসকে অচেনা মনে হয়, **ভয় পায় কেউ তাকে হয়ত আঘাত করবে ইত্যাদি**।

Thyroidinum : **থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে তৈরী করা এই ঔষধটি অনেক ক্ষেত্রে অটিজমের চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা আমরা জানি যে, থাইরয়েড হরমোনগুলো আমাদের শারীরিক-মানসিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং আমাদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা (immunity) বা ইমউনিটি সৃষ্টি এবং সুরক্ষা করে থাকে। এই কারণে ক্যানসার, অটোইমউন ডিজিজ (Autoimmune diseases), অটিস্টিক ডিজিজ (Autism Spectrum Disorder-ASD) ইত্যাদি রোগে থাইরয়েডিনামের ব্যবহার আবশ্যক। থাইরয়েডিনামকে বলা হয় কালো বাক্স (Black Box) যাতে মানুষের অতীতের ঘটনা-দুর্ঘটনা জমা থাকে। এটি রোগীর সিস্টেমে চাপা পড়া অতীতের দুর্ঘটনাকে বের করে নিরাময় করে থাকে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গর্ভকালীন এবং প্রসবকালীন সময়ের দুর্ঘটনা, একটি বিশেষ ধরনের মুখভঙ্গি এবং নির্দিষ্ট একটি ঔষধের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অটিস্টিক শিশুদের মধ্যে ঘটতে দেখা যায়। এই ঔষধটি অনেকক্ষেত্রে রোগীর গুপ্ত লক্ষণকে প্রকাশ করে দেয় এবং এভাবে তার সঠিক ঔষধ নির্বাচনে সহায়তা করে থাকে।**

Cupram metallicum : শিশুরা অপরিচিত কাউকে কাছে আসতে দেখলে ভয় পায়, ভয়ে চীৎকার দিয়ে উঠে।

☆ অটিজমের চিকিৎসার জন্য মানসিক রোগ অধ্যায়ে আলোচিত ঔষধসমূহ দেখতে হবে।

## বেঢপ আকৃতির মাথা ; সাতাশ বছর বয়সের এক ব্যক্তির মানসিক অবস্থা শিশুদের ন্যায় (Misshapen head : Adult mental infancy of a man twenty-seven years of age) :

মুল- হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডা ঃ জে. সি. বার্নেট (এম.ডি.) অনুবাদ- বশীর মাহমুদ ইলিয়াস **(**ব্রিটিশ হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডা ঃ জে. সি. বার্নেট (এম.ডি.) এর এই কেস হিস্ট্রি খানা বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিদের **বা অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের** চিকিৎসায় আপনাদের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করার জন্য দেওয়া হলো**)**

সাতাশ বৎসর বয়স্ক লম্বাচওড়া এক ব্যক্তিকে তার আত্মীয়রা আমার চিকিৎসার অধীনে ন্যস- করে ১৮৮৯ সালের মে মাসে ; আমার মতামতের ওপর আশাভরসা করে যে, ঔষধের মাধ্যমে তার অবস্থা কম-বেশী স্বাভাবিক করা যাবে যদিও এই সাতাশ বছর বয়সেও মানসিকভাবে সে শিশুদের ন্যায় (বোকাই) রয়ে গেছে। তার মুখের দিকে ভালো করে তাকালে যে কেউ দেখতে পাবে যে, তার কপাল বেশ ফোলানো (অর্থাৎ উচুঁ) ; চোখের পাতায় কোন পশম নেই ; হাবাহাবা চাহনি ; মাথার স্বাভাবিক গঠন বেখাপ্পা। তার ইতিহাস হলো শিশুকালে তার মাথায় পানি ছিল এবং সে কখনও অন্যদের মতো ছিল না। তার বোনেরা বলল, সে দুর্বলচিত্তের মানুষ এবং তাকে হাবা বলে ডাকতাম। মাথা খাটানো কাজ করতে না পারার কারণে তার করার মতো কোনো কাজও ছিল না আর এভাবে সে মানসিকভাবে ছিল অনাবাদী। ফলে একজন ভদ্রলোকের সন-ান হয়েও সে রয়ে গেছে পুরোপুরি অশিক্ষিত। সে মাশায়াল্লাহ অনেকগুলো অভিযোগ করল- তার মাথার চামড়া তার কাছে খুব টানটান (*tight*) মনে হয়, তার কপালে এবং মাথার পেছনে উভয়দিকে ব্যথা করে। তার চামড়ার রঙ অনেকটা কালচে ধরনের। তার অনেকগুলো রোগলক্ষণ রাতে বেলা বৃদ্ধি পায়। আমি তাকে খুবই নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করলাম এবং তার মধ্যে তার নিজের ব্যাপারে আগ্রহ জাগিয়ে তুললাম। সে কোন বিবেচনাতেই পাগল ছিল না বরং বলা যায় তার চিন্তাশক্তি ছিল ভালোই কিন্তু তা ছিল

একটি মেঘের আড়ালে লুকানো। সে তার হাত দিয়ে মাথাকে আকড়ে ধরত এবং বেশ চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে বলত যে, এটা খুবই আঁটসাঁট (*tight*) এবং আরো অভিযোগ করল যে, তার ঘুম অত্যন্ত বেশী এবং হিসাব-কিতাব বা মাথা-খাটানো কোনো কাজ সে করতে পারে না।

☆ শারীরিক কারণের মধ্যে প্রথমেই আসে খুব সম্ভবত মস্তিষ্কের (encephalon) পানিজনিত অবস্থাটি।

আমি এই রোগীটির প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দেই, কারণ এটা আমার তত্ত্বকে পুরোপুরিভাবে প্রমাণ করে যে, মস্তিষ্কজনিত অক্ষম শিশু-কিশোরদের মানসিকভাবে পতিত রাখা প্রকৃত চিকিৎসা নয়। যুবকটি একজন পয়সাওয়ালা, ক্ষমতাশালী এবং বুদ্ধিজীবি ভদ্রলোকের সন্তান হওয়াতে ডাক্তারের পরামর্শে মানসিকভাবে অনাবাদীই রয়ে গেছে। ফলে সে শারীরিকভাবে বৃদ্ধি পেলেও মানসিকভাবে রয়ে গেছে হাবলা। কেবল তাই নয়, সে যখন পূর্ণবয়স্ক যুবক তখন উপদেশ অনুসারে তাকে আরো শক্তিশালী করার জন্য খারাপ আবহাওয়াযুক্ত একটি উপনিবেশিক দেশে চাকরি দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল যেখানে তাকে বড় বড় কাঠের গুঁড়ি বহন করতে হতো। এতে তার শারীরিক শক্তি আরো বৃদ্ধি পেলেও মানসিকভাবে রয়ে গেছে আগে মতোই আহাম্মক বিশেষত দীর্ঘ প্রবাস যাপনের পর যখন সে আমাকে সাক্ষাৎ দিতে আসে। এবার চিকিৎসার পরিণতি লক্ষ্য করুন।

প্রথম ঔষধ ছিল Syphilinum শক্তি ১০০০ যাতে "তার হাতে এবং মুখে দেখা দিয়েছিল একটি অস্বস্তিকর অনুভূতি (irritation) যা তাকে রাতের বেলা ঘুমাতে দিত না; এতে জ্বালা-যন্ত্রণা হতো, দিনের বেলা অসুবিধা করত না।" তার মস্তিষ্কের অবস্থা পূর্বের চাইতে ভালো!

পরে দেওয়া হয় Thuja 30 এবং এতে মনে হয় তার ভালো উন্নতি হয়েছে। তাকে দুবার টিকা দেওয়া হয়েছিল। তারপর তাকে দেওয়া হয়েছে Nux vomica 6 এবং Bacillinum 200। এই পর্যায়ে তার মস্তিষ্কের অবস্থা খুবই ভালো যাচ্ছে বিধায় সে পাটিগণিত শেখা শুরু করল। সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম প্রেসক্রিপশনের পুণরাবৃত্তি করা হল।

অক্টোবর ২৩ - শারীরিকভাবে বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে; কবুতরের ন্যায় বক্ষপিঞ্জরের (pigeon breastednesss) আকৃতি অনেকটা কমে এসেছে। সে তার "তিনটি আর" (**রিডিং, রাইটিং এবং এরিথমেটিক**) শেখার কাজে বেশ উন্নতি করেছে। পরবর্তীতে দেওয়া হয় Morbillinum 30 ঔষধটি।

নভেম্বর ২৭- সে তার পড়াশোনাকে ইদানিং বেশ উপভোগ করছে, প্রধানত লেখা এবং অংকশাস্ত্রকে। তারপরে Bacillinum 100, Zincum aceticum 3x, Thuja 30, Calcarea phos 3x ইত্যাদি ঔষধগুলি আমাদেরকে ১৮৯১ সালের দিকে নিয়ে যায়, যখন সে তার জ্ঞানার্জনে এতটাই উন্নতি করেছে যে, শহরের একজন পুঁজিপতির অফিসে চাকুরি পেয়ে যায় যাতে সে অদ্যাবধি সম্পূর্ণরূপে মাথা খাটিয়ে নিজের জীবিকা নির্বাহ করছে।

উপরোক্ত ঘটনাটি আমার এই তত্ত্বকেই প্রমাণ কওে যা আমি এখন পোষণ করি; অর্থাৎ বুদ্ধিহীন এবং পিছিয়ে পড়াদের অব্যবহৃত ফেলা রাখাটা যথেষ্ট নয়। এই ভেবে যে, তারা তাদের বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিত্ব রোগ থেকে বেরিয়ে

আসতে অক্ষম। বরঞ্চ তারাও অন্যদের মতো একই সাথে নিজেদেও ভেতরে এবং বাইরে বৃদ্ধি পেতে সক্ষম। এই যুবক লেখাপড়ার সাথে সম্পর্কিত না থাকার কারণে মানসিকভাবে রয়েছিল অনাবাদী। তার পেশীসমূহকে ব্যবহার করা হয়েছিল, এগুলোর হয়েছিল প্রচুর ব্যায়াম; কিন্তু তার মস্তিষ্কের কোন উন্নতি হয়নি, কেননা সেটা ছিল অব্যবহৃত অবস্থায়। এটাকে অব্যবহৃত ফেলে রাখা হয়েছিল কেননা তা কাজের উপযুক্ত ছিল না। সন্দেহ নেই যে, এই অযোগ্য অবস্থায় ইহাকে কাজে না লাগানোতে বুদ্ধিমত্তা ছিল কিন্তু যথেষ্ট ছিল না।

আপনি হাতের পেশীতে পট্টি বেধে তাকে বড়ো করতে পারবেন না। তেমনি পারবেন না আপনার ধীশক্তিকে অলসভাবে ফেলে রেখে তাকে পরিপুষ্ট করতে। পেশীশক্তি অর্জন করতে হয় পেশীর ব্যায়াম করে; তেমনি বুদ্ধিমত্তা অর্জন করতে হয় তার চর্চা করে। কিন্তু মস্তিষ্কের ক্ষমতা যদি হয় অসুস্থ; তবে প্রথমে তার চিকিৎসা করতে হবে এবং তারপরেই কেবল নিরাপদে তার অনুশীলন করা যাবে এবং তার শক্তি বৃদ্ধি করা যাবে। পেশীর চর্চা সরাসরি ধীশক্তিকে বলশালী করে না, তেমনি ধীশক্তির চর্চাও করে না পেশীর কোন উপকার; প্রত্যেকের প্রাপ্য চর্চাই প্রত্যেকের সুষম বৃদ্ধিতে সহায়ক। যে-কোনটির অতিরিক্ত চর্চা অন্যটিকে ক্ষতিগ্রস' করে নিশ্চিতভাবে। প্রত্যেকটি প্রাণীর প্রাপ্ত ক্ষমতা একটা পর্যায় পর্যন- সীমাবদ্ধ এবং তার বেশী নয়। **মস্ত মস্ত** পন্ডিতরা হয় পেশীশক্তিহীন; আকর্ষণীয় পেশীবহুল ব্যক্তিরা একই সাথে ব্রেনের বিশাল কাজ করতে অক্ষম। ইহা অসম্ভব, বিরুদ্ধে অনেক বকবকানি স্বত্ত্বেও।

উপরোক্ত উপদেশটি ভালোভাবে স্মরণে রাখা অতীব জরুরি। আমি বলছি শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবিরা একই সাথে কখনও শ্রেষ্ঠ পেশীকর্মী হয় না। আমি এই মত পোষণ করি না যে, একজন প্রচণ্ড পেশীশক্তির অধিকারী ব্যক্তি একই সাথে তীক্ষ্মধীশক্তিসম্পন্ন, উচ্চমানের বুদ্ধিজীবি হতে পারে না। আমি যা বলতে চাই তা হলো, এমন একজনকেও আমি দেখিনি যিনি দু'টোতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। গ্ল্যাডস্টোন একজন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবি এবং একটি গাছ কেটে সে লাকড়ি করতে পারবে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে, পেশাদার শ্রেষ্ঠ লাকড়ি চেলাইকারীদের সাথে প্রতিযোগিতায় সে ভালো কোন পজিশনে যেতে পারবে। আর তাঁর দিকে ভালোভাবে না তাকালেও বুঝা যায় যে, সে কোন কালেও বিষেশভাবে পেশীবহুল দেহধারী ছিল না।

প্রত্যেকটি প্রাণীই তার প্রাপ্ত ক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারে না। শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার ডাঃ গ্রেইসের বংশধরদের মধ্যে হয়ত একজনও শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক খুঁজে পাওয়া যাবে না। পাতলা লোকেরা যেমন কখনও ভালো কয়লা-উত্তোলনকারী হয় না, তেমনি কয়লা-শ্রমিকরাও হয় না ভালো এক্রোবেট বা নৃত্যশিল্পী। প্রত্যেকেই তার নিজের অবস্থানে অনন্য।

## Babies best vitamin (শিশুদের শ্রেষ্ট ভিটামিন) :-

ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা (Calcarea Phosphorica) নামক ঔষধটি শিশু এবং বৃদ্ধদের জন্য পৃথিবীর সেরা একটি ভিটামিন। মায়ের পেট থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত সকলেরই এই হোমিও ঔষধটি মাঝে-মধ্যে খেয়ে যাওয়া উচিত। সাত দিন বা পনের দিন পরপর একমাত্রা করে খাওয়া উচিত। গর্ভকালীন সময়ে খেলে ইহা আপনার সন-ানের হাড় (bone), দাঁত (teeth), নাক (nose), চোখ (eye), মস্তিষ্ক (brain) ইত্যাদির গঠন খুব ভালো এবং নিখুঁত করতে সাহায্য করবে এবং আপনার সন্তান ঠোক কাটা (harelip), তালু কাটা (cleft palate), হাড় বাঁকা (rickets),

খোঁজা (epicene), বামন (dwarfish), পিঠ বাঁকা (Spina bifida), বুদ্ধি প্রতিবন্ধি (autism), হৃদরোগ, চর্মরোগ, কিডনীরোগ প্রভৃতি দোষ নিয়ে জন্মনোর হাত থেকে রক্ষা পাবে। এজন্য প্রত্যেক গর্ভবতী মায়েরই এটি সপ্তাহে বা পনের দিন পরপর একমাত্র করে কয়েক মাস খাওয়া উচিত। এটি শিশুদের নিয়মিত খাওয়ালে তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং অসুখ-বিসুখ কম হবে। ক্যালকেরিয়া ফস নিয়মিত খেলে আর টিকা (vaccine) নেওয়ার প্রয়োজন নাই। একে ধরে নিতে পারেন টিকার বিকল্প হিসেবে। এটিই শিশুদের জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ট টিকা স্বরূপ। যে-সব শিশুদের মাথার খুলির হাড় (open fontanelle) ঠিক মতো জোড়া লাগেনি, তাদেরকে অবশ্যই ক্যালকেরিয়া ফস খাওয়াতে হবে। নাকের পলিপ (nasal polypus), পায়খানার রাস্তার পলিপ (anal polypus) এবং জরায়ুর পলিপ (uterine polypus) বা নরম টিউমার এই ঔষধে দুর হয়ে যায়। অবশ্য এজন্য অনেক দিন ক্যালকেরিয়া ফস খেতে হয়।

হাড় ভেঙে (breaking) গেলে কিংবা মচকে গেলে (Fracture) ক্যালকেরিয়া ফস দ্রুত জোড়া লাগিয়ে দেয়। স্বাভাবিক ভাবে ভাঙ্গা হাড় ভালোভাবে জোড়া লাগতে যদি লাগে এক বছর, তবে ক্যালকেরিয়া ফস খেলে লাগবে তিন মাস। হাড় সংক্রান্ত যাবতীয় রোগে এটি খুব ভালো কাজ করে। পিঠে ব্যথা (backache), হাটুতে দুর্বলতা ইত্যাদি সমস্যায় ক্যালকেরিয়া ফস খেতে ভুলবেন না। কিছু কিছু শিশু আছে যাদের পায়ের বিভিন্ন পেশী দুর্বল (weak Ankles) ; ফলে তাদের হাঁটা শিখতে অনেক দেরী হয়, দাঁড়ানো শিখতে দেরী হয় (delayed walking), দাঁড়াতে গেলে বা হাঁটতে গেলে টপাটপ পড়ে যায়। এসব শিশুর একমাত্র ঔষধ হলো ক্যালকেরিয়া ফস। পিঠের দুর্বলতায় (weakness of Back) ক্যালকেরিয়া ফস একটি গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ। অনেক শিশু এবং বয়স্কদের দেখা যায় যে, চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ পড়াশুনা বা কাজ করলেই পিঠে ব্যথা করতে থাকে। ইহার মানে হলো মেরুদন্ড দুর্বল। এই মেরুদন্ডের দুর্বলতায় ক্যালকেরিয়া ফস ঔষধটি খুবই উপকার দেয়। আবার কোমড় ব্যথারও (Lumbago) এটি একটি ভালো ঔষধ। অনেকের ঘাড়ের পেশী শক্ত হয়ে যায় (stiff neck), ফলে তারা মাথা ডানে-বামে ঘুরাতে পারেন না। এই রোগের একটি শ্রেষ্ট ওষধ হলো এই ক্যালকেরিয়া ফস। কোন শিশু বিরাট বড় মাথা নিয়ে জন্মালে (hydrocephalus) অথবা জন্মের পর মাথা বড় হয়ে গেলে ক্যালকেরিয়া ফস তার এক নম্বর ঔষধ। এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা এসব শিশুদের মাথা ছোট করার জন্য অনেক ঝুঁকিপূণ অপারেশন করে থাকেন, যাতে প্রচুর টাকাও খরচ হয়ে থাকে। কিন্তু কয়েক মাস ক্যালকেরিয়া ফস খেলে বড় মাথা অটোমেটিকভাবে ছোট হয়ে যায়।

রোগের কথা চিন্তা করলে যদি রোগের উৎপাত বেড়ে যায়, তবে এই জাতীয় অদ্ভূত রোগে এই ঔষধ প্রযোজ্য। এটি টনসিলের সমস্যা (tonsilitis) এবং মুখের ব্রণের (acne vulgaris) সেরা ঔষধ। যাদের ঘনঘন সর্দি লাগে (frequent catarrh), তারা অবশ্যই এই ঔষধ খাবেন। ডায়াবেটিসের এটি একটি শ্রেষ্ট ঔষধ। ইহা আপনার কৌষিক বিপাক ক্রিয়া (Basal Metabolism) বৃদ্ধির মাধ্যমে আপনার ডায়াবেটিস চিরতরে নিমূল করে দেবে। শিশুদের দাঁত ওঠার (dentition) সময় অবশ্যই ক্যালকেরিয়া ফস খাওয়ানো উচিত। এতে দাঁত ঠিকমতো ওঠবে এবং দাঁতের গঠন ভাল হবে ; পাশাপাশি দাঁত ওঠার সময় যে-সব অসুখ-বিসুখ হয় (যেমন-ডায়েরিয়া, বদহজম, খিচুঁনি ইত্যাদি) সেগুলো থেকে শিশু রক্ষা পাবে। যে-সব শিশু অনেক বড় হয়ে গেছে কিন্তু এখনও দাঁত ওঠেনি, তাদেরকেও ক্যালকেরিয়া ফস খাওয়ানো দরকার। যে-সব শিশু-কিশোরের সারা বছর মাথাব্যথা (headache) লেগেই থাকে, ক্যালকেরিয়া ফস তাদের জন্য একটি চমৎকার ঔষধ। সাধারণত শিশু-কিশোররা যখন স্কুলে যায়, তখন পড়াশুনার অত্যধিক চাপের কারণে তাদের অনেকেই মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হয়। বিশেষ করে পরীক্ষা সামনে এলে এই মাথা ব্যথা বেড়ে যায় বহুগুণে। ছাত্র জীবনের মাথা ব্যথায় (school headache) ইহা একটি সেরা ঔষধ।

ক্রিটিনিজম (Cretinism) রোগের একটি চমৎকার ঔষধ হলো ক্যালকেরিয়া ফস যাতে একটি শিশু জন্মগতভাবেই হয় বেটে-খাটো, বামন (dwarf), বুদ্ধিহীন, ফোলা ফোলা মুখমন্ডল (puffy face), শুষ্ক চামড়া, মোটা জিহ্বা, বড় নাভী (umbilical hernia), পেশীর সমস্যা ইত্যাদি লক্ষণ একত্রে থাকে। আবার ঘ্যাগ বা গলগন্ড (goiter) রোগেরও ইহার একটি শ্রেষ্ট ঔষধ ; যা থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের কর্মক্ষমতা কমে (Hypothyroidism) যাওয়ার কারণে হয়ে থাকে। শিশুদের এক চোখ বা দুই চোখই যদি টেরা (Strabismus) হয়, তবে তাদের ক্যালকেরিয়া ফস খাওয়াতে পারেন। কেননা এটি টেরা চোখের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিশু-কিশোররা যদি ধূমপানে আসক্ত (Tobacco habit) হয়, তবে তাদের ক্যালকেরিয়া ফস খাওয়াতে থাকুন। কেননা এটি ধূমপানের নেশা দূর করতে কাযকর ভূমিকা পালন করে থাকে। কোন শিশু-কিশোরের অণ্ডকোষ বড় (swollen testicles) হয়ে গেলে, তাকে ক্যালকেরিয়া ফস খাওয়াতে হবে।

অনেক শিশুদের হজম শক্তি (assimilation) খুবই দুর্বল থাকে। অনেক সময় দেখা যায়, স্বচ্ছল ফ্যামিলির বাচ্চা, প্রচুর পুষ্টিকর খাবার খায় কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো হয় না। কারণ ভালো ভালো খাবার খেলেও সেগুলো শরীরে শোষিত (malabsorption) হয় না ; বরং পায়খানার সাথে বেরিয়ে যায়। লিকলিকে, হাড্ডিচর্মসার (emaciation), পাটকাঠির মতো শরীর। এসব শিশুদেরকে নিয়মিত বেশ কয়েক মাস ক্যালকেরিয়া ফস খাওয়ালে তাদের হজম শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং স্বাস্থের অবস্থা আমুল পাল্টে যাবে। যা-ই খাবে, তাই শরীরে শোষিত হবে। এই কারণে শিশুদের রক্তস্বল্পতা (Anemia) সমস্যায় ক্যালকেরিয়া ফস একটি এক নম্বর ঔষধ। বুদ্ধি প্রতিবন্ধি (mental retard) বা অটিজমে (autism) আক্রান্ত শিশুদের এটি একটি শ্রেষ্ট ঔষধ। অনেক শিশু-কিশোরদের পড়াশুনার চাপে অথবা অপুষ্টির কারণে স্মরণশক্তি কমে যায় ; ব্রেন ঠিক মতো কাজ করে না (Brain-fag)। ফলে কিছুই মনে রাখতে পারে না। যা পড়ে সব ভুলে যায় (Low memory)। এই সমস্যায় ক্যালকেরিয়া ফস যাদুর মতো কাজ করে। এজন্য প্রতিটি বার্ষিক পরীক্ষার পূবে শিশু-কিশোরদের দুয়েক সপ্তাহ ক্যালকেরিয়া ফস খাওয়ানো উচিত। যাতে পরীক্ষার সময় পড়াশোনার অত্যধিক চাপে স্মরণশক্তি কমে গিয়ে রেজাল্ট খারাপ না হয়।

আবার অনেক মহিলার বুকের দুধের স্বাদ থাকে বিকৃত। কারো দুধ হয় নোনতা (salty) আবার কারোটা বেশী মিষ্টি। এসব দুধ শিশুরা খেতে চায় না কিংবা খেলেও বমি করে ফেলে দেয়, শিশুরা ডায়েরিয়া-আমাশয়-বদহজম ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ক্যালকেরিয়া ফস ঔষধটি মায়েদের খাওয়ালে তাদের বুকের দুধের স্বাদ ঠিক হয়ে যায় এবং তখন আর শিশুরা খেতে অস্বীকার করে না এবং শিশুদের পেটও খারাপ হয় না। এটি ৩০ (ত্রিশ) শক্তিতে খাওয়া উচিত এবং প্রতিবার এক ফোটা করে অথবা বড়িতে খেলে ১০ (দশ) টি বড়ি করে সপ্তায় অথবা পনের দিন পরপর এক মাত্র করে খাওয়া উচিত। আবার জরুরি সমস্যায় রোজ কয়েকবার করেও খেতে পারেন (যেমন- বড় মাথা নিয়ে জন্মানো শিশু, হাড়ভাঙ্গার ইত্যাদি ক্ষেত্রে)। হ্যাঁ, ক্যালসিয়াম ফসফেট থেকে তৈরী এই হোমিও ঔষধটির তেমন কোন ক্ষতিকর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নাই। এমনকি ভুলবশত যদি নির্দিষ্ট মাত্রার চাইতে দশ গুণ বেশীও কেউ খেয়ে ফেলে, তাতেও কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই।

## Bird flu, Swine flu, Influenza, Seasonal fever, Viral fever (বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু , ইনফ্লুয়েঞ্জা, সিজনাল জ্বর, ভাইরাস জ্বর) :-

এমন একটি প্রাণঘাতী রোগের কথা কল্পনা করুন যাতে একজন টগবগে যুবক সকাল বেলা “গলা ব্যথায় আক্রান্ত হলো, দুপুরে “কোন কিছুই ঠিক মতো চলছে না” অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হলো এবং সন্ধ্যায় সে লাশ হয়ে বেরিয়ে গেলো। কিংবা আরেকজন মানুষের কথা চিন্তা করুন যিনি কোথাও যাওয়ার জন্য বাসে বা ট্রেনে চড়ে বসলেন কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছার পূর্বেই মরে লাশ হয়ে পড়ে রইলেন। হ্যাঁ, ১৯১৮ সালের প্রলংকরী স্প্যানিশ ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী অনেকটা এমনই ছিল যা মাত্র চারমাসে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। এক বছর স্থায়ী সেই মহামারীতে দুই থেকে পাঁচ কোটি মানুষের মৃত্যু হয় এবং অন্তত পঞ্চাশ কোটি লোক অসুস্থ হয়েছিল।

গত দুইশ বছরে পৃথিবীতে যত মহামারী এসেছে, তার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সে-সব মহামারীর চিকিৎসায় এলোপ্যাথির সাফল্য ছিল খুবই সামান্য; অন্যদিকে হোমিওপ্যাথির সাফল্য ছিল অনেকটা ঈর্ষণীয় পর্যায়ের। হোমিওপ্যাথি আবিষ্কারের প্রথম যুগেই ইউরোপ জুড়ে স্কারলেট ফিভারের (Scarlet fever) মহামারী দেখা দেয় যা মোকাবেলায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি বিরাট সাফল্যের পরিচয় দেয়। পক্ষান্তরে স্কারলেট ফিভার নিয়ন্ত্রণে এলোপ্যাথির ব্যর্থতা ছিল স্মরণ রাখার মতো। ১৯১৮ সালের প্রলংকরী স্প্যানিশ ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী মোকাবেলাতেও হোমিওপ্যাথির কামিয়াবী ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। ইহা ছাড়াও কলেরা, বসন্ত, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, পোলিও প্রভৃতি মহামারী নিরাময়ে হোমিওপ্যাথির অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমানে একটি নতুন ইনফ্লুয়েঞ্জা অর্থাৎ সোয়াইন ফ্লু মহামারী বিশ্ববাসীর মনে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। এই বছর খানেক পূর্বেও বার্ড ফ্লু নামক আরেকটি মহামারী পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তুলেছিল, যা এইচ৫এন১ ভাইরাসের আক্রমণে হতো। এই পরযন্ত ১৫ প্রজাতির ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ফ্লু ভাইরাস সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমান সোয়াইন ফ্লু রোগের ভাইরাসের নাম দেওয়া হয়েছে এইচ১এন১ {novel influenza A (H1N1)}।

সরকারী চিকিৎসা পদ্ধতিতে অর্থাৎ এলোপ্যাথিতে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসকে মনে করা হয় রোগের মূল কারণরূপে। ফলে এন্টিবায়োটিক বা এন্টিভাইরাল ঔষধ প্রয়োগে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসকে হত্যা করতে পারলেই মনে করা হয় রোগমুক্তি ঘটেছে। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এই ধরণের চিনত্মা সঠিক নয়। কেননা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাসের মৃত্যুর পরও রোগের অনেক জটিলতা থেকেই যাচ্ছে। অথচ হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা দুশ বছর পূর্ব থেকেই দাবী করে আসছেন যে, ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাস রোগের একটি কারণ হতে পারে; কিন্তু কখনই মূল কারণ নয়। রোগের মূল কারণ হলো বিশেষ বিশেষ রোগ হওয়ার প্রতি ব্যক্তি বিশেষের (জন্মগত বা অর্জিত) শারীরিক প্রবণতা বা টেনডেন্সী (susceptibility)।

একথা সবাই জানে যে, গাছের মরা ডালেই ব্যাঙের ছাতা (ছত্রাক) জন্মে; সুস্থ ডালে নয়। কেউ কেউ যক্ষ্মা রোগীর সংস্পর্শে এক মিনিট থেকেই যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয় পড়ে অথচ কেউ কেউ যক্ষ্মা হাসপাতালে দশ বছর চাকরি করেও যক্ষ্মায় আক্রানত্ম হয় না। ইহার কারণ কি ?
এলোপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ভুল পথে চলছে বলেই জীবদেহের রোগ প্রতিরোধ শক্তি বা ইমিউন সিস্টেমকে (immune system) শক্তিশালী করার পরিবর্তে ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাস মারার পেছনে লেগে আছে। এই অপচিকিৎসার ফলশ্রুতিতে দিন দিন মানুষের আত্মরক্ষার ক্ষমতা কেবলই হ্রাস পাচ্ছে অন্যদিকে ভাইরাসগুলো দিন দিনই অধিক

থেকে অধিকতর শক্তিশালী হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে মানবজাতিই একদিন পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং ভাইরাসগুলো সগৌরবে টিকে থাকবে। হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনের মূল টার্গেট যেহেতু জীবদেহের ইমিউনিটিকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ এবং নিরাময় করা ; সেহেতু সকল রোগের চিকিৎসায় অবলম্বন করাই হতে পারে সর্বোত্তম পন্থা।

একটি ঐতিহাসিক সত্য এই যে, আমেরিকা এবং ইউরোপে হোমিওপ্যাথির জনপ্রিয়তা অর্জনের একটি বড় কারণ ছিল উনবিংশ শতাব্দিতে এসব অঞ্চলে সংঘটিত সংক্রামক মহামারী রোগসমূহের চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথির অবিস্মরণীয় সাফল্য। ডা. টমাস এল ব্রাডফোর্ডের সংখ্যার যুক্তি (The Logic of Figures) নামক বইটি প্রকাশিত হয় ১৯০০ সালে যাতে তিনি এলোপ্যাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালে রোগীদের মৃত্যু হারের বিস্তারিত তুলনামূলক উপাত্ত উপস্থাপন করেন। এতে দেখা যায় হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালের তুলনায় এলোপ্যাথিক হাসপাতালে মৃত্যুর হার ছিল দ্বিগুণ থেকে আট গুণ বেশী। ১৮৪৯ সালে সিনসিনাটির হোমিওপ্যাথিক ডাক্তাররা দাবী করেন যে, তাদের চিকিৎসাধীন এক হাজার কলেরা রোগীর মধ্যে মাত্র ৩% মৃত্যুবরণ করেছেন। তারা তাদের দাবীর সত্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে বেঁচে যাওয়া এবং মৃত্যুবরণ করা সমস্ত রোগীর নাম এবং ঠিকানা তারা পত্রিকায় ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ কলেরা রোগে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা নেওয়া রোগীদের মৃত্যু হার ছিল ৪০% থেকে ৭০% ভাগের মধ্যে। ইয়েলো ফিভারের চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথির সাফল্য এতটাই চমকপ্রদ ছিল যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের এক রিপোর্টে বিশেষজ্ঞরা বেশ কয়েকটি হোমিও ঔষধের নাম উল্লেখপূর্বক তাদের প্রশংসা করেন; যদিও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশই ছিলেন এলোপ্যাথিক ডাক্তার যারা হোমিওপ্যাথিকে পছন্দ করতেন না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, পশু-পাখির ফার্মগুলোতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা অবলম্বন করা হলে তা এমনকি সর্বশেষ আবিষকৃত এন্টিভাইরাল ঔষধের চাইতেও উৎকৃষ্ট ফল দিবে। কেননা এন্টিবায়োটিক এবং অন্যান্য কেমিক্যাল ঔষধের পাইকারী ব্যবহারের কারণে খামারের পশু-পাখিদের স্বাস্থ্যের অবস্থা এতটাই খারাপ যাচ্ছে যে, (হাস-মুরগী-শুকর) এসব পশু-পাখিরাই বর্তমানে মারাত্মক মারাত্মক ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাস উৎপাদনের আখড়ায় পরিণত হয়েছে।

বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু মহামারী আকারে দেখা দিলে সেটি প্রধানত দেখা দিবে প্রাচ্যের (এশিয়া-আফ্রিকার) দেশসমূহে। কেননা পাইকারী হারে টিকা নেওয়ার কারণে এবং কেমিক্যাল ড্রাগ অতিমাত্রায় সেবনের কারণে পাশ্চাত্যের লোকদের ভেতরগত স্বাস্থ্যের অবস্থা এতই নিম্নমানের যে, ওটাই তাদেরকে একিউট ডিজিজ (যেমন-জ্বর, কাশি, নিউমোনিয়া ইত্যাদি) থেকে রক্ষা করে থাকে আর ক্রনিক ডিজিজের (যেমন- ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, হাঁপানী ইত্যাদির) সহজ শিকারে পরিণত করে। বিষয়টি অদ্ভূত মনে হতে পারে কিন্তু বাস্তবে তাই দেখা যায়। সোয়াইন ফ্লু মহামারী ছড়ানোর ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের লোকেরা বরং বাফার হিসেবে কাজ করবে। আরেকটি কথা হলো, সোয়াইন ফ্লু'র টিকা (vaccine) নেওয়া থেকে সবারই বিরত থাকা উচিত। কেননা প্রথমত কোন টিকাই আপনাকে রোগমুক্ত রাখার শতভাগ গ্যারান্টি দিতে পারে না। টিকা নিলে বরং বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু-তে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়েও যেতে পারে। কেননা এসব টিকাতে বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু-র জীবিত ভাইরাস থাকে। যদিও বলা হয় যে, ভাইরাসকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় 'দুর্বল' করে দেওয়া হয় যাতে সেগুলো রোগ সৃষ্টি করতে না পারে। কিন্তু কারো কারো শরীরে উপযুক্ত পরিবেশ পেলে এই 'দুর্বল' ভাইরাস যে সবল হয়ে যে-কারো বা অগণিত মানুষের সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে, ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আছে অসংখ্য। তবে গতবার বার্ড ফ্লু-র সময় শ্বেতাঙ্গ শয়তানরা যেভাবে হাস-মুরগী মারার কুবুদ্ধি আমাদেরকে দিয়েছিল, এবার কিন্তু তারা সোয়াইন বা শুকর মারার পরামর্শ কাউকে দিচ্ছে না। কেননা হাস-মুরগী আমাদের প্রধান খাদ্য ; পক্ষান্তরে শুকর হলো ওদের প্রধান খাদ্য। আমরা নির্বিচারে নির্বুদ্ধিতার সাথে হাস-

মুরগী নিধন করে অর্থনীতির বারোটা বাজিয়েছি এবং আমাদের স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করেছি। শ্বেতাঙ্গরা কিন্তু সোয়াইন ফ্লু-তে মারা পড়বে তবুও সোয়াইন মেরে নিজেদের রিজিকে কুড়াল মারবে না!

অনেক চিকিৎসা বিজ্ঞানীই মনে করেন যে, অতীতের অনেক মহামারীর উৎপত্তি এবং বিস্তারের পেছনে মুল ভূমিকা পালন করেছে টিকার মাধ্যমে ছড়ানো এসব ভাইরাস। তাছাড়া বিসিজি, ডিপিটি, হাম, পোলিও, এটিএস, মেনিনজাইটিস, হেপাটাইটিস প্রভৃতি টিকার যে-সব মারাত্মক ক্ষতিকর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া আজ পযর্ন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে আছে টিকা নেওয়ার সাথে সাথে তাৎক্ষণিক মৃত্যু, ক্যান্সার, ব্রেন ড্যামেজ, শারীরিক প্রতিবন্ধিত্ব, বুদ্ধি প্রতিবন্ধি বা অটিজম, ব্রেন টিউমার, গুলেন-বেরি সিনড্রোম, এলার্জি, হাঁপানি, ডায়াবেটিস প্রভৃতি। কাজেই বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু -র টিকা থেকেও এসব রোগ অবশ্যই হবে। কেননা সকল টিকার প্রস'ত প্রণালী এবং উপাদান তো একই (আর তা হলো প্রাণনাশী ভাইরাস)। তাছাড়া আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় খবর বেড়িয়েছে যে, সোয়াইন ফ্লু'র ভ্যাকসিন বিক্রি করে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের মুনাফা করার জন্যই নাকি বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু'র নামে চারদিকে ভীতি সৃষ্টি করা হচ্ছে।

আরেকটি কথা হলো, যে-কোন একটি নতুন রোগের সূচনা হলো এলোপ্যাথিতে প্রথমে সে রোগটিকে চিনতে হয়, তারপর সেই রোগটিকে একটি নতুন নাম দিতে হয় এবং সবশেষে তার ঔষধ আবিষ্কার করতে হয়। এতো কিছু করতে গিয়ে দেখা যায় ইতিমধ্যে হাজার হাজার কিংবা লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়ে গেছে। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোগ চেনার কোন প্রয়োজন নাই, রোগের নাম দেওয়ার কোন দরকার পড়ে না এবং নতুন রোগের জন্য কোন নতুন ঔষধও আবিষ্কার করতে হয় না। কেননা হোমিওপ্যাথি হলো লক্ষণ সমষ্টি (totality of symptoms) ভিত্তিক চিকিৎসা বিজ্ঞান। ফলে নতুন রোগের সমস্ত লক্ষণ একত্রে মিলিতভাবে তিন হাজার হোমিও ঔষধের মধ্যে কোনটির সাথে সবচেয়ে বেশী মিলে যায়, সেটি বুঝে প্রয়োগ করলেই সেই নতুন রোগ সেরে যাবে। তা সে রোগের নাম যাই হোক না কেন এবং ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাসের নামই বা যাই হোক না কেন! এলোপ্যাথিতে যেহেতু ভাইরাসবিরোধী ঔষধ তেমন একটা নাই, সে কারণে ভাইরাস ঘটিত কোন রোগের সূচনা হলে তারা ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে এবং সবাইকে ভয় দেখাতে থাকে। কিন্তু যাদের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর আস্থা আছে, তাদের ভয় পাওয়ার কিছু নাই।

বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু হইল একটি সিজনাল ভাইরাস জ্বর (ফ্লু / ইনফ্লুয়েঞ্জা) যা বিভিন্ন প্রজাতির ভাইরাস সংক্রমণের কারণে হয়ে থাকে। ভাইরাসটি খামারের পাখি এবং শুয়রদের শরীরে বসবাস করে এবং সেখান থেকে মানুষকে আক্রমণ করার কারণেই ইহার নাম রাখা হয়েছে বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু। বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু'র উল্লেখযোগ্য লক্ষণগুলি হলো গলা ব্যথা, কাশি, ভীষণ তাপসহ জ্বর, পেশীতে ব্যথা এবং চোখে সংক্রমণ। সোয়াইন ফ্লু নয় বরং সোয়াইন ফ্লু-র সাথে প্রায়ই নিউমোনিয়া বা ফুসফুসে প্রদাহ দেখা দেওয়ার কারণে শ্বাসকষ্টের ফলে অনেক রোগীর মৃত্যু ঘটে। কেউ বার্ড ফ্লু বা উচ্চ জ্বরে আক্রান্ত হলে সমস্ত লক্ষণ বিচার করে ঔষধ নির্বাচন করে প্রয়োগ করুন। ব্রিটিশ হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাঃ জে. এইচ. ক্লার্কের (M.D.) মতে, কেউ সোয়াইন ফ্লু-তে আক্রান্ত হলে ইনফ্লুয়েঞ্জিনাম (Influenzinum) অথবা একোনাইট (Aconitum napellus) (৩০ অথবা ২০০ শক্তিতে) এক অথবা দুই ঘণ্টা পরপর খেতে থাকুন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একজন দক্ষ হোমিও ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন। অন্যদিকে নিজের বাড়িতে অথবা মহল্লায় এই রোগ ছড়িয়ে পড়লে তা থেকে বাঁচার জন্য আর্সেনিক এলবাম (Arsenicum album) নামক ঔষধটি রোজ তিনবার করে খেতে থাকুন। এই মুহূর্তে তাই একোনাইট এবং আর্সেনিক নামক হোমিও ঔষধ দুইটি প্রত্যেকেরই কিনে ঘরে সংরক্ষণ করে রাখা উচিত। তাছাড়া হোমিওপ্যাথিক

কন্সটিটিউশনাল মেডিসিন (Constitutional medicine) অর্থাৎ শারীরিক-মানসিক-পারিবারিক-ব্যক্তিগত-জলবায়ুজনিত রোগ লক্ষণের উপর ভিত্তি করে প্রদত্ত হোমিও ঔষধ সেবন করলেও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (Immune system) শক্তিশালী হয় এবং অনেক রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায়। (এই তিনটি ঔষধ বেশী পরিমাণে কিনে প্রতিটি বাড়িতে সংরক্ষণ করা উচিত। কেননা বিশেষজ্ঞদের মতে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ একেবারে নাকের ডগায় !! আর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা-ইজরাইল মানুষ মারার জন্য বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু প্রভৃতি মারাত্মক মারাত্মক জীবাণু বাতাসে ছেড়ে দিবে। তখন এই ঔষধগুলো হাতের কাছে থাকলে কাজে দিবে।)

**Brain-fag (মানসিক ক্লান্তি যাতে বুদ্ধির তীক্ষ্মতা হ্রাস পায়) :** দীর্ঘদিন মস্তিষ্ক বা ব্রেনের কাজ করার কারণে যদি ব্রেন বিকল হয়ে পড়লে Picricum acidum অথবা Aethusa cynapium খেতে হবে। ( যেমন একজন ছাত্র বেশী পড়তে পড়তে অথবা একজন কবি দীর্ঘদিন যাবত কবিতা লিখতে লিখতে এমন অবস্থা হলো যে, এখন আর তার মাথা কাজ করছে না।)

**Increasing breast milk, Retarded, scanty or arrested flow of milk (বুকের দুধ / স্তন দুগ্ধ বৃদ্ধি করা) :** যে-সব নারী শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ান, তাদের বুকে যথেষ্ট দুধ উৎপন্ন না হলে অনেক সময় শিশুদের জীবন নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে যায়। এজন্য ঔষধের পাশাপাশি দুধ, কলা, মিষ্টি, গুড়া মাছ প্রভৃতি খাবারও যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া উচিত। ঔষধ নিম্নশক্তিতে অর্থাৎ মাদার টিংচার (Q) শক্তিতে ২০ ফোটা করে আধা গ্লাস পানিতে মিশিয়ে রোজ দুইবার করে কমপক্ষে তিনদিন খাওয়া উচিত। (সতর্কতা ঔষধ সবচেয়ে নিম্নশক্তিতে অর্থাৎ মাদার টিংচার (Q) শক্তিতে খাবেন। অন্যকোন উচ্চতর শক্তিতে খাবেন না। অন্যথায় দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি না পেয়ে বরং আরো কমে যাবে।)

Urtica urens : আর্টিকা ইউরেন্স ঔষধটি বুকের দুধ বৃদ্ধির জন্য একটি অসাধারণ ঔষধ।

Ricinus communis : স্তনে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধিতে রিসিনাস ঔষধটি শ্রেষ্টত্বের দাবীদার। এটি এমনকি কুমারী এবং বিধবাদের স্তনেও দুধ আনতে পারে।

Pulsatilla pratensis : পালসেটিলা ঔষধটিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুকের দুধ বৃদ্ধি করতে পারে। ঠান্ডা মেজাজী এবং কথায় কথায় চোখ দিয়ে পানি ঝরে এমন মেয়েদের ওপর এটি বেশী কাজ করে।

☆ পক্ষান্তরে স্তনদুগ্ধ হ্রাস করতে বা শুকিয়ে ফেলতে Chionanthus virginica, Fragaria vesca, Lac Caninum ঔষধগুলোর যে-কোন একটি (৩০ বা ২০০ শক্তিতে) রোজ তিনবেলা করে কিছুদিন খান।

**Breast size, increasing (স্তনের আকৃতি বড় করা) ঃ -** শারীরিক আকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সুগঠিত দুটি স্তন কেবল দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জীবন রক্ষার জন্যই প্রয়োজনীয় নয়, বরং এগুলো নারীদের

স্বাভাবিক সৌন্দর্যের জন্যও একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। বয়স হওয়ার পরেও যেসব মেয়েদের স্তন ক্ষুদ্রাকৃতিই রয়ে গেছে, এজন্য তারা ভীষণ দুঃশ্চিন্তায় ভোগেন। পশ্চিমা দেশের পয়সাওয়ালা ফ্যামিলির মেয়েরা অপারেশন করে স্তনের ভেতরে সিলিকনের বস্তা ভরে স্তনের আকৃতি বড় করে থাকে। এতোদিন সার্জনরা এই অপারেশনে কোন ক্ষতি হয় না বলে প্রচার করলেও সমপ্রতি আমেরিকার খাদ্য ও ঔষধ কর্তৃপক্ষ (FDA) এই বলে সতর্ক করে দিয়েছে যে, এই অপারেশনের ফলে autoimmune reactions অথবা connective tissue disorders সমস্যা দেখা দিতে পারে, যার ফলে weakness, immune system damage, poor memory, fatigue, chronic flu-like illness ইত্যাদি রোগ হতে পারে।

Sabal serrulata : মেয়েদের স্তন বড় করতে সবচেয়ে ভালো ঔষধ হলো সেবাল সেরুলেটা। এটি নিম্নশক্তিতে (শক্তি Q) বিশ ফোটা করে প্রতিদিন দুইবেলা করে কয়েক মাস খান।

Lycopodium : লাইকোপোডিয়াম ঔষধটি স্তনের আকার বৃদ্ধি করতে যথেষ্ট শক্তিশালী। এটি উচ্চশক্তিতে (শক্তি ১০,০০০) পনের দিনে একমাত্রা করে কয়েক মাত্রা খান। প্রয়োজনে আরো উচ্চশক্তিতে খেতে পারেন। সেবাল সেরুলেটার ফাঁকে ফাঁকেও খেতে পারেন।

Iodium : মধ্যবয়স্ক নারীদের স্তন শুকিয়ে চুপসে গেলে আয়োডিয়াম (শক্তি ১০,০০০) ঔষধটি মাসে একমাত্রা করে কয়েক মাস খান।

**Breast tumour (স্তনের টিউমার) :** পত্রিকার রিপোর্ট মতে, বর্তমানে ১০০ জন মহিলার মধ্যে ২০ থেকে ২২ জনই স্তন টিউমার-ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে থাকেন এবং তাদের সিংহভাগই শহরবাসী কর্মজীবী নারী। যদিও ক্যান্সার বিশেষ(+অ)জ্ঞদের মতে, শহরবাসী নারীদের জীবনে শারীরিক পরিশ্রমের পরিমাণ কম হওয়ার কারণে তারা এই রোগে আক্রান্ত হন বেশী। কিন্তু আসলে এটি একটি মিথ্যে কথা। বরং প্রকৃত কারণ হলো কর্মজীবী মহিলারা (পেশাগত ঝামেলার হাত থেকে বাঁচার জন্য পরিবার ছোট রাখতে গিয়ে) জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি এবং ইনজেকশান বেশী ব্যবহার করেন এবং (সময়ের অভাবে অথবা সৌন্দর্য নষ্ট হওয়ার ভয়ে তাদের) শিশুদেরকে যথাযথভাবে বুকের দুধ খেতে দেন না। তাছাড়া কর্মজীবী মহিলারা বড় বড় ঔষধ কোম্পানীগুলোর মতলবী প্রচারণায় বিশ্বাস করে অতিমাত্রায় স্বাস্থ্য সচেতনতা দেখাতে গিয়ে বেশী বেশী টিকা (vaccine) নিয়ে থাকেন, যা টিউমার-ক্যানসারের একটি সবচেয়ে বড় কারণ। শুধু তাই নয়, শহরবাসী কর্মজীবী নারীরা তাদের শিশুদেরকেও বেশী বেশী টিকা দিয়ে থাকেন এবং শিশুদের পায়খানা, প্রস্রাব, থুতু, নাকের শ্লেষ্মা ইত্যাদি স্পর্শ করার মাধ্যমেও সে-সব টিকার বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে থাকেন। ক্যান্সার বিশেষ(+অ)জ্ঞরা আরো বলেন যে, ২০ বছর বয়সের আগে বিয়ে হলে অথবা ৩০ বছরের পর প্রথম সন্তানের জন্ম হলে স্তন টিউমার-ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। কিন্তু এগুলো একেবারেই ফালতু কথা ; বিয়ের সাথে স্তন টিউমার-ক্যান্সারের কোন সম্পর্কই নাই। তবে ইহা ঠিক যে, বিড়ি-সিগারেট, তামাক, জর্দা এবং অন্যান্য মাদকসেবী নারীদের স্তন টিউমার-ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশী। ব্রেস্ট টিউমারের একটি বড় কারণ হলো মানসিক অশান্তি। যেহেতু শহরবাসী পুরুষদের একটি বিরাট অংশ চরিত্রহীন লম্পট। সেহেতু তাদের স্ত্রীরা সারাক্ষণই তাদের দাম্পত্য জীবনের সম্ভাব্য খারাপ পরিণতি নিয়ে মানসিক অশান্তিতে ভোগেন। সে যাক, হোমিওপ্যাথিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাত্র দশ পয়সার ঔষধে স্তন টিউমার নির্মূল করা যায়। বিশ্বাস না হলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

Conium maculatum : স্তন টিউমারের এক নাম্বার ঔষধ হলো কোনায়াম। এক লক্ষ (CM) শক্তিতে এক ড্রাম বড়ি কিনে আনুন এবং তা থেকে মাত্র দুটি বড়ি খান। তারপর দুই মাস অপেক্ষা করুন। তখন যদি দেখেন যে, আপনার স্তনে আর কোন টিউমার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তবে হিসাব করে দেখলে দেখতে পাবেন আপনার চিকিৎসায় খরচ হয়েছে সাকুল্যে দশ পয়সা !!! অবশ্য আমার চেম্বারে এসে প্রেসক্রিপশান নিলে তার সাথে আরো ৫০০ টাকা যোগ করতে হবে ! সে যাক, যদি দুই মাস পর দেখেন যে আপনার টিউমার পরোপুরি নির্মূল হয় নাই রবং তার সাইজ অনেক ছোট হয়ে গেছে। তাহলে আরেক মাত্রা খেতে পারেন।

Thuja occidentalis : সাধারণত যাদের অতীতে নানা রকমের টিকা নেওয়ার ইতিহাস আছে, তাদের ক্ষেত্রে থুজা ঔষধটি খেতেই হবে। আপনি ২০০ শক্তিতে সপ্তাহে এক মাত্রা করে কয়েক মাস খান অথবা এক লক্ষ শক্তিতে (CM) দুই মাস পরপর এক মাত্রা করে খেতে পারেন।

Phytolacca decandra : ফাইটোলেক্কা ঔষধটি স্তন টিউমারের আরেকটি সেরা ঔষধ। এটি নিম্নশক্তিতে (Q) ২০ ফোটা করে রোজ দুই বেলা হিসাবে খান দুই মাস ছয় মাস যত দিন লাগে।

**Burns (আগুনে পোড়া) :** আগুন, গরম বাষ্প, গরম গ্যাস, গরম পানি প্রভৃতি যেভাবেই পুড়-ক না কেন, তার পরিমাণ যদি খুব বেশী হয় তবে অবশ্যই দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।

Cantharis vesicator : অল্প, মাঝারী অথবা বেশী, যে পরিমাণেই পুড়-ক না কেন, পোড়ার ব্যথা এবং জ্বালাপোড়া কমাতে ক্যান্থারিস ঔষধটির কোন তুলনা হয় না। **এটি পোড়ার ব্যথা এবং জ্বালাপোড়া এত দ্রুত দূর করে যে, পৃথিবীর কোন ঔষধই ইহার সমতুল্য হইতে পারে না।** এটি একই সাথে খেতে হবে এবং পানি অথবা ভ্যাসলিনের সাথে মিশিয়ে বাইরে লাগাতে হবে। দীর্ঘ সময় প্রখর রৌদ্রে থাকার কারণে যে-সব সমস্যা (sunstroke) হয়, তাতেও ক্যান্থারিস প্রয়োগ করতে পারেন।

Picricum Acidum : পিক্রিক এসিড পোড়ার একটি শ্রেষ্ট ঔষধ। এক ড্রাম পিক্রিক এসিডকে এক লিটার পানির সাথে মিশিয়ে দ্রবণ তৈরী করতে হবে। এই সলিউশনে তুলা ভিজিয়ে সমগ্র পোড়া অংশ পরিস্কার করতে হবে। ফোস্কা গেলে দিতে হবে তবে চামড়া সরানো যাবে না। পরিষ্কার গজ অথবা তুলা ভিজিয়ে পোড়া স্থানে লাগিয়ে দিয়ে তাকে ব্যান্ডেজ দিয়ে ভালো মতো বেঁধে দিতে হবে। এভাবে তিন্চার দিন পর পর ব্যান্ডেজ খুলে পাল্টে দিতে হবে। পাশাপাশি পিক্রিক এসিড রোজ তিনবেলা করে খাওয়া উচিত। এটি একই সাথে জ্বালা-পোড়া নিবারক, ব্যথানাশক, এন্টিসেপটিক এবং এন্টিবায়োটিকের কাজ করে থাকে।

Urtica urens : এটিও পোড়ার এবং এমনকি রোদে পোড়ার ক্ষেত্রে একটি ভালো ঔষধ। ৬ বা ৩০ শক্তিতে খেলে এবং পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত স্থানে লাগালে জ্বালা এবং ব্যথা দূর করে দেয় এবং তাড়াতাড়ি ঘা শুকাতে সাহায্য করে।

Arsenicum album : শরীরের অনেক গভীর পর্যন্ত যদি পুড়ে যায়, তবে আর্সেনিক খাওয়াতে হবে। পোড়া জায়গাটি ধীরে ধীরে কালো হয়ে যায়, যাতে গ্যাংগ্রিন হয়ে গেছে বুঝা যায়। আক্রান্ত স্থান ফুলে যায় এবং তাতে ছুড়ি মারার মতো ব্যথা হয়। রোগী ভীষণ অস্থির হয়ে পড়ে, এক পজিশনে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। সে মনে করে ঔষধ খেয়ে কোন লাভ নেই, তার মৃত্যু হবে এখনই।

Causticum : পোড়ার পরবর্তী যে-কোন জটিলতা নিরাময়ের জন্য কষ্টিকাম ব্যবহার করতে পারেন। অনেকে বলেন যে, "সেই পোড়ার ঘটনার পর থেকেই আমার এই সমস্যাটি দেখা দিয়েছে"- এসব সমস্যার চিকিৎসার ক্ষেত্রে কষ্টিকাম প্রয়োগ করুন।

## Bypass the Bypass surgery (হার্টের বাইপাস অপারেশান বাদ দিন) :-

সাধারণত হৃদপিন্ডের এক বা একাধিক রক্তনালী (coronary artery) চর্বি জমে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলে শৈল্য চিকিৎসকরা / সার্জনরা শরীরের অন্যকোন স্থান থেকে একটি রক্তনালী কেটে এনে সেখানে ফিট করে দেন রক্ত চলাচলে বিকল্প / বাইপাস রাস্তা হিসাবে। একে হার্টের বাইপাস অপারেশান বলা হয়। সারা বিশ্বে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ বাইপাস অপারেশান করা হয়ে থাকে। কারণ এলোপ্যাথিক হার্ট স্পেশালিষ্টরা মানুষকে এই ভুল ধারণা দিয়ে থাকেন যে, বাইপাস অপারেশান ছাড়া এই রোগের আর কোন চিকিৎসা নেই। কিন্তু আপনি যদি একজন হোমিও এক্সপার্টের কাছে যান, তিনি বিনা অপারেশানে কেবল ঔষধের মাধ্যমেই আপনার হার্টের ব্লক সারিয়ে দিতে পারেন। ইন্টারনেটে দেখলাম, ডাঃ সুকুমারন নামক ভারতের মুম্বাইয়ের একজন হোমিও স্পেশালিষ্ট হোমিও ঔষধের সাহায্যে প্রায় ২০০০ হৃদরোগীকে আরোগ্য করেছেন, যাদের সবাইকে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা বাইপাস অপারেশান করতে পরামর্শ দিয়েছিল।

ডাঃ সুকুমারন বাইপাসের রোগীদেরকে ক্রেটিগাস (Crategus oxyacantha Q) এবং অর্জুনা (Arjuna Q) নামক দুটি হোমিও ঔষধ ৫ ফোটা করে একত্রে পানিতে মিশিয়ে রোজ ৪ বার করে খাওয়ার পরামর্শ দিতেন। কেবল ডাঃ সুকুমারন একা নন, আপনি যদি যে-কোন হোমিও স্পেশালিষ্টের কাছে খোঁজ করেন, তবে দেখবেন প্রত্যেকের ভান্ডারেই এরকম সিরিয়াস হৃদরোগী সারানোর ইতিহাস জমা আছে অনেক। শুধু হার্টের বাইপাস অপারেশান নয়, এলোপ্যাথিক হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা যদি কাউকে যদি হার্টে রিং (ring) লাগাতে অথবা পেসমেকার (pacemaker) লাগাতে বলে, তবে তিনিও এই দুটি ঔষধ একই নিয়মে খেয়ে এসব অপারেশানের ক্ষতি থেকে মুক্তি পেতে পারেন। এমনকি হৃদপিন্ডের ব্যথায় / বুকের ব্যথায়ও (angina pectoris) এই ঔষধ দুটি খেয়ে সহজ রোগমুক্তি লাভ করতে পারেন। এমনকি উচ্চ রক্তচাপেও (hypertension) এই দুইটি ঔষধ খুবই কার্যকর প্রমাণিত হয়ে থাকে।

## Calculi, Gravel, stone (পাথর) :-

কিডনীর পাথর (Renal calculi) এবং পিত্তথলির পাথর (cholelithiasis, biliary calculus) দুটোই বিনা অপারেশনে কেবল হোমিও ঔষধের সাহায্যেই ভ্যানিশ করা যায়। এজন্য হোমিওপ্যাথিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের অধীনে চিকিৎসা নেওয়া উচিত। ইহার চিকিৎসা প্রণালী বেশ জটিল বিধায় এই চটি বইয়ে তাহা আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে

সংক্ষেপে কয়েকটি ঔষধের ব্যবহার উল্লেখ করা হলো। সাধারণত একটি ঔষধের ওপর ভরসা না করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কয়েকটি ঔষধ খাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ঔষধের বিস্তারিত লক্ষণ জানতে বোরিকের মেটেরিয়া মেডিকা পড়ে নিতে পারেন -

Urtica urens : এটি কিডনীর পাথরের একটি শ্রেষ্ট ঔষধ। নিয়মিত খেলে পাথর ছোট হতে থাকে এবং প্রস্রাবের সাথে অটোমেটিকভাবে বেরিয়ে যায়। বিশেষত যাদের বাতের বা জয়েন্টে ব্যথার সমস্যা আছে, তাদের ক্ষেত্রে এটি বেশী কাজ করে।

Thlaspi bursa pastoris : এটি কিডনীর পাথরের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। নিয়মিত খেলে পাথর ছোট হতে থাকে এবং প্রস্রাবের সাথে অটোমেটিকভাবে বেরিয়ে যায়।

Chimaphila umbellata : এই ঔষধটি কিডনী বা মূত্রথলির পাথরের চিকিৎসায় ব্যবহার করতে পারেন। মূত্র পাথরজনিত ব্যথার চিকিৎসাতেও এটি ব্যবহার করতে পারেন।

Sarsaparilla, Lycopodium এবং Benzoic acid ঔষধ তিনটি মূত্র পাথরিতে ব্যবহার করতে পারেন যদি প্রস্রাব করার পূর্বে রোগী (ব্যথা-জ্বালাপোড়ার কারণে) চীৎকার করে থাকে।

Sarsaparilla : প্রস্রাব বের হওয়া শেষ হলে ভীষণ ব্যথা শুরু হয়, বসে প্রস্রাব করলে ফোটা ফোটা করে বেরোয় কিন্তু দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে ভালোভাবে প্রস্রাব বের হয় ইত্যাদি লক্ষণে সার্সাপেরিলা খেতে পারেন।

Silicea : সাইলিশিয়া ঔষধটি কিডনী বা মূত্রথলির পাথরে ব্যবহার করতে পারেন বিশেষত যাদের বাতের সমস্যা আছে।

Solidago virgaurea : ফসফেট বা ক্যালসিয়াম ফসফেট জাতীয় মূত্র পাথরে ইহা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

Lycopodium : প্রস্রাবের সাথে যদি **ইটের গুড়ার মতো পদার্থ যায়,** তবে লাইকোপোডিয়াম খেতে হবে। এই ঔষধের অন্যান্য লক্ষণ হলো পেটে প্রচুর গ্যাস হওয়া, **বিকেল ৪টা থেকে ৮টার সময় রোগের কষ্ট বেড়ে যাওয়া** ইত্যাদি।

Ocimum canum : কিডনীর পাথর দূর করতে এবং প্রচণ্ড পেটব্যথা, বমির জন্য অসিমাম ক্যানাম একটি সেরা ঔষধ। **কিডনীতে পাথরজনিত পেট ব্যথার চোটে রোগী একেবারে বাঁকা হয়ে যায় এবং সাংঘাতিকভাবে বমি করতে থাকে।**

Berberis vulgaris : পিত্তথলির পাথর এবং পাথরের কারণে হওয়া ব্যথা নিরাময়ে বার্বেরিস একটি এক নম্বর ঔষধ। এই ঔষধের লক্ষণ হলো ব্যথা পিত্তথলি থেকে নাভীর দিকে অথবা বাম কাধের দিকে যেতে থাকে, তলপেটে জ্বালাপোড়া করা, পেটের ভেতরে বুদ্বুদ উঠতেছে এমন মনে হওয়া ইত্যাদি।

Ipecac : পিত্ত পাথর বা গল ব্লাডারের পাথরের ব্যথা দূর করতে ইপিকাক একটি শ্রেষ্ট ঔষধ (যদি বমিবমি ভাব থাকে)।

## Cancer and their real cure (ক্যানসারের প্রকৃত চিকিৎসা) :-

মনীষীদের মতে, অজ্ঞতা হলো মানবজাতির সবচেয়ে বড় সমস্যা। অজ্ঞতা বা না জানার কারণে আমরা জীবনে অল্প-বেশী বিভিন্নভাবে বঞ্চিত হতে পারি বা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারি । কিন্তু অসুখ-বিসুখ এবং তাদের চিকিৎসার ব্যাপারটি এতই মারাত্মক যে, এই ব্যাপারে সামান্য অজ্ঞতার কারণে আপনি সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যেতে পারেন কিংবা অকাল মৃত্যুর শিকার হতে পারেন ।সম্প্রতি জাতীয় দৈনিকগুলোর এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমাদের দেশে প্রতি বছর দুই লক্ষ মানুষ নতুন করে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে থাকেন ; যাদের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার রোগী দেশে-বিদেশে বিভিন্ন ধরণের চিকিৎসা নিয়ে থাকেন আর বাকী দেড় লক্ষ রোগী কোন চিকিৎসা সুবিধা পায় না । কবিরাজি, এলোপ্যাথি এবং হোমিওপ্যাথি এই তিনটি বিষয়ে যার গভীর পড়াশোনা আছে তিনি নির্দ্বিধায় স্বীকার করবেন যে, কবিরাজি হলো প্রাইমারী মেডিক্যাল সাইন্স, এলোপ্যাথি হলো স্ট্যান্ডার্ড মেডিকেল সাইন্স এবং হোমিওপ্যাথি হলো এডভান্সড মেডিক্যাল সাইন্স । আর এই কারণে অন্যান্য জটিল রোগের মতো টিউমার এবং ক্যান্সারের চিকিৎসাতেও হোমিও ঔষধ শ্রেষ্টত্বের দাবীদার । হোমিও ডাক্তাররা দুইশ বছর পূর্ব থেকেই ঔষধের সাহায্যে টিউমার/ ক্যান্সার নিরাময় করে আসছেন । অথচ এলোপ্যাথিতে ক্যান্সারের ঔষধ চালু হয়েছে মাত্র পঞ্চাশ বছর যাবত । তার পূর্বে এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা টিউমার/ ক্যান্সারের রোগীদের কোন ঔষধ দিতে পারতেন না। টিউমার/ ক্যান্সারের অবস্থান সুবিধা মতো হলে তারা অপারেশন করে সারানোর চেষ্টা করতেন আর তা না হলে ভালো-মন্দ খেয়ে নেওয়ার উপদেশ দিয়ে রোগীদের বিদায় দিতেন।

ইদানীং এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা ক্যান্সার সারানোর জন্য মারাত্মক মারাত্মক অনেকগুলো কেমিক্যাল ঔষধ এক নাগাড়ে কয়েক মাস যাবত রোগীদের শরীরে ইনজেকশন দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে থাকেন। একে তারা নাম দিয়েছেন কেমোথেরাপি (chemotherapy) । ক্যামোথেরাপির ক্ষতিকর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া এতই বেশী যে, এতে প্রায় সকল রোগীই অকালে করুণ মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়। তবে কেমোথেরাপির সবচেয়ে ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলো ব্রেন ড্যামেজ (brain damage) হয়ে যাওয়া অর্থাৎ স্মরণশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। কোন কিছু মনে থাকে না, কোন কথার পরে কোন কথা বলতে হবে তা মাথায় আসে না, একসাথে একটার বেশী কাজ করতে পারে না, ছোটখাটো ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নিতে অনেক সময় লেগে যায়, অল্প সময়ের জন্য সবকিছু ভুলে যায়, কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না, নতুন কিছু শিখতে পারে না ইত্যাদি ইত্যাদি। ডাক্তাররা এই সমস্যার নাম দিয়েছে 'কেমোব্রেন' (chemobrain)।

তাছাড়া কেমোথেরাপির আরো যে-সব মারাত্মক সাইড-ইফেক্ট আছে তা হলো মুখে ঘা হওয়া (stomatitis), পেটে আলসার হওয়া (gastric ulcer), মারাত্মক রক্তশূণ্যতা (anaemia), অপুষ্টি (malnutrition), ওজন কমে যাওয়া (weight loss), চুল পরে যাওয়া (hairlessness), লিভার-কিডনী-হার্টের সর্বনাশ হওয়া (Liver damage), শ্রবণশক্তি নষ্ট হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। কেমোথেরাপির ধাক্কায় রোগী এতই দুর্বল হয়ে পড়ে যে, সে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে অনেক দিনের জন্য। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো কেমোথেরাপি দিতে যেহেতু লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হয়, সেহেতু এই চিকিৎসায় উপকার হোক বা না হোক চিকিৎসা শেষে অনেকেই পথের ভিখিরিতে পরিণত হয়ে যান। আবার টাকার অভাবে অনেকে এই চিকিৎসাই নিতে পারেন না। অথচ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অন্তত একশগুণ কম

খরচে টিউমার/ ক্যান্সার সারানো যায় এবং তাতে রোগীর স্বাস্থের কোন ক্ষতি তো হয়ই না বরং আরো উন্নতি হয়। একজন হিন্দু যুবকের কথা আমার মনে আছে যার লিম্ফ্যাটিক গ্লান্ডে ক্যান্সার (non-hodgkin's lymphoma) হয়েছিল। আমি বলেছিলাম এই ভয়ঙ্কর ক্যান্সার যদি ইতিমধ্যে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে থাকে (metastasis), তবে হয়ত হোমিও চিকিৎসায় তাকে পুরোপুরি সারানো নাও যেতে পারে। কিন্তু তারপরও হোমিও ঔষধের মাধ্যমে ক্যান্সারের অগ্রগতিকে কমিয়ে দিয়ে রোগীকে অনন্যত পাঁচ-দশ বছর বাঁচিয়ে রাখা যাবে। কিন্তু সে হোমিওপ্যাথির ওপর ভরসা না করে রাতারাতি সুস্থ হওয়ার আশায় জায়গা-জমি বিক্রি করে ভারতে গিয়ে কেমোথেরাপি দিয়ে আসে। ভারতের এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা তাকে রোগমুক্ত সম্পূর্ণ সুস্থ (?) বলে ঘোষণা করেন। দেশে এসে সে আবার তার চাকুরিতে যোগদান করে। বাহ্যিকভাবে তাকে দেখতে বেশ সুস্থ-সবল-হৃষ্ট-পুষ্ট মনে হচ্ছিল কিন্তু দেড় বছরের মাথায় সে হঠাৎ করে মারা যায়। (আসলে কেমোথেরাপি এমনই ভয়ঙ্কর ঔষধ যে সেগুলো প্রয়োগের ফলে শরীরের কল-কব্জা সব ঢিলা হয়ে যায়।) আর অপারেশনের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, অপারেশনে টিউমার এবং ক্যান্সারের উন্নতি না হয়ে বরং আরো খারাপের দিকে চলে যায়।

একজন শিশু বিশেষজ্ঞের (pediatrician) কথা আমার মনে আছে যার গালে টিউমার হয়েছিল। ফলে অপারেশন করে টিউমার কেটে ফেলে দেওয়ার ছয়মাস পরে গালে ক্যান্সার ধরা পড়ে। এবার ক্যান্সারসহ গাল কেটে ফেলে দেওয়ার ছয়মাস পরেই চোয়ালের হাড়ে ক্যান্সার দেখা দেয় এবং আবার অপারেশন করে একপাশের সব দাঁতসহ চোয়াল কেটে ফেলে দেওয়া হয়। ফলে এক বছরের মধ্যে তিন তিনটি অপারেশনের ধাক্কায় তার স্বাস্থ্য এতোই ভেঙে পড়ে যে, টিউমার দেখা দেওয়ার দেড় বছরের মধ্যে তার মৃত্যু হয়। অথচ অপারেশন না করে ভদ্রলোক যদি বিনা চিকিৎসায়ও থাকতেন, তথাপি এর চাইতে অনেক বেশী দিন বাঁচতেন। অপারেশনের পরে হাসপাতালের বেডে যেই নারকীয় কষ্ট ভোগ করেছেন, তা না হয় বাদই দিলাম (তিন মাস তো কেবল স্যুপ আর জুস খেয়ে বেঁচেছিলেন, তাও গলা ছিদ্র করে ঢুকানো রাবারের পাইপ দিয়ে !)। হ্যাঁ, সার্জনরা অনেক সময় অজ্ঞতার কারণে অথবা টাকার লোভে অনাকাঙ্খিত অপারেশনের মাধ্যমে ক্যান্সার রোগীদের মৃত্যুকে তরান্বিত করে থাকেন । বহুল প্রচলিত এলোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে ক্যানসারের চিকিৎসা করা হয় কেমোথেরাপি, অপারেশন এবং রেডিয়েশন দিয়ে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে কেমোথেরাপি। অথচ নিরপেক্ষ চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, এসব পদ্ধতিতে ক্যানসারের রোগীদের কোন উপকার হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বরং এগুলো ক্যানসার রোগীদের শরীরকে এবং জন্মগত রোগ প্রতিরোধ শক্তিকে (immune system) দুর্বল করার মাধ্যমে ক্যানসারেরই উপকার করে এবং রোগীর ক্ষতি করে থাকে। এভাবে এসব অপচিকিৎসা ক্যানসার রোগীর মৃত্যুকে আরো কাছে টেনে আনে। ফ্রান্সের একজন ক্যানসার গবেষক বিজ্ঞানী প্রফেসর জর্জ ম্যাথি (Dr. George Mathé) বলেন যে, "যদি আমি ক্যানসারে আক্রান্ত হই, তবে আমি কখনও এসব (কেমোথেরাপি, রেডিয়েশন, অপারেশন ইত্যাদি) চিকিৎসা গ্রহন করব না। কেননা যে-সব ক্যানসার রোগী এসব (কু) চিকিৎসা থেকে অনেক অনেক দূরে থাকতে পারেন, একমাত্র তাদেরই বাঁচার আশা আছে"।

সে যাক, হোমিওপ্যাথিতে টিউমার এবং ক্যান্সারের চিকিৎসায় অনেকটা বিপ্লবের সূচনা করেন ব্রিটিশ হোমিও চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডাঃ জে. সি. বার্নেট (এম.ডি.)। ১৮৭০ থেকে ১৯০১ সাল পযর্ন্ত ঔষধে টিউমার এবং ক্যান্সার নির্মুলকারী হিসেবে সারা দুনিয়ায় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। হোমিওপ্যাথিতে প্রচলিত টিউমার/ ক্যানসারের ঔষধগুলোর বেশীর ভাগই বার্নেট আবিষ্কার করেন এবং ক্যানসারের এসব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ঔষধ তাঁর নিজের শরীরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কারণে অল্প বয়সেই তিনি হার্ট এটাকে মৃত্যুবরণ করেন। বার্নেট তাঁর দীর্ঘ গবেষণায় প্রমাণ

করেছিলেন যে, টিউমার এবং ক্যান্সারের একটি বড় কারণ হলো টিকার বা ভ্যাকসিনের (vaccine) পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন যে, থুজা (Thuja occidentalis) নামক হোমিও ঔষধটি টিকার প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট অধিকাংশ রোগ দূর করতে সক্ষম। তিনি সব সময় বলতেন যে, "ছোট হাতে টিউমার এবং ক্যান্সার নিরাময় করা সম্ভব নয় ; এজন্য বড় হাত লাগবে"। অর্থাৎ সাধারণ হোমিও ডাক্তারদের দ্বারা টিউমার এবং ক্যান্সারের চিকিৎসা সফল হয় না বরং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রচণ্ড দক্ষতা আছে এমন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার প্রয়োজন। টিউমার এবং ক্যান্সারের চিকিৎসায় তিনি একটি বিশেষ পদ্ধতি প্রবর্তন করেন যাকে মই বা লেডার পদ্ধতি (Ladder system) নামে অভিহিত করতেন। অর্থাৎ অনেক উপরে উঠতে যেমন আমাদের মইয়ের অনেকগুলো ধাপ ডিঙাতে হয়, তেমনি টিউমার এবং ক্যান্সারের মতো মারাত্মক জটিল রোগের চিকিৎসাতেও লক্ষণ অনুযায়ী একে একে অনেকগুলো ঔষধের সাহায্য নিতে হয়। এবার আসা যাক ক্যানসার নিয়ে গবেষণার বিষয়ে। দুইবার নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী লিনাস পওলিঙের (Linus Pauling, phd) মতে, "প্রত্যেকেরই জানা উচিত যে, অধিকাংশ ক্যান্সার গবেষণা চরম ধোঁকাবাজি ছাড়া কিছুই নয় এবং বেশীর ভাগ ক্যানসার গবেষণা প্রতিষ্টান তাদের (আর্থিকভাবে) সাহায্যকারীদের চাটুকারিতা নিয়ে ব্যস্ত"। বলা যায়, ক্যান্সারের নামে গবেষণা বর্তমানে সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা। গত পঞ্চাশ বছরে এসব গবেষণা প্রতিষ্টান বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠন, ঔষধ কোম্পানী এবং রাষ্ট্রের নিকট থেকে বিলিয়নকে বিলিয়ন ডলার সাহায্য পেয়েছে। কিন্তু প্রায় এক শতাব্দি পেরিয়ে গেলেও এসব গবেষণা প্রতিষ্টান ক্যানসারের প্রকৃত চিকিৎসা আবিষ্কারের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র অগ্রগতি দেখাতে পারে নাই। গত একশ বছর যাবতই মানুষকে শোনানো হচ্ছে যে, বিজ্ঞানীরা ক্যানসারের কার্যকর চিকিৎসা আবিষ্কারের একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছেন ! একেবারে নাকের ডগায় !! কিন্তু শেষ পযর্ন্ত এটি গাধাকে মুলা দেখানোর মতোই রয়ে গেছে। অথচ যতই দিন যাচ্ছে, ক্যানসারের আক্রমণ ক্রমাগতভাবে আশংকাজনক হারে ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, ১৯৪০ সালে অস্ট্রেলিয়ার যেখানে ১২% মানুষ ক্যান্সারের মৃত্যুবরণ করত, সেখানে ১৯৯২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২৫.৯%-এ দাঁড়িয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কেমোথেরাপির নামে যে-সব ঔষধ ক্যানসার রোগীদের শরীরে ইনজেকশান দিয়ে ঢুকানো হয়, এমন জঘন্য-ধ্বংসাত্মক-ক্ষতিকর পদার্থ ইতিপূর্বে কখনও ঔষধের নামে মানুষের শরীরে প্রয়োগ করা হয় নাই। তারপরও যদি এসব ঔষধের টিউমার/ ক্যানসার নির্মূলে কোন ভূমিকা রাখার প্রমাণ থাকত, তবু কোন কথা ছিল না। কোন ঔষধ ল্যাবরেটরীতে টেস্ট টিউবের বিচ্ছিন্ন টিউমারের ওপর কাজ করলেই তা যে মানুষের শরীরের টিউমার/ ক্যানসারের ওপর একইভাবে কাজ করবে তা সঠিক নয়। কেননা টেস্ট টিউবের বিচ্ছিন্ন (পশুদের) টিউমার আর মানুষের শরীরের জীবন্ত টিউমার দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। বস্তুতপক্ষে এমন অনেক ব্যবহারয্য পদার্থ আছে যা মানুষের শরীরে ক্যানসার সৃষ্টি করে কিন্তু পশুদের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাকে নিরাপদ ঘোষণা করা হয়েছে। জার্মানীর ক্যানসার গবেষক বিজ্ঞানী ডাঃ ওয়ার্নার হার্টিনজারের (Dr. Werner Hartinger) মতে, "মানুষের শরীরে ক্যানসার সৃষ্টিকারী অনেক ঔষধ এবং পেট্রো-কেমিক্যাল সামগ্রির ব্যবহারকে বৈধ করে নেওয়া হয়েছে..........এসব বিভ্রান্তিকর পশু পরীক্ষার (animal experiments) মাধ্যমে.........যা ভোক্তাদের মনে নিরাপত্তার মিথ্যা আশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছে"। সম্প্রতি ডার স্পিগল (Der Spiegel) নামের বিখ্যাত জার্মান ম্যাগাজিনে কেমোথেরাপির তীব্র সমালোচনা করে একটি গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, যাতে কেমোথেরাপিকে "অপ্রয়োজনীয় বিষাক্ত চিকিৎসা (Useless Poisonous Cures)" হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। জার্মানীর ডাসেলডরফ সরকারী হাসপাতালের স্ত্রীরোগ বিভাগের ডাইরেক্টর ডাঃ ওলফ্রেম জেগারের (Dr. Wolfram Jaeger, MD) অভিজ্ঞতা হলো, "(স্তন টিউমার এবং স্তন ক্যান্সারের চিকিৎসায়) কেমোথেরাপি দিয়ে অতীতেও সফলতা পাওয়া যায়নি এবং বর্তমানেও পাওয়া যায় না। বিগত পঞ্চাশ বছরে কোটি কোটি মহিলাকে এই চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এতে উপকার হওয়ার কোন প্রমাণ ছাড়াই। এসব কথা যদি আমরা রোগীদেরকে বলি, তবে তাদের মন ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে"। কানাডার ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটি'র

ক্যানসার সেন্টারের ৭৯ জন ক্যানসার বিশেষজ্ঞের মধ্যে ৫৮ জনই বলেছেন যে" ,আমরা কেমোথেরাপি চিকিৎসা প্রত্যাখান যোগ্য মনে করি। কেন ?
কারণ কেমোথেরাপির অকাযর্কারিতা এবং ইহার বিষক্রিয়ার মাত্রাধিক্য"। কেমোথেরাপি ব্যবহারের হার যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, ক্যানসার রোগীদের মৃত্যুর হারও তত বাড়তেছে। কোন কোন গবেষণায় বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে, মাত্র ২% থেকে ৪% টিউমারের ক্ষেত্রে কেমোথেরাপি কাজ উপকার করে থাকে। অর্থাৎ ৯৬ থেকে ৯৮ ভাগ ক্ষেত্রেই কেমোথেরাপি কোন কাজ করে না।

আমেরিকান কংগ্রেসে সাক্ষ্যদান কালে ক্যানসার গবেষক ডাঃ স্যামুয়েল এপ্সটেইন (Dr. Samuel S. Epstein) বলেছিলেন যে, "কেমোথেরাপি ও রেডিয়েশন রোগীদের মধ্যে দ্বিতীয়বার ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে শতকরা ১০০ ভাগ"। কেমোথেরাপির ওপর পৃথিবীতে আজ পযর্ন্ত গবেষণা হয়েছে তার সবকিছু বিশ্লেষণ করে জার্মানীর হাইডেলবার্গের টিউমার ক্লিনিকের বিজ্ঞানী ডাঃ উলরিক এবেল (Dr. Ulrich Abel) কেমোথেরাপিকে অভিহিত করেন "একটি বৈজ্ঞানিক ধ্বংসস্তূপ" (a scientific wasteland) হিসাবে। তাঁর মতে, কেমোথেরাপি হলো "রাজার নতুন পোষাক পড়া"র মতো। অর্থাৎ পোষাক পড়েও উলঙ্গ থাকা ; বাঁচার আশায় চিকিৎসা নিয়ে উল্টো অকালে মৃত্যুবরণ করা। কেমোথেরাপিতে যদি কোন উপকার না হয়, তবে বিগত ৫০ বছরে কোটি কোটি ক্যানসার রোগীকে কেমোথেরাপি চিকিৎসা দেওয়া হলো ; এটি কিভাবে সম্ভব ?
আসলে এতে তিন পক্ষই খুশী। রোগীরা খুশী তারা দামী (এবং দামী মানেই নিশ্চয় উপকারী ?) একটি চিকিৎসা নিতে পারছেন, ডাক্তাররা খুশী তারা রোগীদেরকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে কিছু একটা চিকিৎসা দিতে পারছেন এবং ঔষধ কোমপানীরাও খুশী (রোগীরা জাহান্নামে গেলেও) তাদের ব্যাংক-ব্যালেন্স ঠিকই দিনদিন ফুলে উঠতেছে ।

বিজ্ঞানীরা ক্যানসারের প্রকৃত চিকিৎসা আবিষ্কার করতে পারছেন না কেন ?
গত একশ বছরে হাজার হাজার চিকিৎসা বিজ্ঞানী এবং শত শত ক্যানসার গবেষণা প্রতিষ্টানের পরিশ্রম কেন বিফলে যাচ্ছে ?
১৯৭০ সালে ক্যান্সার গবেষক, ক্যানসার গবেষণা প্রতিষ্টানসমূহ, ক্যানসারের চিকিৎসায় নিয়োজিত হাসপাতাল-ক্লিনিকগুলো, ক্যানসারের (কেমোথেরাপিউটিক) ঔষধ এবং রেডিয়েশান উৎপাদনকারী কোম্পানীসমূহ ইত্যাদির কারযক্রম, নীতিমালা এবং সম্পদের ওপর ব্যাপক অনুসন্ধান করে রবার্ট হিউষ্টন (Robert Houston) এবং গ্যারি নাল (Gary null) নামক দুজন মার্কিন সাংবাদিক পত্রিকায় রিপোর্ট করেন যে, এদের সকলের সম্মিলিত চক্রান্তের কারণেই ক্যানসারের কোন কাযর্কর চিকিৎসা আবিষ্কার এবং প্রচলন করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ ক্যানসারের কাযর্কর চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়ে গেলে এসব ক্যান্সার গবেষক বিজ্ঞানীদের চাকুরি চলে যাবে, মোটা আয়-রোজগার-পদ-পদবী-ক্ষমতা-প্রতিপত্তি ইত্যাদি বন্ধ হয়ে যাবে এবং ক্যানসার গবেষণার নামে নানা রকমের ছাতা-মাথা আবিষ্কার করে বড় বড় দামী দামী পুরষ্কার / গোল্ডমেডেল আর জুটবে না। ক্যানসার গবেষণায় নিয়োজিত এসব প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর বিভিন্ন ব্যক্তি, ঔষধ কোম্পানী, বিভিন্ন দেশের সরকার, এমনকি জাতিসংঘের কাছ থেকেও বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার সাহায্য (donation) পেয়ে থাকে। ক্যানসার গবেষক এবং দৈত্যাকার ক্যান্সার গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান দাতা হলো এসব কেমোথেরাপি ঔষধ উৎপাদনকারী বহুজাতিক ঔষধ কোম্পানিগুলো। ক্যানসারের প্রচলিত চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হলেও খুবই সামান্য খরচে মানুষকে সচেতন করার মাধ্যমে ক্যানসার প্রতিরোধ করা যায়। কিন্তু ক্যানসার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এসব বিজ্ঞানীদের কিংবা দৈত্যাকার ক্যানসার গবেষণা প্রতিষ্টানগুলোর কোন আগ্রহ নাই ।

ডাঃ রবার্ট শার্পের (Dr. Robert Sharpe) মতে, "......প্রচলিত মেডিক্যাল সংস্কৃতিতে রোগের চিকিৎসা বিপুল লাভজনক কিন্তু রোগ প্রতিরোধ তেমনটা (লাভজনক) নয়। ১৯৮৫ সালে আমেরিকা, ইউরোপ এবং জাপানে সম্মিলিতভাবে ক্যানসারের কেমোথেরাপিউটিক ঔষধ এবং অন্যান্য সেবার (?) বার্ষিক বিক্রির পরিমাণ ছিল ৩.২ বিলিয়ন পাউন্ড এবং প্রতি বছর তা নিশ্চিতভাবেই ১০% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু ক্যানসার প্রতিরোধ কার্যক্রমে একমাত্র রোগীদের ছাড়া অন্য কারো লাভ হয় না। অথচ ঔষধ কোম্পানীগুলোর নীতি হলো যে-কোন ছুতায় মানুষকে ঔষধ খাওয়াতে হবে (pill for every ill)"। কাজেই ঔষধ কোম্পানীগুলো এতো বোকা নয় যে, তাদের ব্যবসার ক্ষতি হয় এমন গবেষকদের কিংবা গবেষণা প্রতিষ্টানের পেছনে তারা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করবে। ঔষধ কোম্পানীর দালাল এসব ক্যানসার গবেষকরা এবং ক্যানসার গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল ক্যানসারের সহজ চিকিৎসা আবিষ্কারের সকল রাস্তা বন্ধ করেই রাখে নাই ; সাথে সাথে যারা ক্যানসারের প্রকৃত চিকিৎসা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় বা হয়েছে, তাদেরকে নির্মূল করার জন্য এরা সর্বশক্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে। হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা আজ থেকে দুইশত বছর পূর্বেই ক্যানসারের প্রকৃত চিকিৎসা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় ; কিন্তু ঔষধ কোম্পানীর এই দালালরা তখন থেকেই হোমিওপ্যাথিকে "অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা", "ভূয়া চিকিৎসা", "হাতুড়ে চিকিৎসা" ইত্যাদি নানাভাবে গালাগালি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে আসছে। অপপ্রচারের পাশাপাশি গত দুইশ বছরে তারা তাদের সরকারী, সাংগঠনিক এবং অথনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে হোমিওপ্যাথিকে সারা দুনিয়া থেকে কয়েকবার ধ্বংস করেছে কিন্তু জনপ্রিয়তার কারণে হোমিওপ্যাথি প্রতিবারই ধ্বংসস্তুপ থেকে আবার গা ঝারা দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। শুধু হোমিওপ্যাথি-ই নয় বরং অন্য যে-কেউও যদি ক্যানসারের চিকিৎসা আবিষ্কারের মাধ্যমে অথবা অন্য কোনভাবে এসব বাঘা বাঘা ঔষধ কোম্পানীগুলোর ব্যবসায়িক স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটায়, তাহলেই এই শয়তানী চক্র (evil industry) তাকে বিনাশ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্ঠা চালাতে থাকে।

হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, আমাদের জীবনী শক্তি বিকৃত (deviate) হলেই শরীর ও মনে নানারকম রোগের উৎপত্তি হয়। জীবনী শক্তি তার স্বাভাবিক পথ থেকে লাইনচ্যুত (out of track) হলেই শরীর এবং মনে ধ্বংসাত্মক (destructive) ক্রিয়াকলাপের সূচনা হয়। যেমন টিউমারের সৃষ্টি হওয়া (neoplasm), পাথর তৈরী হওয়া (calculus), ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাসের আক্রমণ (germ infection), কোন অঙ্গ সরু হওয়া (atrophy), কোন অঙ্গ মোটা হওয়া বা ফুলে যাওয়া (hypertrophy) ইত্যাদি ইত্যাদি। পরবর্তীতে ঔষধের মাধ্যমে যদি আমরা জীবনী শক্তিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে (back to the track) আনতে পারি, তবে শরীর ও মনে আবার বিপরীতমুখী ক্রিয়ার (reverse action), মেরামতকরণ (reconstruction) ক্রিয়া আরম্ভ হয়। আমাদের শরীর তখন নিজেই টিউমারকে শোষণ (absorb) করে নেয়, পাথরকে গলিয়ে (dissolve) বের করে দেয়, জীবাণুকে তাড়িয়ে দেয়, সরু এবং ফুলা অঙ্গকে স্বাভাবিক করে দেয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এভাবে ঔষধ প্রয়োগে জীবনীশক্তিকে উজ্জীবিত করার মাধ্যমে শরীরের নিজস্ব রোগ নিরাময় ক্ষমতাকে ব্যবহার রোগমুক্তি অর্জন করাই হলো প্রাকৃতিক (natural) এবং সঠিক পদ্ধতি। আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, টিউমার/ ক্যান্সার একটি নির্দিষ্ট স্থানে / অঙ্গে দেখা দিলেও এটি কোন স্থানিক রোগ (Local) নয় ; বরং এটি সামগ্রিক দৈহিক (systemic) রোগ। এগুলো এক জায়গায় দেখা দিলেও এদের শিকড় থাকে অন্য জায়গায় । কাজেই অপারেশন (surgery), কেমোথেরাপি (chemotherapy), রেডিয়েশন (radiotherapy) ইত্যাদির মাধ্যমে ক্যান্সার নির্মূল করা সম্ভব নয়। কেটে-কুটে, রেডিয়েশন দিয়ে, কেমোথেরাপি দিয়ে এক জায়গা থেকে বিদায় করা গেলেও কদিন পর সেটি অন্য (আরো নাজুক) জায়গায় গিয়ে আবার দেখা দিবেই। ক্যান্সার-টিউমারের দৃষ্টানত্ম হলো অনেকটা আম গাছের মতো। আম কেটে-কুটে যতই পরিষ্কার করম্নন না কেন, তাতে কিছু দিন পরপর আম ধরতেই থাকবে। যতদিন না আপনি আম গাছকে শিকড়সহ উৎপাটন না করছেন। আর ক্যান্সারের শিকড় হলো এলোপ্যাথিক

ঔষধ এবং টিকা (vaccine)। নিরপেক্ষ চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, "ক্যান্সার কোন জন্মগত বা বংশগত রোগ নয় ; বরং এটি পুরোপুরি ঔষধের (এবং টিকার) বিষক্রিয়াজনিত সৃষ্ট রোগ"। যেহেতু যে-কোন রোগের এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করালে প্রচুর ঔষধ খেতে হয় ,তাই বলা যায় ক্যান্সার হলো এলোপ্যাথিক ঔষধ-টিকার দ্বারা সৃষ্ট একটি রোগ। আর এলোপ্যাথিক ঔষধ এবং টিকার বিষক্রিয়া নষ্ট করার ক্ষমতা একমাত্র হোমিও ঔষধেরই আছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীতে একবার যে জন্ম নিয়েছে, তার ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি থেকে কোন মুক্তি নেই। কিন্তু হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা দাবী করেন যে, যেই পরিবারের লোকেরা তিন পুরুষ পর্যন্ত হোমিও চিকিৎসা ব্যতীত অন্যান্য চিকিৎসা বর্জন করা করে চলবে, সেই পরিবারের লোকেরা ক্যান্সার থেকে মুক্ত থাকবে। হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, লো ব্লাড প্রেসারের (hypotension) রোগীরা সাধারণত যক্ষ্মায় (tuberculosis) আক্রান্ত হয় এবং হাই ব্লাড প্রেসারের (hypertension) রোগীরা সাধারণত ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে থাকে। প্রচলিত ক্যান্সার সনাক্তকরণ (diagnosis) প্রদ্ধতিতেও আছে অনেক ভয়ঙ্কর বিপদ । একটি গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, শতকরা ৪০ ভাগ ক্ষেত্রে থাইরয়েড (thyroid), প্যানক্রিয়াস (pancreas) এবং প্রোস্টেট (prostate) ক্যান্সার ধরা পড়ে রোগীর মৃত্যুর পরে পোষ্ট-মর্টেম বা ময়নাতদন্তের (autopsy) সময়। অর্থাৎ দেখা যায় রোগী এসব অঙ্গের ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিল অথচ ক্যান্সারের কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই বিধায় কোন রকম চিকিৎসা ছাড়াই রোগীরা দীর্ঘদিন সুস্থ জীবনযাপন করেছেন। এসব ক্যান্সারে তাদের মৃত্যু হয় নাই। বয়স ৭৫ হলে প্রায় ৫০% পুরুষরাই প্রোস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে থাকে। কিন্তু এদের মাত্র ১% এই রোগে মৃত্যুবরণ করে। আর বাকীরা বিনা চিকিৎসায় যুগের পর যুগ সুস' থাকে কিভাবে ?
হ্যাঁ, জন্মগতভাবে প্রাপ্ত আমাদের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ শক্তিই (immune system) ক্যান্সারসহ সমস্ত রোগকে সামাল দিয়ে রাখার ক্ষমতা রাখে। ক্যান্সার নির্ণয়ের একটি বহুল ব্যবহৃত পরীক্ষা পদ্ধতির নাম হলো বায়োপসী (biopsy), যাতে টিউমারের ভেতরে সুই ঢুকিয়ে কিছু মাংস ছিড়ে এনে মাইক্রোস্কোপের নীচে রেখে পরীক্ষা করা হয়, তাতে ক্যান্সার কোষ আছে কিনা। কিন্তু সমপ্রতি বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন যে, এভাবে টিউমারকে ছিদ্র করার কারণে সেই ছিদ্র দিয়ে ক্যান্সার কোষ বেরিয়ে দ্রুত সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে (metastasis)। তখন ক্যানসার রোগীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে যায় এবং তাদেরকে বাচাঁনো অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা টিউমারগুলো আসলে ক্যান্সার নামক এই ভয়ঙ্কর বিষাক্ত পদার্থকে চারদিক থেকে গ্রেফতার করে, বন্দি করে রাখে। ফলে ইহারা সহজে সারা শরীরে ছড়াতে পারে না। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে ছিদ্র করে তাদেরকে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ করে দেওয়া একটি জঘন্য মূর্খতাসুলভ কাজ।

আপনি হয়ত ভাবতে পারেন, চিকিৎসা বিজ্ঞানে আবার অজ্ঞতা-মূর্খতা চলে কিভাবে ?
হ্যাঁ, নিরপেক্ষ গবেষকদের মতে, প্রচলিত চিকিৎসা বিজ্ঞান হলো বিজ্ঞানের নামে প্রচলিত নানান রকমের অজ্ঞতা-মূর্খতা-নির্বুদ্ধিতার একটি সবচেয়ে বড় আখড়া । কথায় বলে, বাস্তব সত্য এতই অদ্ভূত যে তা রূপকথাকেও হার মানায় । প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ এলেন গ্রীনবার্গ (Dr. Allan Greenberg, M.D.) বলেন যে, "একজন অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক হিসেবে আমি সততার সাথে বলতে পারি যে, আপনি একশ বছর বাঁচতে পারবেন যদি ডাক্তারদের নিকট এবং হাসপাতালে যাওয়া বাদ দিয়ে চলতে পারেন । আর সৌভাগ্যবশত যদি কোন লতাপাতাপন্থী ডাক্তারের সন্ধ্যান না পেয়ে থাকেন, তবে নিজেই পুষ্টি বিদ্যা ও লতাপাতার ঔষধ সমন্ধে জ্ঞান অর্জন করে নিন । প্রায় সমস্ত ঔষধই বিষাক্ত (Toxic) এবং তাদেরকে তৈরী করা হয়েছে কেবল রোগের লক্ষণ দূর করার জন্য ; কাউকে রোগমুক্ত করার জন্য নয়। টিকাসমূহ (vaccine) মারাত্মক বিপজ্জনক ; তাদের কার্যকারিতা নিয়ে কখনও যথেষ্ট গবেষণা করা হয়

নাই। অধিকাংশ অপারেশনই অপ্রয়োজনীয় এবং বেশীর ভাগ ডাক্তারী বই ত্রুটিপূর্ণ (inaccurate) আর প্রতারণামূলক (deceptive)। প্রায় সব রোগের কারণকেই বলা হয় অজ্ঞাত (idiopathic) এবং বংশগত (genetic) ; যদিও তা অসত্য কথা। সংক্ষেপে বলা যায়, আমাদের বহুল প্রচলিত এলোপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান নৈরাশ্যজনকভাবে কুৎসিত (inept) এবং দুর্নীতিগ্রস্ত (corrupt)। ক্যানসার এবং অন্যান্য জটিল রোগের চিকিৎসা একটি জাতীয় কলঙ্ক স্বরূপ। এই বিষয়টি যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবেন, আপনার জন্য ততই মঙ্গল"। ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি'র ফিজিওলজীর প্রফেসর এবং বিশ্বখ্যাত ক্যান্সার গবেষক ডাঃ হার্ডিন জোনস ,তাঁর সুদীর্ঘ ২৩ বছরের ক্যানসার গবেষণার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেছেন যে" ,আমার গবেষনায় এটি চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, যে-সব ক্যানসার রোগীরা কেমোথেরাপি এবং রেডিয়েশান থেরাপি বর্জন করেন, তারা এসব চিকিৎসা গ্রহনকারী রোগীদের চাইতে চারগুণ বেশী আয়ু লাভ করে থাকেন..........এতে সন্দেহের ছায়ামাত্র নাই। ক্যান্সারের চিকিৎসায় অপারেশন উপকারের চাইতে ক্ষতিই করে বেশী। রেডিয়েশান অর্থাৎ রেডিওথেরাপির (radiation) ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য ; দেওয়া আর না দেওয়ার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নাই। .......ক্যানসার প্রথম পর্যায়ে ধরতে পারলে সহজে সারিয়ে দেওয়া যায় অথবা রোগীর আয়ু বৃদ্ধি পায়- এই জাতীয় চিন্তা চরম মূর্খতার নামান্তর। অধিকন্তু কোন রকমের চিকিৎসা না নেওয়া স্তন ক্যান্সারের রোগীরা বরং চিকিৎসা নেওয়া রোগীদের চাইতে চারগুণ বেশী আয়ু পেয়ে থাকেন। আমার স্ত্রীর যদি স্তন ক্যানসার ধরা পড়ে, তবে সে কি করবে তা নিয়ে আমি তার সাথে আলোচনা করেছি। এবং আমরা দু'জনেই একমত হয়েছি যে, আমরা চিকিৎসার নামে কিছুই করব না ; কেবল যথাসম্ভব সুন্দরভাবে জীবনযাপন করা ছাড়া। আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, একমাত্র এভাবেই সে সবচেয়ে বেশী দিন বাচঁবে"। ডঃ রালফ মস (Dr. Ralph Moss, Ph.D.) একবার বলেছিলেন যে, "বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতিগুলোকে ব্যর্থ প্রমাণ করার জন্য (এলোপ্যাথিক) ডাক্তাররা কত কিছুই না চালু করেছেন, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। আবার তাদের ব্যর্থতা শেষ পর্যনত্ম বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতিসমূহের পক্ষেই গেছে"।

স্তন ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য মেমোগ্রাফী (Mammography) নামে একটি টেস্ট করা হয়, যাতে স্তনকে একটি যন্ত্রের মাধ্যমে চেপে ধরে বিভিন্ন এংগেলে (angle) কয়েকটি এক্স-রে করা হয়। এই টেস্ট করতে যেহেতু রেডিয়েশন (X-ray) ব্যবহৃত হয়, তাই এতে ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি আছে ষোলআনা। পত্র-পত্রিকা-রেডিও-টিভিতে প্রায়ই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যে, তাড়াতাড়ি স্তন ক্যান্সার সনাক্ত (early detection) করার জন্য প্রতিটি সচেতন নারীর উচিত বছরে একবার করে মেমোগ্রাফী টেস্ট করা। অথচ আপনি যদি দুই/চার বার মেমোগ্রাফী করেন, তবে মেমোগ্রাফী টেস্টের কারণেই বরং আপনি আরো আগে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হবেন। কেননা রেডিয়েশানই (radiation) হলো ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার একটি বহুল প্রমাণিত বড় কারণ। বলা হয়ে থাকে, যখন থেকে চিকিৎসা ক্ষেত্রে এক্স-রে (X-ray) চালু হয়েছে, তখন থেকেই ক্যান্সারের হার বৃদ্ধি পেয়েছে দ্রুতগতিতে। এই কারণে ১৯৭৬ সালে আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটি এবং ন্যাশনাল ক্যানসার ইনিষ্টিটিউট তাদের এক ঘোষণায় অপ্রয়োজনে মেমোগ্রাফী টেস্ট করাতে সবাইকে নিষেধ করেছেন। তাছাড়া এই মেমোগ্রাফী টেস্ট অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুয়া রিপোর্ট দিয়ে থাকে। ক্যানসার না থাকলে বলবে আছে আবার ক্যানসার থাকলে বলবে নাই ; অন্যদিকে নরমাল টিউমারকে বলবে ক্যানসার এবং ক্যানসারকে বলবে নরমাল টিউমার। ১৯৯৩ সালের ২৬ মে আমেরিকান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় বলা হয়েছে যে, মেমোগ্রাফী টেস্টে ২০% থেকে ৬৩% ক্ষেত্রে ভুল রিপোর্ট আসতে পারে। কাজেই নিয়মিত মেমোগ্রাফী টেস্ট করতে বিজ্ঞাপন দিয়ে নারীদের উৎসাহিত করা নেহায়েত হাস্যকর ধান্ধাবাজি ছাড়া আর কিছুই না। অধিকাংশ ডাক্তাররা মহিলাদেরকে তাদের স্তনে টিউমার/ ক্যানসার হলো কিনা সে বিষয়ে সচেতন করার জন্য কিছুদিন পরপর নিজেদের স্তন নিজেরাই টিপে টিপে (তাতে কোন চাকা আছে কিনা) পরীক্ষা করার জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকেন। আসলে এভাবে রোগের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির নামে ডাক্তাররা বরং মানুষের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করেন

এবং এতে করে স্তন টিউমার/ ক্যানসারের আক্রমণের হার আরো বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। বাস্তবে দেখা গেছে, টিভিতে ব্লাড প্রেসারের (hypertension) অনুষ্ঠান দেখে ভয়ের চোটে আরো বেশী বেশী মানুষ ব্লাড প্রেসারে আক্রান্ত হচ্ছে। হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের ওপর গবেষণা করে দেখেছেন যে, অধিকাংশ ক্যানসার রোগীর মনেই ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার অনেক বছর পূর্ব থেকেই ক্যানসারের প্রতি একটি ভয় কাজ করত। এবং এই অস্বাভাবিক ক্যানসার ভীতি তাদেরকে শেষ পর্যনত্ম ক্যানসারের শিকারে পরিণত করেছে। কাজেই আপনার সম্বনে যখন টিউমার / ক্যানসার হবে, তখন এটি এমনিতেই চোখে পড়বে। এজন্য ভয়ে ভয়ে রোজ রোজ টিপে টিপে দেখার কোন প্রয়োজন নাই। একইভাবে চিকিৎসা বিষয়ক যাবতীয় বিজ্ঞাপন থেকে সযত্নে একশ মাইল দূরে থাকা সকলেরই উচিত বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

আপনার শরীরের কোন স্থানে যদি ক্যানসার ধরা পড়ে, তবে সবক্ষেত্রে এটি কোন মারাত্মক ঘটনা নয় কিংবা এতে অকালে আপনার প্রাণনাশেরও আশংকা নাই। কিন্তু ডাক্তাররা এবং ঔষধ কোম্পানীসমূহ তাদের স্বার্থে তারা মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে। কেবল খাদ্যভ্যাসের পরিবর্তন (diet), জীবনযাপন পদ্ধতির (Life style) সংশোধন এবং মনমানসিকতার পরিবর্তনের (emotional state) মাধ্যমে বিনা চিকিৎসায় অগণিত মানুষ ক্যানসার থেকে মুক্তি পেয়েছেন, এমন ঘটনা ইন্টারনেটে খোঁজলে অনেক দেখতে পাবেন। কলকারখানায় তৈরী খাবার (industrial food), চর্বি জাতীয় খাবার বর্জন করুন (animal fat), স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-আত্মীয়-স্বজন-পাড়া-প্রতিবেশী পরিবেষ্টিত সহজ-সরল-সুন্দর জীবন যাপন করুন, সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করুন, নিয়মিত নামাজ-রোজা-দান-খয়রাত ইত্যাদি ইবাদত-বন্দেগী পালন করে চলুন, শিশুদের ভালোবাসুন, বড়দের সম্মান করুন, দরিদ্রদের কল্যাণে কাজ করুন, ফুল-পাখি-বৃক্ষ-তরুলতা-আকাশ-বাতাস-সাগর-নদী ইত্যাদির দিকে তাকিয়ে থেকে নিজের মনকে সর্বদা পবিত্র রাখুন। ক্যানসার আপনার ধারেকাছে আসতে পারবে না। আর যদি এসেও থাকে, মানে মানে কেটে পড়বে। আপনার মনকে যদি প্রথমে ক্যানসারমুক্ত করতে না পারেন, তবে দুয়েক মাস বা দুয়েক বছর ঔষধ খেয়ে কখনও শরীরের ক্যানসার দূর করতে পারবেন না। এটা একেবারেই অবাস্তব কল্পনা এবং প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধে। প্রকৃতি মুহূর্তের মধ্যে কিছু ধ্বংসও করে না আবার চোখের পলকে কিছু সৃষ্টিও করে না। প্রকৃতি তার সকল কাজই করে আস্তে-ধীরে, রয়ে-সয়ে দীর্ঘ সময় নিয়ে। ডাঃ লোরেইন ডে (Dr. Lorraine Day, M.D.)-এর মতে, "প্রচলিত অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিসমূহ মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত ইমিউন সিস্টেমকে (immune system) পুণরায় শক্তিশালী করার মাধ্যমে রোগ নির্মূল করে থাকে। পক্ষান্তরে কেমোথেরাপি এবং রেডিওথেরাপি মানুষের ইমিউন সিস্টেমকে একেবারে ধ্বংস করে দেয় । ক্যানসার হলো একটি ইমিউন সিস্টেমের রোগ । কোন মানুষের ইমিউন সিস্টেম অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ শক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলেই কেবল তাকে ক্যানসার আক্রমণ করে থাকে । কাজেই যেই চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে ইমিউন সিস্টেম আরো ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা দিয়ে কিভাবে ক্যানসার নির্মূল করা সম্ভব ?"।

বার্নেট তাঁর ক্লিনিক্যাল গবেষণায় লক্ষ্য করেন যে, একটি বা দুটি হোমিও ঔষধ ব্যবহারে প্রায়ই টিউমার এবং ক্যান্সার সারানো যায় না । কারণ টিউমার/ ক্যান্সারের পেছনে সাধারণত অনেকগুলো কারণ (Link) থাকে । আর একেকটি কারণ দূর করতে একেক ধরনের ঔষধের প্রয়োজন হয় । তিনি পিত্তপাথর থেকে কোলেস্টেরিনাম (Cholesterinum) নামক একটি ঔষধ আবিষ্কার করেন যা দিয়ে অনেক লিভার সিরোসিস এবং লিভার ক্যান্সার তিনি নির্মুল করেছেন । হোমিওপ্যাথিতে ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যর্থতার একটি মুল কারণ হলো রোগীর জীবনীশক্তিহীনতা বা মারাত্মক শারীরিক দুর্বলতা (low vitality) । অধিকাংশ রোগী কবিরাজি এবং এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করে শরীরের বারোটা বাজিয়ে যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, তখন আসে হোমিও চিকিৎসকের কাছে । আমার অবাক লাগে যখন দেখি

লোকেরা স্তন টিউমার এবং স্তন ক্যান্সারের মতো মামুলি রোগে অপারেশন, কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি ইত্যাদি করে ধ্যানাধ্যান মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। অথচ মহাপরাক্রমশালী হোমিও ঔষধের কাছে স্তন টিউমার এবং স্তন ক্যান্সার একেবারে মামুলি রোগ। স্তন টিউমার সম্পর্কে বার্নেট একটি মজার গল্প লিখে গেছেন। এক মহিলার স্তনে ক্যান্সার হলে বার্নেট প্রায় দেড় বৎসর হোমিও ঔষধ খাইয়ে বিনা অপারেশনে সেটি সারিয়ে দেন। কিছুদিন পর সেই মহিলা তার এক বান্ধবীকে বার্নেটের কাছে নিয়ে আসেন, যার ডান স্তনে একটি টিউমার হয়েছে। ভদ্র মহিলা বার্নেটকে জিজ্ঞেস করলেন, "এটি নিরাময় করতে আপনার কত দিন লাগবে "?। বার্নেট বললেন, "দুই বৎসর"। ভদ্র মহিলা বললেন" ,তাহলে আমি অপারেশন করাকেই ভালো মনে করি। কেননা তাতে মাত্র পনের দিন লাগে"। তারপর সে অপারেশন করাল এবং অপারেশনের ছয় মাস পরে তার বাম স্তনে আবার টিউমার দেখা দিল। বাম স্তনে টিউমার আবার অপারেশন করে ফেলে দেওয়ার ছয়মাস পরে তার জরায়ুতে ক্যান্সার দেখা দেয়। জরায়ুতে অপারেশনের কিছুদিন পর সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। এভাবে দুই বছর ঔষধ খাওয়া যার কাছে বিরক্তিকর মনে হয়েছিল, তিন তিনটি অপারেশনের ধাক্কায় দেড় বছরের মধ্যে সে দুনিয়া ছেড়ে বিদায় নিল। হায়! নির্বোধ মানুষেরা সব বিষয়ে কেবল শর্টকার্ট রাস্তা খোঁজে; কিন্তু তারা বুঝতে চায় না যে, শর্টকার্ট রাস্তা প্রায় সবক্ষেত্রেই মানুষের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে। **হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণায় লক্ষ্য করেছেন যে, হোমিও চিকিৎসার মাধ্যমে স্তন টিউমার/ক্যানসার নিরাময়ের পর কিছু কিছু ক্ষেত্রে গুণে গুণে ঠিক বিশ বছর পর সেগুলো আবার দেখা দেয় এবং তখন সেসব রোগীদের কাউকে কাউকে হোমিও চিকিৎসার মাধ্যমে তিন বছরের বেশী বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। কাজেই যারা স্তন টিউমার/ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন, তাদের কারো কারো আয়ু আর মাত্র তেইশ (XXXIII) বছর বাকী আছে বলে ধরে নিতে পারেন।**

হোমিওপ্যাথিকে বলা হয় পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা বিজ্ঞান (holistic healing science) অথবা মনো-দৈহিক গঠনগত (Constitutional medicine) চিকিৎসা বিজ্ঞান। অর্থাৎ এতে কেবল রোগকে টার্গেট করে চিকিৎসা করা হয় না বরং সাথে সাথে রোগীকেও টার্গেট করে চিকিৎসা করা হয়। রোগীর শারীরিক এবং মানসিক গঠনে কি কি ত্রুটি আছে (congenital defect), সেগুলোকে একজন হোমিও চিকিৎসক খুঁজে বের করে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করেন। রোগটা কি জানার পাশাপাশি তিনি রোগীর মন-মানসিকতা কেমন, রোগীর আবেগ-অনুভূতি কেমন, রোগীর পছন্দ-অপছন্দ কেমন, রোগী কি কি জিনিসকে ভয় পায়, কি ধরণের স্বপ্ন দেখে, ঘামায় কেমন, ঘুম কেমন, পায়খানা-প্রস্রাব কেমন, কি পেশায় নিয়োজিত আছে, কি কি রোগ সাধারণত তার বেশী বেশী হয়, অতীতে কি কি রোগ হয়েছিল, বংশে কি কি রোগ বেশী দেখা যায়, রোগীর মনের ওপর দিয়ে কি ঝড় বয়ে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি জেনে রোগীর ব্যক্তিত্ব (individuality) বুঝার চেষ্টা করেন এবং সেই অনুযায়ী ঔষধ নির্বাচন করেন। এই কারণে হোমিওপ্যাথিক ঔষধে এমন রোগও সেরে যায়, যা অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে কল্পনাও করা যায় না। একজন হোমিও চিকিৎসক রোগীর শারীরিক কষ্টের চাইতে বেশী গুরুত্ব দেন রোগীর মানসিক অবস্থাকে। কেননা হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, অধিকাংশ জটিল রোগের সূচনা হয় মানসিক আঘাত (mental shock) কিংবা মানসিক অস্থিরতা/উৎকণ্ঠা/দুঃশ্চিনতা (anxiety) থেকে। মোটকথা অধিকাংশ মারাত্মক রোগের প্রথম শুরুটা হয় মনে এবং পরে তা ধীরে ধীরে শরীরে প্রকাশ পায়। এজন্য হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলতেন যে, মনই হলো গিয়ে আসল মানুষটা (mind is the man)। তাছাড়া পৃথিবীতে হোমিও ঔষধই একমাত্র ঔষধ যাকে মানুষের শরীর এবং মনের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আবিষ্কার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দুনিয়ার অন্য সমস্ত ঔষধই আবিষ্কার করা হয় ইঁদুর-খরগোশ-গিনিপিগ ইত্যাদি পশুদের শরীরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। এই কারণে হোমিও ঔষধ মানুষের শরীর ও মনকে যতটা বুঝতে পারে, অন্য কোন ঔষধের পক্ষেই তা সম্ভব নয়।

সে যাক, টিউমার এবং ক্যান্সার চিকিৎসায় আমাদের সকলেরই উচিত প্রথমে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অবলম্বন করা। কেননা, কেমোথেরাপি, অপারেশন, রেডিয়েশন ইত্যাদি শতকরা নিরানব্বই ভাগ ক্ষেত্রেই রোগীর মৃত্যুকে দ্রুত ডেকে আনে। হোমিওপ্যাথিতে টিউমার/ ক্যান্সার চিকিৎসার আরেকটি বিরাট সুবিধা হলো এতে শতকরা নিরানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে ব্যয়বহুল, কষ্টদায়ক এবং ক্ষতিকারক কোন প্যাথলজিক্যাল টেস্টের দরকার হয় না (যেমন-বায়োপসি, মেমোগ্রাফী, এক্স-রে, সিটি স্ক্যান (CT scan), এমআরআই (MRI) ইত্যাদি)। কেননা হোমিওপ্যাথিতে ঔষধ দেওয়া হয় রোগীর শারীরিক গঠন এবং মানসিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে। যারা ইতিমধ্যে কেমোথেরাপি, অপারেশন, রেডিয়েশান ইত্যাদি অপচিকিৎসা নিয়ে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে গেছেন, তাদেরও কাল বিলম্ব না করে হোমিও চিকিৎসা গ্রহন করা উচিত। ইহার মাধ্যমে তারা ঐসব কুচিকিৎসার কুফল থেকে মুক্ত হয়ে আবারও রোগমুক্ত সুস্থ-সুন্দর জীবনধারায় ফিরে আসতে সক্ষম হবেন। যেহেতু আমাদের দেশে মেধাসমপন্ন হোমিও চিকিৎসকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে, সেজন্য ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ এবং মেডিসিন বিশেষজ্ঞদের উচিত সামান্য কষ্ট স্বীকার করে হোমিওপ্যাথি আয়ত্ত করে নেওয়া এবং জনস্বার্থে হোমিও ঔষধ প্রেসক্রাইব করা। কেননা এগুলো একই সাথে রোগের জন্যও ভালো এবং রোগীর চিকিৎসা ব্যয়ও কমিয়ে দেয় একশ ভাগ। এমনকি যে-সব ক্ষেত্রে ক্যান্সার সারা শরীরে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার কারণে রোগীকে বাচাঁনো কোন মতেই সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে মৃত্যুর পূর্ব পর্যনত্ম রোগীর যাবতীয় অমানুষিক কষ্টসমূহ নিয়ন্ত্রণে রাখার চিকিৎসাতেও (palliative treatment) হোমিও ঔষধ অন্য যে-কোন ঔষধের চাইতে সেরা প্রমাণিত হয়ে থাকে। তাই যে-সব সেবামুলক সংস্থা মানুষকে ক্যান্সারের চিকিৎসা সেবা প্রদানে রত আছে, তারা ইচ্ছে করলে ক্যানসারের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সেবা দেওয়ার মাধ্যমে একই পয়সায় আরো শতগুণ বেশী মানুষকে প্রকৃত চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে পারেন।

**Cancer prevention (ক্যান্সার প্রতিরোধ) ঃ** – নিজ পরিবারের কারো ক্যান্সারে মৃত্যু হলে Carcinosinum (শক্তি ২০০) ঔষধটি বিশ দিন পরপর একমাত্রা করে মোট তিন মাত্রা খেয়ে রাখুন। যে-কোন ধরণের টিউমার বা ক্যান্সারে আক্রান্ত হলে দ্রুত কোন বিশেষজ্ঞ হোমিও ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হউন। কেননা দেরিতে চিকিৎসা শুরু করলে রোগমুক্তির সম্ভাবনা কমে যায়। [ ক্যানসার থেকে বাঁচার জন্য সূর্যরশ্মি , মাংসচর্বি জাতীয় খাবার, কল-কারখানায় তৈরী পণ্যদ্রব্য, টিকা, যৌনরোগ, দুঃশ্চিন্তা, মাদকাসক্তি, বেশী বেশী ঔষধ খাওয়ার অভ্যাস, অলসতা, অপারেশন, রেডিয়েশন, অপচ্ছিন্নতা ইত্যাদি থেকে দূরে থাকুন এবং আঙুর, আপেল, কমলা, পেঁপে, টমেটো, কলা, বড়ই, কামড়াঙা, আমলকি, লেবু ইত্যাদি এন্টি অক্সিডেন্ট জাতীয় খাবার বেশী বেশী খান। সুস্থ-সুন্দর জীবন এবং দীর্ঘায়ুর জন্যও উপরোক্ত পয়েন্টগুলো মেনে চলা দরকার। ]

## Pre-symptoms of cancer (ক্যান্সারের পূর্ব লক্ষণ) :-

ক্যান্সার একটি রোগের দীর্ঘ পথ পরিক্রমার শেষ ধাপের নাম। একজন মানুষ এক লাফেই ক্যান্সারে আক্রান্ত হন না। এটি প্রধানত চারটি ধাপে অগ্রসর হয়ে পরিপুর্ণ ক্যান্সারের রূপ লাভ করে। ক্যান্সারের প্রথম ধাপ হলো মানসিক লক্ষণের প্রকাশ, দ্বিতীয় ধাপ হলো শরীরিক লক্ষণ, তৃতীয় ধাপ হলো শরীরে টিউমার সৃষ্টি হওয়া এবং শেষ ধাপ হলো ক্যান্সারের আত্মপ্রকাশ ও বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়া। ক্যান্সারের প্রথম দুটি ধাপ কোন রোগীর মধ্যে লক্ষ্য করেই বিজ্ঞ চিকিৎসক নিশ্চিত হয়ে যান যে, রোগী অদুর ভবিষ্যতে ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে যাচ্ছে ।

**মানসিক লক্ষণ ঃ-** ক্যান্সার রোগটি প্রথমে মানুষের মনকে আক্রমণ করে। যিনি ভবিষ্যতে একদিন ক্যান্সারে আক্রান্ত হবেন, তার মধ্যে একটি নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যায় যে, সে ক্যান্সারে আক্রান্ত হবেই হবে এবং ক্যান্সার তার মৃত্যুর কারণ হবে। এমনকি তার শরীরে কোন টিউমার সৃষ্টি হওয়ার বহু পুর্বেই এমন বিশ্বাস মনে বাসা বেধে থাকে। সে তার কল্পিত ভয় এবং বিশ্বাসের কথা নানানভাবে চিকিৎসককে বুঝাতে চেষ্টা করে।

**শারীরিক লক্ষণ ঃ-** ইন্টেসটাইন, লিভার এবং কিডনী এই তিনটি অঙ্গ প্রধানত ক্যান্সারজনিত পুর্ব অবস্থার বা সুপ্ত ক্যান্সারের শিকার হয়ে থাকে। যিনি দীর্ঘদিন যাবত শক্ত পায়খানা বা কোষ্টকাঠিন্যে ভোগছেন এবং ঔষধ না খেয়ে পায়খানা করতে পারেন না, তিনি নিশ্চিতভাবে ক্যান্সারের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। মুখে তিতা তিতা লাগা এবং সকালে বমিবমি ভাব হওয়া ক্যান্সারের একটি পুর্ব লক্ষণ। কয়দিন ডায়েরিয়া এবং কয়দিন কোষ্টকাঠিন্য নিশ্চিতভাবেই ক্যান্সারের একটি পুর্ব লক্ষণ। খাবারের পর পেট ভার ভার লাগা এবং ঘুম পাওয়া ক্যান্সারের আরেকটি পুর্ব লক্ষণ। খসখসে শুকনো বা তৈলাক্ত চামড়া এবং তাতে এখানে-সেখানে ছড়ানো কালো কালো দাগ বা তিল হলো ক্যান্সারের একটি পুর্ব লক্ষণ। বিশেষত নাক, কান এবং কপালে তিল থাকে এবং ধীরে ধীরে সেগুলো সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে। বুকের সামনের দিকে এবং পেটে ছোট-বড় লাল লাল দাগ দেখা যায়। যে-সব দাগ বাদামী রঙের এবং ধীরে ধীরে কালো হতে থাকে, সেগুলো ক্যান্সেরিনিক স্পট। ওয়ার্টস বা মেঞ্জ / আচিঁল, প্যাপিলোমা এবং কন্ডাইলোমা হলো ক্যান্সারের একটি পুর্ব লক্ষণ। উপরোক্ত লক্ষণগুলোর উপস্থিতি এবং তীব্রতাই ঈঙ্গিত করে যে, ক্যান্সারজনিত পুর্বাবস্থার শিকার হয়ে তার পুরো শারীরিক সিষ্টেম কতটা বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। শীর্ণতা বা চিকন হওয়া হলো শরীরে খনিজ পদার্থ বা মিনারেলের অভাব কিংবা বলা যায় খনিজ লবণকে ব্যবহারে অক্ষমতা। যক্ষা বা অন্যকোন জ্ঞাত কারণ ছাড়াই শীর্ণতা দেখা দেওয়া বা শুকিয়ে কঙ্কালসার হওয়া ক্যান্সারের একটি বড় পুর্ব লক্ষণ। হাইপারটেনশান বা উচ্চ রক্তচাপ হলো ক্যান্সারের একটি পুর্ব লক্ষণ আর নিম্ন রক্তচাপ বা লো প্রেসার হলো যক্ষার পুর্ব লক্ষণ। একই অঙ্গে বারবার আঘাত পাওয়া সেখানে ক্যান্সার হওয়াকে নিশ্চিত করে। নানা রকমের ঔষধেও নিয়নত্রণ করা যায় না এরকম বাত (rheumatism) হলো ক্যান্সারের আরেকটি পুর্ব লক্ষণ। দুর্দমনীয় অজীর্ণ বা বদহজম (indigestion) হলো ক্যান্সারের একটি উল্লেখযোগ্য পুর্ববস্থা। দীর্ঘদিনের পুরনো মাথা ব্যথা, স্নায়বিক ব্যথা (neuralgia) এবং গেটে বাত (gout) হলো ক্যান্সারের পুর্ব লক্ষণ।

**টিউমার সৃষ্টি ঃ-** শরীরের টিউমারের উৎপত্তি হওয়া হলো ক্যান্সারের সবচেয়ে নিকটবর্তী ধাপ। ক্লার্কের মতে, টিউমার হলো টিস্যুর অস্থিতিশীলতা বা বিদ্রোহ (tissue instability)। টিউমারকে যদিও বিনাইন ও ম্যালিগন্যান্ট অর্থাৎ নিরীহ ও মারাত্মক নামে দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে; তথাপি কোন টিউমারকেই বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখতে নেই। কারণ যে-কোন নিরীহ টিউমারই যে-কোন সময় মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে অর্থাৎ ক্যান্সারাস হতে পারে। শরীরের কোন অংশকে উৎপাত করা বা বিরক্ত করার ফলে কেবল টিউমারেরই সৃষ্টি হয় না ; এমনকি নিরীহ টিউমারকে ক্যান্সারাস টিউমারে রূপান্তরিত করে থাকে। টিউমার বা ক্যান্সার যেহেতু টিস্যুর অস্থিতিশীলতা, সেহেতু যে-সব ঔষধ টিস্যু তৈরীতে সাহায্য করে সেগুলোকে ক্যান্সার নিরাময়ে ব্যবহার করা যায়। টিউমারের চিকিৎসা প্রথমে ঔষধের সাহায্যে করা উচিত। কেননা অপারেশন করে কেটে ফেলে দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই স্থানে বা শরীরের অন্যত্র আবার টিউমার হতে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে টিউমার নিজে কোন রোগ নয়; বরং শরীরের অন্তর্নিহিত কোন রোগের ফল বা লক্ষণ স্বরূপ। গাছকে রেখে ফল কেটে ফেললে যেমন ফল ধরা বন্ধ করা সম্ভব নয়; তেমনি

টিউমারের মুল কারণকে দূর না করে শুধু অপারেশন করে টিউমারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। এতে পরিস্থিতি বরং ক্রমাগত খারাপের দিকে অর্থাৎ ক্যান্সারের দিকে যেতে থাকে।

**ক্যানসারের চিকিৎসা (Cancer treatment) :** আপনি যদি ক্যানসারে আক্রান্ত হন, তবে ভয়ের কোন কারণ নাই। ক্যানসার নয় বরং ভয় পাইতে হবে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে। কারণ এলোপ্যাথি আপনাকে শারীরিকভাবেও মারবে আর অর্থনৈতিকভাবেও মারবে। **এলোপ্যাথিক ক্যানসার বিশেষজ্ঞরা আপনাকে অপারেশান, কেমোথেরাপি, রেডিয়েশান ইত্যাদি করার পর দু'বছর পরে যখন আপনি মরতে বসবেন, তখন তারা বলবে, "আল্লাহ্‌র রহমতে আমরা আপনার আয়ু দুই বছর বাড়াতে পেরেছি"। আসলে তাদের চিকিৎসা গ্রহন না করলেও বরং আপনি আরো দশ বছর বাচঁতেন। এক্ষেত্রে বলা যায়, তারা আপনার আয়ু বরঞ্চ আট বছর কমিয়েছে** !! দুইবার নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী আমেরিকান বিজ্ঞানী লিনাস পওলিঙের (Linus Pauling, Ph.D) মতে, প্রতিদিন বেশী বেশী করে ভিটামিন সি (লেবুর রস) খান (অবশ্যই চিনি-লবন ছাড়া), বছর খানেক পরে দেখবেন আপনার ক্যানসারকে হ্যারিকেন দিয়েও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমেরিকায় গবেষণারত আরেকজন ভারতীয় বিজ্ঞানী (*Dr. Batmanghelidj*) আবিষ্কার করেছেন যে, কেবল বেশী বেশী পানি খাওয়ার মাধ্যমেই যে-কোন ক্যানসার নির্মূল করা যায়। সাথে তেল-চর্বি-ঘি-মাংস জাতীয় খাবার বর্জন করুন এবং শাক-সবজি-ফল-মূল জাতীয় খাবার বেশী বেশী করে খান। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো খাবারের পরিমাণ যথেষ্ট কমাতে হবে । (ডায়েট কন্ট্রোল করতে হবে । বেশী বেশী খাওয়া এবং ওজন বৃদ্ধি করাই হলো ক্যানসারের একটি বড় কারণ)। বর্তমানে এই দুই বিজ্ঞানীর কথা মতো কাজ করে পৃথিবীতে অগণিত মানুষ ক্যানসার মুক্ত হয়ে সুস্থ জীবনযাপন করছেন। **ক্যানসার** নির্মূলে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মানসিক শান্তি বজায় রাখতে হবে। **চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে,** দীর্ঘদিন যাবত মানসিক অশান্তিতে ভোগার কারণেই মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত হয় এবং কেবলমাত্র মনের জোরেই মানুষ ক্যানসারমুক্ত হতে পারে। এজন্য মনকে লোভ-লালসা-হিংসা-অহংকার-ভয়-দুঃশ্চিন্তা ইত্যাদি ঝামেলা থেকে মুক্ত করে শিশুদের মতো সরল পবিত্র করুন। আপনার মনকে শান্তিতে রাখার জন্য যিনি মনকে সৃষ্টি করেছেন সারাক্ষণ সেই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার কাজে নিয়োজিত রাখুন। **এখনকার অনেক চিকিৎসা বিজ্ঞানীর মতে, ডায়াবেটিসের চাইতে বরং ক্যানসার নিরাময় করা অনেক সহজ। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ক্যানসার হলো লাইফস্টাইল সংক্রান্ত রোগ।**

আর এই কারণেই ক্যানসার থেকে মুক্তি চাইলে আপনাকে লাইফস্টাইল বদলাতে হবে । অন্যথায় শুধু ঔষধ খেয়ে অপারেশান-রেডিয়েশান করে ক্যানসার থেকে মুক্তির আশা কম । অতীতে যদি শয়তানী পথে চলে থাকেন, তবে এখন আল্লাহ্‌র পথে চলে আসুন। অতীতে আপনার মন-মানসিকতা যেমন ছিল, বর্তমানে তাকে একশভাগ পাল্টে ফেলুন। লোভ-হিংসা-অহংকার-ভয়-হতাশা ইত্যাদি মন থেকে দূর করে সেখানে ভালবাসা দিয়ে মনকে ভরে রাখুন। আল্লাহ্‌কে ভালবাসুন, আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ)-কে ভালবাসুন, মানবজাতিকে ভালবাসুন, ফুলকে ভালবাসুন, শিশুদের ভালবাসুন, জীবনকে ভালবাসুন। জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহন করুন, আশাবাদী হউন, হতাশামুক্ত থাকুন। অতীতে যে ধরনের খাবার খেয়েছেন, বর্তমানে তার বিপরীত ধরনের খাবার খান। অতীতে ভাত-তরকারি-মাছ-গোশত বেশী খেতেন, এখন তার বদলে শাক-সবজি-ফল-মূল বেশী খান। সে-সব খাবার আগুনে পুড়িয়ে রান্না করা ছাড়া খাওয়া যায়, সেগুলো বেশী বেশী খান (যেমন - ফল-ফ্রুট) । কারণ আগুনের তাপে খাবারের ভালভাল দরকারী উপাদানগুলি সব নষ্ট হয়ে যায়। মোটাকথা আপনার নিজেকে যতটা সম্ভব বদলে ফেলুন। সে যাক, হোমিওপ্যাথিতে ক্যানসারের চিকিৎসার ব্যাপারে এই রকম ছোট বইয়ে যথাযথ আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই আমাকে সংক্ষেপেই

আলোচনা সারতে হবে। মোট কথা, আপনাকে ক্যানসারের চিকিৎসা করলে চলবে না, বরং করতে হবে ক্যানসার রোগীর চিকিৎসা। সহজ কথায় হোমিওপ্যাথির মূলনীতি "রোগ নয় বরং রোগীর চিকিৎসা কর" অনুযায়ী আপনাকে অগ্রসর হতে হবে। আসল কথা হলো রোগীর যে ক্যানসার আছে তা আপনাকে ভুলে যেতে হবে। তাহলে আপনি কি করবেন ?

হ্যাঁ, ক্যানসার ছাড়া রোগীর আর যতো সমস্যা আছে, আপনি সেগুলো বিদায় করার চেষ্টা করবেন। যখন সেগুলো একে একে সব বিদায় হবে, তখন আপনি অবাক হয়ে দেখবেন যে ক্যানসারও বিদায় নিয়েছে !! হোমিওপ্যাথিতে এমন কোন যাদুকরী ঔষধ নাই যে, মাত্র একটা ঔষধেই ক্যানসার সেরে যাবে। আপনাকে লক্ষণ অনুযায়ী আগে-পরে অনেক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। কারণ ক্যানসার, ডায়াবেটিস, হাঁপানী, যক্ষা প্রভৃতি জটিল রোগের পেছনে অনেক কারণ থাকে এবং সে-সব কারণসমূহ একটা একটা করে দূর করতে আপনাকে একাধিক ঔষধের সাহায্য নিতে হবে। মনে করুন, আপনার ক্যানসার রোগীটি দুর্বলতায় ভোগতেছে তাহলে তার দুর্বলতা দূর করার ঔষধ দিন, তারপর যদি দেখেন সে বাতের সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছে তাহলে লক্ষণ অনুযায়ী ঔষধ দিয়ে বাতের চিকিৎসা করুন ।

যদি দেখেন সে বদহজমে আক্রান্ত হয়েছে তখন বদহজম দূর করুন, যদি দেখেন সে কোষ্টকাঠিন্যে ভোগতেছে তার কোষ্টকাঠিন্য দূর করুন, যদি দেখেন সে মেদভূড়িতে আক্রান্ত তবে এমনভাবে ঔষধ নির্বাচন করুন যাতে তার অন্যান্য সমস্যাও ভালো হয় এবং ওজনও কমে আসে। যদি জানতে পারেন যে রোগী অতীতে এক বা একাধিক টিকা নিয়েছে তবে থুজা ঔষধটি অন্যান্য ঔষধের ফাঁকে ফাঁকে বেশ কয়েক মাত্রা খাওয়ান। যদি জানতে পারেন যে, রোগীর বংশে অর্থাৎ ফ্যামিলিতে ক্যানসার রোগী আছে বা ছিল, তাহলে কারসিনোসিনাম **(Carcinosinum)** ঔষধটি কয়েক মাত্রা খাওয়ান। যদি দেখেন তার শরীরের কোথাও থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে তাহলে প্রথমে তার রক্তক্ষরণ বন্ধ করুন, যদি জানতে পারেন যে মানসিক কষ্ট বা বিষন্নতার কারণে রোগী ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছে, তবে তাকে ইগ্নেশিয়া () বা নেট্রাম মিউর (Natrum muriaticum) ঔষধগুলো কিছুদিন খাওয়ান। যদি জানতে পারেন যে শারীরিক আঘাত পাওয়ার কারণে রোগী টিউমার বা ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছে, তবে তাকে কিছুদিন আর্নিকা **(Arnica montana)** অথবা আর্টিকা (Urtica urens) ঔষধগুলো খাওয়ান। যদি দেখেন রোগী বমি করতেছে তখন বমি দূর করুন, যদি দেখেন সে গ্যাসট্রিক আলসারে ভোগতেছে তাহলে গ্যাসট্রিক আলসার দূর করুন, যদি জানতে পারেন রোগী মাদকাসক্ত তাহলে প্রথমে তার মাদকাসক্তি দূর করুন, যদি বুঝতে পারেন যে রোগীর শারীরিক-মানসিক গঠন জন্মগত ভাবে ক্যালকেরিয়া (Calcarea carbonica), ফসফরাস (Phosphorus), সালফার (Sulphur) ইত্যাদি ঔষধের মতো, তাহলে তাকে কয়েক মাত্রা ক্যালকেরিয়া, ফসফরাস () বা সালফার খাওয়ান। যদি জানতে পারেন যে, রোগী অতীতে গনোরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল তাহলে তাকে কয়েক মাত্রা মেডোরিনাম খাওয়ান। যদি জানতে পারেন যে, রোগী অতীতে সিফিলিসে আক্রান্ত হয়েছিল তাহলে তাকে কয়েক মাত্রা সিফিলিনাম খাওয়ান। যদি জানতে পারেন যে, রোগী অতীতে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়েছিল তাহলে তাকে কয়েক মাত্রা ব্যাসিলিনাম খাওয়ান। যদি দেখেন রোগী উচ্চ রক্তচাপে ভোগতেছে তাহলে উচ্চ রক্তচাপ দূর করার চেষ্টা করুন, যদি দেখেন সে হাঁপানিতে ভোগতেছে তাহলে হাঁপানি দূর করুন, যদি দেখেন সে হৃদরোগে ভোগতেছে তাহলে তার হৃদরোগ আগে দূর করুন, যদি দেখেন সে কিডনী রোগে ভোগতেছে তাহলে প্রথমে তার কিডনী রোগ দূর করুন, যদি দেখেন সে মানসিক রোগে ভোগতেছে তাহলে তার মানসিক রোগের চিকিৎসা করুন । এইভাবে দুই-তিন বছর চিকিৎসার মাধ্যমে রোগীর সকল সমস্যা দূর করার পর আপনি আশ্চর্য হয়ে দেখবেন যে রোগীর টিউমার-ক্যানসারও আশ্চর্যজনক ভাবে হাওয়া হয়ে গেছে ! অথচ আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হলো আপনি ক্যানসারের কোন চিকিৎসাই করেন নাই !!! হ্যাঁ, আমাদের শরীর নিজেই হলো আসল ডাক্তার। হোমিও ডাক্তারদের কাজ হলো শরীরের অসুবিধাগুলো দূর করার মাধ্যমে শরীরকে রোগের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ করার কাজে শক্তি যোগান দেওয়া। অপারেশান এবং এলোপ্যাথিক ঔষধ সেবনের ফলে ক্যানসার রোগীদের তাড়াতাড়ি মৃত্যুর কারণ হলো এসবের মাধ্যমে রোগীর শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে, রোগীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে, ফলে ক্যানসারে মৃত্যুর আগেই রোগী হার্ট ফেল করে মারা যায়। তাছাড়া শরীর দুর্বল হওয়ার কারণে ক্যানসার আবার ফিরে আসে এবং দ্রুত গতিতে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে হোমিও ঔষধে ক্যানসার সহজে সেরে যাওয়ার মূল কারণ হলো হোমিও ঔষধ রোগীর শরীরকে দুর্বল করে না। এজন্য একজন হোমিও চিকিৎসককে সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে যে, রোগীর শরীর যেন কিছুতেই দুর্বল না হয়। যখনই দেখবেন যে, একটি ঔষধে রোগীর শরীর কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছে, সাথে সাথেই সেটি বন্ধ করে এমন একটি ঔষধ দিবেন যাতে রোগীর শক্তি - এনার্জি ফিরে আসে। হোমিওপ্যাথিতে ক্যানসারের চিকিৎসায় সফলতা পেতে হলে অবশ্যই আপনাকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ লেভেলের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। অন্ততপক্ষে প্রধান প্রধান একশত হোমিও ঔষধের একশান-রিয়েকশান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। নীচে ক্যানসারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত অল্পকিছু হোমিও ঔষধের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :-

Thuja occidentalis : রোগী যদি টিকা (vaccine) নেওয়ার কারণে (অর্থাৎ রোগীর যদি বেশী বেশী টিকা নেওয়ার অভ্যাস থাকে) কারণে ক্যানসারে আক্রান্ত হন, তবে থুজা অক্সিডেন্টালিস ১০০০ শক্তিতে (Thuja occidentalis 1M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান, তার একমাস বিরতির পরে থুজা অক্সিডেন্টালিস ১০,০০০ শক্তিতে (Thuja occidentalis 10M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান এবং তারও দুই মাস বিরতির পরে থুজা অক্সিডেন্টালিস ৫০,০০০ শক্তিতে (Thuja occidentalis 50M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান। (রোগীর শরীর যদি বেশ দুর্বল হয়, তাহলে সব ঔষধের ক্ষেত্রেই ৩০, ২০০ ইত্যাদি নিম্ন শক্তি ব্যবহার করবেন।)

**Carcinosinum :** যদি জানতে পারেন যে, রোগীর বংশে অর্থাৎ ফ্যামিলিতে ক্যানসার রোগী আছে বা ছিল, তাহলে কারসিনোসিনাম (Carcinosinum) ঔষধটি কয়েক মাত্রা খাওয়ান। সাধারণত ৩০ বা ২০০ শক্তিতে এক মাস পরপর এক মাত্রা করে খাওয়ান। এই ঔষধটিতে শরীর দুর্বল হয় যায়, কাজেই শরীর দুর্বল থাকা অবস্থায় এটি খাওয়ানো উচিত নয়।

**Scirrhinum : ক্যানসার বা টিউমারের চাকাটি যদি (পাথরের মতো) শক্ত হয়, তবে সিরহিনাম** ঔষধটি কয়েক মাত্রা খাওয়ান। সাধারণত ৩০ বা ২০০ শক্তিতে এক মাস পরপর এক মাত্রা করে খাওয়ান। এই ঔষধটিতে শরীর দুর্বল হয় যায়, কাজেই শরীর দুর্বল থাকা অবস্থায় এটি খাওয়ানো উচিত নয়।

Urtica urens : যদি জানতে পারেন যে শারীরিক আঘাত পাওয়ার কারণে রোগী টিউমার বা ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছে, তবে তাকে কিছুদিন আর্নিকা (Arnica montana) অথবা আর্টিকা (Urtica urens) ঔষধগুলো খাওয়ান। **সাধারণত নিম্নশক্তিতে (কিউ) ৫ ফোটা করে রোজ ৩ বার করে কয়েক সপ্তাহ খান।**

Natrum muriaticum : রোগী যদি বড় ধরনের কোন মানসিক আঘাতের (যেমন- প্রেমে ব্যর্থতা, আপনজনের মৃত্যু, তালাক, চাকরি হারানো ইত্যাদি) কারণে টিউমার/ক্যানসারে আক্রান্ত হন, তবে নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম ১০০০ শক্তিতে (Natrum muriaticum 1M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান, তার একমাস বিরতির পরে নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম ১০,০০০ শক্তিতে (Natrum muriaticum 10M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা

দশটি বড়ি) ঔষধ খান এবং তারও একমাস বিরতির পরে নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম ৫০,০০০ শক্তিতে (Natrum muriaticum 50M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান। পক্ষান্তরে শরীর দুর্বল থাকলে ৩০ শক্তিতে রোজ একবার করে কয়েক সপ্তাহ খাওয়ান।

Syphilinum : যদি রোগী বা রোগীর পিতা-মাতা-স্বামী-স্ত্রী অতীতে সিফিলিসে আক্রান্ত হয়ে থাকে, তবে সিফিলিনাম ১০০০ শক্তিতে (Syphilinum 1M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান, তার একমাস বিরতির পরে সিফিলিনাম ১০,০০০ শক্তিতে (Syphilinum 10M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান এবং তারও একমাস বিরতির পরে সিফিলিনাম ৫০,০০০ শক্তিতে (Syphilinum 50M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান।

Bacillinum : যদি রোগীর যক্ষা বা হাঁপানি রোগের পারিবারিক / বংশগত ইতিহাস থাকে (অথবা ঘনঘন সর্দি-কাশি হওয়ার অভ্যাস থাকে), তবে ব্যাসিলিনাম ১০০০ শক্তিতে (Bacillinum 1M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান, তার তিন মাস বিরতির পরে ব্যাসিলিনাম ১০,০০০ শক্তিতে (Bacillinum 10M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান এবং তারও তিন মাস বিরতির পরে ব্যাসিলিনাম ৫০,০০০ শক্তিতে (Bacillinum 50M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান।

Medorrhinum : অতীতে যাদের গনোরিয়া হয়েছিল অথবা যাদের পিতা-মাতা-স্বামীর গনোরিয়া ছিল, তাদেরকে মেডোরিনাম না খাইয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদেরকে স্থায়ীভাবে রোগমুক্ত করা যায় না। মেডোরিনামের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো পেট নীচের দিকে দিয়ে ঘুমায়, চকোলেট-কমলা খুবই পছন্দ করে, অন্ধকারে ভয় পায়, গতকালের ঘটনাকে মনে হয় অনেক বছর আগের ঘটনা, সব কাজে তাড়াহুড়া করে ইত্যাদি ইত্যাদি। ঔষধটি ১০,০০০ শক্তিতে ৩ মাস পরপর একমাত্রা করে খাওয়া উচিত এবং প্রয়োজন হলে পরবর্তীতে শক্তি বাড়িয়ে খাওয়া যেতে পারে।

Calcarea carbonica : **ক্যানসার বা টিউমারের পিন্ডটি যদি নরম হয়, তবে ক্যালকেরিয়া কার্ব** ঔষধটি খাওয়ান।

Calcarea Fluorica : **ক্যানসার বা টিউমারের চাকাটি যদি শক্ত হয়, তবে ক্যালকেরিয়া ফ্লোর** ঔষধটি খাওয়ান।

Sulphur : অতীতে যাদের বেশী বেশী চর্মরোগ হওয়ার ইতিহাস আছে, তাদেরকে অবশ্যই কয়েক মাত্রা সালফার খাওয়াতে হবে।

Psorinum : অতীতে যাদের দুর্গন্ধযুক্ত চর্মরোগ হওয়ার ইতিহাস আছে, তাদেরকে অবশ্যই কয়েক মাত্রা সোরিনাম খাওয়াতে হবে।

Arsenicum album : আর্সেনিক ক্যানসারের একটি প্রধান ঔষধ। রোগীর মধ্যে **প্রচণ্ড অস্থিরতা (অর্থাৎ রোগী এক জায়গায় বা এক পজিশনে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। এমনকি গভীর ঘুমের মধ্যেও সে নড়াচড়া করতে থাকে।), শরীরের বিভিন্ন স্থানে ভীষণ জ্বালা-পোড়া ভাব, অল্প সময়ের মধ্যেই রোগী দুর্বল-কাহিল-নিস্তেজ হয়ে পড়ে,** রোগীর বাইরে থাকে ঠান্ডা কিন্তু ভেতরে থাকে জ্বালা-পোড়া, অতিমাত্রায় মৃত্যুভয়, **রোগী মনে করে ঔষধ খেয়ে কোন লাভ নেই- তার মৃত্যু নিশ্চিত**, গরম পানি খাওয়ার জন্য পাগল কিন্তু খাওয়ার সময় খাবে দুয়েক চুমুক ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে অবশ্যই আর্সেনিক খওিয়াতে হবে।

Silicea : যাদের হাড় বিকৃতির রোগ থাকলে কয়েক মাত্রা সিলিশিয়া খাওয়ান।

**Carbo animalis :** কারবো এনি ক্যানসারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ বিশেষত যখন রোগীর মধ্যে দুর্বলতার সমস্যাই বেশী থাকে।

**Cundurango :** কান্ডুরাঙগ চামড়া, জিহ্বা, স্তন ইত্যাদির ক্যানসারের একটি সেরা ঔষধ। ইহার প্রধান লক্ষণ হলো মুখের ডান কোণে ব্যথাযুক্ত ফাটল।

**Phytolacca decandra :** ফাইটোলেক্কা ঔষধটি স্তন টিউমার এবং ক্যানসারের আরেকটি সেরা ঔষধ। এটি নিম্নশক্তিতে (Q) ২০ ফোটা করে রোজ দুই বেলা হিসাবে খান দুই মাস ছয় মাস যত দিন লাগে।

## খাবার পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্যানসার থেকে মুক্তি (Diet change cure cancer)

**ঃ- বর্তমানে ক্যানসার নির্মূলের জন্য বিজ্ঞানীরা এক ধরনের খাবার মেন্যু (*Dr Johanna Budwig protocol*) তৈরী করেছেন, যা অনুসরন করে লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্যানসার মুক্ত হচ্ছেন। ইন্টারনেটে খোজাঁখুজি করে এগুলো সংগ্রহ করে নিতে পারেন। হোমিওপ্যাথির আবিষ্কারক মহাত্মা স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের পর জার্মানীর আরেকজন মহান চিকিৎসা বিজ্ঞানী হলেন ডঃ জোহান্না বাডওইগ (*Dr Johanna Budwig, Ph.D.*) । এই ভদ্রমহিলা সারাজীবন অমানুষিক পরিশ্রম করে বিনা ঔষধে বিনা অপারেশানে বিনা রেডিয়েশানে ক্যানসার মুক্তির একটি সহজ পন্থা আবিষ্কার করে দিয়ে**

**গেছেন। তার এই অমূল্য আবিষ্কারের ফলে ধনী থেকে ভিক্ষুক সবাই সহজে অল্প খরচে ক্যানসার থেকে মুক্ত হতে পারছেন। হ্যানিম্যান যেমন মানবজাতিকে এলোপ্যাথিক চিকিৎসার নামে বর্বরতার হাত থেকে বাঁচাতে হোমিওপ্যাথি আবিষ্কার করে দিয়ে গেছেন এবং এই জন্য এলোপ্যাথিক ডাক্তারদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত দেশ ছেড়ে অন্য দেশে (ফ্রান্সে) আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তেমনি ভাবে জোহান্না বাডওইগ-কেও এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা এবং রক্তচোষা এলোপ্যাথিক ঔষধ কোম্পানিগুলির হয়রানিমূলক মামলার কারণে অনেকবার আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে এবং প্রতিবারই তিনি তার দাবীর পক্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত দিয়ে আদালতকে সন্তুষ্ট করে মিথ্যা অভিযোগ থেকে ছাড়া পেয়েছেন। এদের চক্রান্তের কারণে সাতবার নোবেল পুরষ্কারের জন্য মনোনীত হয়েও নোবেল পুরষ্কার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। বিপন্ন মানবতার অকৃত্রিম দরদী এই মহান বিজ্ঞানী ছিলেন জার্মানীর স্বাস্থ্যবিভাগের একজন সিনিয়র বিজ্ঞানী এবং পিএইচডি ডিগ্রীধারী একজন বায়োক্যামিষ্ট। তিনি ছিলেন এলোপ্যাথিক ঔষধ বাজারজাত করার অনুমোদন দানকারী সরকারী বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রধান। একবার একটি ঔষধ কোম্পানি ক্যানসারের একটি নতুন ঔষধ বাজারজাত করার অনুমোদনের জন্য আবেদন করে যা ছিল ফ্যাটি এসিড দিয়ে তৈরী। তিনি সেই ঔষধ কোম্পানীর কাছে জানতে চাইলেন যে, ফ্যাটি এসিড যে ক্যানসার নিরাময় করতে সাহায্য করে এই রকম কোন প্রমাণিত তথ্য তাদের কাছে আছে কিনা ?**

**তারপর তিনি ফ্যাটি এসিডগুলো নিয়ে গবেষণায় লেগে যান। যদিও বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছিলেন যে, ফ্যাটি এসিড ক্যানসার নিরাময়ে কার্যকরভাবে সাহায্য করে কিন্তু অগণিত ফ্যাটি এসিডের মধ্যে ঠিক কোন ফ্যাটি এসিডটি এই কাজ করে এবং কিভাবে সেটি ক্যানসার নির্মূল করে তা তারা জানতেন না। প্রায় দুই যুগের প্রাণান্ত গবেষণার মাধ্যমে তিনি এই অসাধ্য সাধন করে গেছেন। ওটো ওয়াবার্গ ১৯৩১ সালে মেডিসিনে নোবেল পুরষ্কার পান। তিনি ক্যানসার কোষের কার্যপ্রণালী অর্থাৎ বিপাক ক্রিয়া আবিষ্কার করে নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, একটি সাধারণ কোষ ক্যানসার কোষে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বে হঠাৎ অক্সিজেনশূণ্য (anaerobic) হয়ে পড়ে এবং তার প্রচুর পরিমাণে গ্লুকোজের দরকার পড়তে থাকে, যাকে অনেকটা গাজন প্রক্রিয়ার (fermentation) সাথে তুলনা করা যায়। তাঁর মতে, ক্যানসারের একটি মূল কারণ হলো আমাদের দেহ কোষের অক্সিজেনযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের (respiration) বদলে অক্সিজেনবিহীন শ্বাস-প্রশ্বাস চালু হওয়া।**

ক্যানসার নিয়ে বাডওইগের এই গবেষণার এক পর্যায়ে এভাবেই তিনি জানতে পারেন যে, কোষে অক্সিজেনের অভাবেই ক্যানসার আক্রমণ করে অর্থাৎ যে-সব কোষে অক্সিজেন পৌছেঁ না, সে-সব কোষই ক্যানসারে আক্রান্ত হয়। কাজেই ক্যানসারে আক্রান্ত কোষে যে-কোন প্রকারে যদি অক্সিজেন পৌছাঁনো যায়, তবে সেটি ক্যানসার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং পুণরায় স্বাভাবিক কোষে পরিণত হবে। এক একটি ফ্যাটি এসিড নিয়ে বছরের পর বছর গবেষণা করে বিশ বছরেরও বেশী সময় ব্যয় করে শেষ পর্যন্ত তিনি আবিষ্কার করেন যে, ওমেগা-৩ গ্রুপের ফ্যাটি এসিডগুলি (omega-3 fatty acids) কোষে অক্সিজেন পৌছাঁতে সাহায্য করে থাকে। এদের মধ্যে লিনোলিক এসিড (Alpha Linolenic Acid) নামক ফ্যাটি এসিডটি সবচেয়ে কার্যকর , যা তিসির তেলে () সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায়। তাছাড়া মাছের তেল, অলিভ অয়েল এবং অন্যান্য তেলের মধ্যেও পাওয়া যায়। আমাদের প্রাত্যাহিক খাবারে ফ্যাটি এসিডের পরিমাণ এমনিতেই কম থাকে। তার মধ্যেও যে-সব ফ্যাটি এসিড আমরা খেয়ে থাকি, তাদেরকে হয় উচ্চ তাপের সাহায্যে তৈরী করা হয়, না হয় তাদের সাথে কেমিক্যাল মিশানো হয় আর না হয় তাদেরকে দীর্ঘদিন গুদামে ফেলে রাখা হয়। ফলে এই ফ্যাটি এসিডগুলো প্রকৃতপক্ষে মৃত ; এরা আমাদের রোগ প্রতিরোধ এবং রোগ নিরাময়ে কোন সাহায্য করতে পারে না।

ডঃ জোহান্না বাডওইগ তার গবেষণায় দেখতে পান যে, তাঁর খাবার মেনু অনুযায়ী চলা ক্যানসার রোগীদের মাত্র তিন মাসের মধ্যে উন্নতি শুরু হয়ে যায়। টিউমার ধীরে ধীরে ছোট হতে থাকে। এমন রোগীরাও তাঁর ডায়েট অনুসরণ করে দীর্ঘদিন সুস্থ ছিলেন যাদেরকে ডাক্তাররা “বাড়ি গিয়ে ভাল-মন্দ খেয়ে নিন” বলে হাসপাতাল থেকে বিদায় করে দিয়েছেন। ডঃ জোহান্না বাডওইগ মাঝে মাঝে হাসপাতাল থেকে মারাত্মক মারাত্মক ক্যানসার রোগীদেরকে বের করে নিয়ে আসতেন, যাদেরকে ডাক্তাররা বলতেন “আর মাত্র কয়েকদিন বাচঁতে পারে”, সে আর প্রস্রাব করতে পারবে না, সে আর পায়খানা করতে পারবে না। অনেকে শুকনা কাশি দিতে থাকতেন কিন্তু কফ বের করার মতো শক্তিও তাদের ছিল না। সবকিছু আটকে গেছে, ব্লক হয়ে গিয়েছিল। রোগীর আত্মীয়দের আনন্দের সীমা থাকত না যখন দেখা যেতো এমন রোগীদেরও শারীরিক অবস্থা হঠাৎ উন্নতির দিকে যাওয়া শুরু হয়েছে। বাউওইগ ডায়েট কেবল নির্দিষ্ট কোন ক্যানসার নয় বরং সকল ধরনের ক্যানসার নির্মূল করতে পারে। এদের মধ্যে আছে স্তন ক্যানসার (breast cancer), ফুসফুসের ক্যানসার (lung cancer), ব্রেন ক্যানসার (brain cancer), প্রোস্টেট ক্যানসার (prostate cancer), হাড়ের ক্যানসার (Bone cancer), কারসিনোমা (Carcinoma), মূত্রথলির ক্যানসার (bladder cancer), জরায়ু ক্যানসার (uterine cancer), মুখগহ্বরের ক্যানসার (esophageal cancer), পাকস্থলীর ক্যানসার ( stomach cancer), ব্লাড ক্যানসার (Leukemia), গ্ল্যাণ্ডের ক্যানসার (Hodgkin's disease), চামড়ার ক্যানসার (skin cancer) ইত্যাদি ইত্যাদি। বাডওইগ ডায়েট কেবল ক্যানসার নয় ; বরং বাত-ব্যথা (Arthritis), হাঁপানি (Asthma), পেশীর ব্যথা (Fibromyalgia), বহুমূত্র (Diabetes), উচ্চ রক্তচাপ (Blood Pressure), মাল্টিপল স্ক্যালেরোসিস (Multiple sclerosis), হৃদরোগ (Heart Disease), সোরিয়াসিস (Psoriasis), একজিমা (Eczema), ব্রণ (Acne) প্রভৃতি জটিল রোগেও কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। ডঃ বাডওইগ তার সারা জীবনের গবেষণা এবং চিকিৎসা অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে কয়েকটি বই লিখে গেছেন (Flax Oil As a True Aid Against Arthritis, Heart Infarction, Cancer, and Other Diseases)।

তিসির তেল এবং ছানা দিয়ে বাডওইগ ডায়েট (Budwig Diet Flaxseed Oil and Cottage Cheese (FOCC) or quark recipe) তৈরী করার পদ্ধতি ঃ- চায়ের চামচে ৩ চামচ তিসির তেলের সাথে ৬ চামচ ছানা / পনির মিশিয়ে ব্লেন্ডারে এক মিনিট মিশাতে হবে। মিকচারটি যদি খুব আঠালো হয়, তবে তার সাথে দুই/তিন চামচ দুধ মিশাতে পারেন (ছাগলের দুধ হলে বেশী ভালো) । তারপরও যদি খেতে রুচি না হয়, তবে সাথে আম-জাম-কাঠাল-আনারস-আপেল-আঙুর-কমলা-কলা-মুলা-গাজর ইত্যাদি যে-কোন এক বা একাধিক ফল-মূল-শাক-সবজি ইত্যাদি মিশিয়ে আবার ব্লেন্ডারে জুস করে খেতে পারেন। এভাবে দৈনিক তিন থেকে চারবার খেতে হবে। খাবার-দাবারের বেলায় বাডওইগ

ডায়েটের মূল শ্লোগান হলো - খাবারটি যদি আল্লাহ্‌র সৃষ্টি হয় তবে অবশ্যই অসাধারণ এবং তাকে বিকৃত না করে আল্লাহ্‌ যেভাবে সৃষ্টি করেছেন ঠিক সেভাবেই খান (*if God made it then its fine and try to eat it in the same form that God made it*)। এই জন্য রান্না করা খাবার যতটা সম্ভব বাদ দিতে হবে। কেননা আগুনের তাপে এবং সাথে বিভিন্ন ধরনের ঝাঁঝালো মশলা ব্যবহারের কারণে সে-সব খাবারের ৯৯% খাদ্যগুণ / ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। দোকানের এবং কল-কারখানায় তৈরী খাবার একেবারে বাদ দিতে হবে। কেননা এদের সাথে রং-গন্ধ-প্রিজারবেটিভ হিসাবে অনেক রকমের কেমিক্যাল মিশানো হয়, যেগুলো ক্যানসার সৃষ্টি করে থাকে। এমনকি কারখানায় তৈরী মিনারেল ওয়াটারও খাওয়া নিষিদ্ধ। কেননা তাতে ক্লোরিনসহ আরো অনেক রকমের ক্যামিকেল মিশানো হয় এবং রেডিয়েশান ব্যবহার করা হয়। বিজ্ঞানীদের মতে, ক্লোরিন এবং রেডিয়েশান ক্যানসার সৃষ্টি করে। মনে করুন আপনি পুই শাক বা পটল খাবেন। তাহলে একে রান্না করে না খেয়ে বরং কাচাঁই ব্লেন্ডারে জুস বানিয়ে খান। যদি স্বাদ না লাগে তবে সাথে আপেল-কমলা-আঙুর-বেদেনা-তরমুজ-ভাঙ্গি-আম-কাঠাল-জাম্বুরা ইত্যাদি কোন একটি ফলমূল মিশিয়ে নিতে পারেন। সরাসরি চিনি অথবা গুড় খাওয়া যাবে না, একেবারে নিষিদ্ধ। কেননা চিনি/গুড় শরীরের বায়োকেমিক্যাল পরিবেশ অম্লীয় (Acidic) করে ফেলে এবং শরীরের অম্লীয় অবস্থা ক্যানসার সৃষ্টিতে এবং ক্যানসার ছড়াতে বিরাট সাহায্য করে। কাজেই মিষ্টি খাওয়ার প্রয়োজন হলে আম, কাঠাল, আপেল, আঙুর ইত্যাদি মিষ্টি ফলগুলি দিয়ে তার প্রয়োজন সারতে হবে (এবং তাহাও পরিমাণে যত কম হয় ততই মঙ্গল)। গোশত-ডিমঘি - ইত্যাদি প্রাণীজ খাবার বর্জন করতে হবে। কেননা এগুলো উপকারের চাইতে ক্ষতি করে অনেক অনেক গুণ বেশী। কফি খাওয়া বর্জন করতে হবে ; কেননা কফি একটি বিষাক্ত ক্ষতিকর পানীয়। সামুদ্রিক খাবার খাওয়া নিষিদ্ধ। চিংড়ি মাছ এবং চিংড়ি মাছের মতো শক্ত খোলস বিশিষ্ট সকল মাছ / প্রাণী খাওয়া নিষিদ্ধ। মশার ঔষধ, তেলাপোকার ঔষধ, কমদামী সাবান, ডিটারজেন্ট, এমনকি কসমেটিকস নামে যত কেমিক্যাল প্রোডাক্টস আছে, এগুলোর স্পর্শ থেকে সারা জীবনের জন্য দূরে থাকতে হবে। কেননা এগুলোর সবই ক্যানসার সৃষ্টি করে থাকে। মাইক্রোওয়েভ ওভেন নিষিদ্ধ। এলুমিনিয়ামের হাড়ি-পাতিল নিষিদ্ধ। তার বদলে যতটা সম্ভব স্টিলের, সিরামিকের, গ্লাসের, মাটির বা লোহার হাড়ি-পাতিল-থালা-বাসন-কাপ-পিরিজ ব্যবহার করতে হবে। তিসির তেলকে অবশ্যই ফ্রিজের ভেতর অথবা ঠান্ডা তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে। ভেজাল থেকে দূরে থাকার জন্য তিসির তেল না কিনে বরং তিসি কিনে নিজে ভাঙিয়ে তেল করে নিতে পারেন। আইসক্রিম এবং দুগ্ধজাত খাবার বাদ দিতে হবে। ডঃ বাডওইগ তাঁর এই ফরমুলার সাথে অন্যকোন ধরনের চিকিৎসা চালাতে নিষেধ করে দিয়েছেন। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ৫ মিনিট হোক ১০ মিনিট হোক সূর্যরশ্মি / রৌদ্র শরীরে নিতে হবে। কারণ সূর্যের সাথে মানুষের এবং গাছপালার বেড়ে ওঠার এবং সুস্থ থাকার একটি আবশ্যকীয় সম্পর্ক আছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, চামড়ায় তেল দিয়ে সূর্যরশ্মি নিলে শরীরে ভিটামিন ডি তৈরী হয়, যা ক্যানসার প্রতিরোধে খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

মানুষের জীবনটা আসলে একটি বিদ্যুতের খেলা। আর আমাদের হৃদপিন্ডটি হলো প্রধান বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (Power station)। এখন অবশ্য এলোপ্যাথির লোকেরা বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছে। হার্টে লোডশেডিং হলে তারা বৈদ্যুতিক ব্যাটারী (pacemaker) লাগিয়ে দেন। চীন দেশের ডাক্তাররা চার হাজার বছর আগেই এই ব্যাপারে ঈঙ্গিত করে গেছেন। আর হ্যানিম্যান দুইশত বছর পূর্বে বিষয়টি হাতে-কলমে প্রমাণ করে গেছেন যে, মানুষের রোগ হওয়ার মূল কারণ হলো তার শরীরের বৈদ্যুতিক লেবেল বা এনার্জি লেবেলে গোলমাল হওয়া। ডঃ বাডওইগের মতে, আমাদের কোষ যখন তার বৈদ্যুতিক চার্জ হারায়, তখন সেটি অক্সিজেন গ্রহনে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং ক্যানসার আক্রান্ত হয়। ডঃ বাডওইগের মতে, কেমোথেরাপী (chemotherapy) এবং রেডিয়েশান (radiation) সুস্থ কোষের বৈদুতিক প্রবাহ (energy flow) ধ্বংস করার মাধ্যমে তাদেরকে ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়া উপযুক্ত (ripe for cancer) করে তোলে। তিনি ক্যানসার ইন্ডাস্ট্রিকে ক্যানসার হিলিং (healing) না করে ক্যানসার কিলিং (killing) করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। তার মতে, আমাদেরকে সুস্থ কোষগুলির যত্ম নিতে হবে যাতে তারা ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার দিকে না যেতে পারে। তাহলে এই সুস্থ কোষগুলিই ধীরে ধীরে ক্যানসার আক্রান্ত কোষগুলিকে নির্মূল করে দিতে সক্ষম হবে। আসলে ক্যানসারের প্রচলিত এলোপ্যাথিক চিকিৎসা যেহেতু হাজার হাজার কোটি ডলারের বিরাট লাভজনক ব্যবসা ; তাই এর বিরুদ্ধে প্রমাণ ছাড়া কিছু বললে বা লিখলে মামলা এবং জেল-জরিমানার ঝুঁকি আছে।

ডঃ বাডওইগের জীবনেও তেমনি ঘটনা ঘটেছিল। তিনি তাদেরকে একবার এভাবে আক্রমণ করেছিলেন যে, "টিউমারের / টিউমারের সমস্যাকে স্রেফ মাত্রাতিরিক্ত মাংস বৃদ্ধির সমস্যা মনে করা ঠিক না এবং ফলশ্রুতিতে মাংসবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সকল উপায় এবং উপকরণ নিয়ে ঝাপিয়ে পড়া........।" ফলে জার্মানীর কেমোথেরাপি ঔষধ কোম্পানীগুলির লোকেরা ভাবলেন, এই মহিলাকে তার প্রচারণা চালাতে দিলে নিজেদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ফলে তারা ডঃ বাডওইগের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা ঠুকে দিল। আদালত দুই পক্ষের তথ্য-উপাত্ত যাচাই বাছাই করে ডঃ বাডওইগের পক্ষে রায় দিয়ে বললেন, "এই ভদ্রমহিলাকে বিরক্ত করবেন না। ডঃ বাডওইগের তথ্য-উপাত্ত চূড়ান্ত সত্য। বিজ্ঞানের জগতে একটি কলঙ্কজনক ঘটনা আসন্ন ; জনগণ নিশ্চিতভাবেই ডঃ বাডওইগকে সমর্থন করবে"। বাডওইগের গবেষণার বহু পূর্বে থেকেই বিজ্ঞানীরা জানতেন যে, ক্যানসারের সাথে চর্বির (fat) একটি সম্পর্ক আছে। আবার ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মানুষের খাবারের ৬০% থাকে চর্বি অথচ এই অঞ্চলে ক্যানসারের আক্রমণের হার অনেক কম। এই অঞ্চলের খাবারে অলিভ অয়েলের ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। তার মানে সব ধরণের চর্বিতে ক্যানসার হয় না।

অনেকে তিসির তেল (flaxseed oil) ক্যাপসুল আকারে খেয়ে ফেলেন, কিন্তু এটি তিসির তেল খাওয়ার আদর্শ পদ্ধতি নয়। কেননা তিসির তেল পানিতে দ্রবণীয় (water-soluble) নয় । আর পানিতে দ্রবীভূত না হলে সেটি শরীরে ঠিক মতো শোষিত হবে না এবং কাজও করবে না। একে পানিতে দ্রবীভূত করতে যে-সব সহযোগী উপাদান (co-factors) দরকার, তা হলো ম্যাগনেশিয়াম, জিঙ্ক, বি ভিটামিনস ইত্যাদি। অবশেষে ডঃ বাডওইগ এই সমস্যার সমাধান করেছেন। তিনি ঘরে তৈরী ছানার / পনিরের (cottage cheese) সাথে মিশিয়ে তিসির তেল খাওয়ার এক হাজার রেসিপি তৈরী করে দিয়ে গেছেন, যেগুলো খেতে দারুণ সুস্বাদু । আপনি ইচ্ছে করলে এর সাথে আরো মজার মজার অনেক জিনিস যোগ করে স্বাদে বৈচিত্র আনতে পারেন। ছানা / পনিরের মধ্যে থাকা সালফারড প্রোটিনের (sulfured protein) সাথে মিশে ফ্যাটি এসিডটি পানিতে দ্রবীভূত (water-soluble) হবে এবং ফলে এটি আপনার শরীরে শোষিত হবে এবং তারফলে আপনার শরীরের প্রতিটি কোষ তার বৈদ্যুতিক চার্জ ফিরে পাবে। ফলে সুস্থ কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং ক্যানসার আক্রান্ত কোষগুলির অনাহারে ভোগে ভোগে মারা যাবে। ডঃ বাডওইগ তিসির তেল দিয়ে অর্থাৎ ওমেগা-৩ গ্রুপের ফ্যাটি এসিড দিয়ে নিরাময় করার জন্য তিন ধরনের রোগের বিরুদ্ধে গবেষণা করে সাফল্য পেয়েছেন ঃ- ক্যানসার (cancer), বাত (arthritis) এবং হৃদরোগ (heart disease)। আমাদেরকে আবার মূল শ্লোগানে ফিরে আসতে হবে আর তাহলো - আমাদের খাবারই যেন হয় আমাদের ঔষধ )Let your food be your medicine)। আসলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষা ব্যবহার করে ডঃ বাডওইগের গবেষণা সম্পর্কে লিখতে গেলে অনেকেই বুঝবেন না এবং অনেকে বিরক্ত হবেন। এজন্য সহজভাষায় এবং অল্প কথায় কাজ সেরে ফেললাম। যারা ডঃ বাডওইগের ল্যাবরেটরী এবং ক্লিনিক্যাল গবেষনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগ্রহী, তারা http://www.budwigcenter.com এবং http://www.healingcancernaturally.com নামক ওয়েবসাইট দুইটি ছাড়াও আরও লক্ষ লক্ষ ওয়েবসাইটের সাহায্য নিতে পারেন। তাছাড়া আমাজনডটকম থেকে তার লিখিত বইগুলির ইংরেজী অনুবাদ কিনে নিতে পারেন। সারাজীবনের খাওয়া-দাওয়ার স্টাইল হঠাৎ পাল্টানো অনেকের জন্যই কষ্টকর হবে। কাজেই ডাবল স্পীডে ক্যানসার মুক্ত হওয়ার জন্য বাডওইগ ডায়েটের পাশাপাশি একজন হোমিও স্পেশালিষ্টের পরামর্শ মতো হোমিও ঔষধ সেবন করতে পারেন। যদিও ক্যানসার থেকে মুক্তির সবচেয়ে কার্যকর, সহজসাধ্য, ব্যয়সাশ্রয়ী এবং আরামদায়ক হোমিওপ্যাথি কিন্তু আমাদের দেশে সহ পৃথিবীর সকল দেশেই হোমিও বিশেষজ্ঞের সংখ্যা খুবই কম। কাজেই যারা হোমিওপ্যাথি বিশ্বাস করেন না অথবা কোন হোমিও স্পেশালিষ্টের পরামর্শ নিতে অক্ষম, তাদের জন্য বাডওইগ ডায়েট হইল শেষ ভরশা। এলোপ্যাথিক ক্যানসারের ঔষধ প্রস্তুতকারী বহুজাতিক কোম্পানীগুলি ডঃ বাডওইগকে প্রস্তাব দিয়েছিল, তিনি যেন কেমোথেরাপী, অপারেশান এবং রেডিয়েশানের সাথে তার আবিষ্কৃত প্রোটোকল মেনে চলার জন্য ক্যানসার রোগীদেরকে পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি তাদের প্রস্তাবে রাজী হন নাই। তিনি ঘোষণা করেছেন যে, তার খাবার ফরমুলা মেনে চললেই যে-কোন লোক যে-কোন ধরনের ক্যানসার, টিউমার থেকে মুক্তি পাবেন। সাথে কোন কেমোথেরাপী, অপারেশান, রেডিয়েশান ইত্যাদির প্রয়োজন হবে না । এই কারণে এলোপ্যাথিক ক্যানসারের ঔষধ প্রস্তুতকারী বহুজাতিক কোম্পানীগুলি চক্রান্ত করে তাকে নোবেল পুরষ্কার থেকে বঞ্চিত করেছে এবং

**হয়রানীমূলক মামলা করে অনেকবার আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। অবশ্য তিনি তার আবিষ্কৃত এই যুগান্তকারী ডায়েটের সাথে হোমিও ঔষধ খেতে রোগীদেরকে নিষেধ করেন নাই। কেননা তিনি জানতেন যে, হোমিও ঔষধ রোগীদের ইমিউনিটির (Immunity) কোন ক্ষতি করে না; বরং মানুষের ইমিউনিটিকে আরো শক্তিশালী করে ক্যানসার নিরাময়ের গতি বৃদ্ধি করে থাকে। এই জন্য বর্তমানে ডাঃ বাডওইগের যে-সব শিষ্যরা তার ডায়েট প্রোটোকল প্র্যাকটিস করেন, তারা ডায়েট প্রোটোকলের সাথে সাথে রোগীদেরকে লক্ষণ অনুযায়ী হোমিও ঔষধও খেতে দেন।**

## Career as a homeopathic physician (পেশা হিসেবে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার) :-

হোমিওপ্যাথি প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতিসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা পদ্ধতি। আজ থেকে দুইশত বছর পূর্বে জার্মান চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান আবিষ্কার করেন। হোমিওপ্যাথি (homeopathy) ল্যাটিন শব্দ homeo -এর অর্থ সদৃশ বা একই রকম এবং pathy অর্থ ভোগান্তি বা অসুখ। তিনি হোমিওপ্যাথির মূলনীতিকে সংজ্ঞায়িত করেন এভাবে যে, "সদৃশ সদৃশকে নিরাময় করে" (Like cures like)। ল্যাটিন ভাষায় বলা হয় similia similibus curentur. অর্থাৎ যে ঔষধ সুস্থ শরীরে যে-রোগ সৃষ্টি করতে পারে, সেই ঔষধ অল্প মাত্রায় খাওয়ালে তা একই রোগ নিরাময় করতে পারে। পেশাগতভাবে স্যামুয়েল হ্যানিম্যান ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী একজন এলোপ্যাথিক ডাক্তার এবং ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। প্রচলিত চিকিৎসা বিজ্ঞানসমুহের ইতিহাস নিয়ে যারা ব্যাপক পড়াশুনা করেছেন, তারা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, তিনি ছিঁলেন পৃথিবীতে আজ পযর্ন্ত জন্ম নেওয়া সর্বশ্রেষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানী। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন বিদ্রোহী এবং বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রবর্তক। চিকিৎসা বিজ্ঞানকে তিনি বাণিজ্যের পযার্য় থেকে পূণরায় সেবার পযার্য়ে ফিরিয়ে এনেছিলেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কারক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান কেবল একজন শ্রেষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানীই ছিলেন না; একই সাথে তিনি ছিলেন মানব দরদী একজন বিশাল হৃদয়ের মানুষ, একজন মহাপুরুষ, একজন শ্রেষ্ট কেমিষ্ট, একজন পরমাণু বিজ্ঞানী, একজন শ্রেষ্ট চিকিৎসক, একজন অণুজীব বিজ্ঞানী, একজন শ্রেষ্ট ফার্মাসিষ্ট, একজন সংস্কারক, একজন বহুভাষাবিদ, একজন দুঃসাহসী সংগঠক, একজন অসাধারণ অনুবাদক, একজন নেতৃপুরুষ, একজন বিদগ্ধ লেখক, একজন সত্যিকারের ধার্মিক ব্যক্তি, একজন পরোপকারী-ত্যাগী মানব, একজন সুযোগ্য শিক্ষক, একজন আদর্শ পিতা, একজন রোমান্টিক প্রেমিক।

আজ থেকে দুইশত বছর পূর্বে হ্যানিম্যানের সময় চিকিৎসা বিজ্ঞান এতই জঘন্য এবং বর্বরতায় পুর্ণ ছিল যে, হাসপাতাল বা ডাক্তারের চেম্বারকে কশাইখানা বলাই যুক্তিযুক্ত ছিল। সেখানে রোগীদেরকে রাখা হতো ভিজা এবং গরম কক্ষে, অখাদ্য-কুখাদ্য খেতে দেওয়া হতো, দৈনিক কয়েকবার রোগীদের শরীর থেকে রক্ত বের করে ফেলে দিয়ে দুর্বল করা হতো, রোগীদের শরীরে জোঁক লাগিয়ে (Leeching), সিঙ্গা লাগিয়ে (cupping) অথবা রক্তনালী কেটে রক্তপাত করা হতো, পায়খানা নরম করার ঔষধ (purgatives) খাওয়ানোর মাধ্যমে অনেক দিন যাবত রোগীদের পাতলা পায়খানা করানো হতো, বমি করানো হতো ইত্যাদি ইত্যাদি। সিফিলিসের রোগীদের প্রচুর মার্কারী খাওয়ানোর মাধ্যমে লালা নিঃসরণ (salivation) করানো হতো এবং এতে অনেক রোগীই কয়েক বালতি লালা থুথু আকারে ফেলতো এবং অনেক রোগীর দাঁত পযর্ন্ত পড়ে যেতো। অধিকাংশ রোগী (চিকিৎসা নামের) এই কুচিকিৎসা চলাকালীন সময়েই মারা যেতো। শরীরের মাংস অর্থাৎ টিস্যুকে গরম লোহা অথবা বাষ্প দিয়ে পুড়ানো হতো (cauterization),

গরম সুঁই দিয়ে খুচিয়ে চামড়ায় ফোস্কা ফেলা হতো (blistering), লাঠি অথবা পাথরের আঘাতে শরীরে কৃত্রিম ফোঁড়া-ঘা-ক্ষত সৃষ্টি করা হতো এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব ঘা-ক্ষত মাসের পর মাস বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা হতো। মানসিক রোগীদেরকে শিকলে বেধে রাখা হতো, নিষ্টুরভাবে লাঠি দিয়ে তাদেরকে প্রহার করা হতো, কাঠি দিয়ে খোঁচানো হতো, বালতি দিয়ে তাদের শরীরে ঠান্ডা নিক্ষেপ করা হতো এবং আত্মীয়-স্বজনরা দেখতে এলে তাদেরকে জংলী-জানোয়ারের মতো শিকলে বেধে টেনে হিচরে বাইরে এনে দেখানো হতো। উপরে বর্ণিত সকল কিছুই করা হতো মারাত্মক জটিল রোগে আক্রান্ত সংকটাপন্ন রোগীর চিকিৎসা বা রোগমুক্তির নামে (যা আজকের দিনে কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে কল্পনারও বাইরে)।

১৭৯০ সাল থেকে ১৮৫৫ সালে হ্যানিম্যানের মৃত্যু পযর্ন্ত এই দীর্ঘ সময়ে তিনি হোমিওপ্যাথির মুল সুত্রগুলি (aphorism) আবিষ্কার করেছেন, আরো গবেষণা-পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পযার্য়ক্রয়ে তাদেরকে সংশোধন-পরিবধন-পরিবর্তন করেছেন, ঔষধ আবিষ্কার করেছেন, ঔষধের মাত্রাতত্ত্ব (posology) আবিষ্কার করেছেন, ঔষধের শক্তিবৃদ্ধি (potentization) করার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছেন, জটিল (chronic) রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, রোগীদের শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি (miasm theory) আবিষ্কার করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁর সমস্ত আবিষ্কারকে তিনটি মৌলিক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় তিনি বিভিন্ন সংশোধনীর পর অনেকগুলি এডিশন বের করেছেন। **হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকরূপে বিবেচ্য এই বইগুলো হলো- অর্গানন অব মেডিসিন (Organon of Medicine), মেটেরিয়া মেডিকা পিউরা (Materia Medica Pura) এবং ক্রনিক ডিজিজ (Chronic disease)। তাছাড়া লেসার রাইটিংস (Lesser writings) নামে তাঁর আরেকটি মৌলিক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে যাতে তাঁর ছোট ছোট সমস্ত গবেষণা প্রবদ্ধগুলি সংকলিত হয়েছে।**

একজন হোমিওপ্যাথিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মানবজাতির প্রতি মহান আল্লাহর এক বিরাট রহমত স্বরূপ। কেননা তিনি ইচ্ছে করলে মাত্র পঞ্চাশ পয়সার ঔষধে এমন অনেক জটিল রোগ সারিয়ে দিতে পারেন, যা অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে লক্ষ টাকার ঔষধেও সারানো যায় না। হোমিও ঔষধে আজ থেকে দুইশত পুর্বেও এমন অনেক রোগ-ব্যাধি সারানো যেতো যা এখনও অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে নিরাময় করা যায় না। এমন অনেক জটিল রোগ আছে যা এক ফোটা হোমিও ঔষধে সারিয়ে দেওয়া যায় অথচ অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে এসব রোগের জন্য যুগের পর যুগ ঔষধ খেয়ে যেতে হয়। সে যাক, প্রথমকথা হলো হোমিওপ্যাথি পৃথিবীর একমাত্র চিকিৎসা পদ্ধতি যা শতকরা একশ ভাগ বিজ্ঞান সম্মত। পক্ষান্তরে অন্যান্য বহুল প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতিসমুহের কোনটিই শতকরা একশভাগ বিজ্ঞানসম্মত নয়। এদের কোনটিতে বিজ্ঞান আছে দশ ভাগ আর বিজ্ঞানের নামে গোজামিল আছে নব্বই ভাগ আবার কোনটিতে বিজ্ঞান আছে বিশ ভাগ আর বিজ্ঞানের নামে ভাওতাবাজি আছে আশি ভাগ। একমাত্র শতভাগ বিজ্ঞানসম্মত হওয়ার কারণেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সকল রোগই সম্পূর্ণ নির্মুল হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে কোন রোগই নির্মুল হয় না বরং কিছু সময়ের জন্য চাপা পড়ে যায়। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় ছোট-খাটো রোগ চাপা পড়ে কিছু দিন পর বড় বড় রোগে রূপান্তরিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সে-সব চিকিৎসা পদ্ধতিতে ডায়েরিয়ার চিকিৎসা করলে কোষ্টকাঠিন্য/ পাইলস দেখা দেয়, চর্মরোগের চিকিৎসা করলে হৃদরোগ, বাতের চিকিৎসা করলে ক্যান্সার, মানসিক রোগের চিকিৎসা করলে ব্রেন ড্যামেজ, আলসারের চিকিৎসা করলে ধ্বজভঙ্গ ইত্যাদি ইত্যাদি। আরেকটি অসুবিধা হলো প্রচলিত অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতির ঔষধে মারাত্মক

ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে, যেখানে সম্পূর্ণ শতভাগ বিজ্ঞানসম্মত হওয়ার কারণে হোমিও ঔষধের ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া খুবই কম ; একেবারে নাই বললেই চলে।

**পেশাগত প্রশিক্ষণ** নতুন প্রজন্মের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের আমি হোমিওপ্যাথিকে পেশা হিসেবে গ্রহন করার আহ্বান জানাই। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো শতভাগ বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি হওয়ার কারণেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান খুবই জটিল যা একজন গোল্ডেন এ-প্লাস পাওয়া ছাত্র-ছাত্রী ব্যতীত অন্যদের পক্ষে ভালোভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। অথচ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কম মেধাসমপন্নরা হোমিওপ্যাথিকে পেশা হিসেবে নেওয়ার কারণে উল্টো হোমিওপ্যাথির আরো বদনাম বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে সরকারীভাবে হোমিওপ্যাথিতে দুইটি প্রশিক্ষণ কোর্স বিদ্যমান আছে। তার একটি হলো ডিপ্লোমা কোর্স এবং অন্যটি হলো ডিগ্রি কোর্স। ডিপ্লোমা কোর্সটি সারে চার বছর মেয়াদী এবং ডিগ্রি কোর্সটি পাঁচ বছর মেয়াদী। ডিপ্লোমা কোর্সটিকে বলা হয় ডি.এইচ.এম.এস. (D.H.M.S.- Diploma in Homeopathic Medicine & Surgery) এবং ডিগ্রি কোর্সটিকে বলা হয় বি.এইচ.এম.এস. (B.H.M.S.- Bachelor in Homeopathic Medicine & Surgery)। ডিপ্লোমা কোর্সের চার বছর হলো থিওরীটিক্যাল ক্লাস এবং ছয় মাস হলো হাসপাতালে ইন্টার্নী ক্লাস। পক্ষান্তরে পাঁচ বছর মেয়াদী ডিগ্রি কোর্সের চার বছর হলো থিওরীটিক্যাল ক্লাস এবং এক বছর হলো হাসপাতালে ইন্টার্নী ক্লাস। ডিপ্লোমা কোর্সটি পরিচালনা করে বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড (BANGLADESH HOMEOPATHY BOARD), ঢাকা এবং ডিগ্রি কোর্সটি পরিচালিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (UNIVERSITY OF DHAKA) অধীনে। ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা হলো যে-কোন বিভাগ থেকে এস.এস.সি. পাশ অথবা সমমানের যোগ্যতা। অন্যদিকে ডিগ্রি কোর্সের ভর্তির যোগ্যতা হলো বিজ্ঞান বিভাগে এস.এস.সি. এবং এইচ.এস.সি. পাশ অথবা সমমানের যোগ্যতা। ডিপ্লোমা কোর্সে যে-কোন বয়সে ভর্তি হওয়া যায় কিন্তু ডিগ্রি কোর্সে এইচ.এস.সি. পাশের সাথে সাথে ভর্তি হতে হয়। যদিও প্রায় সবগুলো হোমিও মেডিক্যাল কলেজই বেসরকারী, তথাপি এগুলোতে পড়াশুনার খরচ খুবই কম। সাধারণত পনের থেকে বিশ হাজার টাকার মধ্যেই আপনি সাড়ে চার বছর মেয়াদী একটি ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করতে পারবেন। তাছাড়া গরীব এবং মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আছে বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা। সাধারণত হোমিও কলেজগুলোতে এনাটমী, ফিজিওলজী, প্যাথলজী, প্র্যাকটিস অব মেডিসিন, মেটেরিয়া মেডিকা, অর্গানন অব মেডিসিন, মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্স, প্রিন্সিপালস অব হোমিওপ্যাথি, গাইনী এন্ড অবসটেট্রিকস, সার্জারী, ক্রনিক ডিজিজ, হাইজিন এন্ড পাবলিক হেলথ, ফার্মেসী এন্ড ফার্মাকোপিয়া, বায়োকেমিক মেডিসিন, কেইস টেকিং এন্ড রেপার্টরী ইত্যাদি বিষয়সমূহ পড়ানো হয়ে থাকে। যে-সব ছাত্র-ছাত্রী বিজ্ঞান বিভাগে এইচ.এস.সি. পাশ এবং এম.বি.বি.এস. পাশ করেছেন, তাদেরকে অনেকগুলো বিষয় পড়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ডের ঠিকানা ঃ-

বাড়ি নং-১৬

রোড নং-১/এ

নিকুঞ্জ - ২

খিলখেত

ঢাকা-১২২৯

ফোন ঃ- ৮৮০-৮৯৫৯২৮১

৮৮০-৮৯৫৯২৮২

**শিক্ষা প্রতিষ্টান** – হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা এবং ডিগ্রি কোর্স পরিচালনা করার জন্য বাংলাদেশে আছে ৩৯ (উনচল্লিশ) টি হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতাল। উনচল্লিশটি কলেজের মধ্যে কেবল ঢাকাতেই আছে তিনটি হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ। বাংলাদেশের একমাত্র সরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল আছে ঢাকার মিরপুরের চৌদ্দ নম্বরে। ঢাকার অন্য দুটি হোমিও কলেজের একটি হলো ফার্মগেটে এবং আরেকটি জয়কালি মন্দির রোডে। বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন হোমিও কলেজ হলো বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটাল, যা ঢাকার ৪৬/২ নং জয়কালি মন্দির রোডে অবস্থিত (ফোন ঃ ৯৫৬৯৭৪৭)। রাজধানী ঢাকার তৃতীয় হোমিও কলেজটির নাম ফেডারেল হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হাসপাতাল, যা ৭৯ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ফার্মগেইটে অবস্থিত (ফোন ৮১৩০০৯৩, ৮১৪১০১৯)। তাছাড়া নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জামালপুর, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, নরসিংদী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাক্ষণবাড়িয়া, নোয়াখালী, সিলেট, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর, নীলফামারী, পঞ্চগড়, খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, যশোর, কুষ্টিয়া, নড়াইল, বরিশাল এবং ভোলা জেলায় হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ আছে। ডিপ্লোমা কোর্স করা যায় সকল কলেজে অন্যদিকে ডিগ্রি কোর্স করা যায় কেবল মাত্র ঢাকার দুইটি হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজে।

**উচ্চতর প্রশিক্ষণ ঃ** সরকারী রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত ডিপ্লোমা এবং গ্রাজুয়েট হোমিও ডাক্তারদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু সেবামূলক সংগঠন কোচিং দিয়ে থাকে। তাদের মধ্যে একটি হলো হোমিওপ্যাথিক হেলপলাইন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (৪৪ মধ্য পাইকপাড়া, আনসার ক্যাম্প, মিরপুর, ঢাকা। ফোন ঃ ০১৭১৮-০৮২৫১৫)। আরেকটি সংগঠন হলো সেন্টার ফর এডভান্সড স্টাডিজ ইন হোমিওপ্যাথি-ক্যাশ (শাহবাগ, ঢাকা। ফোন ঃ ৭১২১৫৭৭)। এসব সংগঠন থেকে খন্ডকালীন প্রশিক্ষণ নিয়ে যে-কোন হোমিও ডাক্তার তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে রোগীদের সেবায় অধিকতর সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেন। তাছাড়া বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজে পি.ডি.টি. (পোষ্ট ডিপ্লোমা ট্রেনিং) নামে একটি এক বৎসর মেয়াদী উচ্চতর কোর্স আছে, যা সম্পন্ন করে যে-কোন হোমিও ডাক্তার তার পেশাগত নৈপূণ্য বৃদ্ধি করতে পারেন।

**কর্মসংস্থান ঃ** বাংলাদেশে অন্তত কয়েক লক্ষ মানুষ হোমিওপ্যাথি সংক্রান্ত বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থেকে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছেন। এসব পেশার মধ্যে আছে হোমিও কলেজের অধ্যাপক, হোমিও ডাক্তার, হোমিও

নার্স, হোমিও ফার্মাসিষ্ট, হোমিও কেমিষ্ট, হোমিও ঔষধের ব্যবসায়ী, হোমিও ঔষধ কোম্পানীর মালিক, কর্মচারী, বিভিন্ন পযার্য়ের সরবরাহকারী, বিক্রয় কর্মী, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এবং বই-পুস্তক আমদানীকারী, বোতল-শিশি-কর্ক-প্যাকেট ইত্যাদি কোম্পানীর মালিক-কর্মচারী, হোমিও বই-পুস্তক-জার্নালের লেখক-প্রকাশক-বিক্রেতা ইত্যাদি ইত্যাদি। যদিও এখনকার দিনে হোমিওপ্যাথিক গ্রাজুয়েট ডাক্তাররা বি.সি.এস. (স্বাস্থ্য) ক্যাডারেও চাকরি করার সুযোগ পাচ্ছেন, যে সুযোগ অতীতে ছিল না। কিন্তু ডিপ্লোমা হোমিও ডাক্তারদের সরকারী চাকরির সুযোগ অতীতেও ছিল না এবং এখনও নাই। তবে বর্তমানে হোমিও ডাক্তার এবং ছাত্র-ছাত্রীরা ডিএইচএমএস ডিপ্লোমাটিকে ডিগ্রির (বিএ-বিএসসি-বিকম) সমমান আদায়ের জন্য আন্দোলন শুরু করেছে। আশা করা যায়, সরকার বাহাদুর তাদের দীর্ঘদিনের এই ন্যায্য দাবীটি মেনে নিবেন। সেক্ষেত্রে ডিএইচএমএস ডিপ্লোমা করে যে-কোন সরকারী অফিসে চাকুরি করার সুযোগ এসে যাবে।

**ইন্টারনেট সুবিধা ঃ** অন্যান্য শত-সহস্র বিষয়ের মতো ইন্টারনেটে হোমিওপ্যাথি সম্পর্কেও আছে লক্ষ লক্ষ ওয়েবসাইট এবং বিশাল তথ্য ভান্ডার। এসব ওয়েবসাইটে আপনি পাবেন হোমিওপ্যাথি সম্পর্কিত লক্ষ লক্ষ বই-পুস্তক, মেটেরিয়া মেডিকা, রেপার্টরী, গবেষণা প্রবন্ধ, হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের জীবনী, হোমিও ডাক্তারদের বিভিন্ন ঐতিহাসিক সভাসমিতির ছবি, বিভিন্ন সফটওয়ার, লক্ষ লক্ষ কেইস হিস্টোরি ইত্যাদি ইত্যাদি। ইন্টারনেটের বদৌলতে কোন হোমিও ঔষধ কোন গাছপালা থেকে তৈরী করা হয়, ইচ্ছে করলে আপনি তা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই জানতে পারছেন। তথ্য-প্রযুক্তির কারণে হোমিও ডাক্তারদের কষ্ট অনেক কমে গেছে। পূর্বে যেখানে মোটা মোটা বই নাড়াচাড়া করতে হতো, এখন সেখানে একটি কমপিউটার এবং একটি সিডি থাকলেই যথেষ্ট। একটা সিডিতেই হাজার হাজার মোটা মোটা বইয়ের স্থান হয়ে যায় এবং অনেকগুলো বই হাতড়ানোর বদলে মাউস বাটনের সামান্য কয়েকটা ক্লিকই যথেষ্ট। ইন্টারনেটের কারণে মুহূর্তের মধ্যেই আপনি পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তের যে-কোন হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানী বা হোমিও ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে পারছেন এবং তাদের পরামর্শ পেতে পারছেন। ইন্টারনেটের দ্রুত গতির যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণেই আমি ঢাকায় বসে আমেরিকা, ইউরোপ, মিডেল ইস্ট, আফ্রিকার রোগীদের চিকিৎসা করতে পারছি ; যা দশ বছর পূর্বেও ছিল কল্পনার বাইরে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই বিদেশে হোমিওপ্যাথির ওপর বিভিন্ন কোর্স করতে পারছেন। সে যাক, হোমিওপ্যাথির ওপর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা নিম্নে দেওয়া হলো যা থেকে আপনারা প্রভূত উপকার লাভ করতে সক্ষম হবেন। এগুলো হলো ঃ http://www.homeoint.org, http://www.hpathy.com, http://www.homeopathic.com, http://www.vithoulkas.com, http://bashirmahmudellias.blogspot.com, http://bashirmahmudellias.wordpress.com

**আর্থিক সুবিধা ঃ** আপনি যদি একজন হোমিওপ্যাথিতে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হতে পারেন ; তবে দৈনিক দশ-বিশ-পঞ্চাশ হাজার থেকে একলক্ষ টাকা উপার্জন করা কোন কঠিন কাজ হবে না। প্রকৃতপক্ষে যত লোক হোমিওপ্যাথিতে ক্যারিয়ার গড়তে আসেন, তাদের প্রত্যেকেরই নিয়ত থাকে চাকরি নয় বরং প্রাইভেট প্র্যাকটিস। আসলে ডাক্তারীটা হলো একটি স্বাধীন পেশা। চাকুরি করলে বরং নানারকম ঝামেলার শিকার হতে হয়। সরকারী-

বেসরকারী চাকরির চাইতে মানুষের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, দোয়ার মুল্য অনেক বেশী। হোমিওপ্যাথি এতই উন্নত এক চিকিৎসা পদ্ধতি যাতে শতকরা নিরানব্বই ভাগ জটিল রোগই সারিয়ে তোলা যায় কেবল মিষ্টি মিষ্টি ঔষধ মুখে খাওয়ানোর মাধ্যমেই ; কোন প্রকার ইনজেকশান বা কাটাছেড়া না করেই। এমনকি শতকরা নব্বই ভাগ রোগের ক্ষেত্রে ব্যয়বহুল কোন প্যাথলজিক্যাল টেস্ট করারও প্রয়োজন হয় না। এই কারণে শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও আজ এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা থেকে আমেরিকা পর্যন্ত সারা বিশ্বে আবারও হোমিওপ্যাথি জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। প্রচলিত অন্যান্য অবৈজ্ঞানিক অপচিকিৎসা-কুচিকিৎসার কারণে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর রোগ-ব্যাধির সংখ্যা এমন কল্পনাতীতভাবে বেড়ে গেছে যে, মানবজাতির অস্তিত্ব নিয়েই আজ টানাটানি শুরু হয়ে গেছে। মানবসভ্যতার এই মহাদুর্যোগের সময় একমাত্র আদর্শ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তাররাই পারে ত্রাণকর্তার ভূমিকা পালন করতে।

## Case taking form (রোগীর ফরম) :-

হোমিওপ্যাথিতে সঠিকভাবে রোগের চিকিৎসা করার জন্য রোগ সম্পর্কে এবং রোগীর সম্পর্কে অনেক কথা জানতে হয় ; যা অন্যকোন চিকিৎসা পদ্ধতিতে দরকার হয় না। এজন্য আপনি যখন কোন হোমিও স্পেশালিষ্টের নিকট যাবেন, তারপূর্বে নীচের ফরমটি ফিলাপ করে গেলে, সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা পাবেন এবং আপনার রোগমুক্তি ঘটবে তাড়াতাড়ি।

(যে লক্ষণগুলি আপনার মধ্যে আছে, তাদের নীচে দাগ (__) দিন। অতিরিক্ত লক্ষণসমূহ ডট দেওয়া স্থানে লিখুন। কোন লক্ষণ গোপন করলে আপনার রোগ মুক্তিতে বিলম্ব হতে পারে ।)

| নাম - | বয়স - | সেক্স- পুরুষ/ নারী | ঠিকানা - | পেশা - | তারিখ - |
|---|---|---|---|---|---|

**১। রোগের বিবরণ** .............................................................................................................

**২। রোগের অবস্থা বেশী খারাপ হয়** - □ দিনের বেলা □ রাতের বেলা □ নড়াচড়া কয়লে □ বিশ্রামের সময় □ সকালে □ দুপুরে □ বিকেলে □ সন্ধ্যায় □ মধ্যরাতের পূর্বে □ মধ্যরাতের পরে □ শীতকালে □ গ্রীষ্মকালে □ বর্ষাকালে □ গরমে □ ঠান্ডায় □ খোলা বাতাসে গেলে □ শুকনো বাতাসে □ ভেজা বাতাসে □ ঠান্ডা বাতাসে □ ঠান্ডা খাবারে □ বদ্ধ ঘরে □ বিছানায় শুইলে □ খালিপেটে □ ভরাপেটে □ উপরে উঠার সময় □ নীচে নামার সময় □ রোগের কথা চিন্তা করলে □ হাঁটলে □ দাঁড়াইলে □ পরিশ্রম করলে □ মানসিক শ্রমে □ উত্তেজিত হলে □ টেনশন করলে □ কথা বললে □ ঘামলে □ ভিজলে □ ঘুমাইলে □ জাগ্রত অবস্থায় □ ম্যাসেজ করলে □ গরম ঘরে □ চাপ দিলে □ গাড়ি ভ্রমণে □ গান শোনলে □ গোলেমালে □ আলোতে □ অন্ধকারে □ বিকেল ৪টা থেকে ৮টার সময় □ ভোর ৩ টা থেকে ৫ টার সময় □ দুপুর ১২টা থেকে ২টার সময় □ বসা অবস্থায় □ শোয়া অবস্থায় □ ডানকাতে শুইলে □ বামকাতে শুইলে □ সর্বদা একটি নির্দিষ্ট সময়ে □ গর্ভাবস্থায় □ মলত্যাগের পরে □ কাপড় পড়লে □ কাপড় খুললে □ আবহাওয়ার পরিবর্তনে □ স্যাঁতস্যাঁতে স্থানে □ মাসিকের সময় □ যৌন মিলনের পরে □ অমাবশ্যায় □ পূর্ণিমায় □ পানি খেলে □ প্রস্রাব করার সময় □ পায়খানা করার সময় □ স্পর্শ করলে □ শক্ত খাবার খেলে □ তরল খাবার খেলে □ আগুনের কাছে গেলে □ উজ্জ্বল বস'র দিকে তাকালে □ ফল খেলে □ দুধ খেলে □ টক খেলে □ মিষ্টি খাবার খেলে □ কাপড় পড়লে □ মতবিরোধ হলে □ কাশি দিলে □ আলোতে □ অন্ধকারে □ ঝড়-তুফানবজ্রপাতের সময় □ কম্বলের বাইরে হাত নিলে □ চোখ বন্ধ করলে □ কেউ সামনে থাকলে □ চোখ নাড়ালে □ সমুদ্রের ধারে গেলে □ শ্বাস গ্রহনের সময় □ সাতদিন/ পনের দিন/ একমাস/ ছয়মাস/ একবছর পরপর □................................

**৩। রোগ হওয়ার আনুমানিক কারণ ?**

□ ভয় পাওয়া □ আঘাত পাওয়া □ রাগ চেপে রাখা □ পচাঁ/বাসি খাবার খাওয়ায় □ আর্থিক ক্ষতি □ মাত্রাতিরিক্ত যৌনকর্ম □ তেল-চর্বি জাতীয় খাবার □ ঈর্ষা/হিংসা থেকে □ ভেপসা / ভেজা আবহাওয়া □ প্রচণ্ড গরমের সময় ঠান্ডা খাবার খাওয়া □ কারখানায় কাজ করা □ ইট-পাথর ভাঙ্গা □ আপনজনের মৃত্যু □ প্রেমে ব্যর্থতা □ ঠান্ডা বাতাস □ পারদের বিষক্রিয়া □ কোন ধরনের

নিঃস্রাব (ঘাম/সর্দি/মাসিক) হঠাৎ বন্ধ হওয়ায় ☐ কোন জন'র দংশন ☐ ডিজেল/পেট্রোলের কাজ করায় ☐ শোক-দুঃখ ☐ মানসিক আঘাত ☐ মাথায় আঘাত ☐ মাদকাসক্তি ☐ উপর থেকে পতন ☐ সীসার বিষক্রিয়া ☐ টিকা / ভ্যাকসিন নেওয়া ☐ ধূমপান ☐ ঠান্ডা পানিতে পা ভিজানো ☐ বিরক্ত হওয়ার কারণে ☐ ভারী কিছু উঠানো ☐ বিষন্নতা ☐ গর্ভধারন ☐ দুধ খাওয়া ☐ দাঁত উঠা ☐ ঠান্ডা পানিতে গোসল করা ☐ বেশী পড়াশুনা ☐ বেশী পরিশ্রম ☐ দীর্ঘদিন ডায়েরিয়ায় ভোগা ☐ রক্তক্ষরণ ☐ স-ন্যদান ☐...................

**৪। অতীতে যে-সব রোগ হয়েছিল** - ☐ টিবি/যক্ষা ☐ হাঁপানি ☐ টাইফয়েড ☐ সিফিলিস ☐ গনোরিয়া ☐ ক্যান্সার ☐ ব্লাড প্রেসার ☐ হৃদরোগ ☐ কোমরে বাত ☐ গলগন্ড ☐ হার্নিয়া ☐ টিউমার ☐ ফোঁড়া ☐ এলার্জি ☐ কোষ্টকাঠিন্য ☐ চর্মরোগ ☐ গর্ভপাত ☐ ফিস্টোলা ☐ শ্বেতী ☐ জন্ডিস ☐ গ্যাংগ্রিন ☐ ................অপারেশন ☐ টিকা নিয়েছি (বিসিজি, ডিপিটি, হাম, পোলিও, এটিএস, হেপাটাইটিস) ☐ কান পাকা ☐...................

**৫। বর্তমানে যে-সব রোগ আছে** - ☐ ডায়াবেটিস ☐ ব্লাড প্রেসার ☐ গ্যাস্ট্রিক আলসার ☐ পাইলস ☐ হিষ্টেরিয়া ☐ হাঁপানি ☐ দুর্বলতা ☐ রক্তশূণ্যতা ☐ টাক/চুল পড়ে যায় ☐ পিঠে ব্যথা ☐ মাথাব্যথা ☐ অর্ধেক মাথাব্যথা ☐ মাথা ঘুরানি ☐ আঁচিল/মেঞ্জ ☐ চুলকানি ☐ কোমরে বাত ☐ জ্বর ☐ বমি ☐ হৃদরোগ ☐ প্যারালাইসিস ☐ একশিরা ☐ মৃগী ☐ মাদকাসক্তি ☐ ধূমপান ☐ অবশ অবশ ভাব ☐ টিউমার/ চাকা ☐ শ্বাসকষ্ট ☐...................

**৬। নিকট আত্মীয়দের মধ্যে যে-সব রোগ আছে অথবা যে-সব রোগে মৃত্যু হয়েছে ?**
☐ ক্যান্সার ☐ ডায়াবেটিস ☐ সিফিলিস ☐ গনোরিয়া ☐ যক্ষা ☐ এলার্জি ☐ হাঁপানি ☐ ব্রঙ্কাইটিস ☐ পাইলস ☐ একজিমা ☐ শ্বেতী ☐ বোবা ☐ ফিষ্টুলা ☐ প্যারালাইসিস ☐ তোতলামি ☐ বাত ☐ মৃগী ☐ মানসিক রোগ

**৭। ছোটবেলা যে-সব রোগ বেশী হইত** - ☐ চর্মরোগ ☐ সর্দি-কাশি ☐ পেটের অসুখ ☐ কৃমি ☐ দুর্বলতা ☐ বাচাঁর আশা ছিল না ☐ গোয়ার/একঘুয়ে ছিলাম ☐ অল্প পরিশ্রমেই হাপিয়ে উঠতাম ☐ খুব তাড়াতাড়ি লম্বা হয়ে গেছি ☐ পেট ছিল কলসির মতো ☐ শিশুকালে শারীরিক বৃদ্ধি কম ছিল ☐ বড় হয়েও বিছানায় প্রস্রাব করা ☐ খুবই দুষ্ট ছিলাম ☐ ঘরে স্বৈরাচারী কিন্তু বাইরে ভদ্রলোক ☐ ঘরে বাইরে সর্বত্র স্বৈরাচারী ☐ মানুষ এবং পশু-পাখির সাথে নিষ্টুর আচরণ করি

**৮। তাপমাত্রা সম্পর্কিত অনুভূতি ?**
☐ শীত সহ্য করতে পারি না ☐ গরম সহ্য করতে পারি না ☐ দুটোই ☐ কোনটি না ☐ ঠান্ডা বাতাস খুবই পছন্দ ☐ আবহাওয়ার পরিবর্তন হলেই অসুস' হয়ে পড়ি ☐ পেট খোলা রাখতে ভালো লাগে ☐ মাথার তালু সর্বদা গরম থাকে ☐ বাহিরে শীত কিন্তু ভেতরে গরম লাগে ☐ বরফের মতো ঠান্ডা পানি খাই ☐ পাখার বাতাস চাই ☐ তলপেটে মনে হয় জ্বলন্ত কয়লা আছে ☐ শীতকালেও মাথায় কাপড় লাগে না ☐ পা খোলা রাখতে ভাল লাগে

**৯। শারীরিক আকৃতি কেমন ?**
☐ পাতলা/ চিকন ☐ স্বাভাবিক ☐ মোটা ☐ লম্বা ☐ বেঁটে ☐ কালো ☐ শ্যামলা ☐ ফর্সা ☐ কঙ্কালসার ☐ লাবণ্যহীন ☐ বয়সের চাইতেও বেশী বয়স্ক মনে হয় ☐ মুখ দেখতে কাচের ন্যায় চকচকে ☐ অকাল বার্ধক্য ☐ শরীরে পানির পরিমাণ বেশী ☐ প্রচুর খেয়েও শুকিয়ে যাচিছ ☐ অল্প খেয়েও মোটা হয়ে যাচিছ ☐ হাত মেয়েদের হাতের মতো নরম

**১০। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস কেমন ?**
☐ নিয়মিত গোসল করি ☐ নিয়মিত গোসল করি না ☐ দুটোই ☐ কোনটি না ☐ শীতকালেও নিয়মিত গোসল করি ☐ গরমকালে একাধিক বার ☐ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে খুবই সিরিয়াস ☐ ঘনঘন হাত ধোয়ার অভ্যাস ☐ নোংরা স্বভাবের ☐ অনেক দিন পরপর গোসল করি ☐ শিশু গোসল করার সময় কান্নাকাটি করে ☐ পড়নের কাপড়/ বাড়িঘর তাড়াতাড়ি নোংরা করে ফেলে ☐ কোন কিছু এলোমেলো দেখলে ভীষণ রাগ লাগে ☐ বেশী বেশী হাত ধোয়ার অভ্যাস

**১১। যে-সব খাবার/ পানীয় খুব বেশী পছন্দ ?**
☐ টক ☐ ঝাল ☐ দুধ ☐ (সিদ্ধ) ডিম ☐ মাছ ☐ মাংস ☐ বরফ ☐ চা ☐ কফি ☐ চর্বি ☐ আইসক্রিম ☐ চকলেট ☐ কাবাব ☐ মদ-হুয়িস্কি ☐ গোল আলু ☐ কমলা ☐ শাক-সবজি ☐ ভাজা-পোড়া ☐ তেল-ঘি জাতীয় খাবার ☐ ঠান্ডা খাবার ☐ গরম খাবার ☐ তরল খাবার ☐ শুকনা খাবার ☐ ডিম সহ্য হয় না ☐ মিষ্টি খাবারের প্রতি ভীষণ লোভ ☐ লবন বেশী খাওয়ার অভ্যাস ☐ খাওয়ার ব্যাপারে খুব বাছাবাছি ☐ বাজে খাবার বেশী পছন্দ ☐ এতো গরম চা/ কফি খাই যা অন্য কেউ খেলে মুখ পুড়ে যাবে ☐ খাবারে ভীষণ অরুচি ☐ খাই বেশী কিন্তু পান করি কম ☐ পানি পানে দারুণ আগ্রহ ☐ ঠান্ডা পানি , ঠান্ডা বাতাস , ঠান্ডা খাবার পছন্দ ☐ গরম পানি , গরম বাতাস , গরম খাবার পছন্দ ☐ দুধ হজম হয় না ☐ মিষ্টি খাবার পছন্দ

করি না  মাংস পছন্দ করি না  খাবার দেখলেই বমি আসে  লবণ পছন্দ করি না  দুধ পছন্দ করি না  বরফের মতো ঠান্ডা পানি খেতে ভালো লাগে

**১২। ক্ষুধার অবস্থা কেমন ?**

 কম  স্বাভাবিক  বেশী  সবচেয়ে বেশী ক্ষুধা পায় সকাল ১১ টায়  ক্ষুধা আছে কিন্তু খেতে ইচেছ করে না  সব খাবারই নোন্তা লাগে  মুখ তিতা তিতা লাগে  অল্পকিছু খেলেই পেট ভরে যায়  যা খাই তাতেই পেটে গ্যাস হয়  খাওয়ার একটু পরেই আবার ক্ষুধা লাগে  পানি ছাড়া সবই তিতা লাগে  প্রচুর খেয়েও ক্ষুধা মিটে না  চক, কয়লা, পোড়ামাটি, চুনা প্রভৃতি অখাদ্য খাওয়ার ইচ্ছা  খোলা বাতাস খুবই পছন্দ  পিপাসা বেশী  পিপাসা কম  খাওয়ার পর পেট ভার ভার লাগে  যা খাই সব ঠেলে উপরের দিকে উঠতে থাকে  হজমশক্তি দুর্বল  পানি খাওয়ার কিছু পরেই বমি হয়ে যায়

**১৩। ঘুমের অবস্থা কেমন ?**

 কম  স্বাভাবিক  বেশী  পাতলা  গাঢ়  রাতে না হয়ে ভোরের দিকে ঘুম আসে  অল্পতেই ঘুম এসে যায়  খুব ভোরে ঘুম ভেঙ্গে যায়  অনেক ঘুমিয়েও ফ্রেস লাগে না  অল্প ঘুমালেই বেশ আরাম লাগে  ঘুমের মধ্যে অল্পতেই চমকে উঠি  ঘুমের মধ্যে চীৎকার করে উঠি  ঘুমের মধ্যে হাঁটাহাঁটির রোগ  ঘুমের মধ্যে কথা বলি  ঘুমের মধ্যে দাঁত কটমট করি  ঘুমের মধ্যে নাক ডাকে  ঘুমালে শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়  খাওয়ার সময়/পরে ঘুম এসে যায়  ঘুমের সময় মুখ থেকে লালা ঝরে  ঘুমের মধ্যে পায়ে স্পর্শ করলে লাফ দিয়ে উঠি  হাঁটুর মতো বাঁকা হয়ে ঘুমাই

**১৪। কিসে কিসে ভয় পান ?**

 একা থাকতে  লোক সমাগম  অন্ধকার  উপরে ওঠে নীচে তাকাতে  টিকটিকি  তেলাপোকা  সাপ  কুকুর  ভুত-পেত্নী  মৃত্যু  চোর-ডাকাত  বজ্রপাত  ধারালো অস্ত্র  আলপিন  নীচের দিকে নামতে  ক্যান্সার  প্যারালাইসিস  কলেরা  ট্রেন  বদ্ধ ঘর  গরীব হওয়া  চাকরি হারানো  চিপা জায়গা  খোলা বাতাস  ভয় পেলে পেটের ভেতর চন্ করে ওঠে  উপর থেকে পড়ে যাওয়ার ভয় সূচালো জিনিস (যেমন- আলপিন) ..........................

**১৫। আপনার স্মরণশক্তি কেমন ?**

 দুর্বল  স্বাভাবিক  প্রখর  ভুলোমন  নাম , সংখ্যা , মানুষের চেহারা মনে থাকে না  হঠাৎ করে স্মরণশক্তি অনেক কমে গেছে  ছোটবেলা থেকেই স্মরণশক্তি কম  চিন্তা করার শক্তি নাই  কোনো কিছুতে সহজে মনোনিবেশ করতে পারি না  মনোযোগ বেশীক্ষণ এক বিষয়ে রাখতে পারি না  কথা বলার সময় লাইন হারিয়ে ফেলি  চিন্তা ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারি না  ছোটখাট ব্যাপারে বেশী দুঃশ্চিনতা হয়

**১৬। মেজাজ-মর্জি কেমন ?**

 একেবারে ঠান্ডা  স্বাভাবিক  খিটখিটে  অল্পতেই ভীষন রেগে যাই  আমার মতের বিরোধীতা সহ্য করতে পারি না  রাগলেও তা প্রকাশ করি না  মেজাজ-মর্জি ক্ষণে ক্ষণে পাল্টায়  অল্পতেই মনে কষ্ট পাই  ধৈর্য-সহ্য খুবই কম  মেজাজ সর্বদাই চড়া থাকে  রাগের সময় শরীর কাঁপতে থাকে  মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখলে সহ্য করতে পারি না  অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ না করে থাকতে পারি না  টেনশন করলে ডায়রিয়া হয়ে যায়  শরীরের জোর/মনের জোর কমে যাচ্ছে ..........................

**১৭। কোনটি আপনার মধ্যে আছে ?**

 কুসংস্কার  উদ্ভট ধারণা  শুচিবাই  ভ্রান্ত বিশ্বাস  অবাস-ব শব্দ, গন্ধ, স্বাদের অনুভূতি পাই  অবাস-ব শব্দ শুনি

**১৮। বুদ্ধির পরিমাণ কেমন ?**

 কম  স্বাভাবিক  বেশী  জন্ম থেকেই বোকাটে  বুদ্ধি প্রতিবন্দি  বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শিশুদের ন্যায় বোকা হচ্ছি

**১৯। ঘামের অবস্থা কেমন ?**

 ঘাম খুব কম  স্বাভাবিক  ঘাম খুব বেশী  মাথা এবং ঘাড়ে বেশী ঘামায়  ঘুমের মধ্যে / এমনকি চোখ বন্ধ করলেও  সামান্য পরিশ্রমেই প্রচুর ঘামায়  ঘামের গন্ধ টক  শরীর ঘামায় কিন্তু মাথা ঘামে না  রাতে প্রচুর ঘামায়  শরীরের উপরের অংশে বেশী ঘামায়  শরীরের এক পাশে ঘামায়  মাথা বেশী ঘামায়  মাথা ছাড়া সমস- শরীর ঘামায়  শয়ন করলে বেশী ঘামায়  পায়ে দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম  মাথার ঘামে বালিশ ভিজে যায়  শরীরের খোলা অংশ ঘামায়  কপাল ঘামে ভিজে যায়  হাত-পা সর্বদা ঘামে ভিজে থাকে  চামড়া তৈলাক্ত

**২০। কি ধরণের স্বপ্ন দেখেন ?**

 দেখি না  স্বাভাবিক  এলোমেলো  প্রাণবন্ত দুঃস্বপ্ন  নোংরা  অস্থিরতাপূর্ণ  কঠোর পরিশ্রম  গোলাগুলি  ঝগড়া  মাঠে ঘুরতেছি  মজার মজার  দুর্ঘটনা  যৌন উত্তেজক  জন'  ভয়ঙ্কর  মৃত মানুষ  ব্যস-তা  বোবায় ধরা  মৃত্যুবরণ  জটিলতা  রোগব্যাধি  অবাস-ব  উপর থেকে পতন  আগুন  পানি  দুর্ভাগ্যজনক  ডাকাত  বিরক্তিকর

**২১। শিশুকালে যে-সব ব্যাপারে দেরি হয়েছিল ?**

 হাঁটা শিখতে  কথা শিখতে  দাঁত ওঠতে  জানা নেই

**২২। যে-সব রোগ ঘনঘন হয়** -  সর্দি  কাশি  ডায়েরিয়া  মুখের ঘা  টনসিলের সমস্যা  ফোঁড়া  বাতের ব্যথা  কৃমি  প্রস্রাবের রোগ  বদহজম

**২৩। ভীষণ দুর্গন্ধ আছে** -  পায়খানায়  প্রস্রাবে  নিঃশ্বাসে  ঘামে  ঋতুস্রাবে  পূঁজে  নিঃশ্বাস ও কফের দূর্গন্ধ নিজের কাছেও অসহ্য  পায়খানা/ প্রস্রাব/ বমিতে মাছের গন্ধ  পায়খানা এবং ঘামের গন্ধ টক  ঘামের গন্ধ মিষ্টি ধরণের

**২৪। মাসিকের অবস্থা কেমন ?**

 বন্ধ  নিয়মিত  অনিয়মিত  একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে  অল্প স্রাব  বেশী স্রাব  সাদাস্রাব  ব্যথাযুক্ত ঋতুস্রাব  দুর্গন্ধযুক্ত  চাকা চাকা  মাসিকের শুরুতে ডায়েরিয়া দেখা দেয়  মাসিকের সময় ভীষণ দুর্বলতা  মাসিকের কয়েকদিন পূর্ব থেকে মাথাধরা শুরু হয়  প্রথম মাসিক দেরীতে শুরু হয়েছিল  স-ন্যদান কালে জরায়ু থেকে রক্তক্ষরণ হয়  মাসিকের পূর্বে বিষন্নতা  মাসিকের পূর্বে ভীষণ দুর্বলতা  মাসিকের পূর্বে এবং মাসিকের সময় পিঠব্যথা  মাসিক নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই শুরু হয়ে যায়  মাসিকের পূর্বে স-নে ব্যথা হয়  মাসিক শুরু হলে অনেক সমস্যা চলে যায়  মাসিকের পরিবর্তে স-নে দুধ আসে  মাসিকের পরিবর্তে মাথাধরা  সহবাসের পরে জরায়ু থেকে রক্তক্ষরণ ..........................................

**২৫। ব্যথা-বেদনার হালচাল কেমন ?**

 ব্যথা হাতুড়ি মারার মতো  বিজলীর মতো  ছুরি মারার মতো  চেপে ধরার মতো  ব্যথা ঘন ঘন স্থান পরিবর্তন করে  ব্যথা হওয়ার কথা অথচ ব্যথা নেই  ব্যথা হঠাৎ আসে হঠাৎ যায়  ব্যথা কোমর থেকে হাটুর দিকে যায়  ডান কাঁধের নীচে ঝিমমারা ব্যথা ব্যথা তলপেট থেকে স্তনের দিকে যায়  কোমরে ব্যথা  মেরুদন্ডে ব্যথা  আঙ্গুলের মাথায় সুই ফোটানোর মতো ব্যথা  ব্যথা অল্প একটু জায়গায়  তলপেটে নীচের দিকে ঠেলামারা ব্যথা  ক্ষুধা লাগলে মাথাব্যথা শুরু হয়  ব্যথা ধীরে ধীরে বাড়ে এবং ধীরে ধীরে কমে  পেটে ব্যথার সময় ঘনঘন প্রস্রাব হয়  সারা শরীরে ব্যথা  সামান্য স্পর্শেও ব্যথা পাই  শক্ত বিছানায় শুতে পারি না  সামান্য ব্যথাতেই অজ্ঞান হয়ে যাই  ব্যথা একদম সহ্য করতে পারি না ..............................................

**২৬। পায়খানা-প্রস্রাবের বৃত্তান্ত ?**

 কোষ্টকাঠিন্য/ পায়খানা শক্ত (দীর্ঘদিন যাবত)  ঘনঘন প্রস্রাব হয়  প্রস্রাবের রঙ লাল/ কালো/ হলুদ/ বাদামী/ ঘোলাটে  পায়খানায়/ প্রস্রাবে ভীষণ জ্বালা-পোড়া আছে  ছাগলের লেদির মতো পায়খানা  প্রস্রাব খুবই কম  প্রস্রাবের গন্ধ কড়া/ঝাঁঝালো  হাঁচি, কাশি বা হাঁটার সময় প্রস্রাব বেরিয়ে যায়  প্রস্রাব করার সময় পায়খানা বেরিয়ে যায়  প্রস্রাবের সাথে লাল বালুর মতো যায়  প্রস্রাব খুব বেশি  খাওয়ার সাথে সাথেই টয়লেটে যেতে হয়  প্রস্রাবের গন্ধ গরুর চেনার মতো  পায়খানা-প্রস্রাব অজানে-বেরিয়ে যায়  কেউ সামনে থাকলে পায়খানা করতে পারি না  পায়খানা/প্রস্রাব ক্লিয়ার হয় না  পায়খানার রঙ হলুদ/সাদাটে/মাটির মতো  কিছুদিন কোষ্টকাঠিন্য আবার কিছুদিন ডায়েরিয়া থাকে  পায়খানা নরম কিন্তু বের করতে কোথানি লাগে  পায়খানার সাথে আম যায়  রোগের সময় প্রস্রাব বেড়ে যায়  পায়খানার সময় মনে হয় নাড়িভুড়ি/জরায়ু সব বেরিয়ে যাবে  ঝড়-তুফানের সময় ঘনঘন প্রস্রাবের বেগ হয়  পায়খানার পরে খুব আরাম লাগে ......................................

**২৭। শরীরে জ্বালা-পোড়া আছে** -  মাথার তালুতে  হাতের তালুতে  পায়ের তালুতে  পেটের ভেতরে  তলপেটে  চামড়ায়  পায়খানার রাস্তায়  প্রস্রাবের রাস্তায়  চোখে  গলায়  জিহ্বায়  সর্দিতে/ চোখের পানিতে/ বমিতে/ঋতুস্রাবে ভীষণ জ্বালা-পোড়া আছে ....................................

**২৮। রোগের গতি কোন দিকে ?**

 রোগ ডান পাশ থেকে বাম পাশে যায়  রোগ বাম পাশ থেকে ডান পাশে যায়  রোগের আক্রমণ শরীরের ডানদিকে  রোগের আক্রমণ শরীরের বামদিকে  রোগের গতি আড়াআড়িভাবে (যেমন্ত ডান হাতের পরে বাম পা)  নীচ থেকে উপরের দিকে যায়  উপর থেকে নীচের দিকে যায়

**২৯। হার্টের/ হৃৎপিন্ডের অবস্থা কেমন ?**

□ হার্টবিট খুবই দ্রুত □ বুক ধড়ফড়ানি □ হার্টবিট খুবই কম/ধীরে ধীরে □ মাঝেমধ্যে হার্টবিট মিস হয় □ অল্পতেই অজ্ঞান হয়ে যাই □ বুকে দুর্বলতা বোধ হয় □ হৃৎপিন্ডের ভেতরে ঠান্ডা অনুভূত হয় □ হার্টের ব্যাপারে সব সময় দুঃশ্চিন্তায় থাকি □ মনটা সব সময় হার্টের ওপর পড়ে থাকে □ হৃৎপিন্ডটি কেউ যেন লোহার হাত দিয়ে চেপে ধরেছে □ হৃৎপিন্ডটি যেন একটি সুতার ওপর ঝুলে আছে □......................................

**৩০। চোখের অবস্থা কেমন ?**

□ চোখের পাওয়ার কমে গেছে □ সবকিছুই ঝাপসা দেখি □ কাছের জিনিস ভালো দেখি না □ দূরের জিনিস ভালো দেখি না □ দৃষ্টিপথে কালো একটি বিন্দু দেখা যায় □ বেশী আলো সহ্য হয় না □ চোখের ওপরের পাতা ফোলা □ ছানি পড়েছে

**৩১। অন্যান্য শারীরিক লক্ষণসমূহ** - □ মাথার তালূ সব সময় গরম থাকে □ শরীর সব সময় গরম থাকে □ ভেতরে কাপঁতে থাকে □ সর্ব শরীরে কাপুঁনি/দপদপানি □ মাথা গরম কিন্তু শরীর ঠান্ডা থাকে □ পা দুটি সব সময় ঠান্ডা থাকে □ এক পা ঠান্ডা আরেকটা গরম □ রাতের বেলা নাক বন্ধ হয়ে যায় □ দাঁত/ নাক/ মুখ/ পায়খানার রাস্তা থেকে রক্তক্ষরণ হয় □ অল্পতেই গলা বসে যায় □ শরীরের ভেতরে মনে হয় কিছু নাই/ফাঁপা □ সর্বদা হাত ও আঙ্গুল নাড়ানোর প্রবনতা □ অতিরিক্ত পা নাড়ানোর স্বভাব □ এক জায়গায় বেশীক্ষণ সি'র থাকতে পারি না □ (রান্নার) গন্ধ অসহ্য লাগে □ ঘা/ ক্ষত সহজে সারতে চায় না □ কোন রোগই সহজে সারতে চায় না □ পুঁজের রং লাল/ হলুদ/ সাদা/ কালো/ সবুজ □ ছোট্ট কাটা থেকে প্রচুর রক্তপাত হয় □ শরীরের প্রতিটি ছিদ্রপথ থেকেই রক্তক্ষরণ হয় □ হাতের তালু সব সময় গরম থাকে □ মানুষের আওয়াজ কম শুনি কিন্তু অন্যান্য আওয়াজ ভালো শুনি □ কানের ভিতরে শো শো আওয়াজ হয় □ গলায় সিদ্ধ ডিমের (চাকার) মতো কি যেন আটকে আছে □ সামান্য পরিশ্রমেই হাটুতে কাঁপুনি □ হাত-পা ঠান্ডা থাকে □ সারা শরীর বরফের মতো ঠান্ডা □ পায়ের তলায় অত্যধিক সুড়সুড়ি □ ডানকাতে শুইতে পারি না □ বামকাতে শুইতে পারি না □ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গরম বোধ হয় □ সামান্য পরিশ্রমেই কাহিল হয়ে পড়ি □ অনেক পরিশ্রমেও ক্লানত হই না □ অল্প পরিশ্রমেই হাত-পায়ে কাঁপুনি শুরু হয় □ ভ্রমণ করতে ভালো লাগে □ ঘাড়ের উপর কাপড়ের চাপ সহ্য হয় না □ হঠাৎ দাড়ালে মাথা ঘোরায় □ কফ/ থুতু/ নাকের শ্লেস্মা খুবই আঠালো এবং টানলে রশির মতো লম্বা হয় □ হাত থেকে সহজেই জিনিসপত্র পড়ে যায় □ শারীর দুর্বল কিন্তু ব্রেন খুবই ভালো □ আক্রান্ত অঙ্গে শক্তি পাই না □ আঙ্গুলের মাথায় কেমন শুকনো শুকনো লাগে □ কাশি দিলে চোখে পানি এসে যায় □ খোলা বাতাস খুবই পছন্দ □ রোগের লক্ষণ প্রতিমুহূর্তে পাল্টে যায় □ বেশীক্ষণ দাড়িয়ে থাকতে কষ্ট হয় □ মুখের লালা তুলার মতো ঘন □ সামান্য উত্তেজনায় মুখমন্ডল লাল/গরম হয়ে ওঠে □ দাঁতগুলি খুবই দ্রুত ক্ষয় হয়ে গেছে □ যৌন শক্তি দুর্বল □ মাত্রাতিরিক্ত যৌনকর্ম করেছি □ যৌন মিলনের পরে জ্বালা-পোড়া □ ঘনঘন স্বপ্নদোষ হয় □ সহবাসের পর হাটুতে/চোখে সমস্যা হয় □ যৌন মিলনের পরে দুর্বলতা □ যৌনকর্মে আগ্রহ নাই □ সঙ্গমে ব্যথা লাগে □ মনে যৌন চিন্তা বেশী আসে □ অনেকদিন ডায়েরিয়ায় / রক্তক্ষরণে ভোগেছি □ নাক-গলা-জিহ্বা শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে □ দাঁতে দাঁত চেপে ধরতে ইচ্ছা হয় □ ভেতরটা মনে হয় পঁচে গেছে □ হাঁটতে অসুবিধা হয় □ জীবনে প্রচুর ঔষধ খেয়েছি

**৩২। মানসিক লক্ষণসমূহ** - □ অত্যধিক চঞ্চল □ অলস □ ভীষণ অসি'র □ এক পজিশনে বেশীক্ষণ থাকতে পারি না □ সারাক্ষণ আনন্দে থাকি □ বিষন্নতা - মনে আনন্দ নাই □ আবেগপ্রবণ □ অনুশোচনা/অনুতাপ দগ্ধ হইতেছি □ ভবিষ্যতের ব্যাপারে হতাশা □ ধৈর্যহীন □ লজ্জা-শরম কম □ বেশী বেশী কথা বলার স্বভাব □ কথা বলতে ইচ্ছে করে না □ কর্কশ/কটুভাষায় কথা বলার স্বভাব □ বন্ধুত্ব প্রিয় □ উদাসীন/ বেখেয়ালী □ মানুষকে সন্দেহ করার অভ্যাস □ কাউকে বিশ্বাস হয় না □ নিজেকেও বিশ্বাস করি না □ কথায় কথায় ঝগড়া করার স্বভাব □ পরের দোষ খুঁজে বেড়াই □ মিশুক/ সামাজিক □ মানুষের সাথে সহজে মিশতে পারি না □ খরচের ব্যাপারে সাংঘাতিক হিসাবী □ খুবই লাজুক □ ধার্মিক □ ভালোবাসার মানুষদের প্রতি উদাসীন □ টাকা উড়ানোর স্বভাব □ প্রতিশোধ পরায়ণ □ আশাবাদী □ নৈরাশ্যবাদী □ ক্ষমতাপ্রিয় □ শান্তিপ্রিয়-ঝগড়া-বিবাদ পছন্দ করি না □ নেতৃত্বের জন্য পাগল □ বিখ্যাত হওয়ার ইচ্ছা □ গোয়ার / একঘুয়ে স্বভাবের □ হিংসুটে □ রোমান্টিক (রসিক) ধরনের মানুষ □ অন্যকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পাই □ দীর্ঘদিন টেনশান/অশানি-তে ছিলাম □ পরের ভালো দেখতে পারি না □ মনে বড় রকমের কষ্ট পেয়েছিলাম □ নিজেকে বড় এবং অন্যদের তুচ্ছ মনে হয় □ মাতালের মতো লাগে □ মনে হয় আমার সাংঘাতিক কোন রোগ হয়েছে □ বাড়ির জন্য সর্বদা মন কান্দে □ সমাজের / পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা নেই □ মানসিক দুর্বলতা □ এক মুহূর্ত কাজ না করে থাকতে পারি না □ গালাগালি করার অভ্যাস □ সামান্য শব্দেই চমকে উঠি □ গান খুবই পছন্দ করি □ নিজের বা অন্যের কৃতকর্মের পরিণতি নিয়ে ভীষণ দুশ্চিন্তা হয় □ অল্পতেই ভয় পেয়ে যাই □ অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার করে ফেলি □ অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করি □ পার্টি, অনুষ্ঠান, সভা-সমিতি ইত্যাদি নিয়ে পড়ে থাকতে ভালো লাগে □ ধর্মীয় বিষয়ে/ পরকালের মুক্তি নিয়ে বেশী চিন্তা করি □ সবকিছুতে গোপনীয়তার স্বভাব □ সান্ত্বনা দিলে উল্টো ক্ষেপে যাই □ সবকিছুর খারাপ দিকটা আগে চিন্তা করি □ কথায় কথায় কেঁদে ফেলি □ সবকাজেই তাড়াহুড়া করি □ সবকিছু স্বপ্নের মতো মনে হয় □ সহজে মত পাল্টে যায় □ দ্রুত হাঁটার অভ্যাস □ ঘনঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলি □ মনে হয় আমার আখেরাত বরবাদ হয়ে গেছে □ মনের মধ্যে অদ্ভূত-হাস্যকর সব

চিন্তা আসে  মাথায় একসাথে হাজার চিন্তা ঘুরপাক খায়  মনে হয় আর বাঁচব না  সব বিষয়ে সেরা হওয়ার ইচ্ছা  অপরিচিত লোক দেখলে বিরক্ত লাগে  সামর্থের চেয়ে অনেক বেশী পরিশ্রম করি  প্রশ্নের উত্তর দিতে দেরি হয়ে যায়  উচ্চ আওয়াজ ভীষণ অসহ্য লাগে  চাকরি বা পেশার প্রতি আগ্রহ কমে গেছে  ঘনঘন পেশা পরিবর্তনের অভ্যাস  অন্যদের কোন কাজই পছন্দ হয় না  অল্পতেই হাসি অল্পতেই কাঁদি  আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হয় মাথায় গুলি করে/ উপর থেকে লাফ দিয়ে  অন্যের ক্ষতি করার ইচ্ছা হয়  ভয় পেলে হাত-পায়ে কাঁপুনি দেখা দেয়  মানুষের অনেক দুর্ব্যবহার সহ্য করেছি  মনের মধ্যে অনেক রাগ জমে আছে  অল্পতেই মনে কষ্ট পাই  একাকী থাকতে পারি না  একা থাকতে ইচ্ছা করে  কাজ করতে ভালো লাগে না  মানুষ খুন করার ইচ্ছা হয়  মনে হয় সবাই আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতেছে  চাঁদের আলোতে আবেগপ্রবন হয়ে পড়ি  মনে হয় সবাই আমাকে বিষ খাওয়ায়ে মেরে ফেলবে  অশ্লীল গান গাই  নাচে, লাফায়, হাসে, শীস বাজায়  জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ  প্রশংসা শোনলে কান্না পায়  সামান্য কারণেও বিবেক দংশন করতে থাকে  কোন ব্যাপারেই আগ্রহ নাই  কোনো মানুষকেই সহ্য হয় না  স্ত্রী-পুত্র-স্বামী-সন্তানের প্রতি দরদ কমে গেছে  বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি অনাসক্তি  ভবিষ্যতের অজানা অমঙ্গলের ভয় হয়  সব ব্যাপারে ডেমকেয়ার ভাব  মনে হয় পাগল হয়ে যাব  মনে হয় আমার রোগ কখনও ভালো হবে না  ভীষণ অপমানিত হয়েছিলাম  কাজের প্রশংসা শুনতে খুবই পছন্দ করি  মনের মধ্যে ঘৃণা-ভালবাসা কিছুই নাই  বাসায় একা থাকলে মনে হয় ঘরের কোণায় চোর-ডাকাত লুকিয়ে আছে  কারো কোন অসুখ হয়েছে শুনলে মনে হয় আমার নিজেরই হয়েছে

**৩৩। অদ্ভুত লক্ষণসমূহ** -  মনে হয় বাতাসের উপরে হাঁটিতেছি/ ভেসে বেড়াচ্ছি  গতকালের ঘটনাকে মনে হয় অনেক দিন আগের ঘটনা  মনে হয় আমার সাথে অন্য একজন (শিশু) শুয়ে আছে  কে যেনো আমাকে নির্দেশ দিচ্ছে এবং আমি তার কথা মতো চলতে বাধ্য হচ্ছি রক্ত জমাট হলে সুতার মতো লম্বা হয়ে যায়  আমার ভেতরে দুইটি ইচ্ছা কাজ করে - একটি আদেশ করে অন্যটি নিষেধ করে  মাথার ভেতরে যেন ঢেউ খেলতেছে  মাথাটি যেন বড় হয়ে গেছে  নিজেকে দুইজন মনে হয়  শিশুদের পছন্দ হয় না  নিজেকে গর্ভবতী মনে হয়  গান অসহ্য লাগে  মনে হয় গরম কিছু একটা গলায় উঠে এসে দম আটকে দিচ্ছে  মনে হয় পেটের নাড়িভূড়ি সব নীচে দিয়ে বেরিয়ে যাবে  সারাক্ষণ বকবক করি  নিজেকে কোন ফেরেশতা বা জ্বিনের শিষ্য মনে হয়  এক হাত এক পা বেশী নড়ে  চিবানোর মতো করে মুখ নড়ে  একবাক্য বারবার বলি  চেনা জায়গা হঠাৎ অচেনা লাগে  সকাল না বিকাল বুঝতে পারি না  চামড়ার নীচে মনে হয় বালু আছে/পোকা হাঁটিতেছে  গলায় মনে হয় ধুলাবালি আছে  আমার চারদিকে সাপ দেখি  মল-মূত্র-গোবর খাওয়ার স্বভাব  মুখের ওপর মাকড়সার জালের মতো লাগে  শরীরটা মনে হয় টুকরা টুকরা হয়ে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে  মনে হয় পেটের ভেতরে বুদবুদ উঠতেছে  বুকে-পেটে জীবন্ত কিছু একটা নড়াচড়া করতেছে  অট্টহাসি-চীৎকার-হৈহুল্লোর করতে ইচ্ছে হয়  আলপিন নিয়ে ব্যস- থাকি



**Cataract (চোখে ছানি পড়া) :** চোখের ছানি পড়ার প্রথম দিকে অথবা মাঝামাঝি পর্যায়ে থাকলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধে সেটি অপারেশন ছাড়াই সারানো যায়। অর্থাৎ বলা যায় চোখের ছানি ৭০% ভাগ পরিপক্ক (mature) হলেও সেটিকে ঔষধে সারানো যায় কিন্তু ১০০% ম্যাচিউরিটি লাভ করলে সেটিকে অপারেশন ছাড়া অনেক সময় দূর করা যায় না। তবে অপারেশান করলেও সাধারণত দুয়েক বছর পরই আবার অনেকের ছানি ফিরে আসে।

Calcarea fluorata : বার্ধক্যজনিত চোখের ছানি দূর করতে এটি একটি শ্রেষ্ট ঔষধ। নিম্নশক্তিতে কয়েক মাস খেতে হতে পারে।

Sulphur : চুলকানী-চর্মরোগ বেশী হয়, সকাল ১১টার দিকে ভীষণ ক্ষুধা পায়, শরীরের বিভিন্ন স্থানে জ্বালাপোড়া করে, **নোংরা স্বভাবের, গোসল করতে চায় না, ভাবুক বা দার্শনিক স্বভাবের, মাথা গরম কিন্তু পা ঠান্ডা থাকে,** একই রোগ বার বার দেখা দেয় ইত্যাদি লক্ষণ যাদের মধ্যে পাওয়া যাবে, তাদের চোখের ছানি সালফার প্রয়োগে সেরে যাবে।

Phosphorus : ফসফরাসের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো এই রোগীরা খুব দ্রুত লম্বা হয়ে যায় (এবং এই কারণে হাঁটার সময় সামনের দিকে বেঁকে যায়), অধিকাংশ সময় রক্তশূণ্যতায় ভোগে, রক্তক্ষরণ হয় বেশী, অল্প একটু কেটে গেলেই তা থেকে অনেকক্ষণ রক্ত যায়, **রোগী বরফের মতো কড়া ঠান্ডা পানি খেতে চায়,** মেরুদন্ড থেকে মনে হয় তাপ বেরুচ্ছে, একা থাকতে ভয় পায় ইত্যাদি ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে সেটি আপনার চোখে ছানি সারিয়ে দিবে।

Silicea : সিলিশিয়ার রোগীরা হয় **শীতকাতর, এদের জন্মগত হাড়ের সমস্যা থাকে, মারাত্মক ধরণের বাতের সমস্যা থাকে,** এক বা একাধিক অঙ্গ চিকন হয়ে যায়, মনের জোর বা আত্মবিশ্বাস কমে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

Magnesia carbonica : আলসার হয়ে বা অন্য কোন কারণে কর্ণিয়া গোলাটে হয়ে গেলে বা ছানি পড়লে ম্যাগ কার্ব ঔষধটি তা দূর করে দিতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরোপুরি না পারলেও দৃষ্টি শক্তির অনেকটা উন্নতি করে দিতে পারে। **মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম বা টেনশানে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে, ঠান্ডা বাতাস সহ্য করতে পারে না,** খুবই সেনসেটিভ ইত্যাদি লক্ষণ পেলে এটি প্রয়োগ করা উচিত।

Causticum : অল্পতেই ভীষণ রেগে যায়, শীত সহ্য করতে পারেন না, শরীরের এক বা অনেক জায়গায় প্যারালাইসিস (অবশ) হয়ে থাকে, দাঁড়িয়ে পায়খানা করলে ভালোভাবে করতে পারা যায়, পেটে বা শরীরের বিভিন্ন স্থানে জ্বালাপোড়া করে, গোসল করলে রোগ বেড়ে যায়, **অন্যের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারে, অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে থাকতে পারে না** ইত্যাদি লক্ষণের উপর ভিত্তি করে কষ্টিকাম প্রয়োগ করতে হয়।

Calcarea Carbonica : মোটা থলথলে শারীরিক গঠন, মাথা বড়, পা সব সময় ঠান্ডা থাকে, শিশুকালে দাঁত উঠতে বা হাঁটা শিখতে দেরী হয় থাকে, **শরীরের চাইতে পেট বেশী মোটা, খুব সহজে মোটা হয়ে যায়, প্রস্রাব-পায়খানা-ঘাম সব কিছু থেকে টক গন্ধ আসে, হাতের তালু মেয়েদের হাতের মতো নরম** (মনে হবে হাতে কোন হাড়ই নেই), মাথা ঘামে বালিশ ভিজে যায়, মুখমন্ডল ফোলাফোলা ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে প্রয়োগ করতে হয়।

## Charity for treatment (চিকিৎসায় সাহায্যের জন্য আবেদন প্রসঙ্গে) :-

মানুষের জীবনে রোগ-ব্যাধির চাইতে বড় বিপদ সম্ভবত আর একটিও নেই। আবার যদি তা হয় এমন রোগ যার চিকিৎসা করাবার মতো আর্থিক সামর্থই রোগীর নেই, তবে সেটি নিশ্চয় বিপদের চূড়ান্ত। তবে আমার ধারণা, একজন মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় বিপদ নিঃসন্দেহে অজ্ঞতা। তাছাড়া এখনকার দিনে মানুষের জীবন এতো জটিলতার আবর্তে আষ্টেপৃষ্টে বাধা যে, তাকে অনেক অনেক ঝামেলা থেকে বাচাঁর জন্য অনেক কিছু জানতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সামান্য একটা বিষয় না জানার কারণে কেউ কেউ প্রচণ্ড রকমের বঞ্চনার স্বীকার হয়ে কিংবা বড় ধরণের বিপদে পতিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতো কথা বলছি একারণে যে, অসুখ-বিসুখ যেহেতু মানুষের জীবনের একটি মারাত্মক সমস্যা; সেহেতু এ সম্পর্কে আমাদের যতো বেশি জানাশোনা থাকবে, ততই শান্তি। চিকিৎসার খরচ জোগাতে বাড়িঘর-ভিটেবাটি বিক্রি করে সর্বহারা হয়ে শেষ পযর্ন্ত আমরা অনেকেই পত্রিকায় সাহায্যের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকি। অথচ একটু বুদ্ধি করে যদি আমরা কোন ভালো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হই; তবে খুবই অল্প খরচে আমরা এসব তথাকথিত কঠিন রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারি।

আমার এক বন্ধু হেপাটাইটিসে আক্রান্ত হলে একজন লিভার বিশেষজ্ঞ তার নিকট কয়েক লক্ষ টাকার বাজেট দিয়েছিল। কিন্তু সে হামদর্দের চিকিৎসা গ্রহন করে অন্তত দশগুণ কম খরচে হেপাটাইটিস রোগ থেকে মুক্ত হয়েছিল। আমি নিশ্চিত, সে যদি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অবলম্বন করতো, তবে একশগুণ কম খরচে হেপাটাইটিস থেকে মুক্ত হতে পারত। এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় কেবল সে-সব রোগই সহজে আরোগ্য হয়, যে-সব রোগ কোন জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট। তাছাড়া অন্যান্য রোগ অর্থাৎ ক্রনিক বা পুরাতন জটিল রোগ নিরাময় করার ক্ষমতা এলোপ্যাথিক

ঔষধের নাই। কিছুদিন পূর্বে পত্রিকায় দেখলাম একটি জটিল চর্মরোগে আক্রান্ত শিশুকে একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ত্রিশ লাখ টাকা নিয়ে সিঙ্গাপুর যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন অথচ হোমিও চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের পুস্তকে দেখা যায় দশ টাকার ঔষধেই তারা এসব রোগ সারিয়ে দিয়েছেন। চিকিৎসাকাজে সাহায্যের আবেদন সম্বলিত বিজ্ঞাপনগুলোতে এমন অনেক রোগই দেখা যায়, যা হোমিও চিকিৎসায় খুবই সামান্য খরচে আরোগ্য করা সম্ভব। আমার মতে, যে-সব রোগের চিকিৎসায় প্রচুর টাকা দাবী করা হয় অথবা অপারেশন করতে বলা হয়; সে-সব রোগের চিকিৎসায় এলোপ্যাথির চিন্তা মাথা থেকে বাদ দেওয়া উচিত। এলোপ্যাথি হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাণিজ্য। এর কাজই হলো তিলকে তাল বানানো এবং মানুষকে ভয় দেখিয়ে টাকা খসানো। আমরা অনেকেই জানি না যে, লিভার, কিডনী, ব্রেন এবং হার্টের অনেক বড় বড় রোগ হোমিওপ্যাথিতে খুবই অল্প খরচে সারিয়ে তোলা যায়। তবে এজন্য অবশ্যই বিশেষজ্ঞ হোমিও চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হওয়া উচিত এবং নিজেদের মেধাবী সন্তানদেরকে হোমিও কলেজে পাঠানো উচিত। কিছুদিন পূর্বে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে জন্মগত হৃদরোগে (Dextrocardia) আক্রান্ত দশ বছর বয়সী একটি মেয়েকে আমি মাত্র পচিঁশ পয়সার হোমিও ঔষধ খাইয়ে রোগমুক্ত করে দিয়েছিলাম, যাকে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা (Cardiologist) অপারেশানের জন্য এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে যোগাযোগ করতে বলেছিলেন। হ্যাঁ, একজন মেধাবী হোমিও চিকিৎসক ইচ্ছে করলে এই রকম অগণিত অবিশ্বাস্য বিস্ময়কর ঘটনা ঘটাতে পারেন।

অনেকের ধারণা, অন্যান্য চিকিৎসার চাইতে এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় যেহেতু বেশী পয়সা খরচ হয়, সেহেতু এটি নিশ্চয় সবার সেরা। কিন্তু ভেবে দেখুন, আর্থিক মূল্যই যদি শ্রেষ্টত্বের প্রমাণ হতো তবে নিশ্চয় ঘি-এর চাইতে চালের দাম বেশী হতো। কেননা ঘি ছাড়া আমরা অনেক বছর চলতে পারি কিন্তু চাল ছাড়া একমাসও না। তবে ইহা সত্য যে, এলোপ্যাথিতে মেধাবী চিকিৎসকের সংখ্যা যতো বেশী; হোমিওপ্যাথি-ইউনানী-আয়ুর্বেদিতে ততই কম। কিন্তু তারপরও বাস্তবতা হলো মোটরগাড়ি বিকল হলে মোটর মেকানিক্সের কাছেই যেতে হবে; আর্কিটেকটদের কাছে গেলে চলবে না তাদের সংখ্যা যত বেশীই হোক না কেন। উন্নত বিশ্বের লোকেরা এলোপ্যাথিক চিকিৎসার মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা সীমাবদ্ধতা অনুধাবন করার কারণে অনেক পূর্বেই হোমিওপ্যাথি, কবিরাজি প্রভৃতির দিকে চলে গেছে আর আমরা শিক্ষা-দীক্ষা-সচেতনতার অভাবে এখনও এলোপ্যাথি নিয়ে পড়ে আছি। স্রেফ ইন্টারনেটেও যদি একটু লক্ষ্য করেন, তবে আপনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবেন ইউরোপ-আমেরিকায় লতাপাতার দাপট দেখে। আমাদের ঢিলেমির কারণে এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথির মতো কবিরাজি চিকিৎসাতেও তারা খুব শীঘ্রই আমাদের হারিয়ে দিবে শোচনীয়ভাবে।

**রাসায়নিক পদার্থ মানবজাতির বিলুপ্তি ঘটাতে যাচ্ছে (Chemical is gonna extinguish human race) :** আজ দশ বছরেরও বেশী হবে আমি টুথপেষ্ট ছাড়া দাঁত মাজা শুরু করেছি। হ্যাঁ, ব্যাপক পড়াশুনার পর আজ থেকে দশ বছর পূর্বে যখন আমি নিশ্চিত হই যে, মানবজাতি ক্যানসার-ডায়াবেটিসসহ আজকের যুগে যত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর এবং অভূতপূর্ব রোগে আক্রান্ত হচ্ছে তার মূল কারণ তাদের জীবনকে চব্বিশ ঘণ্টা ক্যামিকেলের সংস্পর্শে সপে দেওয়া ; তখন থেকেই নিজেকে যতটা সম্ভব ক্যামিকেলের আলিঙ্গন থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করছি। আমাদের এই তথাকথিত আধুনিক জীবন এতটাই ক্যামিক্যালাইজড হয়ে গেছে যে, তাদের ক্ষতিকর প্রভাব কল্পনা করলেও গা শিউরে ওঠে । এই আর্টিক্যালটি আজ পাঁচ বছর যাবত আমার মাথার মধ্যে ড্রাফট করে রেখেছি কিন্তু সময়ের অভাবে লিখার সময় পাচ্ছি না । কিন্তু এই বইটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ছাড়াই পাঠকের দুয়ারে চলে যাবে ভেবে জোর করে লিখতে বসে গেলাম । ভেবে দেখুন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমরা যে টুথপেষ্ট দিয়ে দাঁত মাজি তা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় যে কনডম ব্যবহার

করি অথবা জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি খাই এর সবই ক্যামিক্যাল । আর সারাদিন আমরা যতকিছু খাই, ব্যবহার করি অথবা যতকিছুর নিকট অবস্থান করি, মোটামুটি বলা যায় তার সবই ক্যামিক্যাল । তাদের মধ্যে কোন কোনটিতে ক্যামিক্যাল আছে একটি আবার কোন কোনটিতে ক্যামিক্যাল আছে একাধিক। যারা শহরে বাস করেন তাদের নিঃশ্বাসের বাতাসেও আছে ডিজেল-পেট্রোল-অকটেন-কেরোসিন-সীসা আর খাবার পানিতে আছে ক্লোরিন-ফ্লোরিন ইত্যাদি ক্যানসার সৃষ্টিকারী কেমিকেল। বাচ্চাকে একটি চকলেট কিনে দিবেন ?
এতেও আছে অন্তত কয়েক রকমের রোগ সৃষ্টিকারী কেমিক্যাল।

এখন দেখা যাচ্ছে যে, মাছ-তরকারি-ফল-ফ্রুট-শাক-সবজি সবকিছুতে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কেমিক্যাল মিশানো হচ্ছে। আজকে টিভিতে দেখলাম এক সিঙ্গারা বিক্রেতা বলছে যে, সে সিঙ্গারা ভাজার সময় তেলের সাথে কিছু মবিলও মিশিয়ে দেয়, কারণ এতে করে সিঙ্গারা অনেক বেশী সময় পর্যন্ত মচমচে থাকে। খাবার এবং ঔষধের পর কেমিকেলের সবচেয়ে বড় আখড়া হলো প্রসাধনী বা কসমেটিকসগুলি। কসমেটিকসের দোকানে গেলে বুঝা যায়, কত কিসিমের কসমেটিকস যে মানুষ আবিষ্কার করেছে আর অপরিণামদর্শী আদম সন্তান সেগুলো চোখ বুজে ব্যবহার করছে। ইদানীং মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেরাও নানা রকমের কসমেটিকস ব্যবহার করে সুন্দরী হওয়ার চেষ্টায় রত আছে। আমার বন্ধুর কলেজ পড়ুয়া ছেলে চুলে জেল ব্যবহার করে করে মাথায় একজিমা বানিয়ে ফেলেছিল। শেষে বছর খানেক এলোপ্যাথি-হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা নিয়ে তার থেকে মুক্তি পেয়েছে। হয়ত তার চামড়ার ওপর যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছিল, তা থেকে সে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু চুলের জেলগুলি তার লিভার-ব্রেন-কিডনী-চোখ-হার্ট ইত্যাদির যেই ক্ষতি করেছে, তা জানতে হয়ত অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে। হয়তোবা কোনদিনই জানা যাবে না !! আরেকটি জঘন্য ক্যামিকেল যা প্রতিনিয়ত আমাদের শরীরে ঢুকতেছে, তাহলো সাবান এবং ডিটারজেন্ট পাইডার। বিশেষত ডিটারজেন্ট পাউডার, ব্লিচিং পাউডারগুলি যে কত ক্ষতিকর তা যদি মানুষ জানত, তবে ময়লা কাপড় পড়ে থাকাকেই ভাল মনে করত। মনে রাখবেন যেই সাবান বা ডিটারজেন্ট ময়লা পরিষ্কারে যত বেশী এক্সপার্ট সেটি আপনার স্বাস্থ্যের জন্য তত বেশী ক্ষতিকর। কিছুদিন পূর্বে পত্রিকায় একটি হেডলাইন দেখেছিলাম, “গত বছর দেশবাসী ১৫০০ কোটি টাকার বিষ খেয়েছেন”। খবরে বলা হয়েছে যে, গত বছর দেড় হাজার কোটি টাকার কীটনাশক বিষ আমদানী করা হয়েছে এবং এগুলো ফসলের জমিতে ব্যবহার করা হয়েছে এবং আলটিমেটলি সেগুলো চাল-ডাল-শাক-সবজির সাথে আমাদের পেটেই গেছে। ইদানীং ডাক্তারদের চেচামেচির কারণে সাধারণ মানুষ বেশী বেশী শাক-সবজি খাওয়ার অভ্যাস করে ফেলেছে কিন্তু বাস্তবে যেহেতু শাক-সবজিতে কীটনাশক বিষ বেশী দিতে হয়, তাই বলা যায় বেশী বেশী শাক-সবজি খাওয়াতে উপকারের চাইতে ক্ষতিই বেশী হচ্ছে।

আপনি যেই কাগজে আমার আর্টিক্যালটি পড়ছেন, সেটি যে কাগজে ছাপা হয়েছে সেই কাগজটিও অনেকগুলো ক্যামিকেলের সমষ্টি এবং যেই কালিতে ছাপা হয়েছে তাতেও আছে অনেকগুলো ক্যামিকেল। এই ক্যামিকেলগুলো হাতের আঙুলের চামড়া দিয়ে আপনার শরীরে ঢুকছে। বেশী কাছে নিয়ে পড়লে সেগুলো বাতাসের সাথে মিশে আপনার নিঃশ্বাসের সাথেও শরীরে ঢুকে যায়। আমার একজন পরিচিত লোক একটি বড় ছাপাখানায় কাজ করে, একদিন সে বলল তাদের ছাপাখানায় কিছুদিন পরপরই একজন একজন করে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়। (সে কি ধরনের উত্তর দেয় পরীক্ষা করার জন্য) আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, “এতো লোকের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার কারণ কি বলে আপনার মনে হয় ?”। সে একজন অশিক্ষিত মানুষ, তারপরও উত্তরে বলল, “ছাপাখানায় অনেক রকমের ক্যামিকেল নাড়াচাড়া করতে হয় তো, মনে হয় এই কারণেই”। সে যাক, আপনি যেই কমপিউটার মনিটরে আমার আর্টিক্যালটি পড়ছেন, সেই মনিটর থেকে যেই রেডিয়েশান হচ্ছে তাও একটা ক্যামিকেল। কল-

কারখানায় তৈরী সব খাবার-পানীয়তেই আছে এক বা একাধিক ভয়ঙ্কর ক্যামিকেল আছে। প্রিজারভেটিভের নামে, খাবারে রঙ দেওয়ার নামে, খাবারে গন্ধ দেওয়ার নামে যতো ক্যামিকেল খাবার বা ঔষধ কোম্পানীগুলি ব্যবহার করে, তার সবই সম্ভবত মারাত্মক ক্ষতিকর। বিজ্ঞানীদের সব কথা চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করবেন না যখন তারা বলেন যে, এই রাসায়নিক পদার্থটি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো এবং ঐ কেমিক্যালটি স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর। কারণ পৃথিবীর সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনীতি বা ব্যবসা (মানে লাভ-লোকসানের ব্যাপার আর কি !)। মানুষ তার লাভের জন্য সত্যকে চাপা দিয়ে দেয় আবার মিথ্যাকে রঙ মাখিয়ে সত্য বানিয়ে ফেলে। আমি গত বিশ বছরে অনেকবার পত্রিকায় দেখেছি, একবার বিজ্ঞানীরা বলছে ফ্লোরাইড দাঁতের এনামেলের ক্ষতি করে আবার বলছে উপকার করে । বড় বড় কোম্পানীগুলো ভাড়া করা বিজ্ঞানী দিয়ে ভুয়া রিসার্স করে তাদের সুবিধা মতো ফলাফল ঘোষণা করে এবং প্রচার করতে থাকে। বিগত কয়েক বছর যাবত বাজারে এসেছে আরেক ঘাতক আর তা হলো জেনেটিক ফুড অর্থাৎ মেগা সাইজের পেয়াজ-রসুন-বড়ই-আঙুর ইত্যাদি। বিজ্ঞানীরা ইদানীং বলতেছেন যে, জেনেটিক ফুড বেশী বেশী খেলে অনেকগুলো বিয়ে করেও আপনি সন্তানের মুখ দেখতে সক্ষম হবেন না। অর্থাৎ এগুলো মানুষের যৌনাঙ্গের দারুন ক্ষতি করে থাকে।

প্রাত্যহিক জীবনে আমরা যত রকমের ক্যামিক্যাল ব্যবহার করি, তাদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য ক্ষতিকর হলো ঔষধ (বিশেষত এলোপ্যাথিক ঔষধ)। আর যত রকমের ঔষধ ব্যবহার করি, তাদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য ধ্বংসাত্মক হলো টিকাগুলি (vaccines)। এই টিকাগুলি কেবল যে ক্যানসার-হার্পাঁনি-ডায়াবেটিসের মতো জঘন্য রোগ সৃষ্টি করে তাই নয়, এরা মানুষের নৈতিক চরিত্রও ধ্বংস করে দেয় । মানুষকে অন্যায়-অত্যাচার-প্রতারণা-খুন-ধর্ষণ-আত্মহত্যা-সমকামিতা-ধর্মহীনতা-মাদকাসক্তি ইত্যাদি মারাত্মক পাপকাজে লিপ্ত করে। পবিত্র কোরআন এবং হাদীসের ভাষ্য মতে, পৃথিবী যখন পাপে পূর্ণ হবে তখন কেয়ামত / মহাপ্রলয় অনুষ্ঠিত হবে এবং মানবজাতির বিলুপ্তি ঘটবে। কাজেই বলা যায় যে, এসব অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকর ধ্বংসাত্মক ক্যামিকেলের কারণেই পৃথিবী থেকে মানবজাতির বিলুপ্তি ঘটবে। হ্যাঁ, এটা হলো ধর্মীয় ব্যাখ্যা। আর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হলো অতিমাত্রায় ক্যামিকেলের ব্যবহারের কারণে পৃথিবীর উপরস্থ ওজন স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ফলে সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মির পৃথিবীতে আগমণ বেড়ে যাবে, তার ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাবে এবং এক সময় পৃথিবী মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। মোটকথা যেভাবেই পৃথিবী ধ্বংস হোক, তাতে ক্যামিকেলের ভুমিকাই প্রধান। সে যাক, টুথপেস্টের পরিবর্তে শক্ত ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজেন, পেষ্ট ছাড়াই দাঁত পরিস্কার হবে। ছাই দিয়ে বা কয়লা দিয়ে দাঁত মাজতে পারেন, এটা খুবই স্বাস্থ্যকর। হোমিওপ্যাথিতে শক্তিবলের সবচেয়ে সেরা ঔষধটি (কার্বো ভেজ) তৈরী করা হয় বৃক্ষের ছাই থেকে। কাজেই ছাইকে তুচ্ছ মনে করবেন না। এজন্যই কবি বলেছেন, "কোথাও পাইলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই। পাইলেও পেতে পার অমূল্য রতন"। কবি একটি দারুণ কথা বলেছেন। আমি জানি না, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যবহৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ ছাই থেকে তৈরী করার বিষয়টি তিনি জানতে পেরেছিলেন কি না ?
জয়তুনের ঢালা দিয়ে দাঁত মাজতে পারেন, তাতে উপকার ছাড়া কোন ক্ষতি নাই। আজ দশ বছর হয় আমি চুলে সাবান-শ্যাম্পু ব্যবহার করি না। যদিও সাবান-শ্যাম্পু কোম্পানীগুলো হরদম প্রচার করছে যে, এগুলো ব্যবহার না করলে আপনার চুলে ময়লা জমতে জমতে এক সময় আপনি জটাধারী সন্যাসীতে পরিণত হবেন। কিন্তু আমার চুলে দশ বছর হলো এখনও জট পড়েনি। বিশ্বাস না হয় আমার বাসায় এসে স্বচক্ষে দেখে যেতে পারেন। হ্যাঁ, গোসলের সময় একটু জোরে ঝর্ণা ছেড়ে গোসল করুন, আপনার চুলে কোন ময়লা থাকতে পারবে না। পরিশেষে বলতে চাই, যতটা সম্ভব প্রাকৃতিক জীবন যাপন করুন, যতটা সম্ভব প্রাকৃতিক জিনিস ব্যবহার করুন। কল-কারখানার তৈরী জিনিসপত্র যতটা সম্ভব বর্জন করুন। যতটা সম্ভব ডাক্তারদের নিকট থেকে দূরে থাকুন। ক্যানসার, ডায়াবেটিস, কিডনী ড্যামেজ, লিভার ড্যামেজ ইত্যাদি মহামারী থেকে বাচুঁন। কোন রোগে আক্রান্ত হলে রোজ এক গ্লাস করে

লেবুর রস খান (চিনি-লবন ছাড়া)। এমন কোন রোগ নাই যা লেবুর রসে (ভিটামিন সি) সারে না। রোজ এক গ্লাস চিরতার রসও খেতে পারেন। এটিও লেবুর রসের মতো আরেকটি অসাধারণ ঔষধ।

**Chicken pox (নোমতি, পানিবসন্ত, জলবসন্ত) :** এই রোগে পিঠে, বুকে, মুখে, ঘাড়ে, হাত-পায়ে পানি ভর্তি ফোস্কা ওঠে। তবে ফোস্কা ওঠার কয়েকদিন পূর্ব থেকে হালকা জ্বর, মাথা ব্যথা, শরীর ম্যাজমেজ করা, বমিবমি ভাব ইত্যাদি থাকতে দেখা যায়। এসব ফোস্কাতে ভীষণ চুকানি থাকে। এই রোগ বাচ্চাদের মধ্যে বেশী দেখা যায় এবং সরাসরি স্পর্শ ও হাঁচি-কাশির মাধ্যমে ছড়ায়।

Antimonium tartaricum : এন্টিম টার্ট চিকেন পক্সের জন্য একেবারে স্পেসিফিক ঔষধ। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো যে-কোন রোগের সাথে **পেটের কোন না কোন সমস্যা থাকবেই, জিহ্বায় সাদা রঙের মোটা স্তর পড়বে,** বমি বমি ভাব, দুর্বলতা, শরীরের ভেতরে কাঁপুনি, ঘুমঘুম ভাব, বুকের ভেতরে প্রচুর কফ ইত্যাদি ইত্যাদি।

Rhus toxicodendron : রাস টক্স পানিবসন্তের একটি ভালো ঔষধ। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **প্রচণ্ড অস্থিরতা**, রোগী এতই অস্থিরতায় ভোগে যে এক পজিশনে বেশীক্ষণ স্থির থাকতে পারে না, **রোগীর শীতভাব এমন বেশী থাকে যে তার মনে হয় কেউ যেন বালতি দিয়ে তার গায়ে ঠান্ডা পানি ঢালতেছে,** নড়াচড়া করলে তার ভালো লাগে অর্থাৎ রোগের কষ্ট কমে যায়, জ্বালাপোড়া, চুলকানি ইত্যাদি। রাস টক্স খাওয়ার সময় ঠান্ডা পানিতে গোসল বা ঠান্ডা পানিতে গামছা ভিজিয়ে শরীর মোছা যাবে না। এতে ঔষধের একশান নষ্ট হয়ে যায়।

Mercurius solubilis : মার্ক সল ঔষধটি পানি বসন্তের শেষের দিকে খাওয়াতে হয়, যখন ফোস্কা উঠা শেষ হয়ে যায় এবং পাকতে শুরু করে। এটি ফোস্কাতে পূঁজ হওয়া বন্ধ করে এবং এন্টিবায়োটিকের মতো ফোস্কা শুকিয়ে আরোগ্য করে। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো প্রচুর ঘাম হয় কিন্তু রোগী আরাম পায় না, ঘামে দুর্গন্ধ বা মিষ্টি গন্ধ থাকে, রোগী ঠান্ডা পানির খাওয়ার জন্য পাগল, **রোগের উৎপাত রাতের বেলায় বেড়ে যায়, মুখ থেকে লালা ঝরে** ইত্যাদি।

Pulsatilla pratensis : পালসেটিলা চিকেনপক্সের আরেকটি সেরা ঔষধ। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **গলা শুকিয়ে থাকে কিন্তু কোন পানি পিপাসা থাকে না**, ঠান্ডা বাতাস/ ঠান্ডা খাবার/ ঠান্ডা পানি পছন্দ করে, গরম-আলো-বাতাসহীন বদ্ধ ঘরে বিরক্ত বোধ করে ইত্যাদি। **আবেগপ্রবন, অল্পতেই কেঁদে ফেলে এবং যত দিন যায় ততই মোটা হতে থাকে**, এমন মেয়েদের ক্ষেত্রে পালসেটিলা ভালো কাজ করে। এসব লক্ষণ কারো মধ্যে থাকলে যে-কোন রোগে পালসেটিলা খাওয়াতে হবে।

**Cholera (কলেরা, ওলাওঠা) :** এই রোগে মারাত্মক ধরণের পাতলা পায়খানা, বমি এবং পেশীতে আক্ষেপ দেখা দেয়। ফলে রোগীরা শরীরে পানিশূণ্যতার কারণে মৃত্যুবরণ করে। এই রোগ সাধারণত দূষিত পানি ও ভেজাল খাবারের মাধ্যমে ছড়ায়। কলেরা সাধারণত মহামারী আকারে দেখা দেয় অর্থাৎ একই এলাকার শত-সহস্র লোক এক সাথে আক্রান্ত হয়ে থাকে। যদিও এলোপ্যাথিতে বলা হয়ে থাকে যে, প্রত্যেকটি রোগই একটি নির্দিষ্ট জীবাণুর (অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাস) আক্রমণের ফলে হয়ে থাকে। কিন্তু হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা তা স্বীকার করেন না। কেননা

সেক্ষেত্রে জীবাণুদের ধ্বংস করে দিলেই রোগ সেরে যাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, জীবাণু ধ্বংস করার পরও অনেক রোগ পুরোপুরি নিরাময় হয় না। তাদের মতে, দেহ-মনের ভেতরগত কোন দুর্বলতার (susceptibility) কারণেই মানুষ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে রোগের সৃষ্টি করে না; বরং মানুষ রোগাক্রান্ত হওয়ার পরেই জীবাণুরা শরীরে প্রবেশ করে বংশবৃদ্ধি করার সুযোগ পায়। তাদের মতে রোগের অন্যান্য অনেক লক্ষণের মতো জীবাণুর আক্রমণও একটি লক্ষণ মাত্র। সে যাক, কলেরা রোগের চিকিৎসা "ডায়েরিয়া" অধ্যায়ে দেখুন।

**Colic, Abdominal pain (পেট ব্যথা, শূলবেদনা)** ঃ- পেট ব্যথা বলতে পেটের ভেতরে থাকা পাকস্থলী, নাড়িভুড়ি, লিভার, কিডনী, পেনক্রিয়াস, প্লীহা, গলব্লাডার ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যথাকে বুঝায়। পক্ষান্তরে ফুসফুস এবং হৃৎপিন্ডের ব্যথাকে বলা হয় বুকের ব্যথা। পেটের ব্যথারও সুনির্দিষ্ট কোন ঔষধ নেই। বরং ব্যথার ধরণ, ব্যথার কারণ, ব্যথার লক্ষণ ইত্যাদি বিবেচনা করে ঔষধ খেতে হবে।

Colocynthis : **পেটের ব্যথা যদি শক্ত কোন কিছু দিয়ে পেটে চাপ দিলে অথবা সামনের দিকে বাঁকা হলে কমে যায়**, তবে কলোসিন্ত আপনাকে সেই ব্যথা থেকে মুক্ত করবে। কলোসিনে'র ব্যথা ছুরি মারার মতো খুবই মারাত্মক ধরণের। পেটের নাড়ি-ভূড়িকে মনে হবে কেউ যেন দুটি পাথর দিয়ে পিষতেছে।

Dioscorea villosa : ডায়োস্কোরিয়া'র পেটের ব্যথা পেটে চাপ দিলে অথবা সামনের দিকে বাঁকা হইলে বৃদ্ধি পায়। ডায়োস্কোরিয়া'র ব্যথা কিছুক্ষণ পরপর বৃদ্ধি পায় এবং পেট থেকে শরীরের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যায়। (শিশুদের কান্না-কাটি অথবা মেজাজ দেখানোর যদি কোন কারণ খুঁজে না পান, তবে নিশ্চিত ধরে নিতে পারেন তার পেটে ব্যথা হচ্ছে। কারণ দুধ এবং চিনি বেশী খাওয়ার কারণে তাদের পেটে গ্যাস এবং এসিডিটির সমস্যা থাকবেই। শিশুদের পেটের ব্যথা পেটে চাপ দিলে বাড়ে না কমে তা যদি বুঝতে না পারেন, তবে একবার Dioscorea এবং একবার Colocynthis দুটো ঔষধই একত্রে মিশিয়ে খাওয়াতে থাকুন)।

Belladonna : **যে-কোনো তীব্র ব্যথা যতক্ষণই থাকুক না কেন, যদি হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলে যায়,** তবে বেলেডোনা ঔষধটি খেতে থাকুন। বেলেডোনা'র ব্যথা সাধারণত শরীরের উপরের দিক থেকে নীচের দিকে যায়।

Nux vomica : নাক্স ভমিকা পেট ব্যথার একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। খাওয়া-দাওয়ার কোন গন্ডগোলের কারণে পেট ব্যথা হলে এটি প্রয়োগ করতে হয়। গলব্লাডার বা কিডনী রোগ যে-কারণেই পেট ব্যথা হোক না কেন। শীতকাতর এবং বদমেজাজী লোকদের বেলায় এটি ভালো কাজ করে।

Arsenic album : পচাঁ, বাসি কিংবা বিষাক্ত কোন খাবার-পানীয় খাওয়ার কারণে পেটে ব্যথা হলে আর্সেনিক এক নাম্বার ঔষধ। কাচাঁ কোন ফল খেয়ে পেট ব্যথা হলেও আর্সেনিক খেতে হবে। পেটের ভেতরের কোন ক্যান্সারের কারণে পেট ব্যথা হলেও আর্সেনিক খেতে পারেন।

Ignatia amara : দুঃসংবাদ শোনার পরে অথবা বিরহ-বিচ্ছেদ-ছ্যাকা খাওয়ার কারণে, মনে কষ্ট পাওয়ার কারণে পেটে ব্যথা হলে ইগ্নেশিয়া খেতে হবে।

Teucrium Marum verum : পেটে ব্যথার সাথে যদি মুখে পানি উঠতে থাকে, তবে ক্রিমির ঔষধ খাওয়া উচিত (যেমন- টিউক্রিয়াম)।

Plumbum metallicum : পেট ব্যথার সাথে যদি কোষ্টকাঠিন্য/শক্ত পায়খানা থাকে, তবে প্রথমেই প্লামবাম ঔষধটি খাওয়ার কথা চিন্তা করতে হবে। প্লামবামের পেট ব্যথার লক্ষণ হলো, মনে হবে পেটের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কেউ যেন সুতো দিয়ে বেঁধে পিঠের দিকে টানতেছে।

Stannum metallicum : স্ট্যানাম-এর ব্যথার লক্ষণ হলো হালকা ব্যথা নিয়ে সেটি শুরু হয়, তারপর ধীরে ধীরে ব্যথা বাড়তে বাড়তে চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায় এবং শেষে আবারও ব্যথা আস্তে আস্তে কমতে কমতে পুরোপুরি চলে যায়।

Chamomilla : যদি পেট ব্যথা বা অন্য কোন ব্যথার তীব্রতায় কোন রোগী দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূণ্য হয়ে পড়ে, তার ভদ্রতাজ্ঞানও লোপ পেয়ে যায়, সে ডাক্তার বা নার্সকে পযর্ন্ত গালাগালি দিতে থাকে; তবে তাকে ক্যামোমিলা খাওয়াতে হবে। ক্যামোমিলা হলো অভদ্র রোগীদের ঔষধ। শিক্ষকদের হাতে শিশুরা মার খাওয়ার ফলে এবং কোন কারণে ভীষণ রেগে যাওয়ার ফলে পেট ব্যথা শুরু হলে ক্যামোমিলা খাওয়াতে হবে। যারা ব্যথা একদম সহ্য করতে পারে না, ক্যামোমিলা হলো তাদের ঔষধ। ব্যথার সময় গাল গরম হয়ে যায়, মুখ লাল হয়ে যায় এবং ঘামতে থাকে।

China officinalis : ব্যথা যদি নির্দিষ্ট সময় পরপর একেবারে ঘড়ির কাটা কাটায় আসে, তবে তাতে চায়না প্রযোজ্য। ব্যথা পেটে চাপ দিলে কমে যায়। পেটে প্রচুর গ্যাস হওয়ার কারণে ব্যথা।

Ipecac : পেট ব্যথা সাথে যদি বমিবমি ভাব থাকে, তবে তাতে ইপিকাক প্রযোজ্য। পেট ব্যথা এমন সাংঘাতিক যেন মনে হয় নাড়িভুড়িকে কেউ হাত দিয়ে কচলাচ্ছে।

Magnesia phosphorica : বিজলীর মতো পেট ব্যথা, একবার আসে একবার যায়। ব্যথা চাপ দিলে এবং গরম শেক দিলে কমে। ঠান্ডা বাতাসে বা ঠান্ডা পানি লাগলে ব্যথা বৃদ্ধি পায়।

Veratrum album : মারাত্মক ধরনের পেট ব্যথা ; সাথে বমিবমি ভাব এবং বমি করা থাকে। বরফের মতো ঠান্ডা পানি খেতে চায়। ব্যথার চোটে শরীরে বিশেষত কপালে ঠান্ডা ঘাম দেখা দেয়। হাঁটাহাঁটি করে ব্যথা কমানোর চেষ্টা করে। রোগী খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে।

Pulsatilla : গুরুপাক খাবার অর্থাৎ তেল-চর্বি জাতীয় খাবার খাওয়ার কারণে পেট ব্যথা হলে পালসেটিলা খাওয়াতে হবে। গর্ভধারণের কারণে পেট ব্যথা হলেও ইহা প্রযোজ্য।

Cocculus Indicus : ককুলাস হলো মাথা ঘুরানির এক নম্বর ঔষধ। পেট ব্যথার সাথে মাথা ঘুরানি এবং কোষ্টকাঠিন্য থাকলে এটি ভালো কাজ করে।

Cuprum Metallicum : ছুরি মারার মতো মারাত্মক পেট ব্যথা, কিছুক্ষণ পরপর বৃদ্ধি পায়। ঠান্ডা পানি খেলে ব্যথা ভীষণ বেড়ে যায়।

Natrum sulphuricum : পেটে গ্যাস হওয়ার কারণে অর্থাৎ পেট ফাঁপার কারণে পেটে ব্যথা হলে নেট্রাম সালফ প্রযোজ্য। বিশেষত গল ব্লাডারে পাথর বা পিত্তথলির অন্য কোন সমস্যার কারণে পেট ব্যথা হলে, নেট্রাম সালফ খেতে হবে।

## Cold, Catarrh, Coryza, Common cold (সর্দি, ঠান্ডা) ঃ-

সর্দি কাহাকে বলে এটি কাউকে বুঝিয়ে বলার দরকার পড়ে না। সাধারণত পেয়াজ কাটার সময় পেয়াজের ঝাজ নাকে-চোখে লাগলে নাক-

চোখ লাল হয়ে তা থেকে যেভাবে পানি ঝরতে থাকে, তাই হলো সর্দি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সর্দিতে যদি নাক ও চোখ থেকে প্রচুর পানি ঝরতে থাকে, তবে ঔষধ খাওয়ার পাশাপাশি পানি খাওয়া কমিয়ে দিন বা বন্ধ রাখুন। এতে তাড়াতাড়ি ফল পাবেন।

Allium cepa : পেয়াজের রস থেকে তৈরী করা এলিয়াম সেপা নামক ঔষধটি (ক্লার্কের মতে) হোমিওপ্যাথিতে সর্দির সবচেয়ে ভালো ঔষধ। সর্দির সাথে যদি জ্বরও এসে যায়, তথাপি অন্য কোন ঔষধ খাওয়ার প্রয়োজন হবে না।

Natrum muriaticum : নাক দিয়ে পানি ঝরাসহ হঠাৎ সর্দির আক্রমণ হলে নেট্রাম মিউর দুয়েক ঘন্টা পরপর খেতে পারেন। এটিও সর্দির একটি ভালো ঔষধ।

Bromium : অত্যন্ত বিরক্তিকর কাচাঁ সর্দিতে ব্রোমিয়াম একটি মনে রাখার মতো ঔষধ। বিশেষত যাদের সর্দি, গলা ব্যথা, টনসিলের সমস্যা ইত্যাদি সারা বছর লেগেই থাকে।

Sticta pulmonaria : স্টিকটা সর্দির একটি ভালো ঔষধ। ইহার সর্দিতে পানি ঝরে কম কিন্তু নাক বন্ধ হয়ে থাকে। সর্দির সাথে মাথা ব্যথা এবং চোখের সমস্যা থাকে। নাকের গোড়াকে মনে হয় বোধশক্তিহীন এবং ভারি।

☆ পাকা সর্দিতে Pulsatilla অথবা Kali sulph (শক্তি ৩০, ২০০) তিনবেলা করে কয়েকদিন খেতে হবে। যাদের ঘনঘন সর্দি লাগার অভ্যাস আছে, তারা Calcarea carb (শক্তি 10M) মাসে একমাত্রা করে একবার করে তিন মাস খান এবং যাদের বংশে যক্ষ্মা রোগী আছে, তারা Bacillinum (শক্তি 10M) একবার করে তিন মাস খান।

## Coma, unconsciousness, Shock (অজ্ঞান হওয়া) ঃ-

অজ্ঞান বা অচেতন হওয়ার কারণ এবং লক্ষণের উপর ভিত্তি করে ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।

Carbo vegetabilis : কোনো মুমুর্ষ রোগী অত্যধিক রোগ যন্ত্রণার কারণে অজ্ঞান হয়ে গেলে কার্বো ভেজ ঔষধটি পাঁচ/দশ মিনিট পরপর খাওয়াতে থাকুন। ঔষধ মুখের/ ঠোঁটের ভেতরে রাখতে পারলেই চলবে অথবা ঘ্রাণের সাথে ব্যবহার করুন। যে-কোন বিপজ্জনক পরিস্থিতি সামলাতেও (অর্থাৎ অন্তিম মুহূর্তে) সাময়িক ভাবে Carbo vegetabilis অথবা Camphora ঔষধটি ব্যবহার করতে পারেন। এই দুইটি ঔষধকে বলা হয় হোমিওপ্যাথিক কোরামিন।

Arnica montana : উপর থেকে পড়ে গিয়ে বা আঘাত পেয়ে মুচর্ছা গেলে আর্নিকা দশ মিনিট পরপর খাওয়াতে থাকুন।

Hypericum perforatum : দাঁত উঠানোর কারণে অথবা শরীরের কোন সেনসেটিভ জায়গায় (অণ্ডকোষ, মাথা, পাছার নিকটের কন্ডার হাড়, আঙ্গুলের মাথায় ইত্যাদি) আঘাত লাগার কারণে (ব্যথার চোটে) অজ্ঞান হলে হাইপেরিকাম ঘনঘন কয়েক মাত্রা খাওয়ান।

China officinalis : অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে অজ্ঞান হলে চায়না ঘনঘন খাওয়াতে থাকুন।

Phosphorus : বৈদ্যুতিক শক বা বজ্রপাতে অজ্ঞান হলে ফসফরাস দশ মিনিট পরপর খাওয়াতে থাকুন।

Ignatia amara : দুঃসংবাদ শুনে অজ্ঞান হলে ইগ্নেশিয়া ঔষধটি পাঁচ/দশ মিনিট পরপর খাওয়ান।

Coffea cruda : সুসংবাদ শুনে অজ্ঞান হলে কফিয়া ঔষধটি দশ মিনিট পরপর খাওয়ান।

Opium : ভয় পেয়ে মুর্ছা গেলে Opium ঔষধটি দশ মিনিট পরপর খাওয়াতে থাকুন।

Glonoine : কড়া রৌদ্রে থাকার কারণে মাথাব্যথা বা অজ্ঞান হলে গ্লোনইন দশ মিনিট পরপর খাওয়াতে থাকুন।

## Constipation (কোষ্টকাঠিন্য, শক্ত পায়খানা) ঃ-

কোষ্টকাঠিন্য বলতে কেবল শক্ত পায়খানাকে বুঝায় না ; নরম পায়খানাও যদি বের করতে কষ্ট হয়, তাকেও কোষ্টকাঠিন্য বলা হয়। কোষ্টকাঠিন্য কোন রোগ নয় বরং এটি শরীরের ভেতরকার অন্যকোন মারাত্মক রোগের একটি লক্ষণ মাত্র। তবে দীর্ঘদিন কোষ্টকাঠিন্য চলতে থাকলে পাইলস, উচ্চ রক্তচাপ, গ্যাস্ট্রিক আলসার, হৃদরোগ, হজমশক্তির দুর্বলতা, পেট ফাঁপা, দুর্বলতা, মেদভুঁড়ি, মাথা ব্যথা, স্মরণশক্তি কমে যাওয়া, শরীরে এবং নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, বিষন্নতাসহ নানা রকমের মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। কোষ্টকাঠিন্য হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হলো পায়খানার বেগ হওয়ার পরেও পায়খানা না করে তাকে চেপে রাখা। চেয়ারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকাও কোষ্টকাঠিন্য হওয়ার আরেকটা বড় কারণ। এজন্য প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সকালে বা রাতে) পায়খানা করার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। যাদের কোষ্টকাঠিন্যের সমস্যা আছে তাদের শাক-সবজি, চাল কুমড়া, মিষ্টি কুমড়া, লাউ, ফল-মুল ইত্যাদি খাবার বেশী বেশী খাওয়া উচিত।

Sulphur : কোষ্টকাঠিন্যের সবচেয়ে সেরা ঔষধ হলো সালফার। এই কারণে রোগীর মধ্যে অন্য কোন ঔষধের লক্ষণ না থাকলে অবশ্যই তার চিকিৎসা প্রথমে সালফার দিয়ে শুরু করা উচিত। **এটি সাধারণত কবি-সাহিত্যিক-লেখক-বুদ্ধিজীবি-গবেষক-বিজ্ঞানী ইত্যাদি পেশার লোকদের** অর্থাৎ সৃজনশীল ব্যক্তিদের বেলায় ভালো কাজ করে। সালফারের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **গোসল করা অপছন্দ করে, গরম লাগে বেশী, শরীরে চুলকানী বেশী, হাতের তালু-পায়ের তালু-মাথার তালুতে জ্বালাপোড়া, মাথা গরম কিন্তু পা ঠান্ডা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে কোন খেয়াল নাই**, ছেড়া-নোংরা তেনা দেখেও আনন্দিত হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

Lac defloratum : এটি কোষ্টকাঠিন্যের একটি সেরা ঔষধ। ইহার প্রধান লক্ষণ হলো **পায়খানা করার সময় প্রসব ব্যথার মতো মারাত্মক ব্যথা হওয়া**, পায়খানার বেগ হয় না, পায়খানার রাস্তা ছিড়ে যায়, পায়খানা হয় শুকনো এবং বড় বড় সাইজে।

Natrum muriaticum : অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোষ্টকাঠিন্যের একটি মুল কারণ হয়ে থাকে নাড়িভূড়ির দেওয়ালের শুষ্কতা (dryness of the bowel) আর এই কারণে নেট্রাম মিউর ঔষধটি কোষ্টকাঠিন্যের একটি অমুল্য ঔষধ। কেননা খাবার লবণ থেকে তৈরী করা এই ঔষধটি শরীরের সকল স্থানে পানির ভারসাম্য আনতে সাহায্য করে থাকে। তাছাড়া **যাদের বেশী বেশী লবণ খাওয়ার অভ্যাস আছে** এবং যাদের মুখে ব্রণ হয় প্রচুর, তাদের কোষ্টকাঠিন্যসহ যে-কোন রোগে নেট্রাম মিউর যাদুর মতো কাজ করবে। এমনিভাবে Magnesia muriatica এবং Ammonium muriaticum ঔষধ দুইটিও কোষ্টকাঠিন্যের শ্রেষ্ট ঔষধ।

Nux vomica : হোমিওপ্যাথিতে কোষ্টকাঠিন্যের জন্য সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত ঔষধ হলো নাক্স ভমিকা। **দিনরাতের বেশীর ভাগ সময় শুয়ে-বসে কাটায়, ভয়ঙ্কর বদমেজাজী, শীতকাতর, কথার বিরোধীতা সহ্য করতে পারে না** ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে এটি ভালো কাজ করে। বিশেষত যারা দীর্ঘদিন পায়খানা নরম করার এলোপ্যাথিক ঔষধ খেয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে এটি বেশী প্রযোজ্য। (☆ অনেক হোমিও বিজ্ঞানী কোষ্টকাঠিন্য এবং পাইলসের রোগীদেরকে সকালে

সালফার এবং সন্ধ্যায় নাক্স ভমিকা- এভাবে খেতে দিতেন। কেননা এই দুটি ঔষধ একে অন্যের একশানকে সাহায্য করে।)

Alumina : এলুমিনার প্রধান লক্ষণ হলো **পায়খানা নরম কিন্তু বের করতে কষ্ট হয়**। কখনও পায়খানার বেগ থাকে আবার নাও থাকতে পারে। শিশুদের কোষ্টকাঠিন্যের ক্ষেত্রে এটি ভালো কাজ করে যখন মুখ শুকিয়ে থাকে, পায়খানার রাসতা লাল হয়ে যায়, **ব্যথায় চীৎকার করতে থাকে, পায়খানা করার সময় বসার সিট অথবা সামনে যা থাকে তাকে খুব শক্ত করে ধরে** এবং পায়খানার সময় রক্ত পড়ে।

Bryonia Alba : ব্রায়োনিয়ার প্রধান লক্ষণ হলো **পায়খানা হবে বড় বড় লম্বা লম্বা সাইজে, শুকনা, শক্ত এবং দেখতে পোড়াপোড়া**। কোন কোন চিকিৎসা বিজ্ঞানীর মতে, শিশুদের, বদমেজাজী লোকদের এবং বাতের রোগীদের কোষ্টকাঠিন্যে এটি সবচেয়ে ভালো কাজ করে। **যদি গলা শুকিয়ে থাকে এবং প্রচুর পানি পিপাসা থাকে,** তবে ব্রায়োনিয়া প্রয়োগ করতে হবে। অনেক চিকিৎসা বিজ্ঞানী আবার ব্রায়োনিয়া এবং নাক্স ভমিকা ঔষধ দুটিকে অদল-বদল করে ব্যবহার করে দারুণ ফল পেতেন।

Opium : কোষ্টকাঠিন্যের ক্ষেত্রে অপিয়ামের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো পায়খানার বেগই হয় না, এমনকি **সাত দিন্ত পনের দিনেও পায়খানার বেগ হয় না। পায়খানা হয় ছাগলের লাদির মতো ছোট ছোট, গোল গোল, কালো, শক্ত শক্ত**। যদি আঙুল দিয়ে কারো পায়খানা বের করতে হয়, তবে এমন ক্ষেত্রে অপিয়াম ঔষধটির কথা সর্ব প্রথম চিনতা করা উচিত।

Plumbum metallicum : ইহার পায়খানাও ছাগলের লাদির মতো ছোট ছোট, শক্ত শক্ত কিন্তু এতে অল্প হলেও পায়খানার বেগ থাকে। পায়খানা বের করতে প্রসব ব্যথার মতো মারাত্মক ব্যথা লাগে। ইহার প্রধান লক্ষণ হলো **পেট ব্যথা যাতে মনে হয় কেউ যেন পেটের নাড়িভূড়িকে সুতা দিয়ে বেধে পিঠের দিকে টানতেছে।**

Hydrastis canadensis : হাইড্রাস্টিস ক্যান কোষ্টকাঠিন্যের একটি সেরা ঔষধ। ইহার প্রধান লক্ষণ হলো **হলদে রঙের পায়খানা এবং উপরের পেটে খালিখালি ভাব।**

Graphites : গ্র্যাফাইটিসের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো অলসতা, **দিনদিন কেবল মোটা হওয়া**, মাসিকের রক্তক্ষরণ খুবই কম হওয়া, **চর্মরোগ বেশী হওয়া এবং তা থেকে মধুর মতো আঠালো তরল পদার্থ বের হওয়া**, ঘনঘন মাথাব্যথা হওয়া, নাক থেকে রক্তক্ষরণ হওয়া, আলো অসহ্য লাগা ইত্যাদি। উপরের লক্ষণগুলোর দু'তিনটিও যদি কোন রোগীর মধ্যে থাকে, তবে গ্র্যাফাইটিস তার কোষ্টকাঠিন্য সারিয়ে দেবে।

Platinum metallicum : **প্লাটিনামকে বলা হয় ভ্রমণকারী এবং পর্যটকদের কোষ্টকাঠিন্যের একটি শ্রেষ্ট ঔষধ**। কাজেই বলা যায়, আমাদের প্রাত্যাহিক জীবন যাপন প্রণালীতে কোন পরিবর্তনের কারণে যদি কোষ্টকাঠিন্য দেখা দেয়, তবে অবশ্যই প্লাটিনাম খাওয়া উচিত।

Silicea : যদি এমন হয় যে **পায়খানা অর্ধেকটা বের হওয়ার পরে আবার পুণরায় ভিতরে ঢুকে যায়, তবে এই ধরণের কোষ্টকাঠিন্যে সিলিশিয়া খাওয়াতে হবে**। সিলিশিয়ার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো শরীর বা মনের জোর কমে যাওয়া, আঙুলের মাথায় শুকনা শুকনা লাগা, আলো অসহ্য লাগা, ঘনঘন মাথা ব্যথা হওয়া, চোখ থেকে পানি পড়া, মুখের স্বাদ নষ্ট হওয়া, মাংস্তচর্বি জাতীয় খাবার অপছন্দ করা, আঙুলের মাথা অথবা গলায় আলপিন দিয়ে খোচা দেওয়ার মতো ব্যথা, পাতলা চুল, অপুষ্টি ইত্যাদি।

Aloe socotrina : শক্ত এমনকি ছাগলের লেদির মতো পায়খানা। শিশুরা চেষ্টা করেও পায়খানা বের করতে পারে না। পায়খানার করার কথা বললে শিশুরা (ব্যথার কথা মনে করে) কাদতে শুরু করে। ইহার প্রধান লক্ষণ হলো **ঘুমের মধ্যে গোলাকার বলের মতো শক্ত শক্ত পায়খানা শিশুদের অজান্তেই বেরিয়ে যায় এবং বিছানায় পড়ে থাকে।**

Lycopodium clavatum : লাইকোপোডিয়ামের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **রোগের মাত্রা বিকাল ৪-৮টার সময় বৃদ্ধি পায়,** এদের রোগ ডান পাশে বেশী হয়, রোগ ডান পাশ থেকে বাম পাশে যায়, **এদের পেটে প্রচুর গ্যাস হয়,** এদের সারা বৎসর প্রস্রাবের বা হজমের সমস্যা লেগেই থাকে, এদের দেখতে তাদের বয়সের চাইতেও বেশী বয়স্ক মনে হয়, স্বাস্থ্যের অবস্থা খারাপ কিন্তু ব্রেন খুব ভালো, এরা খুবই সেনসিটিভ এমনকি ধন্যবাদ দিলেও কেদে ফেলে ইত্যাদি ইত্যাদি। উপরের লক্ষণগুলোর দু'তিনটিও যদি কোন রোগীর মধ্যে থাকে, তবে লাইকোপোডিয়াম তার কোষ্টকাঠিন্য সারিয়ে দেবে।

Arnica montana : ব্যথা পাওয়া বা **আঘাত পাওয়ার পরে কোষ্টকাঠিন্য দেখা দিলে** আর্নিকা খেতে হবে।

Conium maculatum : **শক্ত পায়খানা ত্যাগ করার পর যদি কেউ দুর্বল-ক্লানত হয়ে একেবারে বিছানায় শুয়ে পড়তে বাধ্য হয়,** তবে এক্ষেত্রে কোনায়াম হলো তার কোষ্টকাঠিন্যের ঔষধ।

Collinsonia canadensis : কলিনসোনিয়া কোষ্টকাঠিন্যের একটি শ্রেষ্ট ঔষধ যদি সাথে **পেট ব্যথা, পেট ফাঁপা এবং পাইলস থাকে।**

Carbo animalis : এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ হলো রোগী মনে করে পায়খানা হবে কিন্তু **পায়খানা করতে গেলে শুধু বাতাস বের হয়।**

Ambra grisea : যে-সব শিশু খুবই লাজুক, **কেউ সামনে থাকলে পায়খানা করতে পারে না,** তাদের কোষ্টকাঠিন্যে এমব্রা গ্রিসিয়া খাওয়ান।

## Cough (কাশি) :

কাশির চিকিৎসাতেও লক্ষণ মিলিয়ে ঔষধ খেতে হবে। কাশির নাম (কি হাঁপানি, ব্রংকাইটিস, সর্দিকাশি নাকি হুপিং কাশি ইত্যাদি) চিন্তা করে ঔষধ খেলে কোন উপকার হবে না।

Aconitum napellus :-
যে-কোন ধরনের কাশি হউক না কেন, যদি প্রথম থেকেই মারাত্মক আকারে দেখা দেয় অথবা কাশি শুরু হওয়ার দু'চার ঘণ্টার মধ্যে সেটি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, তবে একোনাইট হলো তার এক নাম্বার ঔষধ। একোনাইটের রোগকে তুলনা করা যায় ঝড়-তুফান্তটর্নেডোর সাথে- অতীব প্রচণ্ড কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। কাশিও যদি তেমনি হঠাৎ করে মারাত্মক আকারে শুরু হয়, তবে একোনাইট সেবন করুন। **কাশির উৎপাত এত বেশী হয় যে তাতে রোগী মৃত্যুর ভয়ে কাতর হয়ে পড়ে।**

Bryonia alba : ব্রায়োনিয়ার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো রোগীর ঠোট-জিহ্বা-গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে এবং প্রচুর পানি পিপাসা থাকে এবং রোগী অনেকক্ষণ পরপর একসাথে প্রচুর ঠান্ডা পানি পান করে। রোগী অন্ধকার এবং নড়াচড়া অপছন্দ করে ; কারণ এতে তার কষ্ট বৃদ্ধি পায়। কোষ্টকাঠিন্য দেখা দেয় অর্থাৎ পায়খানা শক্ত হয়ে যায়। রোগীর মেজাজ খুবই বিগড়ে থাকে এবং সে একলা থাকতে পছন্দ করে। কাশি দিলে মনে হয় মাথা এবং বুক টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যাবে।

Antimonium tartaricum : এন্টিম টার্টের কাশির প্রধান লক্ষণ হলো কাশির আওয়াজ শুনলে মনে হয় বুকের ভেতর প্রচুর কফ জমেছে কিন্তু কাশলে কোন কফ বের হয় না। রেগে গেলে অথবা খাওয়া-দাওয়া করলে কাশি বেড়ে যায়। জিহ্বায় সাদা রঙের মোটা সতর পড়বে, শরীরের ভেতরে কাঁপুনি, ঘুমঘুম ভাব এবং সাথে পেটের কোন না কোন সমস্যা থাকবেই। কাশতে কাশতে শিশুরা বমি করে দেয় এবং বমি করার পর সে কিছুক্ষণের জন্য আরাম পায়। শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়ার কারণে নাকের পাখা দ্রুত উঠানামা করতে থাকে।

Sambucus nigra : শুকনো অথবা বুকে গড়গড়ানি শব্দযুক্ত কাশি উভয়টিতে স্যাম্বুকাস প্রযোজ্য হতে পারে। কাশির সাথে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়, দমবন্ধ অবস্থায় রোগী হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে ওঠে, কাশির চোটে মুখের রঙ নীল হয়ে যায়, শোয়া থেকে উঠে বসে যায়, খুব কষ্ট করে টেনে টেনে দম নিতে চেষ্টা করে, দম নিতে পারে কিন্তু দম ছাড়তে পারে না। কাশির দমকা এক সময় চলে যায় কিন্তু কিছুক্ষণ পরপর আবার ফিরে আসে। ঘুমের মধ্যে শরীর শুকনা থাকে কিন্তু ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর প্রচণ্ড ঘামতে থাকে। বিছানায় শুয়ে থাকলে, ঘুমিয়ে থাকলে, মধ্যরাতে, মধ্যরাতের পরে, ভোর ২-৩ টার দিকে, ঠান্ডা বাতাসে, ভয় পেলে বা আবেগপ্রবন হলে কাশি বৃদ্ধি পায়।

Arnica montana : বুকে বা অন্য কোথাও আঘাত পাওয়ার কারণে যদি কাশি দেখা দেয়, তবে আর্নিকা হলো তার এক নাম্বার ঔষধ। কাশি দিলে যদি বুকে বা গলায় ব্যথা পাওয়া যায়, তবে এমন কাশিতে আর্নিকা খেতে ভুলবেন না। অনেক সময় দেখবেন, শিশুরা কাশির সময় বা কাশির আগে-পরে কাদতে থাকে। ইহার মানে হলো কাশির সময় সে বুকে বা গলায় প্রচণ্ড ব্যথা পায়। এরকম কাশিতে আর্নিকা দিতে হবে। আর্নিকার কাশিতে গলায় সুড়সুড়ি হয়, শিশু রেগে গেলে কাশতে শুরু করে।

Causticum : কষ্টিকামের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো কাশি দিলে প্রস্রাব বেরিয়ে যায়, সকাল বেলা গলা ভাঙ্গা, বুকে প্রচুর কফ কিন্তু সেগুলো উঠানো যায় না, **যেটুকু কফ উঠে তাও আবার ফেলতে পারে না বরং খেয়ে ফেলে**, পেটে বা শরীরের বিভিন্ন স্থানে জ্বালাপোড়া করে, কাশি ঠান্ডা পানি খেলে কমে যায়, কাশি দিলে প্রস্রাব বেরিয়ে যায় ইত্যাদি। ইহার মানসিক লক্ষণ হলো অন্যের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারে না।

Rumex crispus : রিউমেক্স-এর কাশির প্রধান লক্ষণ হলো ইহা ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি পায়। গলার নীচের দিকে বা বুকের উপরের দিকে ভেতরে এক ধরণের সুড়সুড়ি থেকে কাশির উৎপত্তি হয়। ঠান্ডা বাতাস নাক-মুখ দিয়ে ঢুকলেও কাশি হয় আবার শরীর থেকে কাপড়-চোপড় খুলে ফেললেও কাশি হয় অর্থাৎ শরীরে ঠান্ডা বাতাস লাগলেও কাশি শুরু হয়। **লেপ-কম্বল-চাদর দিয়ে মাথাসহ সারা শরীর ঢেকে ফেললে এবং গরম বাতাসে নিঃশ্বাস নিলেই কেবল কাশি বন্ধ হয়।** গলায় বা বুকে চাপ দিলে কাশি বেড়ে যায়। কথা বললে, লম্বা শ্বাস নিলে, ঘনঘন ছোট ছোট শ্বাস নিলে কিংবা খাওয়ার সময় এবং খাওয়ার পরে কাশি বেড়ে যায়।

Kali muriaticum : কাশির কারণে যদি চোখের কোন সমস্যা হয়, তবে ক্যালি মিউর খেতে হবে। যেমন কাশির সময় চোখের সামনে আলো দেখা, চোখ তার গর্ত থেকে বের হয়ে পড়বে- দেখতে এমন মনে হওয়া, কাশির সময় চোখে ব্যথা লাগা, চোখে গরম লাগা ইত্যাদি ইত্যাদি। তাছাড়া **কফের রঙ যদি খুবই সাদা হয়**, সেক্ষেত্রেও ক্যালি মিউর প্রযোজ্য।

Drosera rotundifolia : ড্রসেরার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো গলার মধ্যে সাংঘাতিকভাবে সুড়সুড় করতে থাকে, কাশতে কাশতে দমবন্ধ না হওয়া এবং বমি না হওয়া পযর্ন্ত কাশি থামতে চায় না, কাশির সময় বুকে প্রচণ্ড ব্যথা হওয়ার কারণে শিশুরা দুহাতে বুক চেপে ধরে, কাশি মধ্য রাতে বৃদ্ধি পায় এবং শুয়ে থাকলে বৃদ্ধি পায়, কাশতে কাশতে মুখ নীল হয়ে যায়, দিনরাতে অন্তত দশ-পনের বার কাশির দমকা উঠে। ড্রসেরাকে ঘনঘন খাওয়াতে হ্যানিম্যান নিষেধ করেছেন। কেননা তাতে কাশি বেড়ে গিয়ে বিপদ ডেকে আনতে পারে।

Hepar sulph : হিপার সালফের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো ঠান্ডা এবং শুকনা বাতাসে কাশি বৃদ্ধি পায়, ঠান্ডা পানি পান করলে বৃদ্ধি পায়, মধ্যরাতে এবং সকালের দিকে বৃদ্ধি পায়। হালকা থেকে মারাত্মক যে-কোন কাশিতে হিপার উপযুক্ত। কিন্তু শুকনা কাশি অর্থাৎ যে কাশিতে বুকে কোন কফ জমে নাই, তাতে হিপার দিয়ে কোন লাভ নাই।

Ignatia : ইগ্নেশিয়া হলো অদ্ভূত সব লক্ষণের ঔষধ। যেমনকানের শো শো শব্দ গান শুনলে কমে যায়, পাইলসের ব্যথা হাটলে কমে যায়, গলা ব্যথা ঢোক গেলার সময় কমে যায়, মাথা ব্যথা মাথা নীচু করলে কমে যায় ইত্যাদি। যত কাশে তত কাশি বেড়ে যায়- এই লক্ষণ থাকলে তাতে ইগ্নেশিয়া প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণত শোক, দুঃখ, বিরহ, বিচ্ছেদ, প্রেমে ব্যর্থতা, আপনজনের মৃত্যু ইত্যাদি কারণে যে-কোন রোগ হলে তাতে ইগ্নেশিয়া প্রযোজ্য।

Ipecac : ইপিকাকের প্রধান লক্ষণ হলো বমি বিম ভাব এবং পরিষ্কার জিহ্বা। হালকা কাশি থেকে নিউমোনিয়া, হুপিং কাশি এবং হাঁপানির মতো মারাত্মক কাশিতেও ইপিকাক দিতে পারেন যদি উপরোক্ত লক্ষণ দুইটি কারো মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

Kali bichrom : ক্যালি বাইক্রম হলো হোমিওপ্যাথিতে নাক-কান-গলার একটি শ্রেষ্ট ঔষধ। ইহার প্রধান লক্ষণ হলো (নাকের শ্লেস্মা, বমি,) **কফ খুবই আঠালো হয় এবং কোন কাঠিতে (বা আঙুলে) লাগিয়ে টানলে সুতার/রশির মতো লম্বা হয়ে যায়**। এই লক্ষণটি পাওয়া গেলে যে-কোন ধরণের কাশি বা অন্য যে-কোন রোগে ক্যালি বাইক্রোম খাওয়ালে যাদুর মতো সেরে যাবে।

Kali carb : কালি কার্বের প্রধান লক্ষণ হলো কাশি **ভোর ৩টা থেকে ৫টার দিকে বৃদ্ধি পায়**, কাশির সময় বুকে সূই ফোটানোর মতো ব্যথা হয়, সামনের দিকে কাত হলে অর্থাৎ হাঁটুর ওপর মাথা রেখে বসলে ভাল লাগে, চোখের ওপরের পাতা ফোলা, কোমরে ব্যথা, প্রচুর ঘাম হয় ইত্যাদি।

Spongia tosta : স্পঞ্জিয়া ঔষধটি শুকনা কাশিতে প্রযোজ্য। সাধারণত গলার ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে। **কাশি দিলে ড্রামের মতো আওয়াজ হয়।** মারাত্মক কাশি, শ্বাস নেওয়ার সময় অসুবিধা হয়, হিসহিস শব্দ হয়। মিষ্টি খেলে, ঠান্ডা পানি পানে, ধূমপানে, মাথা নীচু করে শুইলে, মাঝরাতের পূর্বে এবং ঠান্ডা শুকনা বাতাসে কাশি বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে গরম পানি বা গরম খাবারে কাশির মাত্রা কমে যায়। হৃদরোগের সাথে সম্পর্কিত কাশিতে এটি বেশী ফলপ্রদ।

Sticta pulmonaria : স্টিকটার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো শুকনা কাশি, বিকালে এবং রাতে বৃদ্ধি পায়, ঘুমাতেও পারে না এবং শুইতেও পারে না, **বসে থাকতে হয়, বুকের ওপর মনে হয় ভারী একটি পাথর চেপে আছে,** নাকের গোড়া মনে হয় কেউ চেপে ধরেছে, বিরতিহীন হাচিঁ, প্রচণ্ড মাথা ব্যথা ইত্যাদি।

Cuprum met : ভয়ঙ্কর কাশি, একবার কাশি উঠলে অনেকক্ষণ পযর্ন্ত থাকে, কাশি শেষ হলে রোগী দুর্বল হয়ে মরার মতো হয়ে পড়ে, **দিন্তেরাতে অনেকবার কাশির দমকা উঠে, কাশতে কাশতে (ধনুষ্টংকারের মতো) শরীর বাঁকা হয়ে যায়** ইত্যাদি হলো কিউপ্রামের প্রধান প্রধান লক্ষণ।

Mephitis : হুপিং কাশির মতো মারাত্মক কাশিতে মেফিটিস ব্যবহৃত হয়, যাতে অল্পতেই রোগীদের দম বন্ধ হয়ে আসে। উচ্চস্বরে পড়াশোনা করলে, কথা বললে, কিছু পান করলে কাশি বৃদ্ধি পায়। কাশির সময় বুকের ভেতর শো

শো আওয়াজ হয়, সারারাত কাশি হয়, একটু পরপর ফিরে আসে। একটি অদ্ভুত লক্ষণ হলো এদের শরীরে গরমবোধ এত বেশী যে, **বরফের মতো ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করলেও তাদের কোন অসুবিধা হয় না ; বরং আরাম লাগে।**

Jaborandi : জ্যাবোরেন্ডির প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো এটি চামড়া, প্যারোটিড গ্ল্যান্ড এবং টনসিলের ওপর বেশী কাজ করে, গলা থেকে প্রচুর কফ-থুতু-পানি নির্গত হওয়া, জ্বর, বমি, এলার্জি ইত্যাদি । তাহলে কাশির ক্ষেত্রে ইহার লক্ষণ হবে **বেশী বেশী কফ বের হওয়া, একেবারে মুখ ভরে কফ বের হতে থাকলেই কেবল জ্যাবোরেন্ডি কাজ করবে।**

## Crying of kids (শিশুদের কান্নাকাটি) ঃ-

শিশুদের কান্নার চাইতে অধিকতর হৃদয়বিদারক কোন বিষয় আছে বলে আমার জানা নাই। এমনকি মহানবী (দঃ) কখনও মসজিদে শিশুদের কান্না শোনলে নামায পযর্ন্ত সংক্ষিপ্ত করে ফেলতেন। কেননা তিনি মনে করতেন, এক্ষেত্রে নামায দীর্ঘ করলে কান্নারত শিশুর পিতা-মাতার মানসিক প্রশান্তি নষ্ট হবে। অসহায় এবং বাকশক্তিহীন এই শিশুরা তাদের দুঃখ-কষ্ট-অসুবিধার কথা কান্নার মাধ্যমে জানাতে চেষ্টা করে; কান্নাই তাদের ভাষা।

সে যাক, বাহ্যত কোন কারণ ছাড়াই যদি শিশুরা কান্নাকাটি করে তবে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, তার পেটব্যথা হচ্ছে। ক্যালশিয়াম (দুধ) জাতীয় খাবার পেটে গ্যাস বা এসিডের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে থাকে। শিশুরা যেহেতু দুধ বেশি বেশি খায় এবং দুধে যেহেতু প্রচুর ক্যালশিয়াম আছে ; কাজেই ধরে নিতে পারেন শিশুদের পেটে এসিডিটি বা গ্যাসের সমস্যা থাকবেই। শিশুরা দিনরাতে যে-কোন সময়ে অকারণে কান্নাকাটি করলে বা খুব মেজাজ দেখালে Nux vomica দুয়েকটি বড়ি খাইয়ে দিন ; সাথে সাথে কান্নাকাটি বন্ধ হয়ে যাবে। যদি কান্নাকাটি বন্ধ করে আপনার বাচ্চা মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে তবে ভয় পাবেন না ! কারণ নাক্স ভমিকা আসলে ঘুমের জন্যও একটি ভালো ঔষধ। সাধারণত শিশুর মেজাজ কড়া না হলে নাক্সে কাজ হয় না ; কেননা নাক্স হলো প্রধানতঃ বদমেজাজি লোকদের ঔষধ।



এক্ষেত্রে Colocynthis (যদি পেটে চাপ দিলে ব্যথা কমে) এবং Dioscorea (যদি পেটে চাপ দিলে ব্যথা বাড়ে) ঔষধ দুটির যে-কোনটি কিছুক্ষণ পরপর খাওয়াতে থাকুন। হ্যাঁ, শিশু যদি খুবই ছোট হয় যেমন দুয়েক দিন থেকে দু'য়েক মাস বয়স, তাদেরকে ঔষধ না খাইয়ে বরং তাদের মাকে খাওয়ানোই যথেষ্ট (যদি তারা বুকের দুধ খায়)। প্রয়োজনে পানিতে গুলিয়ে খাওয়াতে পারেন।

যে-সব শিশুরা সারাদিন ভালো থাকে কিন্তু রাতে খুব কান্নাকাটি করে তাদেরকে Jalapa নামক ঔষধটি কয়েকবার খাওয়ান।

পক্ষান্তরে যে-সব শিশুরা সারাদিন কান্নাকাটি করে কিন্তু রাতে চুপচাপ থাকে তাদেরকে Lycopodium নামক ঔষধটি কয়েকবার খাওয়ান।

শিশুদের কান্নাকাটির আরেকটি কারণ থাকতে পারে পায়খানার রাস্তায় সুতাকৃমির উৎপাত। এজন্য পায়খানার রাস্তা যতটা সম্ভব ফাঁক করে দেখতে পারেন সুতাকৃমি দেখা যায় কিনা অথবা পায়খানা করে সময় খেয়াল রাখবেন

পায়খানার সাথে কোন ধরনের কৃমি যায় কিনা । কৃমি পাওয়া গেলে Teucrium নামক ঔষধ দুটির যে-কোনটি রোজ দুইবেলা করে তিনদিন খাওয়ান।

অনেক শিশু ঘুমের ভেতরে গোঙাতে থাকে এবং চীৎকার করতে থাকে, এদেরকে Calcarea Carbonica নামক ঔষধটি (শক্তি ২০০) এক মাত্রা খাওয়ান। শিশু একটু বড় হলে এবং স্বাস্থ্য ভালো থাকলে ১০০০ (1M) অথবা ১০,০০০ (10M) শক্তিতে একমাত্রা খাওয়াতে পারেন।

শিশুদের কান্নাকাটি এবং বদমেজাজের একটি বড় কারণ হলো টিকা (vaccine) নেওয়া। সাধারণত বিসিজি, ডিপিটি, এটিএস, হাম, পোলিও, হেপাটাইটিস ইত্যাদি টীকা নেওয়ার কারণে শিশুদের কান্নাকাটি করার রোগ হয়। তারা দিন্তেরাতে, কারণে-অকারণে কাঁদতে থাকে, কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির সবার ঘুম হারাম করে ফেলে। এজন্য Thuja occidentalis নামক ঔষধটি সপ্তায় এক মাত্রা করে ছয় সপ্তাহ খাওয়ান। থুজাতে পুরোপুরি না সারলে বিকল্প হিসেবে Silicea, Vaccininum, Sulphur ইত্যাদি নামক ঔষধগুলোও খাওয়াতে পারেন।

**Dandruff (মাথার খুসকি) :** মাথার খুসকি কি জিনিস তা পরিষ্কার করে বলার প্রয়োজন নাই। কেননা টিভিতে শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে নিশ্চয় বিষয়টি সবারই জানা হয়ে গেছে। শ্যাম্পু কোম্পানি যতই দাবী করুক যে, তাদের শ্যাম্পুতে খুসকি পরিষ্কার হয়ে যাবে; আসলে তা মিথ্যে কথা। তবে শ্যাম্পুতে খুসকি সাফ না হলেও চুল সাফ হয়ে যে টাক পড়ে যায়, এতে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের সমাজে যত লোকের মাথায় টাক পড়েছে, নিরানব্বই ভাগ ক্ষেত্রেই তার জন্য দায়ী হলো অতিরিক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার। অথচ এলোপ্যাথিক চর্মরোগ বিশেষজ্ঞরা খুসকির রোগী পেলেই একটা না একটা শ্যাম্পু ধরিয়ে দেন, যা সত্যিই দুঃখজনক। সে যাক, খুসকি থেকে বাঁচতে চাইলে অবশ্যই শ্যাম্পু ব্যবহার বন্ধ করতে হবে এবং তেল দেওয়ার অভ্যাস চালু করতে হবে।

Thuja occidentalis : খুসকির একটি মূল কারণ হলো টিকা (বিসিজি, ডিপিটি, এটিএস, পোলিও, হেপাটাইটিস, এটিএস ইত্যাদি) নেওয়া। টিকা নিলে কেবল খুসকিই হয় না বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে চুল পাতলা হয়ে যায় এবং পাতলা হতে হতে টাক পড়ে যায়। কাজেই কোন টিকা নেওয়ার দুয়েক মাস থেকে দুয়েক বছরের মধ্যে খুসকি দেখা দিলে প্রথমেই থুজা নামক ঔষধটি খেতে হবে। বিশেষ করে খুসকির সাথে যাদের শরীরে আঁচিলও আছে, তাদের প্রথমেই সপ্তাহে একমাত্রা করে কয়েক মাত্রা থুজা খেয়ে নেওয়া উচিত।

Arsenicum album : মাথার চামড়া শুকনা, খস্খসে, স্পর্শ করলে ব্যথা লাগে, বেশ গরম, রাতের বেলা ভীষণ চুলকায় ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে আর্সেনিক খেতে হবে।

Kali sulph : ক্যালি সালফ খুসকির একটি শ্রেষ্ট ঔষধ। এমনকি যদি তাতে পূঁজও থাকে। খুসকির মতো মরা চামড়া উঠে এমন যে-কোন চর্মরোগেও এটি প্রয়োগ করতে পারেন।

Sanicula : স্যানিকিউলা ঔষধটি মাথার পাশাপাশি চোখের পাতা এবং দাড়ির খুসকিও দূর করতে পারে। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো অকাল বার্ধক্য, প্রচুর খেয়েও দিন দিন শুকিয়ে যায়, পায়ের তালুতে জ্বালাপোড়া, পা থেকে দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম বের হয় ইত্যাদি।

Sepia : সিপিয়া খুসকির একটি ভালো ঔষধ বিশেষত যদি মাথার চামড়া ভেজাভেজা এবং ঘিয়ের মতো আঠালো হয়। সিপিয়ার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **তলপেটে বল বা চাকার মতো কিছু একটা আছে মনে হয়,** রোগী তলপেটের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পায়খানার রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাবে এই ভয়ে দুই পা দিয়ে চেপে ধরে রাখে, সর্বদা শীতে কাঁপতে থাকে, দুধ সহ্য হয় না, ঘনঘন গর্ভপাত হয়, **স্বামী-সন্তান-চাকরি-বাকরির প্রতি আকর্ষণ কমে যায়।**

Sulphur : খুসকির একটি সেরা ঔষধ হলো সালফার যদি তাতে অত্যধিক চুলকানী এবং জ্বালাপোড়া থাকে। এই কারণে রোগীর মধ্যে অন্য কোন ঔষধের লক্ষণ না থাকলে অবশ্যই তার চিকিৎসা প্রথমে সালফার দিয়ে শুরু করা উচিত। সালফারের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **সকাল ১১টার দিকে ভীষণ খিদে পাওয়া, গোসল করা অপছন্দ করে,** গরম লাগে বেশী, শরীরে চুলকানী বেশী, হাতের তালু-পায়ের তালু-মাথার তালুতে জ্বালাপোড়া, **মাথা গরম কিন্তু পা ঠান্ডা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে কোন খেয়াল নাই,** রোগ বিছানার গরমে বৃদ্ধি পায়, ছেড়া-নোংরা তেনা দেখেও আনন্দিত হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

Mezereum : মেজেরিয়ামের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **মাথার থেকে মোটা মোটা চামড়ার মতো চলটা উঠতে থাকে, এগুলোর নীচে আবার পূঁজ জমে থাকে, চুল আঠা দিয়ে জট লেগে থাকে,** পূঁজ থেকে এক সময় দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে, চুলকানীর জন্য রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায় ইত্যাদি।

Graphites : গ্র্যাফাইটিসের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো অলসতা, **দিনদিন কেবল মোটা হওয়া,** মাসিকের রক্তক্ষরণ খুবই কম হওয়া, **চর্মরোগ বেশী হওয়া এবং তা থেকে মধুর মতো আঠালো তরল পদার্থ বের হওয়া,** ঘনঘন মাথাব্যথা হওয়া, নাক থেকে রক্তক্ষরণ হওয়া, আলো অসহ্য লাগা ইত্যাদি। উপরের লক্ষণগুলোর দু'তিনটিও যদি কোন রোগীর মধ্যে থাকে, তবে গ্র্যাফাইটিস তার খুসকি সারিয়ে দেবে।

Oleander : ওলিয়েন্ডার চুলের খুসকির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো মাথায় ভীষণ চুলকানি, **চুলকানির পরে হুল ফোটানোর মতো ব্যথা,** স্তন্যদানের পর শরীরে কাঁপুনি, চোখ তেড়া করে তাকালে মাথা ব্যথা ভালো হয়ে যায়, উদাসীনতা ইত্যাদি।

Natrum muriaticum : চুলের লাইন বরাবর খুসকি বা এই রকম ছাল ওঠা জাতীয় যে-কোন চর্মরোগে নেট্রাম মিউর প্রযোজ্য। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো মুখ সাদাটে এবং ফোলা ফোলা, **বেশী বেশী লবণ বা লবণযুক্ত খাবার খায়,** কথা শিখতে বা পড়াশোনা শিখতে দেরী হয়, ঋতুস্রাবে রক্তক্ষরণ হয় খুবই অল্প, **পা মোটা কিন্তু ঘাড় চিকন** ইত্যাদি।

## Dark side of Medical science (চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্ধকার দিক) :-

ইংরেজীতে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, আমার ডাক্তার সবই জানেন (My doctor knows all)। এই প্রবাদ বাক্যটির মানে কি ?

সহজ কথায় ইহার অর্থ হলো ডাক্তারদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের উচ্চ ধারণা। লোকেরা মনে করে প্রথমত ডাক্তাররা খুবই জ্ঞানী-গুণী মানুষ এবং দ্বিতীয়ত এই কারণে জেনেশুনে ডাক্তাররা কখনও রোগীদের ক্ষতি করতে পারে না। মানুষের নিকট সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো তার জীবন আর ডাক্তাররা যেহেতু জীবন বাঁচাতে সাহায্য করে, সেহেতু ডাক্তারদের সম্পর্কে মানুষের সুধারণা অথবা উচ্চ ধারণা থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এবং অতীব পরিতাপের বিষয় এই যে, অধিকাংশ ডাক্তারই তাদের প্রতি পোষণ করা সাধারণ মানুষের উচ্চ ধারণাকে মর্যাদা দেন না। কিন্তু ইহার কারণ কি ?

প্রথমত আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, ডাক্তাররাও আমাদের মতো মানুষ; তারা ফেরেশতা নন। অন্য সবার মতো তাদের মনেও লোভ-লালসা-হিংসা-ঘৃণা প্রভৃতি দোষ পুরো মাত্রায়ই আছে। একজন ডাক্তার যখন রাস-ায় লেটেস্ট

মডেলের একটি গাড়ি দেখেন কিংবা নিজের মহল্লায় রাজপ্রাসাদের মতো সুন্দর একটি বাড়ি দেখেন; তখন তার মনেও এমন একটি বাড়ি এবং গাড়ির মালিক হওয়ার স্বপ্ন জাগতে পারে। আর গাড়ি-বাড়ির মালিক হওয়ার জন্য অন্যদের মতো তিনিও তার নীতি-আদর্শকে গলা টিপে হত্যা করতে পারেন। ফলে তিনি অল্প সময়ে যাচ্ছেতাইভাবে অধিক রোগী দেখে বেশী টাকা উপার্জন করতে পারেন, অপ্রয়োজনীয় বস্তা বস্তা টেস্ট লিখে দিয়ে ডায়াগনষ্টিক কোম্পানীর কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা কমিশন খেতে পারেন, ঔষধ কোম্পানীর কাছ থেকে ঘুষ খেতে পারেন, সরকারী দ্বায়িত্ব ফাঁকি দিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারেন, সরকারী হাসপাতালের রোগীকে প্রাইভেট ক্লিনিকে টেনে নিতে পারেন, সরকারী হাসপাতালের ঔষধ ও যন্ত্রপাতি বিক্রি করে দিতে পারেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা অনেকে ভুলে যাই যে, পুঁজিপতি বা শিল্পপতিদের ছেলে-মেয়েরা কখনও ডাক্তার হয় না যে, তাদের টাকার প্রয়োজন নাই। বরং মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েরাই প্রধানত ডাক্তারী পেশায় আসে। কাজেই ডাক্তারদের টাকার চাহিদা সবচেয়ে বেশী থাকাই যুক্তিসঙ্গত। কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন যে, পুঁজিপতি বা শিল্পপতিদের টাকার চাহিদা বরং মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের চাইতে আরো অনেক বেশী থাকে ; আমিও তা স্বীকার করি। অনেক ডাক্তার আফসোস করেন যে, অশিক্ষিত মেধাহীন লোকেরা কিভাবে কিভাবে ধানাইপানাই করে রাতারাতি শিল্পপতি-মন্ত্রী-এম.পি. হয়ে যাচ্ছে ; অথচ শিক্ষাজীবনের সবগুলো পরীক্ষাতে স্টার মার্ক পেয়েও এখন পযর্ন্ত একটি ভালো বাড়িও বানাতে পারলাম না।

পেশাগত অজ্ঞতার কারণেও ডাক্তাররা আপনার ক্ষতি করে ফেলতে পারেন। কেননা যে-সব ডাক্তার একই সাথে এলোপ্যাথি এবং হোমিওপ্যাথি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ, তারা স্বীকার করেন যে একজন পরিপূর্ণ চিকিৎসক হওয়ার জন্য দুটি বিষয়েই গভীর পড়াশোনা থাকা দরকার। সুতরাং যেই এলোপ্যাথিক ডাক্তার হোমিওপ্যাথি সম্পর্কে পড়াশোনা করেননি, চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনি অর্ধশিক্ষিতই রয়ে গেছেন। আবার যে হোমিও ডাক্তারের এলোপ্যাথিক চিকিৎসা বিষয়ে পড়াশুনা নাই, তার চিকিৎসাজ্ঞান অপূর্ণই থেকে গেলো। এই হিসাবে বলা যায়, আমরা সমাজে যাদেরকে ডাক্তার হিসেবে জানি তাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জনই হাতুড়ে ডাক্তার। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান হলো এলোপ্যাথির চাইতে একধাপ উপরে এবং মেডিসিনের সর্বোচ্চ শাখা। এজন্য উন্নত বিশ্বের অনেক দেশেই আইন পাশ করা হয়েছে যে, এলোপ্যাথিতে সরকারী ডিগ্রিপ্রাপ্ত চিকিৎসক ছাড়া কেউ হোমিওপ্যাথি অধ্যয়ন এবং প্র্যাকটিস করতে পারবে না। আবার অনেকে মনে করেন, হোমিওপ্যাথিকে ধ্বংস করাই এই ধরণের আইন প্রণয়ণের মূল লক্ষ্য। কিছু কিছু রোগ আছে যেগুলোকে এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় নিরাময় করা কল্পনারও বাইরে অথচ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সহজেই নিরাময় করা যায়। অথচ না জানার কারণে এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা রোগীকে বিভ্রান্ত করে থাকে; বলে যে এই রোগের কোন চিকিৎসা নাই। প্রতিটি ঔষধই আমাদের কম-বেশী ক্ষতি করে থাকে। অন্তত কিডনীর তো ক্ষতি করবেই, কেননা সব ঔষধকেই শরীর থেকে বের করে দেওয়ার কঠিন কাজটি করতে হয় কিডনী দুটিকে। আখেরী জমানায় লোকেরা বস্তা বস্তা ঔষধ খেয়ে কিডনী বারোটা বাজাবে ভেবেই হয়ত আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে দুটি করে কিডনী দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন যাতে একটি নষ্ট হলেও অন্যটি দিয়ে আরো কিছুদিন বাচঁতে পারে।

হোমিওপ্যাথির মূলনীতি হলো (এবং বর্তমানে একটি প্রতিষ্টিত বৈজ্ঞানিক সত্য হলো), যে পদার্থ রোগ সারাতে পারে সেই একই পদার্থ রোগ সৃষ্টিও করতে পারে। মনে করুন আপনি একটি ঔষধ খেলেন যার দশটি রোগ সারানোর ক্ষমতা আছে অথচ আপনি সেটি খেলেন মাত্র একটি রোগ সারানোর জন্য। সেক্ষেত্রে ঔষধটি যে রোগটি আপনার শরীরে আছে তাকে সারাবে এবং যে নয়টি রোগ আপনার শরীরে নাই সেগুলোর বীজ আপনার দেহ-মনে বপন করে যাবে। নয়টি না হোক, অন্তত দুয়েকটি রোগের বীজ হলেও সে বপন করে যাবেই। ফলে দুয়েক মাস

কিংবা দুয়েক বছর পর যখন সেই রোগসমূহ ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করবে, তখন হয়ত বিষয়টি আপনার চিন্তায়ও আসবে না যে, এই রোগগুলো আপনার খাওয়া অতীতের ঔষধগুলির দ্বারাই সৃষ্ট। সে যাক, রোগ হলেই যে চিকিৎসা করতে হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। দেখতে হবে রোগের ফলে যে ক্ষতি হচ্ছে ; রোগের চিকিৎসায় তার চাইতে বেশী ক্ষতি হয় কিনা। যেমন অনেক চিকিৎসক দাদ, ছুলি ইত্যাদি মামুলি রোগের চিকিৎসায় এমন ঔষধ আপনাকে খেতে দিবেন যা আপনার লিভারের ক্ষতি করে থাকে। এখন বলুন দাদ, ছুলি, একজিমা ইত্যাদি ছোটখাটো চর্মরোগ নিয়ে বেঁচে থাকা ভালো নাকি এগুলোকে সারাতে গিয়ে কড়া কড়া ঔষধ খেয়ে লিভার, কিডনী ইত্যাদি নষ্ট করে অকালে মৃত্যুবরণ করা ভালো ?
অনেক ডাক্তারই (রোগীকে খুশি করার জন্য !) অবলীলায় এই জাতীয় অপকর্ম করে থাকেন। অথচ রোগীকে একটু বুঝিয়ে বললে কতই না ভালো হতো যে, সাধারণ ঔষধে যখন এগুলো সারছে না তখন ক্ষতিকর ঔষধ খেয়ে এগুলো সারানোর চেষ্টা করা উচিত হবে না ; অথবা আপনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অবলম্বন করে চেষ্টা করুন।

সাধারণ মানুষ না জানলেও ডাক্তাররা ঠিকই জানেন যে, শতকরা ৯৫ ভাগ রোগ বিনা ঔষধেই সেরে যায়। একটু ধৈরয ধরলেই হলো এবং কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলার বিষয় আছে। এজন্য সবারই উচিত, ঔষধ না খেয়েই কিভাবে রোগমুক্ত হওয়া সম্ভব তার পন্থা ডাক্তারদের কাছ থেকে জেনে নেওয়া। আমাদের পূর্বপুরুষরা যে কয়েকশ বছর আয়ু পেতেন তার মূল রহস্য ছিল, তারা ঔষধ খেতেন না অথবা বলা যায় ঔষধ খুবই খু-ব-ই কম খেতেন। আমরা অনেকেই জানি না যে, ভিটামিন বা মাল্টিভিটামিন নামে যে-সব ঔষধ আমরা খাই, ইহারা পযর্ন্ত কখনও কখনও শরীরের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। বাস্তবে দেখবেন, যে যত বেশী ঔষধ খায় ; তার রোগ-ব্যাধির সংখ্যা তত বাড়তে থাকে। তার স্বাস'্য তত তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে পড়ে। অনেক সময় দেখা যায় যে, ডাক্তার বলছেন ঔষধ খাওয়া লাগবে না কিন্তু রোগী জোর করে ডাক্তারকে দিয়ে ঔষধ লিখিয়ে নিচ্ছে। মানুষকে দোষ দিয়ে লাভ নেই ; ঔষধ কোম্পানীগুলো এতো সুন্দর সুন্দর রঙ-চং আর ডিজাইন করে ঔষধ বাজারে ছাড়ে যে, সেগুলো দেখলেই (শিশুদের চকলেটের মতো) যে কারো খেতে ইচ্ছে করবে। নিয়তির পরিহাস বলতে হবে (কেননা মনীষীরা বলে গেছেন) যে, “যা কিছু মানুষকে আকর্ষণ করে তার সবই মানুষের জন্য ক্ষতিকর আর যা কিছু মানুষের নিকট অপছন্দনীয় মনে হয় তার সবই মানুষের জন্য কল্যাণকর”। দার্শনিক ওলিভার ওয়েন্ডেল হোমস একবার বলেছিলেন যে, “পৃথিবীর সমস্ত ঔষধ যদি সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হতো তবে মানবজাতির বিরাট উপকার হতো কিন্তু মৎসজাতির সর্বনাশ হয়ে যেতো”।

ডাক্তাররা হরহামেশা আপনাকে বলবেন যে, এই রোগের টিকা (vaccine) নেন, ঐ রোগের টিকা নেন। কিন্তু কখনও বলবে না যে, টিকা নেওয়ার কারণে আপনার তাৎক্ষণিক মৃত্যু হতে পারে, টিউমার হতে পারে, ক্যান্সার হতে পারে, ইমিউন সিস্টেমের বারোটা বেজে যেতে পারে, ব্রেন ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে, হাঁপানি হতে পারে, ডায়াবেটিস হতে পারে, এনসেফালোপ্যাথি হতে পারে, গুলেন-বেরি সিনড্রোম হতে পারে, প্যারালাইসিস হতে পারে, মৃগীরোগ হতে পারে, অন্ধ হয়ে যেতে পারেন ইত্যাদি ইত্যাদি। পোলিও টিকাতে একবার ব্রেন টিউমার সৃষ্টিকারী এসভি-৪০ ভাইরাস পাওয়ার ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল ; কেননা উক্ত ব্যাচের পোলিও টিকা আগের বছর যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচ কোটি শিশুকে খাওয়ানো হয়েছিল। ইতালীয় বিজ্ঞানীরা গবেষণায় দেখেছেন যে, এসভি-৪০ ভাইরাস যার শরীরে ঢুকে কেবল তার শরীরেই নয়, এমনকি তার ছেলে-মেয়ে এবং নাতি-পুতিদের শরীরেও ক্যান্সার সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে। এখন বলুন, মাত্র পঞ্চাশ পয়সার হোমিও ঔষধে যে পোলিওমায়েলাইটিস রোগ সারানো যায়, তার হাত থেকে বাঁচার জন্য পোলিও টিকা নিয়ে ক্যান্সারে আক্রান- হওয়া কতটা বুদ্ধিমানের

কাজ হবে ?
অর্থ পিচাশ রক্ত পিপাসু নরঘাতক বড় বড় ঔষধ কোম্পানীগুলি টাকার লোভে এমন কোন রোগ নেই, যার টিকা বের করেনি। কিন্তু ক্ষতির দিক দিয়ে প্রায় সমস্ত টিকাই এক ঝাঁকের কৈ। আমরা ছোট-বড় অনেক রোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য টিকা নেই, অথচ চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন যে ঐসব রোগে আক্রান্ত হওয়া বরং আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থার একটি সেরা বর্বরতা হলো ইনজেকশান। ব্যথা তো আছেই তাছাড়া অনেক সময় ইনজেকশানের সাথে যদি সামান্য ময়লাও শরীরে ঢুকে যায়, সেক্ষেত্রে ইনজেকশানের জায়গাটি পেকে ফোলে যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় অপারেশন করে পূঁজ বের করতে হয়, ঘা শুকাতেও অনেক দিন লেগে যায়। তাছাড়া যেই পেশীতে ইনজেকশান দেওয়া হয়েছে, সেই পেশীটি সারা জীবনের জন্য ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। ফলে এমনও হতে পারে যে, আপনার ইনজেকশান নেওয়া হাতের কর্মশক্তি কমে যেতে পারে। অনেকে ভীষণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইনজেকশান নেন এবং নিজের বাচ্চাদেরকেও জোর করে ইনজেকশান নিতে বাধ্য করেন। কারণ তারা ভাবেন ইহার কোন বিকল্প ব্যবস্থা নাই। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি ভুল ধারণা। যে-কোন ইমারজেন্সী রোগের জন্যই ইনজেকশানের বদলে আপনি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পাবেন। হউক তা এটিএস ইনজেকশান, কুকুরে কামড়ানোর ইনজেকশান, শিশুদের বা বড়দের যে-কোন টিকা, হাই পাওয়ারের এন্টিবায়োটিক ইনজেকশান কিংবা জীবনরক্ষাকারী কোরামিন/ ওরাডেক্সন ইনজেকশান। আর এসব হোমিও ঔষধ কাজও করবে ইনজেকশনের চাইতে অন্তত দশগুণ দ্রুত এবং এদের সাইড ইফেক্ট একেবারে নাই বললেই চলে। তবে এজন্য হোমিও ঔষধের গুণাগুণ ও ব্যবহার সম্পর্কে আপনার ভালো পড়াশুনা থাকতে হবে অথবা কোন হোমিওপ্যাথিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। অনেকে আবার একটু দুর্বল লাগলেই স্যালাইন ইনজেকশান (Intra Venus saline) নেওয়ার জন্য পাগল হয়ে যায়। সাধারণ মানুষের মনে করে মুখে খাওয়ার স্যালাইনের চাইতে আই.ভি. স্যালাইন বেশী উপকারী। অথচ বাস্তবতা হলো তার ঠিক উল্টো ; কেননা আই.ভি. স্যালাইনে থাকে দুইটি ঔষধ, পক্ষান্তরে খাবার স্যালাইনে থাকে চারটি ঔষধ। যে-কোন ঔষধ মুখে খাওয়া আর সরাসরি রক্তনালীতে ইনজেকশান করে ঢুকিয়ে দেওয়ার মধ্যে আসলে তেমন কোন পার্থক্য নাই। কেননা আমরা ঔষধ, খাবার-দাবার যা কিছুই খাই না কেন, দশ-পনের মিনিটের মধ্যেই সেটি শোষিত হয়ে রক্তে চলে যায়। আই.ভি. স্যালাইন হলো তাদের জন্য যারা কোন সঙ্গত কারণে মুখে খেতে পারেন না অথবা মুখে খেতে পারলেও বমির জন্য তা পেটে রাখতে পারেন না। সে যাক, নিজের এবং নিজের পরিবারের সদস্যদের ডাক্তার বা হাসপাতালে দৌঁড়ানোর ঝামেলা থেকে বাঁচাতে পনের-বিশটি জরুরি হোমিও ঔষধ অল্প পরিমাণে কিনে সর্বদা ঘরে জমা রাখা উচিত এবং সাথে প্রেসক্রাইবার গাইড, পারিবারিক চিকিৎসা ইত্যাদি ধরণের দুয়েকটা হোমিও বই। আরেকটি কথা মনে রাখবেন, যে রোগ ছয়মাস এলোপ্যাথিক ঔষধ খেয়েও সারেনি ; তা ষাট বছর এলোপ্যাথিক ঔষধ খেলেও সারবে না। এই ক্ষেত্রে ভিন্ন পদ্ধতির চিকিৎসা অবলম্বন করা উচিত।

অনেক ডাক্তার আছেন এবং অনেক রোগীও আছেন, যারা হোমিওপ্যাথির নামই শুনতে পারেন না। অথচ হোমিওপ্যাথি হলো একমাত্র বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি। মানুষ এলোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক মনে করলেও নিরপেক্ষ গবেষকদের মতে, এলোপ্যাথিতে দশ ভাগ আছে বিজ্ঞান আছে আর বাকী নব্বই ভাগই বিজ্ঞানের নামে গোজামিল। তারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অনুসরণ করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আন্দাজ, অনুমান, কুসংস্কার, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, হোমিওপ্যাথির আংশিক অনুসরণ ইত্যাদি ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে চিকিৎসাকার্য পরিচালনা করে থাকে। ইহারা রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার নামে যদিও খুবই উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকুক না কেন ;

আসলে সেগুলো হলো মানুষকে বোকা বানানোর এবং পকেট মারার এক ধরণের অত্যাধুনিক ফন্দি মাত্র। তাদের নানা রকমের চটকদার রঙের এবং ডিজাইনের দামী দামী ঔষধগুলো কোন জটিল রোগই সারাতে পারে না বরং চিকিৎসার নামে উপকারের চাইতে বরং ক্ষতিই করে বেশী। হোমিওপ্যাথির রয়েছে প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক নীতিমালা যা দুইশ বছরেও কোন পরিবর্তন হয়নি। হোমিওপ্যাথিতে একই ঔষধ দুশ বছর পূর্বে যেমন কার্যকর ছিল, আজও তা সমান কাযর্কর প্রমাণিত হচ্ছে বলেই সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। পক্ষান্তরে কোন এলোপ্যাথিক ঔষধই দশ-বিশ বছরের বেশী কার্যকর থাকে না। একদিন যেই এলোপ্যাথিক ঔষধকে বলা হয় মহাউপকারী-জীবনরক্ষাকারী, কয়েক বছর পরই তাকে বলা হয় অকাযর্কর -ক্ষতিকর-বর্জনীয়। আজ যেই ঔষধের নাম মানুষের মুখে মুখে ফিরে, কাল সেটি হারিয়ে যায় ইতিহাসের পাতা থেকে।

বাজারে আসা যে-কোন নতুন ঔষধ ব্যবহার থেকে সযত্নে দূরে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ। কেননা অতীতে যে-সব ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অথবা বিষক্রিয়ায় হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মরেছে ; সে-সব ঔষধও প্রথম বাজারে ছাড়ার সময় ঔষধ কোম্পানীগুলো “খুবই নিরাপদ, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াহীন, খুবই কার্যকর, যাদুকরী ক্ষমতাসম্পন্ন” ইত্যাদি ইত্যাদি নানান অভিধায় অভিহিত করেছিল। সেজন্য পুরনো ঔষধগুলো ব্যবহার করাই নিরাপদ ; কেননা তাদের কি কি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে, তা ইতিমধ্যে সবার জানা হয়ে গেছে। ১৯৬৪ সালে যখন এলোপ্যাথিক ঔষধ থেলিডোমাইড (thalidomide) মার্কেটে আসে, তখন দাবী করা হয়েছিল যে, এটি টেনশানের বা মাথা ঠান্ডা রাখার কিংবা নিদ্রাহীনতার জন্য এ যাবত কালের সবচেয়ে ভালো এবং নিরাপদ ঔষধ। কিন্তু দুই বছরের মাথায় ১৯৬৬ সালে জানা যায় যে, যে-সমস্ত গর্ভবতী মহিলা থেলিডোমাইড খেয়েছেন, তারা হাত এবং পা বিহীন পঙ্গু, বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। পশ্চিম জার্মানীর স্বাস্থ্য বিভাগ একাই থেলিডোমাইড খাওয়ার ফলে দশ হাজার বিকলাঙ্গ শিশুর জন্মের ঘটনা রেকর্ড করেছে। সত্যিকার অর্থে এটি ছিল চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে সবচেয়ে জঘন্য এবং নির্মম ঘটনা। ভালো রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাচাই-বাছাই ছাড়াই মার্কেটে ঔষধ ছেড়ে দেওয়া হলো এলোপ্যাথিক ঔষধ কোম্পানীগুলোর কয়েক শতাব্দীর পুরনো অভ্যাস। প্রথম যখন জন্ম নিয়ন্ত্রণের বড়ি মার্কেটে আসে, তখন তাতে ঔষধের (মানে হরমোনের) পরিমাণ ছিল এখনকার তুলনায় অনেক বেশী। ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই যখন প্রমাণ পাওয়া গেলো যে, জন্ম নিয়ন্ত্রণের বড়ি খাওয়া লক্ষ লক্ষ মহিলা স্তন ক্যান্সার ও জরায়ু ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মরেছে ; তখন তাতে হরমোণের পরিমাণ অনেক কমিয়ে দেওয়া হলো।

কিন্তু এখনও বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত যে, অধিকাংশ স্তন ক্যান্সার এবং জরায়ুর ক্যান্সারের জন্য এসব জন্ম নিয়ন্ত্রণের বড়ি দায়ী। অন্যদিকে যে-সব মহিলা জন্ম নিয়ন্ত্রণের বড়ি খায়, তাদের সন্তানদের ওপর কি কি গযব পড়ে, তা আজও জানা যায় নাই। এসব নিয়ে গবেষণা করার কোন লোক পাওয়া যাবে না। কেননা নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মানসিকতা কয়জনের আছে ?
আর ঔষধ কোম্পানীগুলো এমন কোন গবেষণা করবে না, যা তাদের ব্যবসার ক্ষতি করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দুটি বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের বাহিনীর হাতে যত লোক না মরেছে, তার চাইতে অনেক বেশী লোকের মৃত্যু হয়েছে বড় বড় ঔষধ কোম্পানীগুলোর সীমাহীন লালসার কারণে। হিটলারের বাহিনীর বিচার হয় কিন্তু এসব নরঘাতক ঔষধ কোম্পানীর মানুষ হত্যার কোন বিচার হয় না। টাকার জোরে এরা আইন-আদালত, কোন কোন দেশের সরকার, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, এমনকি জাতিসংঘকে পযর্ন্ত কিনে ফেলে। কারণ এগুলো তো মানুষরাই চালায় আর মানুষ মাত্রই টাকার কাছে দুর্বল।

অপারেশন হলো চিকিৎসার নামে আরেকটি ক্ষতিকর ধ্বংসাত্মক কাজ। এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা অধিকাংশ রোগের চিকিৎসাতেই অপারেশনের সাহায্য নিয়ে থাকেন। ইহার কারণ অধিকাংশ জটিল রোগই এলোপ্যাথিক ঔষধে নিরাময় হয় না। ফলে তারা কাটাকুটি করে রোগ সারানোর চেষ্টা করেন। তাছাড়া অপারেশন করতে পারলে ডাক্তারদের আয়-রোজগারও বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ ডাক্তারদের জন্য অস্ত্র চিকিৎসার বিষয়টি বেশ লাভজনক। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো অপারেশনে শতকরা ৯৯ ভাগ ক্ষেত্রে রোগ সারে না বরং তা আরো মারাত্মক রূপ ধারণ করে কিছুদিন পর একই জায়গায় অথবা শরীরের অন্যত্র কিংবা মানসিক রোগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কারণ অপারেশনের মাধ্যমে কেবল রোগের ফলটা দূর করা যায় কিন্তু রোগের কারণটা দূর করা যায় না। রোগের কারণটা কিন্তু বহাল তবিয়তে থেকেই যায়। ফলে ছুরির ঘা খেয়ে সেটি আরও মারাত্মক রোগের আকৃতিতে প্রকাশ পায়। পেট ব্যথা, মাথা ব্যথা, হাঁপানি, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি ইত্যাদি অগণিত নামে আমরা যত রোগ দেখি ; এগুলো প্রকৃতপক্ষে রোগ নয় বরং রোগের ফলাফল। রোগের ফলটা বস্তু স্তরে (physical level) প্রকাশ পায়, তাই এটি আমরা দেখতে পাই। কিন্তু রোগের কারণটা থাকে শক্তি স্তরে (energy level), তাই সেটি আমাদের দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায়। সে যাক, অপারেশনের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় রোগটি কম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ (যেমন- হাত, পা, চামড়া ইত্যাদি) থেকে চলে গিয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে (যেমন- হার্ট, লিভার, কিডনী, ব্রেন ইত্যাদিকে) আক্রমণ করে থাকে। মনে করুন আপনার ঘরের একটি গর্তে একটি সাপ ঢুকেছে এবং সাপের লেজটি দেখা যাচ্ছে। ইহার মানে হলো সাপটি আপনাকে কামড় দিতে পারে আবার কামড় না দিয়েও ভদ্রভাবে চলে যেতে পারে। কিন্তু আপনি যদি লেজটি দেখা যাচ্ছে ভেবে ছুরি দিয়ে সাপের লেজটি কেটে দেন, তবে এটি নিশ্চিত বলা যায় যে সাপটি ভীষণ ক্ষেপে যাবে এবং জীবন দিয়ে হলেও আপনাকে অন্তত একটি কামড় দেওয়ার চেষ্টা করবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপারেশন হলো সাপের লেজ কেটে দেওয়ার মতো।

আবার অনেক অপারেশন আছে যার ভাল-মন্দ, উপকার-ক্ষতি ইত্যাদি ভালোমতো পরীক্ষা না করেই কোটি কোটি লোকের ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন পুরুষদের জন্ম নিয়ন্ত্রণের অপারেশন ভ্যাসেকটমী (Vasectomies)। প্রায় অর্ধশতাব্দি যাবত এটি একটি জনপ্রিয় অপারেশন এবং বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ইতিমধ্যে এই অপারেশন করেছেন। এতে অণ্ডকোষের একটি নালীকে কেটে দেওয়া হয় অথবা বেধে দেওয়া হয় যাতে শুক্রাণু বের হতে না পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, ভ্যাসেকটমী অপারেশনের সাথে অণ্ডকোষের ক্যান্সার, প্রোস্টেট গ্ল্যাণ্ডের ক্যান্সার, হৃদরোগ, ইমিউনিটির গণ্ডগোল, যৌনকর্মে আকর্ষণ কমে যাওয়া, অকাল বার্ধক্য ইত্যাদি রোগের সম্পর্ক আছে। স্কটল্যাণ্ডের ভ্যাসেকটমী করা ৩০০০ পুরুষের মধ্যে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে যে, অপারেশনের চার বছরের মধ্যে ৮ জন অণ্ডকোষের ক্যান্সারে (testicular cancer) আক্রান্ত হয়েছেন।

আবার কিছু অপারেশন আছে যা ফ্যাশান হিসেবে চালু করা হয়েছে। যেমন ছোট স্তনকে বড় করার অপারেশন। মিডিয়াতে যখন বড় স্তনকে আকর্ষণীয়-লোভনীয় হিসেবে দেখানো শুরু হলো তখন সার্জনরা চিন্তা করলেন যে, অপারেশন করে স্তন বড় করার একটি কালচার চালু করতে পারলে ভালো আয়-রোজগার হবে। তখন তারা প্রচার করতে লাগলো যে, এই অপারেশনে স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হয় না। ফলে বিগত তিন দশকে কেবল আমেরিকাতেই বিশ লক্ষ মহিলা এই অপারেশন করে তাদের স্তন বড় করে ফেললো। ১৯৯২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ঔষধ কর্তৃপক্ষ (FDA) ডাক্তারদের এই অপারেশন বন্ধ করার অনুরোধ জানায় ; কেননা সর্বশেষ গবেষণায় দেখা গেছে ইহার ফলে দুর্বলতা, শরীরের রোগ প্রতিরোধ শক্তি (immune system) ধ্বংস হওয়া, স্মরণশক্তি কমে যাওয়া, স্নায়বিক ক্লান্তি, দীর্ঘস্থায়ী জ্বর প্রভৃতি সমস্যা দেখা দেয়। এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা যে-সব রোগ সারানোর জন্য ছুরি

চালায়, তাদের শতকরা ৯৫ ভাগ রোগ হোমিওপ্যাথিতে বিনা অপারেশনে কেবল ঔষধেই সারানো যায়। অনেকে আশ্চর্য হতে পারেন যে, হার্টের ভাল্ব নষ্ট হওয়া, হার্টে পেস-মেকার লাগানো, হার্টের বাইপাস সার্জারী ইত্যাদির মতো বড় বড় অপারেশনের কেসও হোমিওপ্যাথিতে স্রেফ ঔষধেই নিরাময় করা যায়। কিন্তু তারপরও অধিকাংশ রোগী ঔষধ খেয়ে রোগ সারানোর চাইতে অপারেশন করে রোগ সারানোকে ভালো মনে করেন। তাদের মতে অনেক দিন ঔষধ খাওয়া ঝামেলার ব্যাপার; তার চাইতে সাতদিন হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকা অনেক সহজ। অপারেশন প্রীতির মূল কারণ হলো সাধারণ মানুষ জানে না যে, অপারেশনে রোগ ভাল না হয়ে বরং আরো খারাপ জায়গায় চলে যায় এবং বেশী বেশী অপারেশন করলে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

কোন কোন নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ মনে করেন টনসিলকে যত তাড়াতাড়ি অপারেশন করে ফেলে দেওয়া যায় ততই মঙ্গল আবার কোন কোন নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ মনে করেন টনসিল কেটে ফেলে দেওয়াতে কোন উপকার নেই বরং এটি সাংঘাতিক ক্ষতিকর কাজ (মারাত্মক মারাত্মক হৃদরোগের সৃষ্টি হয়)। কোন কোন ডাক্তার মনে করেন আলসারের রোগীদের দুধ এবং দুধের তৈরী খাবার বেশী বেশী খাওয়া উচিত আবার অন্যদিকে অনেক ডাক্তার মনে করেন এগুলো প্রাগৈতিহাসিক আমলের চিন্তা-ভাবনা (এবং অবশ্যই বর্জনীয়)। আশ্চরযের ব্যাপার হলো, এতো ফ্যাসাদের পরও অধিকাংশ এলোপ্যাথিক ডাক্তারই বিশ্বাস করেন যে, তাদের সকল কর্মকাণ্ড একেবারে (শতভাগ বিজ্ঞানসম্মত এবং কোন প্রকার সন্দেহ আর) প্রশ্নের উর্ধে।

আমাদের দেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্পর্কে প্রচলিত অনেকগুলো ভুল ধারণার মধ্যে কয়েকটি হলো হোমিও ঔষধ দেরিতে কাজ করে, ধীরে ধীরে কাজ করে, হোমিও ঔষধ শিশুদের জন্য ভালো কিন্তু বড়দের ক্ষেত্রে কাজ করে না, হোমিও ঔষধের কোন সাইড ইফেক্ট নাই, জরুরি অবস্থায় হোমিও চিকিৎসা করা ঠিক না ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে আমাদের শরীর এবং মনের গঠন-প্রকৃতি যেমন জটিল, সেই কারণে আমাদের রোগ-ব্যাধির গঠন-প্রকৃতি এবং গতিবিধিও খুবই জটিল। ফলে হোমিওপ্যাথিও হয়েছে খুবই জটিল ; কেননা অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতির মতো এটি কোন ভেজাল-গোজামিল বিজ্ঞান নয়, বরং একশ ভাগ খাঁটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান। কাজেই হোমিওপ্যাথি খুবই জটিল চিকিৎসা বিজ্ঞান হওয়ার কারণে সবচেয়ে বেশী আই.কিউ. সম্পন্ন মেধাবী ছাত্রদের পক্ষেই সম্ভব একজন ভালো হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হওয়া। কিন্তু যেহেতু হোমিওপ্যাথি পড়লে সরকারী চাকুরি পাওয়া যায় না (ইদানীং অবশ্য কয়েকজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে), বড় বড় পদ-পদবী জুটে না, এফসিপিএস-এফআরসিএস ইত্যাদি গাল ফোলানো ডিগ্রি পাওয়া যায় না ; এই কারণে ভালো মেধাবী ছাত্ররা সাধারণত হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয় না। ফলস্রুতিতে দেখা যায় যে, প্রকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন, সুদক্ষ হোমিও ডাক্তারের সংখ্যা আমাদের দেশে খুবই কম। আর ইহাই হোমিওপ্যাথির সমস্ত বদনামের মূল কারণ।

হোমিও ঔষধ অন্য যে-কোন ঔষধের চাইতেও অন্তত একশগুণ দ্রুত কাজ করে যদি লক্ষণ অনুযায়ী সঠিক ঔষধটি দেওয়া যায়। হোমিওপ্যাথিতে যেহেতু রোগের নামে কোন ঔষধ দেওয়া যায় না ; রোগের এবং রোগীর সমস্ত লক্ষণ বিচার করে ঔষধ দিতে হয়- এই কারণে সঠিক ঔষধটি খুঁজে বের করা এতোই কঠিন যে, সবচেয়ে এক্সপার্ট হোমিও ডাক্তারেরও শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ক্ষেত্রে ভুল করার সম্ভাবনা আছে। অনেক রোগের ক্ষেত্রেই এলোপ্যাথিক বা অন্যান্য ঔষধ তো রোজ তিন-চার বেলা করে এক বা একাধিক সপ্তাহ খেতে হয় বা ইনজেকশান নিতে হয়। কিন্তু সঠিক হোমিও ঔষধ যদি সঠিক শক্তিতে দেওয়া যায়, তবে জরুরি অসুখ-বিসুখ তো আছেই, এমনকি পঞ্চাশ বছরের পুরনো রোগও মাত্র এক ডোজ ঔষধেই সেরে যায়। দ্বিতীয় ডোজ ঔষধ খাওয়ারও প্রয়োজন

হয় না। আর হোমিও ঔষধের কোন সাইড ইফেক্ট নাই, ইহাও একটি ভুল ধারণা। যুক্তির কথা হলো যার একশান আছে, তার রিয়েকশানও আছে। সঠিক তথ্য হলো, নিম্নশক্তিতে এবং মধ্যম শক্তিতে হোমিও ঔষধের সাইড ইফেক্ট খুবই কম ; একেবারে নাই বলার মতো। তবে উচ্চশক্তিতে যদি উল্টাপাল্টা ঔষধ খান, তবে আপনার বারোটা বেজে যেতে পারে। অনেকে মনে করেন, হোমিও ঔষধের মতো ইউনানী, আয়ুর্বেদিক এবং কবিরাজি ঔষধেরও কোন সাইড ইফেক্ট নাই। এটিও আরেকটি মহা ভুল ধারণা। লতাপাতার গুণাগুণ সম্পর্কে যাদের কোন জ্ঞান নাই, তারাই এই ধরণের কথা বলতে পারে। গাছপালা যদি এতই নিরাপদ হতো তবে ধুতরার বীচি খেলে মানুষ মরতো না !

ইদানীং আবার শুরু হয়েছে বিশেষজ্ঞদের (specialist) হুজুগ। মানুষ এখন আর ডাক্তারদের উপর ভরসা করতে চায় না। পান থেকে চুন খসলেই দৌড়ে যায় স্পেশালিষ্টের কাছে। অথচ চিকিৎসক সমাজে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, একজন ভালো ডাক্তার দশজন বিশেষজ্ঞের সমান। অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ হওয়া সহজ কিন্তু একজন যথার্থ আদর্শ ডাক্তার হওয়া খুবই কঠিন কাজ। বিশেষজ্ঞরা যেহেতু খুবই ক্ষুদ্র এবং সংকীর্ণ একটি বিষয় নিয়ে তাদের জীবন কাটিয়ে দেয়, সেহেতু তাদের জ্ঞানের পরিধি এবং দৃষ্টিভঙ্গিও সংকীর্ণ হয়ে যায়। আমাদের শরীর-মনকে যদি সমুদ্রের সাথে তুলনা করা যায়, তবে বিশেষজ্ঞদের তুলনা করা যাবে খাল-বিলের দক্ষ মাঝি-মাল্লা হিসেবে। এখন ভেবে দেখুন, খালের মাঝিরা যদি কখনো সমুদ্রের ঝড়ের কবলে পড়ে, তবে চোখে-মুখে সর্ষে ফুল দেখবে কিনা ?
হোমিও ডাক্তাররা এবং আরো অনেকেই এই বিশেষজ্ঞ প্রথাকে অযৌক্তিক এবং হাস্যকর মনে করতেন। ব্রিটিশ হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাঃ বার্নেট বলতেন যে, রোগ চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথির নীতিতে অটল একজন ছোট হোমিও ডাক্তারও যে যাদু দেখাতে পারবেন, তা দেখে দৈতাকৃতির এলোপ্যাথিক বিশেষজ্ঞও মহাবিস্মিত না হয়ে পারবেন না। মেডিক্যাল গবেষক বা চিকিৎসা বিজ্ঞানী নামে আমরা যাদের জানি, তাদের মধ্যে দুটি গ্রুপ আছে। তাদের সবচেয়ে বড় অংশটি কাজ করে বহুজাতিক ঔষধ কোম্পানিগুলো দালাল হিসেবে। তারা আবিষ্কারের নামে এমন সব উল্টাপাল্টা তথ্য প্রচার করে যাতে সংশ্লিষ্ট ঔষধ কোম্পানির ব্যবসা আঙুল ফোলে কলা গাছ হতে পারে। অন্যদিকে খুবই অল্পসংখ্যক চিকিৎসা বিজ্ঞানী আছেন, যারা মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য বিবেকের তাড়ণায় গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে সত্য উদঘাটন করেন। কিন্তু তাদের আবিষ্কারকে মেডিক্যাল জার্নাল বা অন্যকোন মিডিয়া প্রচার করতে চায় না। কেননা ঔষধ কোম্পানিগুলো টাকা দিয়ে তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থের পরিপন্থী এসব আবিষ্কারকে প্রচার না করতে বাধ্য করে।

এবার কোলেস্টেরলের (cholesterol) কাহিনী একটু বলা দরকার। ঔষধ কোম্পানীগুলি ঔষধের ভাল-মন্দ না জেনে পর্যাপ্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই কিভাবে ক্ষতিকর, ধ্বংসাত্মক ঔষধ বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মানুষকে পাইকারী হারে খাওয়াতে থাকে, এটি তার আরেকটি দৃষ্টান্ত। পাশ্চাত্যের ধনী দেশগুলোর অধিকাংশ লোকই মোটা-সোটা, নাদুস-নুদুস। কেননা তারা মাংস, তেল, চর্বি জাতীয় খাবার বেশী খায়। ফলে তাদের রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা অন্যদের চাইতে বেশী থাকে। বড় বড় ঔষধ কোম্পানিগুলো ভাবলো, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যাওয়াকে যদি একটি রোগ হিসেবে ঘোষণা করা যায় এবং এজন্য কোলেস্টেরলের মাত্রা কমানোর একটি ঔষধ বাজারে ছাড়া যায়, তবে আমাদের লাভের অংক মিলিয়ন ডলারের কোটা ছেড়ে বিলিয়ন ডলারের কোটায় পৌঁছে যাবে। ফলে তারা টাকা-পয়সা খরচা করে কিছু দালাল চিকিৎসা বিজ্ঞানীকে গবেষণা করার জন্য নিয়োগ দিলো। এই ভাড়াটে বিজ্ঞানীরা অল্প দিনের মধ্যেই ঘোষণা করলো যে, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলে উচ্চ রক্তচাপ এবং হার্ট এটাকের ঝুঁকি বেড়ে যায়। আর যায় কৈ ?

রাতারাতি কোলেস্টেরলের মাত্রা কমানোর ঔষধ মার্কেটে এসে গেলো এবং হার্ট এটাকের ভয়ে কোটি কোটি মানুষ সেগুলো পাইকারী হারে খাওয়া শুরু করলো। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, ৯০-এর দশকে ঔষধ কোম্পানীগুলি সবচেয়ে বেশী লাভ করেছে কোলেস্টেরল কমানোর ঔষধ বিক্রি করে। ঔষধ কোম্পানিগুলি পছন্দ করে দীর্ঘমেয়াদী আন্তর্জাতিক মার্কেট আর ভোগবাদী মানুষ পছন্দ করে মজার মজার খাবার খাওয়া বন্ধ না করে বরং ট্যাবলেট খেয়ে ঝামেলা মুক্তি। অথচ পরবর্তীতে অনেক গবেষণায় দেখা গেছে যে, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমানো কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কেননা তাতে ছোট-খাটো দুর্ঘটনাতেই মৃত্যু ঘটার সম্ভাবণা আছে এবং আরেকটি বিপদ হলো রক্তে কোলেস্টরলের পরিমাণ কমে গেলে আত্মহত্যা করার ইচ্ছা বেড়ে যায় আবার ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। শুধু তাই নয়, চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের একটি অংশ মনে করেন যে, কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশী কমে গেলে ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় বিপদজ্জনকভাবে। কিন্তু কে শোনে কার কথা, ঔষধ কোম্পানীগুলোর প্ররোচনায় ডাক্তাররা এখনও হরদম এসব ঔষধ মানুষকে গিলিয়ে যাচ্ছেন।

চিকিৎসা পেশার প্রায় সব শাখায় বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণের অভাব এতই বেশী যে, এটি এখন গাঁ সওয়া হয়ে গেছে। নিতান্ত অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ইহাতে নিশ্চিত বলে কোন ব্যাপার নেই। রোগী ডাক্তারের কাছ থেকে কি পাবে তা নির্ভর করে বিজ্ঞানের ওপর নয় বরং ভাগ্যের ওপর এবং ডাক্তারের মানসিক অবস্থার ওপর। ডাক্তারদের উভয় সঙ্কট (The doctor's dilemma) নামক নাটকের ভূমিকায় জর্জ বার্নার্ড শ দেখিয়ে ছিলেন যে, একবার ইংল্যাণ্ডের এক ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর সময় একজন সাংবাদিক রোগীর অভিনয় করে তখনকার দিনের সেরা চিকিৎসকদের পরামর্শ নিয়েছিলেন। পরদিন নামকরা সকল চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন পত্রিকায় ছাপিয়ে ছিলেন যাতে দেখা যায় যে, তিনি সকল চিকিৎসককে একই সমস্যার কথা বললেও প্রত্যেক ডাক্তারের পরামর্শ ছিল ভিন্ন ভিন্ন (দুইজন ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের মধ্যেও মিল পাওয়া যায় নাই)। এই ঘটনার পর প্রায় একশ বছর কেটে গেলেও অবস্থার তেমন হেরফের হয়নি (যদিও এখন চিকিৎসার কাজে উচ্চ প্রযুক্তির চরম ব্যবহার হচ্ছে) ; বিশ্বাস না করলে এখনও আপনি একই রোগের জন্য দশজন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে দেখতে পারেন। এমনকি একই রোগের জন্য আপনাকে কতদিন হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকতে হবে, তাও একেক ডাক্তারের ক্ষেত্রে একেক রকম হবে। কাউকে কাউকে আবার দেখা যায়, ডাক্তারদের কাছ থেকে জোর করে ঔষধ লিখিয়ে নেন। হয়ত সামান্য একটু কেটে গেছে, ডাক্তার সাহেব বললেন এরকম ছোটখাটো ব্যাপারে ধনুষ্টংকারের টিকা (এটিএস) নেওয়ার প্রয়োজন নাই। কিন্তু রোগী বলবে, "না ডাক্তার সাহেব, ভয় করতেছে, একটি এটিএস ইনজেকশান দিয়ে দেন"। ফলে বাধ্য হয়ে রোগীকে খুশি করার জন্য তিনি এটিএস লিখে দেন। ডাক্তার সাহেব জানেন যে, এটিএস ইনজেকশান যে-কারো ওপর রিয়েকশান করতে পারে এবং তাতে রোগীর বিরাট ক্ষতি এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। কাজেই অপ্রয়োজনে ইহার নিকটবর্তী না হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ কিন্তু রোগীদের তো আর এতো কিছু জানা থাকে না।

আপনাকে বুঝতে হবে যে, আপনার প্রিয় অথবা অতি প্রিয় ডাক্তার সাহেব আসলে সব জানেন না। আবার ক্ষেত্র বিশেষে সবই জানেন, কিন্তু ইচ্ছে করলেই তিনি সবকিছু করতে পারেন না। কেননা তিনিও একটি সিস্টেমের হাতে বন্দী হয়ে আছেন। যে-কোন প্রতিষ্ঠিত দুষ্ট চক্রের বাহুজাল ছিন্ন করে মুক্ত-স্বাধীন হতে গেলে যে অপরিসীম ত্যাগ ও সাহস দরকার, তা কেবল মহাপুরুষদের মধ্যেই থাকে। আর বাস্তবতা হলো সব ডাক্তারই মহাপুরুষ নন। হোমিওপ্যাথির আবিস্কারক জার্মান চিকিৎসা বিজ্ঞানী মহাত্মা ডাঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যান ছিলেন এমনই একজন মহাপুরুষ। আজ থেকে দুশ বছর পূর্বে হ্যানিম্যানের সময় এলোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল চরম বর্বরতার সমতুল্য। তখনকার দিনের এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা উচ্চ রক্তচাপসহ অধিকাংশ রোগের চিকিৎসার জন্যই রোগীর শরীরে অনেকগুলো জোঁক

লাগিয়ে দিতো অথবা রগ কেটে রক্ত বের করত, মানসিক রোগীকে ভুতে ধরেছে মনে করে পিটিয়ে লাশ বানিয়ে ফেলত, একটি রোগের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে পনের থেকে বিশটি ঔষধ রোগী খাওয়ানো হতো ইত্যাদি ইত্যাদি। হ্যানিম্যান কিন্তু অন্যান্য ডাক্তারদের মতো ডাক্তারী পাশ করে মাল কামানোর পেছনে লেগে যান নাই; বরং চিকিৎসার নামে এসব বর্বরতা থেকে মানবজাতিকে কিভাবে মুক্ত করা যায় তা নিয়ে যুগের পর যুগ গবেষণা করেছেন। এজন্য তাকে অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট, অপমান-লাঞ্ছনা, হুমকি-ধামকি, দেশ থেকে বহিষ্কার প্রভৃতি অনেক অনেক ভোগান্তি সহ্য করতে হয়েছে কিন্তু তারপরও তিনি পিছপা হননি। ফলে রোগের উৎপত্তি, রোগের চিকিৎসা, ঔষধ আবিষ্কার, ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী, ঔষধের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে তিনি অনেকগুলো বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। ডাক্তারদের মধ্যে পেশাগত অহমিকা, লোভ, হিংসা ইত্যাদি যে কত বেশী মাত্রায় আছে, তার প্রমাণ হলো হোমিওপ্যাথির আবিষ্কার। রোগীকে কষ্ট না দিয়ে, কম খরচে এবং কম সময়ের মধ্যে রোগ নিরাময়ের স্বার্থে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই অমূল্য আবিষ্কারকে যেখানে সকল চিকিৎসকের সাদরে গ্রহন করা উচিত ছিল, সেখানে দেখা গেছে নব্বইভাগ ডাক্তারই হ্যানিম্যানের এই অমূল্য আবিষ্কারকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞান এলোপ্যাথি এবং হোমিওপ্যাথি নামে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, আজ থেকে একশ বছর পূবে ইউরোপে এবং আমেরিকায় এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা প্রথম যখন সমিতি গঠন করেছিল, তখন তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর বুক থেকে (একটি মানবতাবাদী চিকিৎসা বিজ্ঞান) হোমিওপ্যাথিকে নিশ্চিহ্ন করা। বাণিজ্যের কাছে সেবাধর্ম কিভাবে পরাজিত হয়, এসব ইতিহাস সবারই জানা থাকা উচিত।

মনে রাখতে হবে যে, আপনার শরীর, আপনার মন, আপনার জীবন- এসবই আপনার অমূল্য সম্পদ। কাজেই এগুলোর ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সকল ক্ষমতা কেবল ডাক্তারের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনার নিজেকেই। যদি কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হন, তবে এলোপ্যাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক উভয় ধরণের ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে তারপর সিদ্ধান্ত নিন। প্রয়োজনে ইউনানী, আয়ুর্বেদিক এবং ন্যাচারোপ্যাথিক ডাক্তারেরও পরামর্শ নিন। সবচেয়ে ভালো হয় প্রচলিত সব ধরণের চিকিৎসা পদ্ধতির বই কিনে সেগুলো পড়ে দেখুন আপনার রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে তাতে কি লেখা আছে। যেহেতু রোগ-ব্যাধি সবারই হয়ে থাকে, সেহেতু প্রত্যেক পরিবারের অন্তত একজন সদস্যের হলেও চিকিৎসা বিষয়ক বই-পুস্তক পড়ার অভ্যাস থাকা উচিত। আর এভাবেই আমরা নিজেদেরকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি।

**Dengue fever (ডেঙ্গু জ্বর) :** প্রতি বছরের ন্যায় এবারও রাজধানীতে ডেঙ্গু জ্বরের উৎপাত শুরু হয়েছে। এটি সত্যিসত্যি একটি ভয়ঙ্কর ধরণের জ্বর। আমার এক পরিচিত যুবক বয়সী ভদ্রলোককে একদিন দেখলাম হঠাৎ করে ইয়া লম্বা দাঁড়ি রেখে দস্তর মতো নামায-রোজা শুরু করে দিয়েছেন। তার হঠাৎ এরকম আমূল পরিবর্তনের কারণে জিজ্ঞেস করলে বললেন, "ভাই, হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলাম। ভাবিনি আজরাইলের হাত থেকে ছাড়া পাবো। তাই নিয়ত করেছিলাম এই যাত্রায় বেঁচে গেলে ধর্মকর্মে আর কোন গাফিলতি করব না"। হ্যাঁ, এই রকম ঘটনা খোঁজ নিলে অনেক পাওয়া যাবে। যদিও বলা হয় যে, এডিস মশার দংশনের মাধ্যমে ডেঙ্গু জ্বরের ভাইরাস আমাদের শরীরে প্রবেশের ফলেই আমরা ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হই কিন্তু এটি পুরোপুরি সত্য নয়। আসলে প্রতিনিয়ত হাজার হাজার ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাস বিভিন্নভাবে আমাদের শরীরে ঢুকিতেছে এবং বের হইতেছে, তাতে কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত হাজার হাজার রোগে আক্রান্ত হচ্ছি না। আমরা তখনই রোগে আক্রান্ত হই যখন আমাদের জীবনীশক্তি বা রোগ প্রতিরোধশক্তি (immune system) দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার কারণে জীবাণুরা আমাদের শরীরে বংশবিস্তার করার উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে যায়। আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, বেশী বেশী টিকা নেওয়া, বেশী

বেশী ঔষধ খাওয়া, মাদক-দ্রব্য সেবন করা, যৌন রোগে আক্রান্ত হওয়া, স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম-কানুন মেনে না চলা, পর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রম / ব্যায়াম না করা, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহন না করা ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে (জন্মগতভাবে প্রাপ্ত মানবজাতির অমূল্য সম্পদ আমাদের এই) রোগ প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

**লক্ষণ** ঃ- সামপ্রতিক কালে বাংলাদেশে ত্রাস সঞ্চারকারী এই **ডেঙ্গু জ্বরের প্রধান লক্ষণ হলো তিনটি ঃ জ্বর, চামড়ার নীচে লালচে দাগ (ৎধংয) পড়া এবং শরীর ব্যথা।** জ্বরের তাপ থাকে খুব বেশী (১০৩ থেকে ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট)। মাংস, হাড় এবং জয়েন্টে এমন প্রচণ্ড ব্যথা থাকে যে, **মনে হবে কেউ যেন লাঠি দিয়ে পিটিয়ে তার হাড়গুলো ভেঙ্গে গুড়ো করে দিয়েছে।** আর এই কারণে ডেঙ্গু জ্বরের আরেক নাম হলো হাড়ভাঙ্গা জ্বর (Bone breaker)। তাছাড়া **অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাংঘাতিক মাথা ব্যথা এবং প্রচণ্ড বমি থাকে।** চামড়ার নীচে ছোট ছোট লালচে দাগ পড়ে। ভীষণ দুর্বলতা, গলা ব্যথা, হাত-পায়ে পানি নামা ইত্যাদি থাকতে পারে। ডেঙ্গু জ্বরের দুটি পর্যায় আছে যার মাঝখানে জ্বরের বিরতি থাকে একদিন। ডেঙ্গু জ্বরের দ্বিতীয় পর্যায় হলো রক্তক্ষরণযুক্ত (hemorrhagic fever) জ্বর। এসময় চামড়ার নীচে রক্তক্ষরণ হওয়ার কারণে লালচে দাগ পড়ে, হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়, নাড়ির গতি ক্ষীণ হয়ে পড়ে, শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়, রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে, পায়খানা-প্রস্রাব-বমির সাথে রক্ত যায় এবং রোগী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এই জন্য চামড়ার নীচে রক্তক্ষরণ হওয়া মাত্রই রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণ করা উচিত। এই জ্বর সাধারণত ৫ থেকে ১০ দিনের মধ্যে সেরে যায়, তবে রোগীর স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পেতে প্রায় এক মাস লেগে যায়।

**প্রতিরোধ** - ডেঙ্গু জ্বর শিশু, অসুস্থ এবং বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে প্রায়ই মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনতে পারে। কাজেই এটি প্রতিরোধের দিকে সকলকে গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য মশা মারতে হবে, মশার বৃদ্ধি বংশবৃদ্ধি বন্ধ করতে হবে। ডেঙ্গু মশা যেহেতু পরিষ্কার পানিতে ডিম পারে, সেহেতু পরিষ্কার পানি যাতে বাড়ির আশেপাশে কোথাও জমে না থাকে সেটি নিশ্চিত করতে হবে। যেমন- এসি বা ফ্রীজের নীচে, ফুলের টবে, ছাদে ইত্যাদি। পাশাপাশি এমন ধরণের পোষাক পড়তে হবে যাতে মশা শরীরে কামড়াতে না পারে। ঘরে বাইরে মশার ঔষধ ছিটাতে হবে এবং মশারির নীচে ঘুমাতে হবে।

**চিকিৎসা** ঃ- ডেঙ্গু জ্বরের একটি শ্রেষ্ট ঔষধ হলো ইউপেটোরিয়াম পারফোলিয়েটাম (Eupatorium perfoliatum)। এই হোমিও ঔষধটি এমন একটি গাছের রস থেকে তৈরী করা হয়, যেই গাছের আঞ্চলিক নাম হলো বোনসেট (Bone set) বা হাড় জোড়া লাগানো। এখানে লক্ষ্য করার মতো একটি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এই যে, জ্বরের নাম হাড়ভাঙ্গা এবং তার ঔষধি গাছটির নাম হাড়জোড়া। ঔষধটি একই সঙ্গে ডেঙ্গু জ্বরের ঔষধ এবং ডেঙ্গু জ্বরের টিকা বা প্রতিষেধক (Vaccine) হিসাবে কাজ করে। ডেঙ্গু জ্বরে ইউপেটোরিয়াম পারফো খেতে পারলে আর অন্য কোন ঔষধ খাওয়ার প্রয়োজন হয় না। তবে অন্য কোন ঔষধের সাথে খেলেও ইহার একশানে কোন বাধা পড়বে না। ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, ইনফ্লুয়েঞ্জা, বার্ড ফ্লু, সিজনাল ভাইরাস জ্বর ইত্যাদি যে-কোন নামের জ্বরই হউক না কেন, এই ঔষধটি খেয়ে দারুণ উপকার পাবেন যদি তাতে প্রচণ্ড শরীর ব্যথা থাকে। অর্থাৎ প্রচণ্ড শরীর ব্যথাযুক্ত যে-কোন জ্বরে এটি প্রযোজ্য। তাছাড়া ডেঙ্গু জ্বরে এই ঔষধটি সেবন করলে স্বাভাবিক ডেঙ্গু জ্বরকে রক্তক্ষরণযুক্ত ডেঙ্গু জ্বরে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমিয়ে দেয়। ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হলে এটি ৩০ অথবা ২০০ শক্তিতে রোজ কমপক্ষে তিনবেলা করে খান। আর যারা ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হননি, তারা ডেঙ্গু জ্বরের হাত থেকে বাঁচার জন্য সপ্তাহে একমাত্রা করে খেয়ে যান। অত্যধিক জ্বরের সময় মাথায় ঠান্ডা পানি ঢালুন এবং ভিজা গামছা দিয়ে ঘনঘন শরীর মুছে দিতে থাকুন। হ্যাঁ, ঔষধের পাশাপাশি স্বাভাবিক খাবার, পানি ও শরবত প্রচুর পরিমাণে খেতে থাকুন। ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ যদি অন্য কোন ঔষধের সাথে মিলে যায়, তবে সেটিই সেবন করুন। বিস্তারিত জ্বরের অধ্যায়ে দেখুন।

**Depression (বিষন্নতা, হতাশা) :** দীর্ঘদিন মন খারাপ থাকাকে বিষন্নতা বলা হয়। সাধারণত আপনজনের বিচ্ছেদ, ঘনিষ্ট কারো মৃত্যু, প্রেমে ব্যর্থতা, চাকরি হারানো, ব্যবসায়ে লোকসান, আশাভঙ্গ, অতীতের অপরাধের অনুশোচনা, বেশী বেশী লবণ খাওয়া, হতাশা, কঠিন কোন রোগে ভোগা, পারিবারিক অশান্তি, কোন ঔষধের কুফল, শৈশবে পাওয়া মানুষের দুর্ব্যবহার প্রভৃতি কারণে মানুষ বিষন্নতায় আক্রান্ত হয়। বিষন্নতায় আক্রান্ত হলে মানুষ অসহায় বোধ করতে থাকে, কাঁদতে ইচ্ছে করে, নিরিবিলি থাকতে চায়, নিঃসঙ্গ থাকলে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসায়, আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়, কেউ কেউ আত্মহত্যা করে ফেলে, ক্ষুধা কমে যায়, মাথা ব্যথা হয় বেশী বেশী, বুক ধরফড়ানি, নিদ্রাহীনতা, পুরোপুরি পাগল হয়ে যাওয়া প্রভৃতি সমস্যা দেখা দেয়।

Aurum metallicum : অরাম মেট হলো হোমিওপ্যাথিতে বিষন্নতার একটি শ্রেষ্ট ঔষধ। বিশেষত মারাত্মক ধরণের বিষন্নতা যাতে মানুষের মধ্যে আত্মহত্যার নেশা চেপে যায়, তাতে অরাম মেট ভালো কাজ করে। সে ভাবে সে পৃথিবীতে বসবাসের অনুপযুক্ত এবং আত্মহত্যা করতে আনন্দ পায়। স্বর্ণ থেকে প্রস্তুত করা এই ঔষধটি আত্মহত্যা ঠেকানোর একটি শ্রেষ্ট ঔষধ। সাধারণত স্বর্ণ মানুষকে আত্মহত্যা করতে উৎসাহিত করে; যেমন মেয়েরা স্বর্ণের অলঙ্কার ব্যবহার করে বেশী আর এই কারণে তারা আত্মহত্যাও করে বেশী। কেননা স্বর্ণ তাদের চামড়া দিয়ে অল্প অল্প করে শরীরে ঢুকে থাকে। পক্ষান্তরে স্বর্ণকে শক্তিকৃত করে তৈরী করা ঔষধ অরাম মেট মানুষের আত্মহত্যা করার ইচ্ছাকে নষ্ট করে দেয়।

Arsenicum album : আর্সেনিকের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা, জ্বালাপোড়া ভাব, খুঁতখুঁতে স্বভাব, কাজে কর্মে একবারে নিখুঁত (perfectionistic), মৃত্যুকে ভয় পায় আবার আত্মহত্যা করতেও চায়, রাত ১টা থেকে ২টা পযর্ন্ত বিষন্নতা বেড়ে যায়, অজানা অমঙ্গলের ভয়, মনে হয় মানুষ খুন করেছে এমন টেনশান করতে থাকে, মনে হয় এখনই পুলিশ এসে তাকে গ্রেফতার করবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

Causticum : যারা অন্যের দুঃখ-কষ্ট দেখতে সহ্য করতে পারেন না, প্রতিবাদী স্বভাবের, অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে থাকতে পারেন না, ভুলো মন, দরজা লাগানো হয়েছে কিনা কিংবা চুলা নেভানো হয়েছে কিনা বারবার পরীক্ষা করেন, এই ধরনের লোকদের বিষন্নতায় কষ্টিকাম প্রযোজ্য।

Cimicifuga : সিমিসিফিউগার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো গোমড়ামুখ, দুঃখবোধ, নিদ্রাহীনতা, ভয় পায় সে মনে হয় পাগল হয়ে যাবে, কেউ আঘাত করবে অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয় করে, মনে হয় সবকিছুকে একটি কালো পর্দা ঢেকে দিয়েছে ইত্যাদি।

Ignatia amara : অল্প সময় বা অল্প কয়েকদিন পূর্বে বড় ধরণের মানসিক আঘাত পাওয়ার কারণে বিষন্নতার সৃষ্টি হলে তাতে ইগ্নেশিয়া প্রয়োগ করতে হবে। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো কোন কারণ ছাড়াই হাসে-কাদে, কিছুক্ষণ পরপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হাই তোলে, গলার মধ্যে একটা চাকার মতো কিছু আটকে আছে মনে হওয়া, নিদ্রাহীনতা, মাথাব্যথা, পেটের মধ্যে খামচে ধরা ব্যথা ইত্যাদি।

Natrum muriaticum : পক্ষান্তরে মানসিক আঘাত পাওয়ার পরে অনেক দিন কেটে গেলে তাতে নেট্রাম মিউর ঔষধটি প্রযোজ্য। সাধারণত খুবই সেনসেটিভ, সান্ত্বনা দিলে উল্টো আরো ক্ষেপে যায়, লবণ জাতীয় খাবার বেশী খায় ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে তাতে নেট্রাম মিউর ভালো কাজ করে।

Kali phosphoricum : সাধারণত কঠোর পরিশ্রমের কারণে, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের ফলে, দীর্ঘদিন শোক-দুঃখ-আবেগ-উত্তেজনায় ভোগার কারণে বিষন্নতার সৃষ্টি হলে তাতে ক্যালি ফস ঔষধটি সুফল দিবে। কোন কাজে মনোযোগ

দিতে না পারা, মানসিক পরিশ্রমে মাথাব্যথা, প্রচুর ঘামানো, সহজে সর্দি লাগা, রক্তশূণ্যতা, নিদ্রাহীনতা, বদহজম প্রভৃতি সমস্যা একসাথে দেখা দিলে তাতে ক্যালি ফস প্রযোজ্য।

Natrum carbonicum : সাধারণত **নম্র-ভদ্র-শান্তিপ্রিয়-পরোপকারী** স্বভাবের লোকদের ক্ষেত্রে এই ঔষধটি প্রযোজ্য, যারা ঝগড়া-ঝাটিকে ভয় পায়। কোন কারণে এরা কষ্ট পেলে সেটি মনের মধ্যে চেপে রাখে এবং বিষন্নতায় ভোগতে থাকে। এরা বিষন্নতায় আক্রান্ত হলে বসে বসে বিরহের গান শুনতে থাকে। এই ধরণের লোকদের ক্ষেত্রে নেট্রাম কার্ব হলো বিষন্নতার শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

## Dermatological diseases, Skin disease (চর্মরোগ) :-

হোমিওপ্যাথিতে চর্মরোগের চিকিৎসার জন্য আলাদা কোন শর্টকাট রাস্তা নাই। রোগের নাম নয় বরং রোগের লক্ষণ এবং রোগের কারণ অনুযায়ী ঔষধ নির্বাচন করে প্রয়োগ করতে হবে। তাহলেই আরোগ্যের আশা করতে পারেন। হ্যাঁ, যে-কোন হোমিও ঔষধেই যে-কোন চর্মরোগ নিরাময় করা সম্ভব যদি সেই ঔষধের সাথে রোগটির লক্ষণ মিলে যায়। তারপরও নীচে কয়েকটি হোমিও ঔষধের ব্যবহার বর্ণনা করা হলো -

Thuja occidentalis : একটু মারাত্মক ভয়ঙ্কর ধরনের অধিকাংশ চর্মরোগের একটি মূল কারণ হলো টিকা (বিসিজি, ডিপিটি, এটিএস, পোলিও, হেপাটাইটিস, এটিএস ইত্যাদি) নেওয়া। কাজেই কোন টিকা নেওয়ার দুয়েক মাস থেকে দুয়েক বছরের মধ্যে কোন চর্মরোগ দেখা দিলে প্রথমেই থুজা নামক ঔষধটি উচ্চ শক্তিতে এক মাত্রা খেয়ে নিতে হবে। বিশেষ করে খুসকির সাথে যাদের শরীরে আঁচিলও আছে, তাদের প্রথমেই সপ্তাহে একমাত্রা করে কয়েক মাত্রা খুজা খেয়ে নেওয়া উচিত।

Arsenicum album : যে-কোন চর্মরোগের সাথে যদি অস্থিরতা, জ্বালাপোড়া, পেটের অসুখ, রাতের বেলা বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে আর্সেনিক খেতে হবে।

Kali sulphuricum : ক্যালি সালফ খুসকির মতো চামড়া ওঠা জাতীয় রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ক্যালি সালফের আরেকটি প্রধান লক্ষণ হলো হলুদ রঙ। যদি পূজেঁর রঙ, প্রস্রাবের রঙ অথবা কফের রঙ হলুদ হয়, তবে যে-কোন রোগে ক্যালি সালফ প্রয়োগে ভাল ফল পাবেন।

Sepia : **তলপেটে বল বা চাকার মতো কিছু একটা আছে মনে হয়,** রোগী তলপেটের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পায়খানার রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাবে এই ভয়ে দুই পা দিয়ে চেপে ধরে রাখে, সর্বদা শীতে কাঁপতে থাকে, দুধ সহ্য হয় না, ঘনঘন গর্ভপাত হয়, **স্বামী-সন্তান-চাকরি-বাকরির প্রতি আকর্ষণ কমে যায় ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে যে-কোন চর্মরোগে সিপিয়া খেতে পারেন।**

Sulphur : চর্মরোগের একটি সেরা ঔষধ হলো সালফার যদি তাতে অত্যধিক চুলকানী এবং জ্বালাপোড়া থাকে। এই কারণে রোগীর মধ্যে অন্য কোন ঔষধের লক্ষণ না থাকলে অবশ্যই তার চিকিৎসা প্রথমে সালফার দিয়ে শুরু করা উচিত। যাদের চর্মরোগ বেশী বেশী হয়, তাদেরকে প্রথমে অবশ্যই দুয়েক মাত্রা সালফার খাওয়াতেই হবে এবং সালফার তার ভেতর থেকে সকল চর্মরোগ বের করে আনবে। পক্ষান্তরে যাদের চর্মরোগ বেশী বেশী হয় এবং শীতকাতর তাদেরকে প্রথমে খাওয়াতে হবে সোরিনাম (Psorinum)। সালফারের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **সকাল ১১টার দিকে ভীষণ খিদে পাওয়া, গোসল করা অপছন্দ করে,** গরম লাগে বেশী, শরীরে চুলকানী বেশী, হাতের তালু-পায়ের তালু-মাথার তালুতে জ্বালাপোড়া, **মাথা গরম কিন্তু পা ঠান্ডা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে কোন খেয়াল নাই,** রোগ বিছানার গরমে বৃদ্ধি পায়, ছেড়া-নোংরা তেনা দেখেও আনন্দিত হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

Mezereum : মেজেরিয়ামের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **মাথার থেকে মোটা মোটা চামড়ার মতো চলটা উঠতে থাকে, এগুলোর নীচে আবার পূঁজ জমে থাকে, চুল আঠা দিয়ে জট লেগে থাকে,** পূঁজ থেকে এক সময় দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে, চুলকানীর জন্য রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায় ইত্যাদি।

Graphites : গ্র্যাফাইটিসের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো অলসতা, **দিনদিন কেবল মোটা হওয়া,** মাসিকের রক্তক্ষরণ খুবই কম হওয়া, **চর্মরোগ বেশী হওয়া এবং তা থেকে মধুর মতো আঠালো তরল পদার্থ বের হওয়া,** ঘনঘন মাথাব্যথা হওয়া, নাক থেকে রক্তক্ষরণ হওয়া, আলো অসহ্য লাগা ইত্যাদি। উপরের লক্ষণগুলোর দু'তিনটিও যদি কোন রোগীর মধ্যে থাকে, তবে গ্র্যাফাইটিস তার চর্মরোগ সারিয়ে দেবে।

Hepar sulph : হিপার সালফের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো এরা সাংঘাতিক সেনসেটিভ (over-sensitiveness), এতই সেনসেটিভ যে রোগাক্রান্ত স্থানে সামান্য স্পর্শও সহ্য করতে পারে না, এমনকি কাপড়ের স্পর্শও না। কেবল মানুষের বা কাপড়ের স্পর্শ নয়, এমনকি ঠান্ডা বাতাসের স্পর্শও সহ্য করতে পারে না। সাথে সাথে শব্দ (গোলমাল) এবং গন্ধও সহ্য করতে পারে না। হিপারের শুধু শরীরই সেনসেটিভ নয়, সাথে সাথে মনও সেনসেটিভ। অর্থাৎ মেজাজ খুবই খিটখিটে। কাটা-ছেড়া-পোড়া ইত্যাদি ঘা/ক্ষত শুকাতে হিপার বেশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে মনে রাখতে হবে যে, হিপারের পূঁজ হয় পাতলা। যেখানে আঠালো পূঁজ বা কষ বের হয়, সেখানে হিপারের বদলে ক্যালি বাইক্রোম (Kali bichromicum) ব্যবহার করতে হবে। সাধারণত ফোড়া পাকাতে নিম্নশক্তি এবং ফোড়া সারাতে উচ্চশক্তি ব্যবহার করতে হয়।

Natrum muriaticum : মুখ সাদাটে এবং ফোলা ফোলা, **বেশী বেশী লবণ বা লবণযুক্ত খাবার খায়,** কথা শিখতে বা পড়াশোনা শিখতে দেরী হয়, ঋতুস্রাবে রক্তক্ষরণ হয় খুবই অল্প, **পা মোটা কিন্তু ঘাড় চিকন, মানসিক আঘাত পাওয়ার পর কোন চর্**মরোগ হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে যে-কোন চর্মরোগে নেট্রাম মিউর খেতে পারেন।

Croton Tiglium : ক্রোটন টিগ চর্মরোগের একটি সেরা ঔষধ। ইহার প্রধান লক্ষণ হলো **চর্মরোগে প্রচুর চুলকানি থাকে কিন্তু জোরে চুলকানো রোগী সহ্য করতে পারে না।** কেননা তাতে আরাম না বরং সাংঘাতিক ব্যথা পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে হালকা ভাবে চুলকালে অথবা মালিশ করলে রোগী আরাম পায়।

Rhus toxicodendron : রাস টক্সের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **প্রচণ্ড অস্থিরতা,** রোগী এতই অস্থিরতায় ভোগে যে এক পজিশনে বেশীক্ষণ স্থির থাকতে পারে না, রোগীর শীতভাব এমন বেশী যে তার মনে হয় কেউ যেন বালতি দিয়ে তার গায়ে ঠান্ডা পানি ঢালতেছে, নড়াচড়া করলে (অথবা শরীর টিপে দিলে) তার ভালো লাগে অর্থাৎ রোগের কষ্ট কমে যায়, স্বপ্ন দেখে যেন খুব পরিশ্রমের কাজ করতেছে। পাশের চিত্রের ন্যায় লালচে এবং ফোস্কা জাতীয় চর্মরোগের জন্য রাসটক্স এক নাম্বার ঔষধ।

Arnica montana : **যে-কোন ধরনের আঘাত, থেতলানো, মচকানো, মোচড়ানো, ঘুষি, লাঠির আঘাত বা উপর থেকে পড়ার** কারণে কোন চর্মরোগ হলে আর্নিকা খেতে হবে। **আক্রান্ত স্থানে এমন তীব্র ব্যথা থাকে যে, রোগী কাউকে তার দিকে আসতে দেখলেই সে ভয় পেয়ে যায়** (কারণ ধাক্কা লাগলে ব্যথার চোটে তার প্রাণ বেরিয়ে যাবে)। উপরের লক্ষণগুলোর কোনটি থাকলে যে-কোন রোগে আর্নিকা প্রয়োগ করতে পারেন।

Mercurius solubilis : মার্ক সল ঔষধটির প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **প্রচুর ঘাম হয় কিন্তু রোগী আরাম পায় না,** ঘামে দুর্গন্ধ বা মিষ্টি গন্ধ থাকে, **ঘুমের মধ্যে মুখ থেকে লালা ঝরে,** পায়খানা করার সময় কোথানি, **অধিকাংশ রোগ রাতের বেলা বেড়ে যায়,** রোগী ঠান্ডা পানির জন্য পাগল ইত্যাদি। ঘামের কারণে যাদের কাপড়ে হলুদ দাগ পড়ে যায়, তাদের যে-কোন রোগে মার্ক সল প্রয়োগ করতে পারেন। মার্ক সল যেহেতু এন্টি-সিফিলিটিক ঔষধ তাই সিফিলিস রোগী বা তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের যে-কোন রোগে এটি ভাল কাজ করে।

Cantharis : জ্বালা-পোড়া এবং ছিড়ে ফেলার মতো ব্যথা হলো ক্যান্থারিসের প্রধান লক্ষণ। **ভীষণ জ্বালাপোড়া থাকলে যে-কোন চর্মরোগে ক্যান্থারিস ব্যবহার করতে পারেন। এটি জলাতঙ্ক রোগের একটি শ্রেষ্ট ঔষধ।** এটি যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি করে থাকে ভীষণভাবে। কোন জায়গা পুড়ে গেলে একই সাথে খাওয়ান এবং পানির সাথে মিশিয়ে পোড়া জায়গায় লাগান। এটি পেটের মরা বাচ্চা, গর্ভফুল বের করে দিতে পারে এবং বন্ধ্যাত্ব নির্মূল করতে পারে।

## Diabetes Mellitus (ডায়াবেটিস, বহুমূত্র)

– যদিও এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা ডায়াবেটিসের চিকিৎসার জন্য বিরাট আলিশান এক হাসপাতালই তৈরী করে ফেলেছেন, তথাপি সত্যি কথা হলো এলোপ্যাথিতে ডায়াবেটিসের কোন চিকিৎসাই নাই। তারা যা করেন অথবা বলা যায় তারা যা পারেন, তা হলো ডায়াবেটিসের তীব্রতা বা উৎপাত কমিয়ে রাখা, নিয়ন্ত্রণে রাখা। ডায়াবেটিস নির্মূল করা বা পুরোপুরি ভালো করার ক্ষমতা এলোপ্যাথিক ঔষধের নাই। তবে ডায়াবেটিস সৃষ্টি করার ক্ষমতা এলোপ্যাথিক ঔষধের আছে। আপনি যদি ইন্টারনেটে একটু খোঁজাখুঁজি করেন, তবে এমন হাজারো গবেষণা রিপোর্টের সন্ধান পাবেন, যাতে নিরপেক্ষ চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, টিকা/ ভ্যাকসিন (vaccine) নেওয়ার কারণেই মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়। যখন থেকে মানুষকে পাইকারী হারে টিকা দেওয়া শুরু হয়েছে, তখন থেকেই পাইকারী হারে ডায়াবেটিস হওয়া শুরু হয়েছে। আগে জন্মের পর থেকে শিশুদের টিকা দেওয়া শুরু হতো আর এখন শিশুরা মায়ের পেটে থাকতেই তাদের গর্ভধারীনী মাকে টিকা দেওয়ার মাধ্যমে প্রকারান্তরে শিশুদেরকেই টিকা দেওয়া হচ্ছে। ফলে মায়ের পেট থেকেই শিশুরা বিষাক্ত দেহ-মন নিয়ে দুনিয়ায় আগমণ করছে। তাই ইদানীং শিশুদের মধ্যেও ডায়াবেটিসের প্রকোপ দেখা যাচ্ছে।

ভ্যাকসিন/ টিকা (vaccine) ছাড়াও ভয়ঙ্কর হাই-পাওয়ারের (?) ক্ষতিকর সব এন্টিবায়োটিক, সড়ক দুর্ঘটনায় বড় ধরনের শারীরিক আঘাত, ঘনিষ্ট কারো মৃত্যু বা পেশাগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মাধ্যমে বড় ধরণের মানসিক আঘাত ইত্যাদির কুপ্রভাবে মানুষের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে, রোগ প্রতিরোধ শক্তির (immune system) বারোটা বেজে যায় ; ফলস্রুতিতে মানুষ ডায়াবেটিসের মতো জঘন্য রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, ডায়াবেটিস আসলে কোন রোগ নয় বরং এটি একটি বিরাট লাভজনক ব্যবসা। দিন-রাতের অধিকাংশ সময় শুয়ে-বসে কাটানো শহরের অলস (এবং অন্যদিকে অতিমাত্রায় টিকা/ভ্যাকসিন ভক্ত) মানুষদের মধ্যে এই রোগ মহামারী আকারে দেখা না দিলে এ যুগের ডাক্তারদের পক্ষে এতো সহজে বাড়ি-গাড়ি-ব্যাংক ব্যালেন্স করা খুবই কঠিন হতো। ডায়াবেটিস থেকে প্রথমত সবচেয়ে বেশী লাভবান হয় ডায়াবেটিসের ঔষধ এবং ইনজেকশান উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলো। কারণ ডায়াবেটিসের রোগীরা প্রায় সবাই কোন না কোন ঔষধ-ইনজেকশন নিয়ে থাকেন। ঔষধ কোম্পানীর মালিক এবং তাদের সমর্থক ডাক্তাররা যোগসাজস করে ঘোষণা করেছে যে, রক্তে সুগারের মাত্রা ছয়ের চাইতে বেশী হলেই বিপদ।

আপনাকে ঔষধ খেতে হবে, ইনজেকশন নিতে হবে, নিয়মিত টেস্ট করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে এগুলো হলো কমার্শিয়াল চিন্তাধারা / বাণিজ্যিক পলিসি। বাস্তবে দেখা যায়, কারো কারো সুগার ছয়-সাতে উঠলেই নানা রকম সমস্যা দেখা দেয় আবার কেউ কেউ দশ-বারো নিয়েও স্বাভাবিক জীবনযাপন করে। একেকজন মানুষের শারীরিক গঠন একেক রকম আর তাই একই থিওরী সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না। দ্বিতীয়ত ডায়াবেটিস থেকে সবচেয়ে বেশী লাভবান হয় প্যাথলজীষ্টরা, ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের মালিকরা, এসব টেস্টের মেশিন-পত্র এবং রিয়েজেন্ট প্রস্তুতকারী কোম্পানিরা। কারণ ডায়াবেটিসের রোগীরা সাধারণত ঘনঘন বিভিন্ন প্যাথলজীক্যাল টেস্ট করে থাকে। তৃতীয়ত সবচেয়ে বেশী লাভবান হয় ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ বা মেডিসিন বিশেষজ্ঞরা। চতুর্থত সবচেয়ে বেশী লাভবান হয় কিডনী রোগ বিশেষজ্ঞরা (urologist), কারণ ডায়াবেটিসের রোগীদের সাধারণত কিডনীর রোগ বেশী হয়ে থাকে। পঞ্চমত সবচেয়ে বেশী লাভবান হয় চক্ষু বিশেষজ্ঞরা (oculist), কারণ ডায়াবেটিসের রোগীদের চোখের সমস্যা লেগেই থাকে। চর্ম-যৌন বিশেষজ্ঞরাও বেশ লাভবান হয়, কারণ ডায়াবেটিসের রোগীদের অনেকেরই যৌন দুর্বলতা/ ধ্বজভঙ্গ দেখা দিয়ে থাকে।

ডায়াবেটিস থেকে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরাও (cardiologist) কম লাভবান হন না, যেহেতু ডায়াবেটিস রোগীদের হার্টের সমস্যা বেশী হতে দেখা যায়। এমনকি হরমোন বিশেষজ্ঞরাও বেশুমার রোগী পেয়ে থাকেন যারা দীর্ঘদিন যাবৎ ডায়াবেটিসে ভোগছেন তাদের মধ্যে থেকে। সার্জনরাও প্রচুর লাভবান হয়ে থাকেন, কেননা ডায়াবেটিস রোগীদের প্রায়ই হাত-পায়ে গ্যাংগ্রিন (gangrene), মারাত্মক আলসার (ulceration) ইত্যাদি দেখা দিয়ে থাকে। স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ (neurologist) এবং মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞরাও (psychiatrist) ডায়াবেটিস থেকে উপকৃত হয়ে থাকেন, কেননা দীর্ঘদিন ডায়াবেটিসে ভোগলে স্নায়ুঘটিত রোগ এবং মানসিক রোগ দেখা দিবেই। ডায়াবেটিসের কারণে কবিরাজরাও যথেষ্ট লাভবান হয়, কেননা অনেক রোগীরই কবিরাজি-ইউনানী-আয়ুর্বেদী চিকিৎসার প্রতি ভীষণ ভক্তি দেখা যায়। ডায়াবেটিসের কারণে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তাররাও বেশ লাভবান হয়, কারণ অনেকেরই হোমিও ঔষধের প্রতি অন্ধভক্তি আছে। তাছাড়া অনেকে দশ-বিশ বছর প্রচলিত চিকিৎসা করেও ডায়াবেটিসমুক্ত হতে না পারার কারণে হোমিও চিকিৎসা শুরু করে দেয়।

ডায়াবেটিসের প্রচলিত এলোপ্যাথিক চিকিৎসার বিষয়টি গত ৮০ বছরে ধীরে ধীরে সারাবিশ্বের মানুষদের মধ্যে এমনভাবে শিকর গেড়েছে যে, এটি বর্তমানে মানুষের কাছে ধর্ম বিশ্বাসে (religion) পরিণত হয়েছে। আর কোন একটি বিষয় যখন মানুষের কাছে অন্ধবিশ্বাসে পরিণত হয়, তখন তাকে আর যুক্তি-তর্ক দিয়ে বুঝানো যায় না। ঔষধ কোম্পানীগুলোর নীতি হলো শিশু থেকে বুড়ো পযর্ন্ত সবাইকে ঔষধ খাওয়াতে হবে, ভ্যাকসিন দিতে হবে। যেভাবেই হোক বছর বছর লাভের মাত্রা বাড়াতে হবে। চিকিৎসার নামে দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে সারাজীবনের জন্য তাদের ওপর নিভরর্শীল করে রাখতে হবে। ডায়াবেটিসের সংক্রান্ত সমস্ত গবেষণায় এসব ঔষধ কোম্পানী অর্থ যোগান দেয় এবং এভাবে তারা চিকিৎসা বিজ্ঞানকে নিজেদের ইচ্ছেমতো পরিচালিত করে থাকে। ডাক্তাররা মেডিক্যাল কলেজে কি শিখবে এবং কিভাবে ডাক্তারী করবে, তার সবই এসব ঔষধ কোম্পানীর পরিকল্পনা মতো হয়ে থাকে। বহুজাতিক ঔষধ কোম্পানীগুলোর এই পৈশাচিক লোভের শিকারে পরিণত হয়ে বহুল প্রচলিত এলোপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান আজ মানবজাতির জন্য গযবে পরিণত হয়েছে।

আপনার ডাক্তার কখনও আপনাকে বলবে না যে, রক্ত সঞ্চয়জনিত হৃদরোগ (ischaemic heart diseases), স্নায়ুঘটিত হার্ট ফেইলার (neuropathic heart failure), করোনারি হৃদরোগ (coronary heart diseases), মেদভূড়ি সমস্যা (obesity), রক্তনালীতে চর্বি জমা (atherosclerosis), উচ্চ রক্তচাপ (elevated blood pressure), কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি (elevated cholesterol), ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বৃদ্ধি (elevated triglycerides), যৌন অক্ষমতা (impotence), চোখের রেটিনার রোগ (retinopathy), কিডনী ফেইলুর (renal failure), লিভার ড্যামেজ (liver failure), ডিম্বাশয়ের টিউমার (polycystic ovary syndrome), রক্তে সুগারের মাত্রা বৃদ্ধি (elevated blood sugar), ক্যানডিডা সংক্রমণ (systemic candida), ত্রুটিপূর্ণ শ্বেতসার বিপাক (impaired carbohydrate metabolism), ঘা শুকাতে দেরি হওয়া (poor wound healing), ত্রুটিপূর্ণ চর্বি বিপাক (impaired fat metabolism), প্রান্তীয় স্নায়বিক রোগ (peripheral neuropathy) ইত্যাদিকে এক সময় ডায়াবেটিসেরই লক্ষণ মনে করা হতো। আপনি যদি কোন এলোপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে ডায়াবেটিসের নিমূর্ল বা ডায়াবেটিস থেকে ১০০ ভাগ মুক্তির ব্যাপারে জানতে চান, তবে তিনি বিরক্ত হবেন। কারণ তাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে ডায়াবেটিসের “চিকিৎসা আছে কিন্তু কোন স্থায়ী মুক্তি (বা নিরাময়) নাই”। অথচ ডায়াবেটিস পুরোপুরি নিরাময়যোগ্য (curable) একটি রোগ। কিন্তু এজন্য (ডায়াবেটিস) রোগ এবং রোগী দুটোর চিকিৎসা করতে হবে একত্রে বা সামগ্রিকভাবে (holistic)। কিন্তু বতর্মানে প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতিতে ডায়াবেটিস রোগীদের সুগারের চিকিৎসা করেন একজন বিশেষজ্ঞ, খাদ্যাভাসের চিকিৎসা করেন আরেকজন, চোখের জটিলতার চিকিৎসা করেন একজন, কিডনীর জটিলতার চিকিৎসা করেন আরেকজন, লিভারের সমস্যার চিকিৎসা করেন একজন, হার্টের পীড়ার চিকিৎসা করেন আরেকজন, চর্মরোগের চিকিৎসা করেন একজন, রক্তের অসুখের চিকিৎসা করেন আরেকজন ইত্যাদি ইত্যাদি। মোটকথা, মরা গরুর লাশ নিয়ে যেমন শুকুনদের মধ্যে কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যায়, ডায়াবেটিস রোগীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়েও বিশেষজ্ঞদের (?) মধ্যে তেমনটা লক্ষ্য করা যায়।

আমার মূল বক্তব্য হলো, অন্যান্য জটিল রোগের (chronic disease) মতো ডায়াবেটিসেরও সবচেয়ে ভালো এবং সেরা চিকিৎসা আছে একমাত্র হোমিওপ্যাথিতে (Homeopathy)। নতুন আর পুরাতন দু’ধরণের ডায়াবেটিসেরই সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিতে আছে। ডায়াবেটিস হওয়ার মুল কারণ কি ?
সাধারণ মানুষের বুঝার মতো ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, আমাদের শরীরের হজম শক্তি কমে যাওয়াই হলো ডায়াবেটিসের মুল কারণ। সাধারণ মানুষ যদিও মনে করে আমাদের খাদ্য-দ্রব্য পাকস্থলী বা পেটে হজম হয় কিন্তু তা একেবারেই ভুল ধারণা। পাকস্থলী এবং নাড়িভুড়িতে খাদ্য-দ্রব্য হজম হয় না বরং বলা উচিত শোষণ (absorb) হয়। সেখান থেকে শোষণ হয়ে রক্তের মাধ্যমে প্রতিটি কোষে কোষে পৌঁছে যায়। আমাদের শরীরে যে কোটি কোটি কোষ আছে, খাদ্য-দ্রব্য হজমের কাজটি হয় সেই কোষগুলোতে। ডাক্তারী ভাষায় একে বলা হয় বিপাক ক্রিয়া (metabolism)। ইহার পরিমাপকে বলা হয় বিপাক ক্রিয়ার হার (BMR-basal metabolic rate)।

কোষগুলোতে খাদ্য-দ্রব্য হজম হয়ে শক্তি তৈরী হয় যা দিয়ে আমাদের শরীরের সমস্ত কাজ-কর্ম চলে। তাই ডায়াবেটিস সমপুর্ণরূপে নির্মুল করতে চাইলে আমাদেরকে শরীরের হজম শক্তি বাড়াতে হবে অর্থাৎ কোষের বিপাক ক্রিয়ার হার বাড়াতে হবে। আর সত্যি কথা হলো, শরীরের বিপাক ক্রিয়ার হার বাড়ানোর ক্ষমতা কেবল হোমিও ঔষধেরই আছে। আয়োডিয়াম (Iodium), ক্যালকেরিয়া কার্বনিকাম (Calcarea carbonica), ফিউকাস ভেসিকোলোসিস (Fucus vesiculosis), ফাইটোল্যাক্কা ডেকানড্রা (Phytolacca decandra) ইত্যাদি হোমিও ঔষধগুলি শরীরের বিপাক ক্রিয়ার হার বৃদ্ধি করতে পারে। বিশেষত আর্সেনিকাম ব্রোমেটাম (Arsenicum Bromatum), সিজিজিয়াম (Syzygium), এসিড ফস (acidum Phosphoricum), জিমনেমা সিলবাস্টা (Gymnema sylvestra), রাস এরোমেটিকাম (Rhus

aromaticum), হেলোনিয়াস ডঐকা (Helonias Dioica), ইউরেনিয়াম নাইট্রিকাম (Helonias Dioica) ইত্যাদি হোমিও ঔষধগুলো যে-কোন ডায়াবেটিস রোগী খেয়ে উপকার পাবেন ; সাধারণত এতে কোন ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না (নিম্নশক্তিতে ১০ ফোটা করে রোজ ৩ বার)। তবে ডায়াবেটিসের মূল কারণসমূহ দূর করা এবং শরীরকে বিষমুক্ত করার কাজে হোমিও স্পেশালিস্টের পরামর্শ দরকার।

যদিও শারীরিক-মানসিক-পারিবারিক-জলবায়ুজনিত লক্ষণ সমষ্টির উপর ভিত্তি করে প্রদত্ত যে-কোন হোমিও ঔষধেই ডায়াবেটিস সমপুর্ণ নির্মুল হয়ে যায়। তবে এই ঔষধগুলো হলো একেবারে স্পেসিফিক। সত্যি বলতে কি ডায়াবেটিস আসলে একটি রোগ নয় ; বরং বলা যায় এটি অনেকগুলি রোগের সমষ্টি (group of diseases)। অথবা বলা যায় ডায়াবেটিসের পেছনে অনেকগুলো কারণ (Link) থাকে। ডায়াবেটিস সম্পূর্ণ নির্মূল করার জন্য প্রথমে এই কারণগুলিকে একটি একটি করে দূর করতে হয়। কিন্তু অন্যান্য বিভিন্ন পন্থী ডাক্তাররা এই কারণগুলো সম্পর্কে কিছুই জানেন না এবং এই কারণগুলো দূর করার ক্ষমতাও তাদের ঔষধের নাই। তাদের একমাত্র টার্গেট হলো রক্তে সুগারের মাত্রা কমিয়ে রাখা। ইদানীং আবার সে-সব ডাক্তাররা পেটুক রোগীদের শরীরে অপারেশন করে পাকস্থলী কেটে ছোট করে দিচ্ছে যাতে রোগীরা বেশী খেতে না পারে, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য ! এসব কাণ্ডকারখানা চিকিৎসার নামে ববরর্তা ছাড়া আর কিছুই না। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, খেজুর গাছের গোড়া না কেটে যতই অপারেশন-মলম-ট্যাবলেট-ইনজেকশান প্রয়োগ করা হউক না কেন, তাতে কিন্তু খেজুরের রসের উৎপাদন বন্ধ করা যাবে না।

রক্তে সুগারের মাত্রা কেন বাড়ে তা নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা নাই বরং সুগারের মাত্রা কিভাবে কমানো যায় তাই নিয়ে ব্যস্ত। ফলে অস্বাভাবিক পথে শরীরের ওপর জবরদস্তি করে সুগারের মাত্রা কন্ট্রোল করার জন্য তারা যে-সব ঔষধ/ ইনজেকশান রোগীদেরকে দেন, সেগুলো দুয়েক বছর কাজ করলেও তারপর আর কোন কাজ করে না। আমাদের শরীর এমনই অদ্ভূত ক্ষমতার অধিকারী যে, বিষাক্ত ঔষধকেও এক সময় সে হার মানিয়ে দেয়। ফলে ডাক্তাররা ধীরে ধীরে ঔষধ/ ইনজেকশানের মাত্রা বাড়িয়ে দেন কিন্তু তারপরও সুগারের মাত্রা আর কন্ট্রোলে আনা যায় না। মাঝখানে এসব বিষাক্ত ঔষধের ধাক্কায় ধীরে ধীরে ডায়াবেটিস রোগীদের কিডনী নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। আর কিডনী যেহেতু নষ্ট হওয়ার কারণে ঠিকমতো রক্ত পরিষ্কার করতে পারে না, ফলে রক্ত বিষাক্ত হয়ে পড়ার কারণে রক্ত চলাচলের সাথে বেশী সম্পর্ক আছে, এমন অঙ্গগুলোও ধীরে ধীরে অকেজো হয়ে পড়তে থাকে (যেমন- হৃদপিন্ড, ব্রেন, স্নায়ু, চোখ ইত্যাদি)।

ডায়াবেটিসের প্রচলিত চিকিৎসা অনেকটা এরকমই। প্রথমে ডাক্তাররা কয়েক বছর ডায়েট কন্ট্রোল এবং হাঁটাহাঁটির মাধ্যমে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের চেষ্ঠা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। তারপর কয়েক বছর ট্যাবলেট-ক্যাপসুল দিয়ে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হয়ে শেষে ইনসুলিন (insulin) ইনজেকশান দিয়ে নিয়ন্ত্রণের চেষ্ঠা করেন। প্রথমে কিছুদিন কাজ হলেও শেষে আর ইনসুলিন ইনজেকশানেও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আনা যায় না। ডায়াবেটিসের অশুভ গতি ফেরাতে না পারার কারণে ধীরে ধীরে কিডনী, হৃদপিন্ড, ব্রেন, চক্ষু ইত্যাদিতে নানান জটিলতা দেখা দিতে থাকে। ফলে এই সকল রোগের চিকিৎসার জন্য ডাক্তাররা বস্তা বস্তা ঔষধ খাওয়াতে থাকেন। ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই ডায়াবেটিসের উৎপাত এবং ভয়ঙ্কর বিষাক্ত ঔষধগুলির বিষক্রিয়ায় কিডনী দুটি নষ্ট হয়ে ডায়াবেটিস রোগীরা কবরে চলে যান।

এই প্রসংগে বলতে হয় যে, হাত-পায়ের পচঁন বা গ্যাংগ্রিনেরও (gangrene) সবচেয়ে উৎকৃষ্ট চিকিৎসা আছে হোমিওপ্যাথিতে। অথচ অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে ডাক্তাররা গ্যাংগ্রিন হলে ঔষধে ভালো করতে না পেরে প্রথমে আঙুল কেটে ফেলে দেন, তারপর গ্যাংগ্রিন বাড়তে থাকলে সে-সব পন্থী ডাক্তাররা পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত কেটে ফেলে দেন। তারপর গ্যাংগ্রিন আরো বাড়তে থাকলে হাঁটু পর্যন্ত এবং শেষে কোমড় পর্যন্ত পা কেটে ফেলে দেন। এভাবে দেখা যায় যে, দুই-তিনটি অপারেশনের ধাক্কা সামলাতে না পেরে গ্যাংগ্রিনের রোগীরা দুয়েক বছরের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। অথচ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় কেবল মিষ্টি মিষ্টি ঔষধ মুখে খাওয়ার মাধ্যমেই খুবই কম সময়ে এবং কম খরচের মাধ্যমে গ্যাংগ্রিন সারিয়ে দেওয়া যায়।

রোগী অতীতে কি কি ঔষধ খেয়েছেন/ ভ্যাকসিন নিয়েছেন, কি কি রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এবং সেগুলো তার স্বাস্থ্যকে কিভাবে-কতটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, ইত্যাদি নিয়ে সাধারণত অন্যান্যপন্থী ডাক্তাররা মাথা ঘামান না। পক্ষান্তরে একজন হোমিও ডাক্তার রোগীর মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত, তার অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত, শরীরের বাহ্যিক রূপ থেকে মনের অন্দর মহল পর্যন্ত সকল বিষয় বিবেচনা-পর্যালোচনা করে হাজার হাজার হোমিও ঔষধ থেকে রোগীর জন্য সবচেয়ে মানানসই ঔষধ খুঁজে বের করে প্রয়োগ করেন। আর এই কারণেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সবচেয়ে সহজে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূল করা যায়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ডায়াবেটিস পুরোপুরি নির্মূল করতে প্রথমে সেই ব্যক্তি জন্মগতভাবে (Genetics) যে-সব দোষত্রুটি নিয়ে জন্মেছেন, সেগুলোর সংশোধন করতে হয়। তারপর বিষাক্ত এলোপ্যাথিক বা কবিরাজি ঔষধ খেয়ে শরীরের যে-সব ক্ষতি করেছেন, শরীর থেকে সে-সব বিষ দূর করতে হয়। তারপর টিকার (vaccine) মাধ্যমে শরীরে যতটা প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়েছেন, তার ক্ষতিপূরণ করতে হয়। তারপর অপারেশন / একসিডেন্ট ইত্যাদির মাধ্যমে শরীরের যতটা ক্ষতি হয়েছে, সেগুলোর সংস্কার করতে হয়। আপনজনের মৃত্যু, প্রেমে ব্যথর্তা, বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা, চাকুরি / ব্যবসায়ের পতন ইত্যাদি দুর্বিপাকে সৃষ্ট মানসিক বেদনা থেকে শরীরের যেটুকু ক্ষতি হয়েছে, তাহা মেরামত করতে হয়। মোটকথা, বিভিন্ন ভাবে আমাদের দেহ-মনে যত বিষ ঢুকেছে, আমাদের শরীরকে সে-সব বিষ থেকে মুক্ত করতে হয়।

আসলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হলো বিষমুক্তির (detoxification) চিকিৎসা। অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতি ভয়ঙ্কর সব ক্যামিকেল ঔষধ-ভ্যাকসিন ইত্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের দেহ-মনকে ক্রমাগতভাবে বিষাক্ত (poisoning) করে তোলে আর হোমিও চিকিৎসা আমাদের দেহ-মনকে বিষমুক্ত করে। হ্যাঁ, বিষমুক্ত হওয়ার পরে আমাদের শরীর আবার তার স্বাভাবিক গতিতে চলতে শুরু করে। তখন আর আপনাকে ডায়াবেটিস বা অন্য যে-কোন রোগের জন্য লাগাতার কোন ঔষধ খাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। শুধু খাবার-দাবার-বিশ্রাম-ব্যায়াম ইত্যাদি সংক্রান্ত নিয়মগুলো পালন করে চললেই হবে। সে যাক, আমাদের দেহ-মনকে বিষমুক্ত করার এই প্রক্রিয়াটি পুরোপুরি সম্পন্ন করতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক থেকে দুই বছরের মতো লাগতে পারে। আবার অবিশ্বাস্য মনে হলেও একথা সত্য যে, অনেক সময় রোগীর শরীরের বিষের উৎপাত কম থাকলে এবং রোগীর একশভাগ লক্ষণ মিলিয়ে দিতে পারলে মাত্র এক ফোটা হোমিও ঔষধেই ডায়াবেটিস নির্মূল হয়ে যায়। তবে হোমিওপ্যাথির ওপর যাদের বিশ্বাস কম, তারা ইচ্ছে করলে কিছুদিন হোমিও ঔষধের সাথে অন্যান্য ঔষধও চালিয়ে যেতে পারেন। হোমিও ঔষধ সাধারণত অন্যান্য ঔষধের সাথে রিয়েকশান করে না। যখন চাক্ষুস প্রমাণ পেয়ে বিশ্বাস জন্মাবে, তখন অন্যান্য ক্ষতিকর-ধ্বংসাত্মক ঔষধ বন্ধ করে দিতে আর মনে দ্বিধা-দ্বন্দ আসবে না। পরিশেষে ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞসহ সকল মেধাবী ডাক্তারদের নিকট আমাদের

অনুরোধ থাকবে, ডায়াবেটিসের অভিশাপ থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করতে তাঁরা যেন হোমিও ঔষধ প্রেসক্রাইব করেন।

## Diabetes Formula :-

প্রিয় বন্ধুগণ, ডায়াবেটিস সম্পূর্ণ নির্মূল করার জন্য (আমার নির্দেশনা মতো) নিচে উল্লেখিত এগারটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করুন। আমার প্রণীত এই ফরমূলাটি অনুসরন করলে শতকরা ৯৫ ভাগ ডায়াবেটিস রোগী পুরোপুরি ডায়াবেটিস মুক্ত হবেন বলে আমি আশাবাদী। যদিও কিছু রোগী পুরোপুরি ডায়াবেটিসমুক্ত হবেন না; তারপরও তারা অন্য যে-কোন চিকিৎসা পদ্ধতির চাইতে অন্তত দশগুণ ভালো রেজাল্ট পাবেন। প্রতিটি ঔষধ আপনি প্রতিবার মাত্র এক সপ্তাহ করে খাবেন। **এইভাবে ঔষধগুলি চক্রাকারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারে বারে খাবেন (অর্থাৎ ১১ নাম্বার ঔষধটি খাওয়ার পরে আবার ১ নাম্বার থেকে একই নিয়মে খাওয়া শুরু করবেন)।** আপনার সুগার লেভেল যদি অনেক বেশী হয়, তবে দিগুণ মাত্রায় ঔষধ খেতে পারেন (অর্থাৎ ২০ ফোটা করে)। আবার শিশু-কিশোরদের ক্ষেত্রে ৫ ফোটা করে খাওয়াতে পারেন, যদি তাদের সুগার লেভেল অনেক কম থাকে; তবে অন্যান্য নিয়ম-কানুনের কোন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই। হ্যাঁ, সকল হোমিওপ্যাথিক ঔষধই খালি পেটে খাওয়া ভালো; তবে খালি পেটে খেতে ভুলে গেলে ভরা পেটেও খেতে পারেন। **এই হোমিওপ্যাথিক ঔষধগুলো অন্য যে-কোন ঔষধের সাথে একত্রে খেতে পারবেন (হোক তা ট্যাবলেট, ক্যাপসুল বা ইনজেকশান); তাতে কোন সমস্যা হবে না। তবে অবশ্যই ডায়াবেটিসের অন্য ঔষধগুলোর আধা ঘণ্টা আগে অথবা আধা ঘণ্টা পরে খাবেন। ডায়াবেটিসের যথেষ্ট উন্নতি হলে অন্য ঔষধগুলোর মাত্রা কমিয়ে অর্ধেক করে দিন এবং সুগার লেভেল নরমালে চলে আসলে সেই ঔষধগুলি পুরোপুরি বন্ধ করে দিন।** জার্মানী বা আমেরিকার তৈরী হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কেনার চেষ্টা করবেন।

এই এগারটি ঔষধের যে-কোনটিকে আপনি বাদ দিয়ে দিতে পারেন, যদি মনে করেন যে, সেটি কোন কাজ (উপকার) করছে না অথবা অনাকাঙিখত সমস্যার (যেমন- বুকজ্বালা, চুলকানি, ব্যথা, যৌনশক্তি বৃদ্ধি ইত্যাদি) সৃষ্টি করছে অথবা স্থানীয় মার্কেটে পাওয়া যাচ্ছে না। অবশিষ্ট ঔষধগুলি তাদের প্রদত্ত সিরিয়াল বা ধারাক্রম অনুযায়ী খেতে থাকুন। **ঔষধের শক্তি এবং মাত্রা সম্পর্কে আমার নির্দেশনা পরিবর্তন করবেন না। তবে আমার নির্দেশিত শক্তি স্থানীয় মার্কেটে পাওয়া না গেলে আপনি তার কাছাকাছি (এবং বাজারে পাওয়া সবচেয়ে নিম্নতম) শক্তির ঔষধ খেতে পারেন। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শক্তিকরণ ক্ষেত্রে কিউ (Q) -কে বলা হয় মাদার টিংচার, অর্থাৎ সবচেয়ে নিম্নতম শক্তি অর্থাৎ এক বা শূণ্য শক্তির ঔষধ। আমরা সবাই জানি যে, নিম্নশক্তির (like Q, 3X, 6X, 12X, 30X, 200X, 3C, 6C, 3, 6 ইত্যাদি) হোমিওপ্যাথিক ঔষধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া খুবই কম, নাই বললেই চলে।** মনে রাখবেন যে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধের নামসমূহ হলো বিশ্বজনীন (অর্থাৎ এগুলো পৃথিবীর সকল দেশে একই নিয়মে পাওয়া যায়)। এসব ঔষধের কোনটি যদি তরল আকারে পাওয়া না যায়, বরং তার পরিবর্তে বড়ি আকারে পাওয়া, তবে তা সমান মাত্রায় খান অর্থাৎ দশ ফোটার পরিবর্তে দশটি বড়ি করে খান। ঔষধ সব সময় তরল আকারে কেনার চেষ্টা করবেন এবং কিছু পানির সাথে মিশিয়ে খাবেন। কেননা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ তরল আকারে খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

অল্প কিছু রোগীর ক্ষেত্রে পুরোপুরি রোগমুক্তির জন্য (আমার ফরমুলা অনুযায়ী ঔষধ সেবনের পাশাপাশি) কোন একজন হোমিওপ্যাথিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হতে পারে; যিনি রোগীর শারীরিক ও মানসিক গঠন বিশ্লেষণ পূর্বক আরো উৎকৃষ্ট ও মানানসই ঔষধ নিবার্চন করে প্রয়োগ করবেন। পুরোপুরি রোগমুক্তির জন্য এই

ঔষধগুলি আপনাকে কমপক্ষে এক থেকে দুই বছর অথবা আরও বেশী কিছু সময় খেতে হতে পারে। ইনশায়াল্লাহ্ আমার ফরমুলা আপনার শরীরকে বিষমুক্ত করে তার আগেকার ভাল অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে (এবং ফলস্রুতিতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আপনাকে আর ডায়াবেটিসের ঔষধ খেতে হবে না)। আপনি যখন ডায়াবেটিস (এবং ডায়াবেটিসের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য রোগ) থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন, তখন এই তালিকার এগারটি ঔষধ খাওয়া বন্ধ করে দিবেন এবং নতুন এই তেরটি ঔষধ (Natrum sulphuricum, Nux vomica, Kali phosphorica, Natrum muriaticum, Acidum Picricum, Iodium, Calcarea Phosphorica, Crataegus oxyacantha, Sanicula, Magnesia Phosphorica, Alfalfa, Calcarea fluor, Vanadium) একই শক্তিতে এবং একই নিয়মে খাওয়া শুরু করুন (তবে মাত্রা হবে ৫ ফোটা বা ৫ বড়ি করে রোজ দুইবার)। এই তেরটি ঔষধ আপনার শরীর এবং মনকে বিষমুক্ত, পরিশুদ্ধ, মেরামত এবং ক্ষয়মুক্ত করার মাধ্যমে পুণরায় ডায়াবেটিসের (অন্যান্য ঘাতক রোগসমূহের) ফিরে আসার সম্ভাবনাকে শেষ করে দিবে। **(বিঃ দ্রঃ- খাদ্য এবং ব্যায়াম সংক্রান্ত নিয়মকানুন অবশ্যই বাকী জীবন মেনে চলবেন।)**

{**ডায়াবেটিসের কারণ দূর করা** ঃ- ঔষধ খেয়ে ডায়াবেটিস দূর করার পাশাপাশি আপনাকে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার মুল কারণগুলো দূর করার জন্যও কিছু ঔষধ খেতে হবে। (১) আপনি যদি বড় ধরনের কোন মানসিক আঘাতের (যেমন- প্রেমে ব্যর্থতা, আপনজনের মৃত্যু, তালাক, চাকরি হারানো ইত্যাদি) কারণে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হন, তবে নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম ১০০০ শক্তিতে (Natrum muriaticum 1M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান, তার একমাস বিরতির পরে নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম ১০,০০০ শক্তিতে (Natrum muriaticum 10M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান এবং তারও একমাস বিরতির পরে নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম ৫০,০০০ শক্তিতে (Natrum muriaticum 50M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান। (২) আপনি যদি টিকা (vaccine) নেওয়ার কারণে (অর্থাৎ আপনার যদি বেশী বেশী টিকা নেওয়ার অভ্যাস থাকে) কারণে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হন, তবে থুজা অক্সিডেন্টালিস ১০০০ শক্তিতে (Thuja occidentalis 1M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান, তার একমাস বিরতির পরে থুজা অক্সিডেন্টালিস ১০,০০০ শক্তিতে (Thuja occidentalis 10M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান এবং তারও একমাস বিরতির পরে থুজা অক্সিডেন্টালিস ৫০,০০০ শক্তিতে (Thuja occidentalis 50M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান। (৩) যদি আপনার ডায়াবেটিসের পারিবারিক / বংশগত ইতিহাস থাকে (অর্থাৎ আপনার পরিবারের অনেক সদস্য যদি ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়ে থাকে), তবে সিফিলিনাম ১০০০ শক্তিতে (Syphilinum 1M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান, তার একমাস বিরতির পরে সিফিলিনাম ১০,০০০ শক্তিতে (Syphilinum 10M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান এবং তারও একমাস বিরতির পরে সিফিলিনাম ৫০,০০০ শক্তিতে (Syphilinum 50M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান। (৪) যদি আপনার যক্ষা বা হাঁপানি রোগের পারিবারিক / বংশগত ইতিহাস থাকে (অথবা ঘনঘন সর্দি-কাশি হওয়ার অভ্যাস থাকে), তবে ব্যাসিলিনাম ১০০০ শক্তিতে (Bacillinum 1M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান, তার তিন মাস বিরতির পরে ব্যাসিলিনাম ১০,০০০ শক্তিতে (Bacillinum 10M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান এবং তারও তিন মাস বিরতির পরে ব্যাসিলিনাম ৫০,০০০ শক্তিতে (Bacillinum 50M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান। **ডায়াবেটিসের কারণ দূর করার উপরোক্ত চারটি ঔষধের যে-কোনটি অবশ্যই তিন মাত্রার বেশী খাবেন না। এই ঔষধগুলো আপনি যে-কোন সময় খাওয়া শুরু করতে পারেন ; তবে অবশ্যই অন্য কোন ঔষধের সাথে একত্রে খাবেন না ; বরং অন্য ঔষধের এক ঘণ্টা আগে অথবা এক ঘণ্টা পরে খাবেন।** }

[ইহা একটি প্রমাণিত সত্য যে, একজন হোমিওপ্যাথিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকই কেবল ডায়াবেটিস পুরোপুরি নির্মূল করার ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু সারা পৃথিবীতে যে-পরিমাণ ডায়াবেটিস রোগী আছে, সেই তুলনায় হোমিওপ্যাথিক স্পেশালিষ্টের সংখ্যা খুবই নগণ্য। এই কারণে আমি হোমিওপ্যাথিক মতে "নিজে নিজে ডায়াবেটিসের চিকিৎসা"-এর একটি ফরমুলা তৈরী করেছি, যা এই বিপুল সংখ্যক ডায়াবেটিসের ভুক্তভোগীদেরকে যথেষ্ট সহায়তা করবে এবং কোন ক্ষতি করবে না। এজন্য প্রথমে আমাকে হাজার হাজার হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মধ্যে এমন কিছু ঔষধ খুজেঁ বের করতে হয়েছে, যাদের ডায়াবেটিস নিরাময়ে প্রবল কাযর্ক্ষমতা আছে এবং অন্যদিকে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া খুবই কম। তারপর তাদেরকে এমনভাবে সিরিয়াল অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে সাজাতে হয়েছে, যাতে একটি ঔষধ অন্যটির সাথে রিয়েকশান না করে এবং একটি ঔষধ তার পূর্বের ঔষধের একশানকে বিনষ্ট করবে না। সত্যি বলতে কি, ডায়াবেটিস কোন একটি একক রোগ নয়, বরং বলা যায় এটি অনেকগুলো রোগের সমষ্টি (অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি যে, অনেকগুলো রোগ/ত্রুটি/বিকৃতি সম্মিলিতভাবে ডায়াবেটিসের সৃষ্টি করে থাকে)। এই কারণে, একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের প্রয়োজন মানবতার এই ভয়ঙ্কর দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় তার হাতে থাকা সকল প্রকার অস্ত্র প্রয়োগ করা। আমার এই ফরমুলা অনুসরণ করার কারণে যদি ডায়াবেটিসের সাথে সাথে আপনার অন্যান্য রোগও (যেমন- উচ্চ রক্তচাপ, হার্পাঁনি, মেদভুড়ি, বাতের সমস্যা, কিডনী রোগ, হৃদরোগ, স্নায়বিক রোগ ইত্যাদি) সেরে যায়, তবে বিস্মিত হবেন না। কেননা আমাদের হৃৎপিন্ড, ফুসফুস, লিভার, কিডনী, মস্তিষ্ক, পাকস্থলী, স্নায়ু, হরমোন গ্রন্থি, রক্ত, যৌনাঙ্গ, চোখ, হাড় ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর এই এগারটি ঔষধের অনেক ইতিবাচক প্রভাব আছে। আল্লাহ্‌র করুণা আমাদের সকলের ওপর বর্ষিত হউক।

অনেকেই আমার নিকট ই-মেইল অথবা ফোন করে জানতে চান যে, এই হোমিওপ্যাথিক ঔষধগুলো কিভাবে সংগ্রহ করা যাবে। প্রকৃতপক্ষে এই এগারটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ হলো একেবারে সাধারণ / বহুল প্রচলিত হোমিও ঔষধ। যে-কোন হোমিওপ্যাথিক ফার্মেসী থেকেই আপনারা এগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। আমার জানা মতে, পৃথিবীর ছোট-বড় সমস্ত শহরেই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পাওয়া যায়। যদি আপনার এলাকায় পাওয়া না যায়, তবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অর্ডার দিয়েও পৃথিবীর বিভিন্ন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতকারী কোম্পানীর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

এগারটি ঔষধের তালিকা ঃ-

(১) Acidum Phosphoricum Q/3x/6x/12x/3c/6c/3/6

(এই হোমিওপ্যাথিক ঔষধটি ১০ ফোটা করে রোজ তিন বেলা করে প্রথম সপ্তাহ খান। আধা গ্লাস পানির সাথে মিশিয়ে)

(২) Gymnema sylvestra Q/3x/6x/12x/3c/6c/3/6

(এই হোমিওপ্যাথিক ঔষধটি ১০ ফোটা করে রোজ তিন বেলা করে দ্বিতীয় সপ্তাহ খান। আধা গ্লাস পানির সাথে মিশিয়ে)

(৩) Arsenicum Bromatum Q/3x/6x/12x/3c/6c/3/6

(এই হোমিওপ্যাথিক ঔষধটি ১০ ফোটা করে রোজ তিন বেলা করে তৃতীয় সপ্তাহ খান। আধা গ্লাস পানির সাথে মিশিয়ে)

(৪) Syzygium Jambos Q/3x/6x/12x/3c/6c/3/6

(এই হোমিওপ্যাথিক ঔষধটি ১০ ফোটা করে রোজ তিন বেলা করে চতুর্থ সপ্তাহ খান। আধা গ্লাস পানির সাথে মিশিয়ে)

(৫) Rhus aromaticum Q/3x/6x/12x/3c/6c/3/6

(এই হোমিওপ্যাথিক ঔষধটি ১০ ফোটা করে রোজ তিন বেলা করে পঞ্চম সপ্তাহ খান। আধা গ্লাস পানির সাথে মিশিয়ে)

(৬) Murex purpurea Q/3x/6x/12x/3c/6c/3/6

(এই হোমিওপ্যাথিক ঔষধটি ১০ ফোটা করে রোজ তিন বেলা করে ষষ্ট সপ্তাহ খান। আধা গ্লাস পানির সাথে মিশিয়ে)

(৭) Sanicula Q/3x/6x/12x/3c/6c/3/6

(এই হোমিওপ্যাথিক ঔষধটি ১০ ফোটা করে রোজ তিন বেলা করে সপ্তম সপ্তাহ খান। আধা গ্লাস পানির সাথে মিশিয়ে)

(৮) Helonias Dioica Q/3x/6x/12x/3c/6c/3/6

(এই হোমিওপ্যাথিক ঔষধটি ১০ ফোটা করে রোজ সকালে এবং দুপুরে দুই বেলা করে অষ্টম সপ্তাহ খান। আধা গ্লাস পানির সাথে মিশিয়ে)

(৯) Calcarea Phosphorica Q/3x/6x/12x/3c/6c/3/6

(এই হোমিওপ্যাথিক ঔষধটি ১০ ফোটা করে রোজ তিন বেলা করে নবম সপ্তাহ খান। আধা গ্লাস পানির সাথে মিশিয়ে)

(১০) Uranium nitricum Q/3x/6x/12x/3c/6c/3/6

(এই হোমিওপ্যাথিক ঔষধটি ১০ ফোটা করে রোজ তিন বেলা করে দশম সপ্তাহ খান। আধা গ্লাস পানির সাথে মিশিয়ে)

(১১) Iodium Q/3x/6x/12x/3c/6c/3/6

(এই হোমিওপ্যাথিক ঔষধটি ১০ ফোটা করে রোজ তিন বেলা করে এগারতম সপ্তাহে খান। আধা গ্লাস পানির সাথে মিশিয়ে। এরপর পূণরায় এক নাম্বার ঔষধ থেকে একই নিয়মে খাওয়া আরম্ভ করুন।)

**Diarrhoea (ডায়েরিয়া, পাতলা পায়খানা, পেট নামা) ঃ-** ডায়েরিয়ার চিকিৎসাতেও লক্ষণ মিলিয়ে ঔষধ খেতে হবে। রোগের নাম (ডায়েরিয়া, কলেরা, উদরাময়, এশিয়াটিক কলেরা, পেট নামা, আমাশয়, ফুড পয়জনিং ইত্যাদি) চিন্তা করে ঔষধ খেলে কোন উপকার হবে না।

Arsenicum Album : আর্সেনিকের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো অস্থিরতা, অসহ্য ব্যথা, পিপাসা প্রচুর কিন্তু পানি পান করে অল্প, পায়খানা করে অল্প কিন্তু দুরবল হয় তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী, পায়খানা খুবই দুগন্ধযুক্ত, পায়খানার রাস্তায় জ্বালাপোড়া ইত্যাদি ইত্যাদি । পচাঁ, বাসি, বিষাক্ত খাবার খেয়ে ডায়েরিয়া হলে প্রথমেই আসের্নিকের কথা চিন্তা করতে হবে। কারণ আর্সেনিক হলো ফুড পয়জনিংয়ের শ্রেষ্ট ঔষধ।

Croton Tiglium : **পায়খানা যদি বন্দুকের গুলির ন্যায় ভীষণ দ্রুতগতিতে বের হয়,** তবে ক্রোটন টিগ ঔষধটি খেতে থাকুন। সাধারণত একে বলা হয় হাঁসের ন্যায় পায়খানা (goose stool), কেননা হাঁসের পায়খানা খুব স্পীডে বের হয়। পায়খানা থাকে হলদে রঙের এবং খুবই পাতলা আর সাথে বমিবমিভাব ও বমি থাকতে পারে। কিছু খেলে বা পান করলে ডায়েরিয়া বেড়ে যায়। ঔষধটি প্রতিবার পায়খানায় যাওয়ার সাথে একবার করে খেতে থাকুন।

China officinalis / Cinchona : **পাতলা পায়খানার সাথে যদি প্রচুর বাতাস বের হয়, তবে এমন ডায়েরিয়াতে চায়না হলো শ্রেষ্ট ঔষধ।** চায়নার ডায়েরিয়াতে কোন পেট ব্যথা থাকে না এবং রোগী খুব তাড়াতাড়ি দুরবল হয়ে পড়ে। ফল-ফ্রুট খাওয়ার কারণে ডায়েরিয়া হলে তাতে চায়না প্রযোজ্য। শরীর থেকে প্রয়োজনীয় তরল পদার্থ বের হয়ে যাওয়ার কারণে দুর্বর্লতা/ রক্তশূণ্যতা দেখা দিলে চায়না খাওয়াতে হবে। চায়নাকে বলা হয় হোমিওপ্যাথিক স্যালাইন (O.R.S.)।

Phosphoricum acidum : ফসফরিক এসিডের প্রধান লক্ষণ হলো একেবারে **পানির মতো পাতলা পায়খানা করে** প্রচুর পরিমাণে এবং দিন-রাতে **পঞ্চাশ বার পাতলা পায়খানা করেও শরীরে কোন দুরবলতা আসে না**।

Pulsatilla pratensis : তেল-চর্বি জাতীয় খাবার খেয়ে ডায়েরিয়া হলে পালসেটিলা খান।

Veratrum album : ভিরেট্রাম এলবাম হলো মারাত্মক ডায়েরিয়া বা কলেরার এক নাম্বার ঔষধ। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **রোগী প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা পানি খেতে চায়, মারাত্মক ধরনের পেট ব্যথা, সাথে বমিবমি ভাব, বমি করা, শরীরে বিশেষত কপালে ঠান্ডা ঘাম দেখা দেয়, হাত-পা বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে যায়** ইত্যাদি লক্ষণ থাকে।

Podophyllum peltatum : পডোফাইলামের প্রধান লক্ষণ হলো পিত্তযুক্ত পাতলা পায়খানা অথাৎ **পায়খানা থেকে তিতা তিতা গন্ধ আসে। রোগী যে পরিমাণে খায়, পায়খানা করে তার ডাবল।** শিশুর পিতা-মাতা অবাক হয়ে যান যে, এতো পায়খানা আসে কোথা থেকে ?
বিশেষত শিশুদের দাঁত ওঠার সময় যে ডায়েরিয়া হয়, তাতে পডোফাইলাম খুবই উপকার করে থাকে।

Elaterium : **ইলেটেরিয়ামের পাতলা পায়খানাও খুবই হাই স্পীডে বের হয় কিন্তু সেটি তীরের মতো সোজাভাবে বের না হয়ে বরং চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।** সাধারণত বোমা বিস্ফোরণ ঘটলে যেমন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, অনেকটা তেমনই ধরণের। ইহার পায়খানার রঙ হয় হালকা সবুজ এবং সাথে দুরবলতা, শীতবোধ, হাই তোলা ইত্যাদি থাকে।

Gratiola officinalis : **গ্রেটিওলার পাতলা পায়খানাও খুবই হাই স্পীডে বের হয় কিন্তু এতে পায়খানার রঙ থাকে হলদে এবং পেটের ভেতরে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বোধ হয়।** পায়খানার সাথে রক্ত, ভয়ঙ্কর পেট ব্যথা, হাত-পায়ে কাঁপুনি, খিঁচুনি, মেজাজ বিগড়ে যাওয়া ইত্যাদি থাকতে (যা ভয়ঙ্কর এশিয়াটিক কলেরা রোগে) দেখা যায়।

Jatropha curcas : **জেট্রোফার পাতলা পায়খানাও খুব স্পীডে বের হয় তবে পেটের ভেতরে গড়গড় গড়গড় শব্দ হতে থাকে।** সাথে পেট ব্যথা, হঠাৎ পায়খানার বেগ হওয়া, ভীষণ দুরবলতা, পানি খেলে সাথে সাথে বমি হওয়া, খিচুঁনি, প্রস্রাব বন্ধ হওয়া, অজ্ঞান হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ থাকে।

Argentum nitricum : **পরীক্ষা, ইন্টারভিউ, জনসভায় ভাষণ দেওয়া ইত্যাদি অনুষ্টানের আগে টেনশান বা মানসিক উত্তেজনার কারণে ডায়েরিয়া শুরু হলে আরজেনটাম নাইট্রিকাম খান।** এতে পায়খানার রঙ থাকে সবুজ এবং দেখতে চাবানো ঘাসের মতো। কেনডী বা মিষ্টি জাতীয় খাবার খেয়ে ডায়েরিয়া হলে এটি খেতে হবে।

Rheum officinale : রিউমের প্রধান লক্ষণ হলো **পায়খানা থেকে টক গন্ধ** আসা অর্থাৎ এসিডিক ধরণের গন্ধ আসে এবং কাজ করলে বা ব্যায়াম করলে ডায়েরিয়া বেড়ে যায়।

Phosphorous : ডায়েরিয়া বা কলেরার চরম অবস্থায় অনেক সময় ফসফরাস প্রযোজ্য হয়। **যখন পায়খানার রাস্তা একেবারে খুলে যায়, তাতে কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না, কখন পায়খানা বেরিয়ে গেছে রোগীও জানে না,** এরকম অবস্থায় ফসফরাস খেতে হবে।

Ignatia amara : আমার দুই মেয়ে। বড় মেয়েটি একটি কিণ্ডার গার্টেন স্কুলে কেজি ওয়ানে পড়ে। ছোটটির বয়স মাত্র এক বছর। দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার পর তার স্কুলে এক সপ্তাহের জন্য ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এই সুযোগে আমার স্ত্রী তার কন্যাদের সঙ্গে করে পিত্রালয়ে বেড়াতে গেছেন আজ চারদিন হলো। বড় মেয়েটি যেমন-তেমন ছোট মেয়েটি ছিল আমার খুবই ভক্ত। যতক্ষণ আমাকে বাসায় পেতো সারাক্ষণ আমার কোলে অথবা কাঁধে চড়ে থাকত। মেয়ে দুটোর জন্য সারাক্ষণই মনটি আনচান করছে। এদিকে তাদের যাওয়ার পর থেকেই আজ চারদিন যাবত আমার ডায়েরিয়া চলছে। তিনবেলাই পাতলা পায়খানা হচ্ছে। সাথে আছে ক্ষণে ক্ষণে পেট ব্যথা। একে তো কন্যাদের বিচ্ছেদ, তার ওপরে ডায়েরিয়া আবার পেট ব্যথা। ক্ষুধা নষ্ট হয়ে গেছে, কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। সব মিলিয়ে চারদিন যাবত আমার শারীরিক-মানসিক সুখ-শানি- একেবারে বিপর্যস- হয়ে পড়েছে। প্রথম দুদিন কোন ঔষধ খাইনি। ভাবলাম আমার ডায়েরিয়া এবং পেটে ব্যথা হওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। তাই ধরে নিয়েছিলাম ঔষধ ছাড়াই হয়ত এক সময় সেরে যাবে। পেটের ব্যথাটা ছিল এমন যে, হঠাৎ আসত এবং হঠাৎ চলে যেতো (বেলেডোনা, লাইকোপোডিয়াম)। ফলে তৃতীয় দিন একমাত্রা বেলেডোনা খেয়েছিলাম। তাতে ঘণ্টাখানেকের জন্য পেট ব্যথা চলে গিয়েছিল বটে, তবে ডায়েরিয়ার কোন পরিবর্তন হয়নি। চতুর্থ দিনও ডায়েরিয়া এবং পেট ব্যথা সমান তালে চলছিল। চতুর্থ দিনে হঠাৎ আমার মনে হলো কন্যাদের বিচ্ছেদ-যাতনাই সম্ভবত আমার ডায়েরিয়া-পেট ব্যথার মূল কারণ। কেননা আমি খুবই সেনসিটিভ ধরণের মানুষ এবং আমার টুকটুকে সোনামনিদের কাছ থেকে দূরে যাওয়াকে সব সময় আমার কাছে মনে হতো বিরাট শাস্তির মতো। কাজেই ভেবে দেখলাম ইগ্নেশিয়া ঔষধটি হবে আমার ডায়েরিয়া এবং পেট ব্যথার সবচেয়ে ভালো ঔষধ। (কেননা বিরহ, মানসিক আঘাত, প্রেমে ব্যর্থতা, আপনজনের মৃত্যু প্রভৃতি কারণে যে-সব রোগের সৃষ্টি হয়, তাতে ইগ্নেশিয়া (Ignatia amara) ঔষধটি যাদুর মতো কাজ করে।) যা ভাবা তাই কাজ। ইগ্নেশিয়া ২০০ শক্তিতে একমাত্রা খেলাম। যাদুর মতো আমার ডায়েরিয়া এবং পেটব্যথা চলে গেলো। কিন্তু হায় ডায়েরিয়া এবং পেট ব্যথার সাথে সাথে যে মেয়েদের বিরহের মনোকষ্টটাও চলে গেলো ! ঔষধটা কি আমাকে আমার মেয়েদের কথাও ভুলিয়ে দিলো ! হোমিও ঔষধ তো দেখছি ভারি দুষ্ট !!

**Dysentery (আমাশয়) ঃ-** সাধারণত পায়খানার সাথে আম বা মিউকাস যাওয়াকে আমাশয় বলা হয়। তবে ইহার সাথে বমি, আমাশয়ের চিকিৎসাতেও লক্ষণ মিলিয়ে ঔষধ খেতে হবে। রোগের নাম (সাধারণ আমাশয়, রক্ত আমাশয়, পুরনো আমাশয় ইত্যাদি) চিন্তা করে ঔষধ খেলে কোন উপকার হবে না।

Mercurius solubilis : সাধারণ আমাশয়ে প্রথমেই আমাদেরকে মারক সল ঔষধটির কথা স্মরণ করতে হবে। মারক সলের প্রধান লক্ষণ হলো পায়খানার করার পরে রোগীর মধ্যে একটি তৃপ্তির ভাব আছে, সে আরাম পায়।

Mercurius corrosivus : পক্ষান্তরে রক্ত আমাশয়ের ক্ষেত্রে মারক কর ঔষধটি খেতে হবে।

Ipecac : আমাশয়ের সাথে যদি বমিবমি ভাব থাকে, তবে ইপিকাক ঔষধটি খেতে থাকুন।

Nux vomica : অনেক রকম ঔষধ খাওয়ার পরও যদি আমাশয় ভালো না হয়, তবে নাক্স ভমিকা খেতে থাকুন। নাক্স ভমিকার প্রধান লক্ষণ হলো রোগী পায়খানা করার পরেও কোন আরাম পায় না। মনে হয় কিছু পায়খানা এখনও রয়ে গেছে ; মনে হয় আরো কিছুক্ষণ বসে কোথানি দিলে আরাম লাগত।

Belladonna : যদি শরীর গরম থাকে, শরীরে জ্বালাপোড়া থাকে, পায়খানার সাথে টকটকে লাল তাজা রক্ত যায়, ছুড়ি মারার মতো পেট ব্যথা থাকে, তবে এই ধরণের আমাশয়ে বেলেডোনা খেতে হবে।

Cantharis : পায়খানার রাস্তায় যদি আগুনের মতো জ্বালাপোড়া থাকে, তবে ক্যান্থারিস খেতে হবে।

Colchicum : কলচিকামের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো হেমন্তকালের আমাশয়, পায়ের পেশীতে খিল ধরা, খাবার দেখলে-খাবারের কথা চিন্তা করলে-খাবারের গন্ধ পেলেও বমি বমি ভাব হয়, সাংঘাতিক কোথানি ইত্যাদি ইত্যাদি।

Colocynthis : আমাশয়ের সাথে যদি পেটে ছুরি মারার মতো মারাত্মক ব্যথা থাকে এবং সেই ব্যথা যদি পেটে চাপ দিলে কমে, তবে তাতে কোলোসিন্থ খেতে হবে। সাধারণত ঝগড়াঝাটি, অপমান ইত্যাদি ঘটনার পরে কোলোসিন্থের লক্ষণ এসে থাকে।

Dioscorea : আমাশয়ের সাথে যদি পেটে ছুরি মারার মতো মারাত্মক ব্যথা থাকে এবং সেই ব্যথা যদি পেটে চাপ দিলে বেড়ে যায়, তবে তাতে ডায়োস্কোরিয়া খেতে হবে। সাধারণত ঝগড়াঝাটি, অপমান ইত্যাদি ঘটনার পরে কোলোসিন্থের লক্ষণ এসে থাকে।

Ipecacuanha : আমাশয়ের সাথে যদি বমিবমি ভাব থাকে এবং জিহবা পরিষ্কার থাকে, তবে ইপিকাক প্রযোজ্য।

**Dysmenorrhea, menstrual cramp, painful mense (ব্যথাযুক্ত মাসিক) -** সাধারণত মেয়েদের মাসিক স্রাবের সময় ব্যথা হওয়াকে সাইকোটিক মায়াজম (sycotic miasm) ঘটিত রোগ বলে বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছেন। তাই এই রোগের চিকিৎসার জন্য প্রথমেই এন্টি-সাইকোটিক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। মেডোরিনাম এবং থুজা হলো দুটি সেরা এন্টি-সাইকোটিক ঔষধ।

Medorrhinum : অতীতে যাদের গনোরিয়া হয়েছিল অথবা যাদের পিতা-মাতা-স্বামীর গনোরিয়া ছিল, তাদেরকে মেডোরিনাম না খাইয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাসিকের ব্যথা স্থায়ীভাবে সারানো যায় না। মেডোরিনামের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো পেট নীচের দিকে দিয়ে ঘুমায়, চকোলেট-কমলা খুবই পছন্দ করে, অন্ধকারে ভয় পায়, গতকালের ঘটনাকে মনে হয় অনেক বছর আগের ঘটনা, সব কাজে তাড়াহুড়া করে ইত্যাদি ইত্যাদি। ঔষধটি ২০০ শক্তিতে বিশ দিন পরপর একমাত্রা করে খাওয়া উচিত এবং প্রয়োজন হলে পরবর্তীতে শক্তি বাড়িয়ে খাওয়া যেতে পারে।

Thuja occidentalis : যে-কোন টিকা (বিসিজি, ডিপিটি, পোলিও, এটিএস ইত্যাদি) নেওয়ার কারণে ব্যথাযুক্ত মাসিকের রোগ হলে সেক্ষেত্রে থুজা একটি অতুলনীয় ঔষধ। থুজার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো 'উপর থেকে পড়ে যাওয়ার' স্বপ্ন দেখে, শরীরে আঁচিল বা মেঞ্জ হওয়া, বর্ষাকালে বা ভ্যাপসা আবহাওয়ার সময় রোগের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, বদহজম, কোষ্টকাঠিন্য, হাত-পা ছড়িয়ে রাখলে রোগের মাত্রা বেড়ে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি । ঔষধটি অবশ্যই ৫/৬ মাত্রা খাওয়াতে হবে। এটি ২০০ শক্তিতে দশ দিন পরপর একমাত্রা করে খাওয়া উচিত।

Lapis albus : ল্যাপিস ঔষধটিও ডিসমেনোরিয়ার একটি শ্রেষ্ট ঔষধ বিশেষত যাদের যৌনাঙ্গে চুলকানি ও রাক্ষুসে ক্ষুধার লক্ষণ আছে।

Actea racemosa : একটিয়া রেসি মাসিকের ব্যথার আরেকটি প্রধান ঔষধ।

☆ ইহা ছাড়াও ব্যথার অধ্যায়ে যে-সব ঔষধের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাদের যে-কোনটি লক্ষণ মিলিয়ে প্রয়োগ করতে পারেন ।

**Eye diseases (চক্ষুরোগ) :** শিশুদের জন্য তৈরী করা শিক্ষামুলক কার্টুন সিরিজ সিসিমপুরের একটি পর্বে দেখানো হয়েছে যে, এক রাজকুমারী কাছের জিনিস ভালো দেখতে পেতো না। ফলে তার চলাফেরা-কাজ-কর্মে ভীষণ অসুবিধা হতো। এজন্য রাজপরিবারের সবার মনে দুঃখের শেষ ছিল না। অবশেষে একজন চোখের ডাক্তার তাকে সুন্দর ফ্রেমের একটি চশমার ব্যবস্থা করে দিলেন। ফলস্রুতিতে তার সমস্যাও চলে গেলো এবং রাজপরিবারের সকলের আনন্দের আর সীমা রইলো না। এভাবে শিশুদেরকেও ভুল শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, চোখের সমস্যায় সর্বোত্তম চিকিৎসা হলো চোখের ডাক্তারের কাছে গিয়ে চশমা নেওয়া। আমরা বয়স্করাও জানি যে, চোখের সমস্যায় চশমাই একমাত্র চিকিৎসা ; ইহার কোন বিকল্প নাই। অথচ আমরা অনেকেই জানি না যে, দৃষ্টিশক্তির সমস্যা দুর করতে চশমা ব্যবহার করা হলো একটি হাতুড়ে চিকিৎসা, বলা যায় একটি কুচিকিৎসা। কারণ এতে চোখের মুল সমস্যাটি দুর হয় না বরং রয়েই যায় এবং দিন দিন সেই সমস্যাটি আরো খারাপের দিকে যেতে থাকে। চশমা কোমপানীরা আবার হরদম অপপ্রচার চালায় যে, চশমা নাকি মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ! যদি তাই সত্যি হতো, তবে হলিউড-বলিউড-ঢালিউডের নায়ক-নায়িকারা চব্বিশ ঘণ্টাই চোখে একটা করে লেটেস্ট মডেলের চশমা লাগিয়ে রাখত। হ্যাঁ, সুন্দর মডেলের একটি চশমা ক্ষণিকের জন্য আপনার সৌন্দর্য যদি বৃদ্ধিও করে থাকে, তথাপি একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানে যে সর্বক্ষণ চশমা পড়ে থাকা কতোটা বিরক্তিকর এবং যনত্রণাদায়ক একটি বিষয়।

সে যাক, আজ থেকে একশ বছর পুর্বে ব্রিটিশ হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাঃ জে. সি. বার্নেটের (এম.ডি.) কাছে চিকিৎসার জন্য একটি দশ বছরের শিশুকে আনা হয়েছিল, যে কিনা কাছের জিনিস ভালো মতো দেখতে পেতো না। তিনি শিশুটির বিস্তারিত খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলেন যে, তার হজমের সমস্যা আছে। বার্নেট বুঝতে পারলেন যে, হজমে গন্ডগোল থাকার কারণে শিশুটির মধ্যে অপুষ্টির সমস্যা আছে এবং তার চোখও অপুষ্টিতে ভোগছে। ঔষধ দিয়ে বার্নেট শিশুটির হজমের সমস্যা দুর করে দিলেন, ফলে শিশুটির অপুষ্টিও দুর হয়ে গেলো এবং চোখের সমস্যাও সেরে গেলো। তারপর থেকে সে চশমা ছাড়াই পরিষ্কার দেখতে পেতো। বলা যায়, বার্নেটই প্রথম হোমিওপ্যাথিতে চক্ষু রোগের চিকিৎসায় বৈপ্লবিক সুচনা করেন। তিনি যখন ঘোষণা করেন যে, শুধুমাত্র ঔষধের সাহায্যেই চোখের ছানি নিরাময় করা সম্ভব ; তখন তৎকালীন সমস্ত এলোপ্যাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক ডাক্তাররাই তার দাবীকে অযৌক্তিক ও অসম্ভব ঘোষণা করে প্রত্যাখ্যান করেন।

কিন্তু বার্নেট শত শত রোগী সুস্থ করে হাতে-কলমে প্রমাণ করে গেছেন যে, শারীরিক-মানসিক-বংশগত-জলবায়ুজনিত প্রভৃতি লক্ষণের উপর ভিত্তি করে প্রদত্ত হোমিও ঔষধের সাহায্যে কাছের জিনিস দেখতে না পাওয়া (myopia), দুরের জিনিস দেখতে না পাওয়া (hypermetropia), রাতকানা (nyctalopia), চোখের ছানিপড়া (cataract) প্রভৃতি রোগ স্রেফ ঔষধেই নিরাময় করা যায়। চশমা বা অপারেশনের দরকার পড়ে না। এজন্য বার্নেট চক্ষু বিশেষজ্ঞদেরকে সম্বোধন করতেন "চোখের মিস্ত্রী" হিসেবে। পুচকে একটি শিশুকে যখন দেখি সারাক্ষণ হাই পাওয়ারের একটি চশমা পড়ে আছে, তখন শিশুটির কষ্ট এবং তার পিতা-মাতার অজ্ঞতা আমার মনকে ব্যথিত করে তোলে। চক্ষুরোগের চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শ্রেষ্টত্ব সম্পর্কে না জানার কারণে মানুষ অযথা কতো কষ্ট স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে ! পরিশেষে চক্ষু বিশেষজ্ঞদের প্রতি আমাদের দাবী থাকবে, তারা যেন চোখের মূল সমস্যা দূর করার জন্য হোমিও ঔষধ প্রেসক্রাইব করেন এবং স্রেফ চশমা ধরিয়ে দিয়ে রোগী বিদায় করাতেই তাদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ না রাখেন।

☆ সাধারণত চক্ষুরোগে Actea racemosa, Allium cepa, Euphrasia, Hydrastis can, Jaborandi, Morbillinum, Nitricum acidum, Onosmodium virginianum, Paris quadrifolia, Pulsatilla, Senega, Tellurium প্রভৃতি ঔষধগুলি বেশী বেশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এদের লক্ষণ বরিকের মেটেরিয়া মেডিকাতে দেখে নিতে পারেন।

**Injuries (আঘাত) ঃ -** মাথায় আঘাতের কারণে অন্ধ, কানা, বোবা হয়ে গেলে, স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেললে কিংবা অন্যকোন শারীরিক-মানসিক রোগ হলে Natrum sulph অথবা Arnica montana খাওয়ান। চোখে ঘুষি বা কোনো রকমের আঘাতে Symphytum বা Arnica অথবা Ledum (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২,৩০,২০০) ঘনঘন খাওয়াতে থাকুন। কোনো ভারী জিনিস উঠাতে গিয়ে কিংবা কোনো শক্ত কাজ করতে গিয়ে শরীরের কোথাও আঘাত লাগলে Rhus tox (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২,৩০, ২০০) দশ মিনিট-আধা ঘণ্টা-এক ঘণ্টা পরপর খেতে থাকুন। আঘাত লেগে চামড়ার নীচে রক্তজমাট বাঁধলে (কালশিরা) Arnica (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২,৩০,২০০) তিনবেলা করে খেতে থাকুন। হাড়ের উপরের আবরণে (periosteum) আঘাত লেগে ব্যথা করলে Ruta (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২,৩০,২০০) দু'চার ঘণ্টা পরপর খেতে থাকুন।

## Fracture (হাড়ভাঙ্গা) ঃ -

☆ শরীরের কোনো হাড় ভেঙ্গে বা মচকে গেলে (ফ্রেকচার) এর ফলস্বরূপ আগত জ্বর, ব্যথা, ফোলা, অনিদ্রা ইত্যাদি দূর করার জন্য Arnica montana দশ মিনিট-আধাঘণ্টা-একঘণ্টা পরপর খেতে থাকুন। যদি সাথে Hypericum perforatum ঔষধটি খাওয়াতে পারেন, তবে তা হবে খুবই বুদ্ধিমানের কাজ। একবার আর্নিকা একবার হাইপেরিকাম, এভাবে অদল বদল করে খাওয়াতে থাকুন। ব্যথা নিবারণে এই দুইটি ঔষধের যে ক্ষমতা, তার ধারে কাছেও কোন এলোপ্যাথিক ব্যথার ঔষধ আসতে পারে না।

☆ জ্বর-ব্যথা-ফোলা চলে গেলে হাড় জোড়া লাগানোর জন্য Symphytum officinale অথবা Calcarea phosphoricum তিনবেলা করে খেতে থাকুন (শক্তি ৩,৬,১২,৩০), যতদিন হাড় জোড়া না লাগছে। সাথে সাথে অবশ্যই হাসপাতালে নিয়ে ব্যান্ডেজ বা প্লাস্টার করে আনবেন। হাড়ভাঙ্গার পর অত্যধিক ব্যথার কারণে খিঁচুনি শুরু হলে অবশ্যই Hypericum perforatum খাওয়াতে হবে।

**Foetus Malposition (ঔষধে গভর্স্থ শিশুর পজিশান ঠিক) :** পালসেটিলা (Pulsatilla pratensis) ঔষধটি যে গর্ভস্থ ভ্রুণের অবস্থানকে পরিবর্তন করতে পারে; বিষয়টি প্রথম লক্ষ্য করেন ফিলাডেলফিয়ার ডাঃ বেথমান। একবার এক প্রসব যন্ত্রণাকাতর রোগীর জন্য তাকে ডাকা হলে তিনি গিয়ে দেখলেন- প্রচণ্ড ব্যথা থাকলেও পর্দা তখনও ছিন্ন হয়নি এবং জরায়ু মুখ সামান্য খুলেছে। পরীক্ষা করে তিনি দেখলেন, শিশুর কাঁধ জরায়ু মুখের দিকে অবস্থান করছে (shoulder presentation)। প্রসবকার্যটি দ্রুত হওয়ার আশা নেই মনে করে তিনি রোগিনীকে একমাত্রা পালসেটিলা খাওয়ান। কয়েক মিনিট পর ভদ্রমহিলা পেটে ব্যথা অনুভব করলেন এবং তার মনে হলো পেটের মধ্যে কিছু একটা মোচড় দিয়ে ঘুরে গেলো যাতে তিনি ভীত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষন শান্ত থাকার পর প্রসব ব্যথা নিয়মিতভাবে পুণরায় শুরু হয় এবং দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় ডাঃ বেথমান মহা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেন যে, ভ্রুণের মাথা যথাযথ অবস্থানে (cephalic presentation) এসে গেছে এবং একটু পরে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে প্রসবকারয্য সম্পন্ন হয়। তিনি বছর পাঁচেক পূর্বে ঠিক একই পরিস্থিতিতে একই পদক্ষেপ নিয়ে একই রকম ফল পেয়েছিলেন। বিষয়টি তিনি স্থানীয় হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল গেজেটে বিস্তারিত লিখে পাঠান।

মহিলাদের জীবনে সবচেয়ে বিপজ্জনক সময় হলো সন্তান প্রসব কাল এবং গভর্স্থ সন্তানের পজিশন যদি ঠিক না থাকে (অর্থাৎ মাথা যদি নীচের দিকে না থাকে), তবে তাদের বিপদের আর কোন সীমা থাকে না। এক্ষেত্রে গভবর্তী মাতা এবং তার পেটের শিশু দুজনেরই মৃত্যুর সম্ভাবনা বেড়ে যায়। বাচ্চার পজিশান ঠিক না থাকলে নরমাল ডেলিভারি হয় না এবং ডাক্তাররা জীবন বাচাঁতে অপারেশন করে ডেলিভারি করেন। কিন্তু অপারেশান করলে তার জন্য সারাজীবনই নানা রকম ভোগান্তি পোহাতে হয়। তাছাড়া অপারেশানের জায়গায় আবার হারনিয়া হয় এবং হারনিয়া সারাতে আবার কয়েকবার অপারেশান করতে হয়। অথচ পালসেটিলা খুব সহজেই ইত্যাকার হুজ্জত থেকে হবু মায়েদের রক্ষা করতে পারে। পালসেটিলার ব্রিচ, ভার্টেক্স, ট্রান্স, ফিট, ক্রশ, শোলডার প্রভৃতি অনাকাঙ্খিত অবস্থানকে (mal-presentation) পরিবর্তন করার ক্ষমতার ওপর সবচেয়ে বেশী গবেষণা করেছেন বোষ্টনের ডাঃ মার্সি

বি. জ্যাকসন। তিনি এই সম্পর্কিত প্রায় তিন শতাধিক ক্লিনিক্যাল অবজারবেশন লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এছাড়াও ডাঃ ডডি, ডাঃ উডওয়ার্ড, ডাঃ মার্টিন, ডাঃ ক্যানিয়ন, ডাঃ ক্যান্ট, ডাঃ বেইলি, ডাঃ বাটলার প্রভৃতি অনেকে তাদের অভিজ্ঞতার কথা লিখে গেছেন। তাদের বর্ণিত অধিকাংশ কেইসে পালসেটিলা ব্যবহৃত হয়েছে ৩০ শক্তিতে এবং প্রতি মাত্রা (৫-১০টি বড়ি) আধাঘণ্টা থেকে কয়েক ঘণ্টা পরপর হিসেবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ৬ অথবা ২০০ শক্তি এবং পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তিকরণ পদ্ধতিতেও ব্যবহৃত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক বা দুই মাত্রার পর ভ্রূণের পজিশন ঠিক হয়ে গেছে।

অন্যদিকে ভ্রূণের অবস্থান ঠিক হতে কয়েক মিনিট থেকে এক সপ্তাহর মতো লেগে গেছে। বিষয়টি নির্ভর করে প্রসবকালের নৈকট্যের উপর ভিত্তি করে। প্রসবকাল যত নিকটবর্তী; ভ্রূণের অবস্থান তত দ্রুত কারেক্ট হয়ে থাকে। তবে কাঙ্খিত প্রসবকাল কয়েক মাস দূরে থাকতেও পালসেটিলার সাহায্যে ভ্রূণের মেলপ্রেজেনটেশন ঠিক করা যায়; এতে গর্ভপাতের কোন আশঙ্কা নেই। যদিও মূলত অনিয়মিত বা অপরযাপ্ত প্রসব ব্যথাকে নিয়মিত এবং বেগবান করা এবং প্রসবকার্যকে তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করার জন্যই পালসেটিলা ঔষধটি ব্যবহৃত হয়। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, ভ্রূণের মেল-প্রেজেনটেশন ঠিক করার জন্যও রোগীর সামগ্রিক মনো-দৈহিক (constitutional symptoms) লক্ষণ সমষ্টির উপর ভিত্তি করে ঔষধ সিলেকশন করা উচিত এবং টোটাল সিম্পটমের ভিত্তিতে নিরবাচিত যে-কোন ঔষধের দ্বারাই ভ্রূণের এলোমেলো পজিশান ঠিক করা যায়; তথাপি এক্ষেত্রে পালসেটিলাকে বলা যায় একেবারে স্প্যাসিফিক।

## Fever, pyrexia (জ্বর, গা গরম) :-

হোমিওপ্যাথি হলো লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা বিজ্ঞান। এতে রোগের নামের কোন মূল্য নাই। তাই জ্বরের ঔষধও নির্বাচন করতে হবে জ্বরের লক্ষণ অনুসারে ; জ্বরের নাম অনুসারে নয়। জ্বরের নাম বার্ড ফ্লু, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু নাকি কালাজ্বর- এসবের কোন গুরুত্ব নাই হোমিওপ্যাথিতে। ঔষধ যদি জ্বরের লক্ষণের সাথে মিলিয়ে দিতে পারেন, তবে সেটি ভাইরাস জ্বরও খতম করে দিবে অথবা টাইফয়েড বা অন্য যে-কোন নামের জ্বরই হউক, নির্মূল করে দিবে। জ্বরের তাপ যখন খুব বেশী থাকে, তখন ঔষধ খেতে নাই। এতে জ্বরের তাপ আরো বেড়ে যেতে পারে। কাজেই জ্বরের তাপ যখন কিছুটা কমে আসে, তখন ঔষধ খাওয়া উচিত। তবে যে-সব জ্বরে উচ্চতাপমাত্রা এক নাগাড়ে চলতে থাকে, তাপ কমেই না ; সে-সব জ্বরে বেশী তাপমাত্রার মধ্যেও ঔষধ খাওয়াতে হবে। জ্বরের তাপমাত্রা যদি খুব বেশী থাকে, তবে ঔষধ খাওয়ানোর সাথে সাথে মাথায় ঠান্ডা পানি ঢালতে হবে, গামছা/তোয়ালে ভিজিয়ে শরীর মুছে দিতে হবে ঘনঘন। কিছু জ্বর এমন আছে (যেমন ভাইরাস জ্বর) যা একদিন, দুইদিন বা তিনদিনের কমে নিয়নত্রণে আসে না। সেক্ষেত্রে লক্ষণ মিলিয়ে যে ঔষধ প্রযোজ্য হয়, সেটি খাওয়ানো বন্ধ করবেন না।

জ্বর না কমার কারণে ঔষধ নির্বাচন ভুল হয়েছে মনে করে অযথা ঘনঘন ঔষধ পরিবর্তন করবেন না। হ্যাঁ, রোগ লক্ষণ যদি পরিবর্তন হয়ে যায়, তবে নতুন লক্ষণ যেই ঔষধের সাথে মিলে সেটি খাওয়ানো শুরু করুন। যেমন প্রচণ্ড তাপ, অস্থিরতা, মৃত্যুভয় ইত্যাদি লক্ষণ নিয়ে জ্বর শুরু হওয়ায় একোনাইট খাওয়ালেন; দুদিন পর দেখা গেলো রোগী রোগীর অস্থিরতা, মৃত্যুভয় ইত্যাদি লক্ষণে চলে গেছে, সে বেহুঁশের মতো পড়ে থাকে, এখন একোনাইট বন্ধ করে জেলসিমিয়াম খাওয়ানো শুরু করা উচিত। স্বাভাবিক অন্যান্য খাবারের সাথে চিনি লেবু দিয়ে শরবত করে

খাওয়াবেন ঘনঘন ; এতে শরীরে দুর্বলতা আসতে পারবে না। জ্বরের রোগী যদি অদ্ভুত কিছু খেতে চায় এবং সেটি যদি তার জন্য ক্ষতিকর না হয়, তবে তাকে খেতে দেওয়া উচিত। যেমন জ্বরের সাথে যদি কারো গ্যাস্ট্রিক আলসার থাকে আর সে যদি লেবু খেতে চায় তবে দুয়েক বার খেতে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু ইহার বেশী ঠিক হবে না।

Aconitum napellus :-

একোনাইট হলো হোমিওপ্যাথিতে জ্বরের এক নাম্বার ঔষধ। যে-কোন রোগই হউক (জ্বর-কাশি-ডায়েরিয়া-আমাশয়-পেট ব্যথা-মাথা ব্যথা-শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি), যদি শুরু থেকেই মারাত্মক রূপে দেখা দেয়, তবে একোনাইট হলো তার এক নাম্বার ঔষধ। একোনাইটকে তুলনা করা যায় ঝড়-তুফান-টর্নেডোর সাথে- প্রচণ্ড কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। জ্বরও যদি তেমনি হঠাৎ করে মারাত্মক আকারে শুরু হয়, তবে একোনাইট সেবন করুন। যে-সব জ্বর আসেত আসেত শুরু হয় বা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, সে-সব রোগে একোনাইট খেতে পারেন। তাতে জ্বর পুরোপুরি না সারলেও অন্তত নব্বই ভাগ নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে। পরবর্তীতে লক্ষণ অনুযায়ী অন্য ঔষধ প্রয়োগ করতে পারেন। একোনাইটের জ্বরের লক্ষণ হলো **প্রথম থেকেই ভীষণ উত্তাপ নিয়ে জ্বর শুরু হয়, রোগী অস্থির হয়ে পড়ে, জ্বরের উৎপাত এত বেশী হয় যে তাতে রোগী মৃত্যুর ভয়ে কাতর হয়ে পড়ে।** যে-কোন জ্বরের শুরু থেকে একোনাইট খাওয়াতে থাকলে জ্বর একশভাগ যদি নাও সারে অন্তত নিয়নত্রণে চলে আসবে এবং জ্বরের গতি খারাপের দিকে যেতে পারবে না। হ্যাঁ, জ্বরের উত্তাপ কমে আসলে অর্থাৎ জ্বরের তীব্রতা হ্রাস পেলে একোনাইট সেবন বন্ধ করে দিবেন। একোনাইট প্রয়োগের পর যদি জ্বর দুর্বল হয়ে যায় কিন্তু পুরোপুরি না সারে, সেক্ষেত্রে দুয়েক মাত্রা সালফার (Sulphur) ঔষধটি খাওয়াতে পারেন।

Bryonia alba : ব্রায়োনিয়ার জ্বরের প্রধান লক্ষণ হলো **রোগীর ঠোট-জিহ্বা-গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে এবং প্রচুর পানি পিপাসা থাকে এবং রোগী অনেকক্ষণ পরপর একসাথে প্রচুর ঠান্ডা পানি পান করে**। রোগী অন্ধকার এবং **নড়াচড়া অপছন্দ করে ; কারণে এতে তার কষ্ট বৃদ্ধি পায়।** কোষ্টকাঠিন্য দেখা দেয় অর্থাৎ **পায়খানা শক্ত হয়ে যায়।** রোগীর মেজাজ খুবই বিগড়ে থাকে এবং সে একলা থাকতে পছন্দ করে (কারণ মানুষ কাছে থাকলেই তাকে নড়াচড়া করতে হতে পারে, যাতে তার কষ্ট বেড়ে যাবে)। প্রলাপ বকার সময় তারা সারাদিনের পেশাগত কাজের কথা বলতে থাকে।

Rhus toxicodendron : রাস টক্সের জ্বরের প্রধান লক্ষণ হলো প্রচণ্ড অস্থিরতা। **রোগী এতই অস্থিরতায় ভোগে যে, এক পজিশনে বেশীক্ষণ সিহর থাকতে পারে না।** রোগীর শীতভাব এমন বেশী যে, তার মনে হয় কেউ যেন বালতি দিয়ে তার গায়ে ঠান্ডা পানি ঢালিতেছে। শরীরে প্রচুর ব্যথা থাকে এবং শরীর মোচড়াতে ভালো লাগে। এই কারণে শুয়ে থাকলেও সে নড়াচড়া করে এবং এপাশ ওপাশ করতে থাকে। **বর্ষাকাল, ভ্যাপসা আবহাওয়া বা ভিজা বাতাসের সময়কার যে-কোন জ্বরে রাস টক্স এক নাম্বার ঔষধ।** রাস টক্সের জ্বর সাধারণ রাতে বেলা বেড়ে যায়। রাস টক্স খাওয়ার সময় ঠান্ডা পানিতে গোসল বা ঠান্ডা পানিতে গামছা ভিজিয়ে শরীর মোছা যাবে না। কেননা ঠান্ডা পানিতে রাস টক্সের একশান নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য কুসুম কুসুম গরম পানি ব্যবহার করতে হবে।

Belladonna : তিনটি লক্ষণের উপর ভিত্তি করে বেলেডোনা ঔষধটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, যথা-উত্তাপ, লাল রঙ এবং জ্বালা-পোড়া ভাব। **জ্বরে যদি উত্তাপ বেশী থাকে, জ্বরে যদি মুখমন্ডল বা চোখ লাল হয়ে যায়,** জ্বরের সাথে যদি প্রচণ্ড মাথা ব্যথা থাকে কিংবা **জ্বরের সাথে যদি রোগী প্রলাপ বকতে** থাকে, তবে বেলেডোনা তাকে উদ্ধার করবে নিশ্চিত। বেলেডোনার জ্বর সাধারণত হঠাৎ মারাত্মক আকারে দেখা দেয় এবং জ্বরের তীব্রতায় খুবই দ্রুত

রোগী প্রলাপ বকতে শুরু করে। রোগী ভয়ঙ্কর সব জিনিস দেখে, ভয়ে পালাতে চেষ্টা করে এবং অনেক সময় মারমুখী হয়ে উঠে।

Gelsemium sempervirens : জেলসিমিয়ামের জ্বরের প্রধান লক্ষণ হলো **রোগীর মধ্যে ঘুমঘুম ভাব থাকে বেশী, রোগী অচেতন-অজ্ঞান-বেহুশের মতো পড়ে থাকে।** দেখা যাবে গায়ে প্রচণ্ড জ্বর অথচ রোগী নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। জেলসিমিয়ামের জ্বরে মাথা ঘুড়ানি থাকে, শরীর ভারভার লাগে, শরীর ব্যথা এবং দুর্বলতা থাকে। **মাত্রাতিরিক্ত দুর্বলতার কারণে রোগী নড়াচড়া করতে পারে না এবং একটু নড়াচড়া করতে গেলে শরীর কাঁপতে থাকে।** জ্বরের সময় পিপাসা থাকে না।

Baptisia tinctoria : টাইফয়েড জ্বরের ঔষধ হিসেবে বেপ্টিশিয়ার খুব সুনাম আছে। মাতালের মতো হাবভাব, গোলাটে চাহনি, মাথাব্যথা, গলা ব্যথা এবং সারা শরীরে টনটনে ব্যথা এই ঔষধের অন্যতম লক্ষণ। **রোগীর শরীরে ব্যথা এত বেশী থাকে যে, খুব নরম বিছানাও তার কাছে শক্ত মনে হয়।** রোগীর শরীরে দুর্বলতা-অবসন্নতা থাকে অকল্পনীয় রকমের বেশী। চোখের পাতা পর্যন্ত ভারী ভারী লাগে। চেতনার খুবই অভাব। **যেমন ডাক্তার কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেওয়ার পুর্বেই রোগী ঘুমিয়ে পড়ে।** কোন ব্যাপারেই রোগী তার মনোযোগ ঠিক করতে পারে না। **রোগী মনে করে তার শরীর দুইটা; আবার মনে করে তার শরীর টুকরা টুকরা হয়ে বিছানায় ছড়িয়ে আছে এবং সে টুকরাগুলো একত্র করে জোড়া লাগানোর চেষ্টা করে।**

Arsenicum album : শরীরের নির্দিষ্ট কোন স্থানের রোগের সাথে যদি জ্বর আসে, সেখানে ঘা-ক্ষত-পচনের সৃষ্টি হয়, রোগীর মধ্যে প্রচণ্ড অস্থিরতা এবং মৃত্যুভয় থাকে, সেক্ষেত্রে আর্সেনিক প্রয়োগে যাদুর মতো ফল পাওয়া যাবে। **রোগীর বাইরে থাকে ঠান্ডা কিন্তু ভেতরে থাকে জ্বালা-পোড়া।** গরম পানি খাওয়ার জন্য পাগল কিন্তু খাওয়ার সময় খাবে দুয়েক চুমুক। **বাসি-পচাঁ-বিষাক্ত খাবার খেয়ে জ্বর হলে অথবা অন্য যে-কোন সমস্যা হলো আর্সেনিক খেতে ভুল করবেন না।**

Veratrum viride : ভিরেট্রাম ভিরিডি-র জ্বরের লক্ষণ অনেকটা একোনাইটের মতো মারাত্মক। তবে এতে বুক ধড়ফড়ানি থাকে বেশী এবং জিহ্বার মাঝখানে টকটকে লাল একটি দাগ থাকে।

Pulsatilla pratensis : পালসেটিলার জ্বরের প্রধান লক্ষণ হলো **গলা শুকিয়ে থাকে কিন্তু কোন পানি পিপাসা থাকে না।** অন্যান্য লক্ষণ হলো শীত শীত ভাব বেশী থাকে, ঘুমঘুম ভাব থাকে এবং বিকাল দুটা-তিনটার দিকে জ্বর বৃদ্ধি পায়। শরীরের এক অংশ গরম এবং অন্য অংশ ঠান্ডা থাকে। গরম, আলো-বাতাসহীন, বদ্ধ ঘরে বিরক্ত বোধ করে। হাতে জ্বালাপোড়া থাকে, ফলে সেটি বিছানার ঠান্ডা জায়গায় রাখার চেষ্টা করে। ঠান্ডা বাতাস, ঠান্ডা খাবার, ঠান্ডা পানি পছন্দ করে। **আবেগপ্রবন, অল্পতেই কেঁদে ফেলে এমন লোকদের ক্ষেত্রে বেশী প্রযোজ্য।**

Antimonium tartaricum : এন্টিম টার্টের জ্বরের প্রধান লক্ষণ হলো **জ্বরের সাথে পেটের কোন না কোন সমস্যা থাকবেই।** ইহার জ্বরের প্রধান লক্ষণ হলো **জিহ্বায় সাদা রঙের মোটা স্তর পড়বে** এবং বমি বমি ভাব থাকবে। তাছাড়া দুর্বলতা, শরীরের ভেতরে কাঁপুনি, ঘুমঘুম ভাব, বুকের ভেতরে প্রচুর কফ ইত্যাদি থাকতে পারে।

Ferrum phosphoricum : ফেরাম ফস ঔষধটি যে-কোন জ্বরের প্রথম দিকে ব্যবহার করতে পারলে ভালো ফল পাওয়া যায়। **সাধারণত যারা ভীতু, সেনিসিটিভ এবং রক্তশুণ্যতায় ভোগে তাদের জ্বরে ফেরাম ফস ভাল কাজ করে।**

**Mercurius solubilis :** মার্ক সল ঔষধটির জ্বরের প্রধান লক্ষণ হলো **প্রচুর ঘাম হয় কিন্তু রোগী আরাম পায় না।** কারণ ঘাম দিয়ে জ্বর নেমে যাবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু জ্বর নামে না। তাছাড়া ঘামে দুর্গন্ধ বা মিষ্টি গন্ধ থাকে। রোগী ঠান্ডা পানির জন্য পাগল। **জ্বর রাতের বেলায় বেড়ে যায়। মুখের লালা বৃদ্ধি পায়।** ঘামে যাদের কাপড়ে হলুদ দাগ পড়ে যায়, তাদের যে-কোন রোগে মার্ক সল উপকারী। আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে যে-সব জ্বর হয়, তাতে মার্ক সলের কথা প্রথমে চিন্তা করতে হবে।

**Natrum muriaticum :** সর্দি জ্বর এবং যে-সব জ্বর একবার পুরো সেরে যায় এবং আবার দেখা দেয় (সবিরাম জ্বর/ম্যালেরিয়া) তাতে নেট্রাম মিউর কার্যকর। **নেট্রাম মিউরের জ্বরে প্রচণ্ড মাথাব্যথা থাকে। ঠোটের মধ্যে ফোস্কা পড়ে।** সাধারণত সকাল ৯টা থেকে ০১টার দিকে জ্বর আসে এবং একদিন পরপর আসে।

**Phosphorus :** ফসফরাসের জ্বরের প্রধান লক্ষণ হলো **রোগী বরফের মতো কড়া ঠান্ডা পানি খেতে চায়, হাতের তালুতে জ্বালাপোড়া করে এবং একা থাকতে ভয় পায়।** তাছাড়া মেরুদন্ড থেকে মনে হয় তাপ বেরুচ্ছে, বুক ধড়ফড়ানি, উৎকণ্ঠা থাকে। জ্বর সন্ধ্যার দিকে বৃদ্ধি পায়। সন্ধ্যার দিকে রোগী খুব অস্থির থাকে।

Phosphoricum acidum : ফসফরিক এসিডের জ্বরের রোগী হয় নির্বোধের মতো, **তার চারপাশে যা কিছু ঘটছে সেদিকে তার কোন খেয়াল থাকে না।** রোগী কথা বলতে চায় না। **জ্বরের সাথে ডায়েরিয়া থাকে এবং কখনও কখনও মারাত্মক ডায়েরিয়া থাকে।** অত্যধিক গ্যাস জমে পেট ফেঁপে থাকে। সাধারণত অত্যধিক যৌনকর্ম করে দুর্বল হয়ে পড়া লোকদের মধ্যে এই জাতীয় লক্ষণ দেখা যায়।

Sulphur : সালফারের জ্বরের প্রধান লক্ষণ হলো রাতের বেলা **রোগীর পায়ে জ্বালাপোড়া থাকে। ফলে ঘুমের সময় সে তার পা দুটি লেপ-কাঁথার বাইরে বের করে রাখে।** তাছাড়া যথেষ্ট পিপাসা থাকে এবং জ্বর সকাল ১১টার দিকে বৃদ্ধি পায়। শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময় গরম হয়ে উঠে।

China officinalis : **চায়নার জ্বর হলো সবিরাম জ্বর যাতে একবার জ্বর ওঠে এবং তারপর জ্বর পুরোপুরি সেরে যায় এবং তারপর পুণরায় জ্বর ওঠে (ম্যালেরিয়ার মতো)।** জ্বর আসে প্রতিদিন বা একদিন পরপর তবে এক ঘণ্টা আগে। যেমন গতকাল যদি সকাল দশটায় জ্বর এসে থাকে তবে আজ আসবে সকাল নয়টায় এবং আগামীকাল আসবে সকাল আটটায়। জ্বরের তিনটি অধ্যায় থাকে- **প্রবল শীত, জ্বর এবং প্রচুর ঘাম।** চায়নার ম্যালেরিয়া জ্বর কখনও রাতে আসে না।

Eupatorium perfoliatum : ইউপেটোরিয়াম পারফো প্রধানত ডেঙ্গু জ্বরে ব্যবহৃত হয়। কেননা এতে ডেঙ্গু জ্বরের মতো প্রচণ্ড শরীর ব্যথা আছে। **শরীরে এমন প্রচণ্ড ব্যথা থাকে যেন মনে হয় কেউ শরীরের সমস্ত হাড় পিটিয়ে গুড়োঁ করে দিয়েছে।** সাধারণত পিঠে, মাথায়, বুকে, হাত-পায়ে এবং কব্জিতে বেশী ব্যথা হয়। **পানি বা খাবার যাই পেটে যায় সাথে সাথে বমি হয়ে যায়।** আইসক্রীম বা ঠান্ডা পানি খেতে ইচ্ছে হয়। রোগী খুবই অস্থির থাকে, এক মুহূর্ত স্থির হয়ে বসতে পারে না। ইনফ্লুয়েঞ্জা বা সিজনাল ভাইরাস জ্বরেও যদি প্রচণ্ড শরীর ব্যথা থাকে তবে ইউপেটোরিয়াম প্রযোজ্য।

Thuja occidentalis : যে-কোন টিকা (বিসিজি, ডিপিটি, পোলিও ইত্যাদি) নেওয়ার কারণে জ্বর আসলে তাতে থুজা একটি অতুলনীয় ঔষধ। তাছাড়া জ্বরের মধ্যে কেউ যদি 'উপর পড়ে যাওয়ার' স্বপ্ন দেখে, তবে সেটি যেই নামের জ্বরই হোক না কেন, থুজা তাকে নিরাময় করে দিবে।

Chininum sulphuricum : যে-সব জ্বর খুব টাইম মেনে চলে অর্থাৎ ঘড়ির কাটায় কাটায় উঠে এবং নামে, তাতে চিনিনাম সালফ প্রযোজ্য। মাথা ব্যথা মাথার পেছন থেকে কপালের দিকে আসে। ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার বা কালা পানির জ্বর নামে এক ধরণের মারাত্মক ম্যালেরিয়া জ্বরে এটি উপকারী যাতে লাল বা কালো রঙের প্রস্রাব হয়ে থাকে। জ্বর ওঠার পূর্বে কাঁপিয়ে শীত লাগার সময় কোন রক্তনালী ফোলে ওঠা চিনিনাম সালফের একটি প্রধান লক্ষণ।

Sambucus nigra : জ্বরে স্যাম্বুকাস নাইগ্রার প্রধান লক্ষণ হলো ঘুমের মধ্যে রোগীর শরীর থাকে শুকনা এবং গরম কিন্তু ঘুম ভেঙে গেলে ভীষণ ঘামতে থাকে এবং শরীর ঠান্ডা হয়ে যায়। কাশি বা অন্য কোন রোগেও যদি এই লক্ষণ থাকে, স্যাম্বুকাস প্রয়োগে সেটি নিরাময় হবে।

Indigo : সাধারণত কৃমির উৎপাতের কারণে জ্বর হলে ইন্ডিগো ভালো কাজ করে। যে-কোন কৃমির ঔষধই গর্ভবতীদের খাওয়ানো নিষিদ্ধ, তেমনি এটিও।

Opium : সাধারণত ভয় পাওয়ার কারণে কোন রোগ হলে তাতে ওপিয়াম প্রয়োগ করে ভালো ফল পাওয়া যায়। একইভাবে ভয় পাওয়ার কারণে জ্বর আসলে তাতে ওপিয়াম প্রয়োগ করতে হবে।

## Finger-Tips injury (আঙ্গুলের মাথা আঘাত) :-

আঙ্গুলের মাথায় ছ্যাচা খেলে বা থেতলে গেলে বা তাতে কিছু বিদ্ধ হলে যে-ই মারাত্মক ব্যথা শুরু হয়, তাতে Hypericum perforatum খান। তবেই বুঝতে পারবেন হোমিও ঔষধের কি যাদু ! তেমনিভাবে অন্ডকোষে অথবা পাছার নিকটের কন্ডার হাড়ে (coccyx / tail bone) আঘাত লাগলে যে ভয়ঙ্কর ব্যথা হয়, তাতেও হাইপেরিকাম খেতে ভুলবেন না।

## Foot sweat (হাতের তালু - পায়ের তালু ঘামানো) :

অনেকের হাতের তালু এবং পায়ের তালু চব্বিশ ঘণ্টা এমনভাবে ঘামায় যে, তাদের হাতে থেকে সবকিছুই পিছলে যায় এবং পায়ের জুতাও পিছলে যায়। সারাক্ষণ রুমাল দিয়ে হাত মুছতে হয়, যা খুবই ঝামেলার বিষয়। এজন্য Pulsatilla ঔষধটি ১০,০০০ শক্তিতে মাসে এক মাত্রা করে তিন মাসে তিন মাত্রা খান। তাতে পুরোপুরি না সারলে Silicea ঔষধটি একই নিয়মে খান। তাতেও পুরোপুরি না সারলে Zincum metallicum ঔষধটি একইভাবে খেতে পারেন।

## Food Poisoning (খাবারের বিষক্রিয়া) :-

বাসি, পচাঁ, ভেজালযুক্ত খাবার, হোটেল-রেস্তোরা-কারখানার মেয়াদবিহীন খাবার, মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যাকেটজাত বা

ক্যানজাত খাবার ইত্যাদি খেয়ে মানুষ বিষক্রিয়ার আক্রান্ত হয়ে থাকে। বটুলিজম (Botulism) বা ক্লস্টট্রিডিয়াম (Clostridium) জাতীয় মারাত্মক বিষক্রিয়া সাধারণত হয়ে থাকে বোতলজাত বা ক্যানজাত খাবার থেকে। যেমন জুস, জেলী, সফট ড্রিংকস ইত্যাদি। এসব মারাত্মক ধরণের ফুড পয়জনিংয়ে সত্তর ভাগ ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যু হয়ে থাকে। তবে উপযুক্ত হোমিও চিকিৎসায় মৃত্যুর সম্ভাবনা খুবই কমে যায়। সাধারণত দুষিত খাবার খাওয়ার কয়েক ঘণ্টা থেকে দুয়েক দিনের মধ্যেই তার লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন জ্বর আসা, শীতে কম্পন, বমিবমি ভাব, বমি হওয়া, পেটে ব্যথা, মাথা ব্যথা, অস্থিরতা, ডায়েরিয়া, দৃষ্টিশক্তির গোলমাল, পেশীর দুর্বলতা বা প্যারালাইসিস, শ্বাশ-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যু ইত্যাদি।

Arsenicum album : **ফুড পয়জনিংয়ের ক্ষেত্রে আর্সেনিক ঔষধটি মানবজাতির জন্য আল্লাহর এক বিশেষ রহমতস্বরূপ।** যে-কোন ধরণের বিশেষত মারাত্মক ধরণের ফুড পয়জনিংয়ে প্রথমে আর্সেনিক খেতে ভুলবেন না। দশ-বিশ মিনিট পরপর হিসেবে কয়েকবার আর্সেনিক খাওয়াবেন। তাতে কোন উপকার না হলেই কেবল অন্য ঔষধের কথা চিন্তা করবেন। ভীষণ বমি, ভয়ানক পেট ব্যথা, পাতলা পায়খানা ইত্যাদি দিয়ে শুরু হয় এবং তারপর পায়খানার সাথে রক্ত ও মিউকাস যেতে থাকে। রোগী অল্প সময়ের মধ্যেই একেবারে বিছানায় পড়ে যায় অর্থাৎ দুর্বল-অবসন্ন হয়ে পড়ে। রোগী মৃত্যুর ভয়ে কাতর হয়ে পড়ে।

Aconitum napellus :-
জ্বর, বমি, পেট ব্যথা, মাথা ব্যথা, ডায়েরিয়া ইত্যাদি লক্ষণ যদি ঝড়-তুফানের মতো হঠাৎ প্রচণ্ডরূপে শুরু হয়, তবে ঘনঘন একোনাইট খাওয়াতে ভুলবেন না। **রোগীর কষ্ট এত বেশী থাকে যে, তার এখনই মৃত্যু হবে এমন মনে হতে থাকে।**

Phosphorus : **যদি পায়খানার ওপর রোগীর কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তবে ফসফরাস খাওয়াতে হবে**। যেমন রোগী বিছানায় পায়খানা করে দিয়েছে অথচ সে টেরই পায়নি কখন পায়খানা বের হয়ে গেলো।

China officinalis : **সাধারণত পঁচা মাছ খেয়ে ফুড পয়জনিং হলে চায়না প্রযোজ্য**। পাতলা পায়খানার সাথে হজম না হওয়া খাবার বেরিয়ে যায়, ফল-ফ্রুট ও দুধ খেলে ডায়েরিয়া বেড়ে যায়।

Colocynthis : ফুড পয়জনিংয়ের কারণে যদি পেটে প্রচণ্ড ব্যথা হতে থাকে, **পেটে ছুরি মারার মতো ব্যথা হয়, পেটে জোরে চাপ দিলে ব্যথা কমে যায়,** তবে কোলোসিন্থ খেতে হবে। আমাশয়ের মতো পায়খানা হয় এবং কিছু খেলে-পান করলে পেট ব্যথা, আমযুক্ত পায়খানা বেড়ে যায়।

Ipecac : ইপিকাক ঔষধটির প্রধান লক্ষণ হলো **সারাক্ষণ বমিবমি ভাব**, সাথে সাংঘাতিক পেট ব্যথা এবং পায়খানার বেগ থাকতে পারে। জিহ্বা পরিষ্কার থাকে।

Pulsatilla pratensis : **সাধারণত তেল-চর্বি জাতীয় খাবার খেয়ে ফুড পয়জনিং হলে পালসেটিলা প্রযোজ্য।** পালসেটিলার প্রধান লক্ষণ হলো একেক বার একেক রকম পায়খানা হয়। রোগী তিনবার পায়খানা করলে তিনবারের পায়খানা দেখতে তিন রকম হবে।

Urtica urens : সাধারণত শামুক-ঝিনুক-চিংড়ি ইত্যাদি শক্ত খোসাওয়ালা খাবার খেয়ে ফুড পয়জনিং হলে আর্টিকা ইউরেন্স খেতে হয়। **আবার প্রচণ্ড গরমের সময় ঠান্ডা খাবার খেয়ে কোন সমস্যা হলে প্রথমেই এই ঔষধটি খেতে ভুলবেন না।**

# Gallstones, cholelithiasis (পিত্তপাথরী) : হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মাধ্যমে পিত্তপাথরীর স্থায়ী মুক্তি : পিত্তপাথরীর নিজে নিজে চিকিৎসা পদ্ধতি :

বন্ধুগণ, পিত্তথলীর পাথর সম্পূর্ণ নিমূর্ল করার জন্য (আমার নির্দেশনা মতো) নিচে উল্লেখিত সাতটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করুন। আমার প্রণীত এই ফরমূলাটি অনুসরন করলে শতকরা ৯৯ ভাগ পিত্তপাথরী রোগী পুরোপুরি পিত্তপাথরী মুক্ত হবেন বলে আমি আশাবাদী। প্রতিটি ঔষধ আপনি প্রতিবার মাত্র এক সপ্তাহ করে খাবেন। **এইভাবে ঔষধগুলি চক্রাকারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারে বারে খাবেন (অর্থাৎ ৭ নাম্বার ঔষধটি খাওয়ার পরে আবার ১ নাম্বার থেকে একই নিয়মে খাওয়া শুরু করবেন)।** আপনার পাথরের সংখ্যা যদি অনেক বেশী হয় অথবা পাথরের আকার যদি অনেক বড়, তবে দিগুণ মাত্রায় ঔষধ খেতে পারেন (অর্থাৎ ১০ ফোটা করে)। হ্যাঁ, সকল হোমিওপ্যাথিক ঔষধই খালি পেটে খাওয়া ভালো ; তবে খালি পেটে খেতে ভুলে গেলে ভরা পেটেও খেতে পারেন। **এই হোমিওপ্যাথিক ঔষধগুলো অন্য যে-কোন ঔষধের সাথে একত্রে খেতে পারবেন (হোক তা ট্যাবলেট, ক্যাপসুল বা ইনজেকশান) ; তাতে কোন সমস্যা হবে না। তবে অবশ্যই অন্য ঔষধগুলোর আধা ঘণ্টা আগে অথবা আধা ঘণ্টা পরে খাবেন। যদি পরীক্ষায় জানতে পারেন যে, পিত্তথলীর পাথর সম্পূণ দূর হয়ে গেছে, তবে সাথে সাথে ঔষধগুলি খাওয়া পুরোপুরি বন্ধ করে দিন।**

জার্মানী বা আমেরিকার তৈরী হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কেনার চেষ্টা করবেন। এই সাতটি ঔষধের যে-কোনটিকে আপনি বাদ দিয়ে দিতে পারেন, যদি মনে করেন যে, সেটি কোন কাজ (উপকার) করছে না অথবা অনাকাঙিখত সমস্যার (যেমন- বুকজ্বালা, চুলকানি, ব্যথা, ডায়েরিয়া, মাথাঘুরানি ইত্যাদি) সৃষ্টি করছে অথবা স্থানীয় মার্কেটে পাওয়া যাচ্ছে না। অবশিষ্ট ঔষধগুলি তাদের প্রদত্ত সিরিয়াল বা ধারাক্রম অনুযায়ী খেতে থাকুন। **ঔষধের শক্তি এবং মাত্রা সম্পর্কে আমার নির্দেশনা পরিবর্তন করবেন না। তবে আমার নির্দেশিত শক্তি স্থানীয় মার্কেটে পাওয়া না গেলে আপনি তার কাছাকাছি (এবং বাজারে পাওয়া সবচেয়ে নিম্নতম) শক্তির ঔষধ খেতে পারেন। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শক্তিকরণ ক্ষেত্রে কিউ (Q) -কে বলা হয় মাদার টিংচার, অর্থাৎ সবচেয়ে নিম্নতম শক্তি অর্থাৎ এক বা শূণ্য শক্তির ঔষধ। আমরা সবাই জানি যে, নিম্নশক্তির (যেমন Q, 3X, 6X, 12X, 30X, 200X, 3C, 6C, 3, 6, 12 ইত্যাদি) হোমিওপ্যাথিক ঔষধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া খুবই কম, নাই বললেই চলে।** মনে রাখবেন যে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধের নামসমূহ হলো বিশ্বজনীন (অর্থাৎ এগুলো পৃথিবীর সকল দেশে একই নামে পাওয়া যায়)। এসব ঔষধের কোনটি যদি তরল আকারে পাওয়া না যায়, বরং তার পরিবর্তে বড়ি আকারে পাওয়া, তবে তা দ্বিগুন মাত্রায় খান অর্থাৎ পাঁচ ফোটার পরিবর্তে দশটি বড়ি করে খান। ঔষধ সব সময় তরল আকারে কেনার চেষ্টা করবেন এবং কিছু পানির সাথে মিশিয়ে খাবেন। কেননা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ তরল আকারে খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

অল্প কিছু রোগীর ক্ষেত্রে পুরোপুরি রোগমুক্তির জন্য (আমার ফরমুলা অনুযায়ী ঔষধ সেবনের পাশাপাশি) কোন একজন হোমিওপ্যাথিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হতে পারে ; যিনি রোগীর শারীরিক ও মানসিক গঠন বিশ্লেষণ পূবর্ক আরো উৎকৃষ্ট ও মানানসই ঔষধ নিবার্চন করে প্রয়োগ করবেন। পুরোপুরি রোগমুক্তির জন্য (পাথরের আকার এবং সংখ্যার অনুপাতে) এই ঔষধগুলি আপনাকে কমপক্ষে এক থেকে দুই বছর অথবা আরও বেশী কিছু সময় খেতে হতে পারে।

[আজ থেকে দেড়শ বছর আগের কথা, পিত্তথলীতে পাথরের সমস্যা নিয়ে এক মহিলা আসলেন আমেরিকান হোমিও চিকিৎসাবিজ্ঞানী প্রফেসর ডাঃ জেমস টাইলার কেন্ট-এর চেম্বারে। কেন্ট তাকে বললেন যে, অপারেশন ছাড়াই কেবল হোমিও ঔষধের সাহায্যেই পিত্তথলীর পাথর গলিয়ে দূর করা সম্ভব। মহিলার আপন ভাই একজন এলোপ্যাথিক ডাক্তার ; যে তাকে বলেছিল যে, ঔষধে পিত্তথলীর পাথর দূর করা সম্ভব নয়, ইহার একমাত্র চিকিৎসা অপারেশান। মহিলার ভাই কেন্টের দাবীর কথা শুনে বললেন যে, একজন হাতুড়ে ডাক্তারের পক্ষেই দাবী করা সম্ভব যে ঔষধে পিত্তপাথর দূর করা যায়। কেন্ট শুনে বললেন যে, তাহলে আমি যদি ঔষধে পিত্তপাথর দূর করতে সক্ষম হই, তবে আপনার ভাইকে হাতুড়ে ডাক্তার বলা যাবে ত ?
তারপর তিনি মহিলার রোগের লক্ষণ, শারীরিক গঠন, মানসিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করে ঔষধ দিলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই তার পিত্তপাথর দূর হয়ে গেল। তাই আজ ইহা একটি প্রমাণিত সত্য যে, একজন হোমিওপ্যাথিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকই কেবল ঔষধের মাধ্যমে পিত্তপাথরী পুরোপুরি নির্মূল করার ক্ষমতা রাখেন (অপারেশন করছেন তো আপনার কপালে ক্যান্সারসহ অনেক ভোগান্তি আছে ! )।

Rx

(1) Natrum Sulphuricum  Q/3x/6x/3c/6c/12/30c/3/6/12/30

(এই হোমিওপ্যাথিক ঔষধটি ৫ ফোটা করে রোজ দুই বেলা করে প্রথম সপ্তাহ খান। আধা গ্লাস পানির সাথে মিশিয়ে)

(2) Baptisia tinctora  Q/3x/6x/30x/3c/6c/12/30c/3/6/12/30

(এই হোমিওপ্যাথিক ঔষধটি ৫ ফোটা করে রোজ দুই বেলা করে দ্বিতীয় সপ্তাহ খান। আধা গ্লাস পানির সাথে মিশিয়ে)

(3) China officinalis  Q/3x/6x/30x/3c/6c/12/30c/3/6/12/30

(এই হোমিওপ্যাথিক ঔষধটি ৫ ফোটা করে রোজ দুই বেলা করে তৃতীয় সপ্তাহ খান। আধা গ্লাস পানির সাথে মিশিয়ে)

(4) Cholesterinum  Q/3x/6x/30x/3c/6c/12/30c/3/6/12/30

(এই হোমিওপ্যাথিক ঔষধটি ৫ ফোটা করে রোজ দুই বেলা করে চতুর্থ সপ্তাহ খান। আধা গ্লাস পানির সাথে মিশিয়ে)

(5) Chelidonium majus  Q/3x/6x/30x/3c/6c/12/30c/3/6/12/30

(এই হোমিওপ্যাথিক ঔষধটি ৫ ফোটা করে রোজ দুই বেলা করে পঞ্চম সপ্তাহ খান। আধা গ্লাস পানির সাথে মিশিয়ে)

(6) Calcarea carbonica  Q/3x/6x/3c/6c/12/30c/3/6/12/30

(এই হোমিওপ্যাথিক ঔষধটি ৫ ফোটা করে রোজ দুই বেলা করে ষষ্ঠ সপ্তাহ খান। আধা গ্লাস পানির সাথে মিশিয়ে)

(7) Hydrastis canadensis Q/3x/6x/30x/3c/6c/12/30c/3/6/12/30

(এই হোমিওপ্যাথিক ঔষধটি ৫ ফোটা করে রোজ দুই বেলা করে সপ্তম সপ্তাহ খান। আধা গ্লাস পানির সাথে মিশিয়ে। এরপর পূণরায় এক নাম্বার ঔষধ থেকে একই নিয়মে খাওয়া আরম্ভ করুন।)

## Emergency (জরুরি প্রাথমিক চিকিৎসা) :-

☆ যে-কোন ধরণের ঔষধের বা বিষাক্ত পদার্থের বিষক্রিয়া নিরাময়ের জন্য Nux vomica (শক্তি কিউ, ৩,৬, ১২,৩০,২০০) ঘনঘন খেতে থাকুন।

☆ প্রচন্ড গরমের সময় ঠান্ডা লেগে কোন রোগ হলে Urtica urens (শক্তি ৬,১২,৩০,২০০) তিনবেলা করে খেতে থাকুন।

☆ অতিরিক্ত মানসিক শ্রমের ফলে কোন রোগ হলে Acidum Picricum রোজ একবেলা করে খান।

☆ অতিরিক্ত রৌদ্রে কিংবা গরমে থাকার পর কোন সমস্যা হলে Glonoinum Glonoine ঘণ্টায় ঘণ্টায় খেতে থাকুন।

☆ শরীরের কোথাও আঘাত পাওয়ার দীর্ঘদিন পরে সেখানে কোন সমস্যা দেখা দিলে Arnica montana ক্রমান্বয়ে শক্তি বৃদ্ধি করে খান।

☆ স্ত্রী যৌনাঙ্গের সপর্শকাতরতায় Staphisagria ঘনঘন খেতে থাকুন।

☆ যাদের চোখে বা শরীরের অন্য কোথাও প্রায় সারা বৎসরই পুঁজ হতে থাকে, তার Medorrhinum মাসে একমাত্রা করে অন্তত তিনমাস খান।

☆ অপমানিত হওয়ার ফলে বা ঝগড়ার করার জন্য বা চেপে রাখা অসন্তোষের কারণে কিংবা শিশুদেরকে মারধর করার কারণে কোন সমস্যা দেখা দিলে Staphisagria ঘনঘন খেতে থাকুন।

☆ তেল-চর্বি জাতীয় খাবার খাওয়ার পরে কোন সমস্যা দেখা দিলে Pulsatilla pratensis খেতে থাকুন।

☆ বজ্রপাত অথবা ইলেকট্রিক শকের পর Phosphorus ঘনঘন খেতে থাকুন।

☆ পচাঁ ডিম অথবা বাসি খাবার খেয়ে কোনো সমস্যা হলে Carbo vegetabilis (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২,৩০,২০০) ঘনঘন খেয়ে যান।

☆ প্রেমে ব্যর্থ হলে বা আপনজনের মৃত্যু বা বিরহজনিত শোকের কারণে কোন রোগ দেখা দিলে প্রথমে ইগ্নেশিয়া এবং পরে নেট্রাম মিউর (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২,৩০,২০০) খেয়ে যান।

☆ অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের ফলে কোন সমস্যা হলে Nux vomica অথবা Cocculus indicus (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২,৩০,২০০) তিনবেলা করে খেতে থাকুন।

☆ চোখের অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে কোন সমস্যা হলে Ruta graveolens (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২,৩০,২০০) ঘণ্টায় ঘণ্টায় খেয়ে যান।

**Filaria, elephantiasis (ফাইলেরিয়া, গোদরোগ) :** ফাইলেরিয়া বা গোদরোগ হলো বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর একটি সাধারণ রোগ। এক ধরনের পরজীবী (Wuchereria bancrofti) পোকা মশার কামড়ের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে এবং বংশবৃদ্ধি করে। সাধারণত দীর্ঘদিন যাবত চিকিৎসা না করলে হাত-পা ফুলে হাতির মতো বড় হয়ে যায়। ফাইলেরিয়া হোমিও চিকিৎসায় খুব সহজেই সারানো সম্ভব। কিন্তু যেহেতু এই রোগের উল্লেখযোগ্য কোন লক্ষণ নাই, তাই কোন নির্দিষ্ট কোন ঔষধের নাম সুপারিশ করা গেল না। আপনাকে রোগীর জন্মগত শারীরিক গঠন, মানসিক অবস্থা, আর কি কি রোগ আছে, অতীতে আর কি কি রোগ হয়েছিল ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে ঔষধ নির্বাচন করে প্রয়োগ করতে হবে। তাতেই এই রোগ থেকে সহজে মুক্ত হওয়া যাবে।

**Hernia (হার্নিয়া, কোন AsM Zvi AveiYx ZŠ' wQ‡o অথবা লম্বা করে Zvi Rb¨ wba©vwiZ ¯'vb †_‡K Ab¨Î P‡j hvIqv ) :** সাধারণত আমাদের পেটের ভেতরে যত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, তাদের প্রত্যেকটিকে একটি থলিতে ভরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে থাকতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু কোন কারণে সেটি থলিকে লম্বা করে অথবা ছিদ্র করে অন্যদিকে চলে গেলে তাকে হার্নিয়া বলা হয়। হার্নিয়ার প্রধান লক্ষণ হলো আক্রান্ত স্থানে চাকার মতো অনুভব করা এবং ব্যথা হওয়া। হার্নিয়ার অবস্থান যেখানে ব্যথাও হয় সেখানে। তাছাড়া বমি, বমিবমিভাব, জ্বর ইত্যাদি লক্ষণ থাকতে পারে। তবে কোন কোন হার্নিয়ায় ব্যথাও থাকে না। অন্য কোন লক্ষণও থাকে না। সাধারণত অপুষ্টি, ধূমপান, মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম, গর্ভধারণ ইত্যাদি কারণে হার্নিয়া হয়ে থাকে। হ্যাঁ, হোমিও চিকিৎসায় আক্রান্ত অঙ্গটি ধীরে ধীরে মেরামত হয়ে আবার নরমালে চলে আসে। কাজেই দু'চার মাস সময় লাগলেও ধৈর্য্য ধরে ঔষধ খাওয়া উচিত। কেননা অপারেশান করলে সাধারণত কয়েক বছরের মধ্যে রোগটি আবার ফিরে আসতে দেখা যায়। লক্ষণ অনুযায়ী এক বা একাধিক ঔষধ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেবন করতে হবে।

Nux vomica : **যারা অধিকাংশ সময়ে পেটের অসুখে-বদহজমে ভোগে**, বদমেজাজী, ঝগড়াটে, **বেশীর ভাগ সময় শুয়ে-বসে কাটায়**, কথার বিরোধীতা সহ্য করতে পারে না, সারাবছর কোষ্টকাঠিন্যে ভোগে, পেটের ভেতরে ছুরি মারার মতো ব্যথা এবং **অল্প শীতেই কাতর হয়ে পড়ে**, এটি তাদের হার্নিয়ার ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে।

Lycopodium clavatum : লাইকোপোডিয়ামের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো রোগের মাত্রা বিকাল ৪-৮টার সময় বৃদ্ধি পায়, এদের রোগ ডান পাশে বেশী হয়, রোগ ডান পাশ থেকে বাম পাশে যায়, এদের পেটে প্রচুর গ্যাস হয়, এদের সারা বৎসর প্রস্রাবের বা হজমের সমস্যা লেগেই থাকে, এদের দেখতে তাদের বয়সের চাইতেও বেশী বয়স্ক মনে হয়, **এদের স্বাস্থ্য খারাপ কিন্তু ব্রেন খুব ভালো,** এরা খুবই সেনসিটিভ-আবেগপ্রবন এমনকি ধন্যবাদ দিলেও কেঁদে ফেলে ইত্যাদি ইত্যাদি। উপরের লক্ষণগুলোর দু'তিনটিও কোন রোগীর মধ্যে থাকলে লাইকোপোডিয়াম তার হার্নিয়া সারিয়ে দেবে।

Opium : ব্যথা হওয়ার কথা কিন্তু ব্যথা নাই, ঘুমঘুম ভাব কিন্তু ঘুম আসে না, খুবই সেনসিটিভ, ঘড়ির কাটার শব্দ কিংবা দূরের কোন মোরগের ডাকেও তার ঘুম ভেঙ্গে যায়, দুঃস্বপ্ন দেখে, কুকুর, বিড়াল, প্রেতাত্মা, বোবায়ধরা স্বপ্নে দেখে, ঘুমের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসে, পায়খানার বেগই হয় না, এমনকি **সাত দিন পনের দিনেও পায়খানার বেগ**

**হয় না, পায়খানা হয় ছাগলের লাদির মতো ছোট ছোট, গোল গোল, কালো, শক্ত শক্ত,** আঙুল দিয়ে পায়খানা বের করতে হয় ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে অপিয়াম ঔষধটির কথা সর্ব প্রথম চিন্তা করা উচিত।

Oxalicum Acidum : ছিড়ে ফেলার মতো ভয়ংকর ব্যথা, ব্যথার কথা চিন্তা করলে ব্যথা বেড়ে যায়, প্রস্রাবের কথা মনে হলে সাথে সাথে প্রস্রাব করতে হয় নইলে কাপড় নষ্ট হয়ে যায়, চামড়া ঠান্ডা, পিঠ-কোমর-পায়ে অবশ অবশ ভাব, কুঞ্চিত চামড়া, নখ নীলচে, বাম পাশের বাতের ব্যথা, বাম ফুসফুসের নীচের দিকে তীব্র ব্যথা, নার্ভাস রোগীদের হৃদরোগ, কোমর ব্যথা, আলো সহ্য হয় না ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে অক্সালিক এসিড খেতে হবে।

Plumbum metallicum : রক্তশূণ্যতা, দীর্ঘ দিনের কোষ্টকাঠিন্য/শক্ত পায়খানার সমস্যা, এমন পেট ব্যথা থাকে যাতে মনে হবে পেটের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কেউ যেন সুতো দিয়ে বেঁধে পিঠের দিকে টানতেছে ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে প্লামবাম খাওয়ার কথা চিন্তা করতে হবে।

Aurum metallicum : সাধারণত তলপেটের (inguinal) অথবা নাভীর (umbilical) হার্নিয়া এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে । শিশুদের ক্ষেত্রেও এটি বেশী ব্যবহৃত হয়।

Gentiana cruciata : সাধারণত তলপেটের ডান পাশের হার্নিয়াতে (right inguinal hernia) এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

Granatum : এটি তলপেটের হার্নিয়াতে (inguinal hernia) এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।



**Gastric ulcer, Peptic ulcer (গ্যাস্ট্রিক আলসার, ) ঃ-** ☆ গ্যাস্ট্রিক আলসারে যদি পেটে গ্যাসের সমস্যা বেশী থাকে, তবে Carbo veg, Lycopodium অথবা China (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২,৩০) খান দু'চার ঘণ্টা পরপর যতদিন আরোগ্য না হচ্ছে । ☆ পক্ষান্তরে যদি পেটে গ্যাস কম থাকে কিন্তু এসিডের পরিমাণ বেশী হয় তবে Magnasium carbonicum অথবা Arsenicum album (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২,৩০) খেতে হবে। যথেষ্ট উন্নতি হলে পরবর্তীতে শক্তি এবং বিরতি বাড়িয়ে খেতে পারেন। ☆ যদি পেটে বা বুকে বেশী জ্বালাপোড়া ভাব থাকে তাহলে Arsenicum album (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২,৩০) সবচেয়ে ভালো কাজ করবে। ☆ মারাত্মক ধরনের গ্যাস্ট্রিক আলসারে Cadmium sulph ঔষধটির কথা ভুলবেন না।

☆ মোটামুটি যে-কোন ধরনের আলসারে একবার Natrum muriaticum (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২,৩০) আর একবার Natrum phosphoricum (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২,৩০) এই রকমভাবে অদলবদল করে খেয়ে যাদুকরী ফল পেতে পারেন।

☆ গ্যাস্ট্রিক আলসারের সাথে যদি বমিবমি ভাব থাকে তবে Ipecac খাওয়াতে হবে। পাশাপাশি তিনবেলা নিয়মিত খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাস করুন এবং টক-ঝাল-ভাজা-পোড়া-দুধ-ডাল-মিষ্টি জাতীয় খাবার বর্জন করুন। বেশী বেশী পানি খাওয়া খুবই জরুরি।

**Hypertension, High blood pressure (উচ্চ রক্তচাপ) ঃ-** আমাদের শরীরের রক্তনালী দিয়ে রক্ত স্বাভাবিকভাবে যে গতিতে চলাফেরা করে কোন কারণে তার চাইতে বেশী স্পীডে চলাকেই উচ্চ রক্তচাপ

বলে। উচ্চ রক্তচাপ নিরাময়ের জন্য এলোপ্যাথিক ঔষধ খাওয়া উচিত নয়। কেননা সেক্ষেত্রে আপনাকে সারাজীবনই ঔষধ খেয়ে যেতে হবে। তাছাড়া এসব ঔষধ অনেক বছর খাওয়ার ফলে হৃৎপিন্ড দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ফলে রোগীরা অল্প বয়সে হার্ট এটাকে মারা যায়।

Passiflora incarnata : উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রনে প্যাসিফ্লোরা ঔষধটি হোমিওপ্যাথিতে বেশী ব্যবহৃত হয়। সাধারণত ১০ থেকে ২০ ফোটা করে রোজ ২/৩ বার করে যতদিন প্রয়োজন খান। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রনে চলে আসলে এটি বন্ধ করে উচ্চ রক্তচাপের কারণ দূর করার ঔষধ খান।

Natrum muriaticum : উচ্চ রক্তচাপের সবচেয়ে ভালো ঔষধ হলো নেট্রাম মিউর। লবণ থেকে তৈরী এই ঔষধটি রক্তে লবণের পরিমাণ কমানোর মাধ্যমে পানির পরিমাণ কমিয়ে রক্তের আয়তন কমিয়ে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কাজেই এই ঔষধ খাওয়ার সময় কাচাঁ লবণ খাওয়া বন্ধ রাখা উচিত।

Glonoine : গ্লোনইন ঔষধটি মাত্রাতিরিক্ত উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় একটি শ্রেষ্ট ঔষধ। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো প্রচণ্ড মাথা ব্যথা, মাথা একটু নাড়ালেই মনে হয় সেটি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, সাংঘাতিক বুক ধড়ফড়ানি, চিন্তাশক্তি এলোমেলো হয়ে যায়, চেনা রাস্তা হঠাৎ অচেনা মনে হয় ইত্যাদি।

Nux vomica : অত্যধিক ব্যস্ত, অধিকাংশ সময় বসে বসে কাজ করে, শীত সহ্য করতে পারে না এবং বদমেজাজি লোকদের উচ্চরক্ত চাপে নাক্স ভমিকা একটি ভালো ঔষধ।

Rauwolfia serpentina : রাওলফিয়া উচ্চ রক্তচাপের একটি বহুল ব্যবহৃত হোমিও ঔষধ। মোটামুটি সব ধরনের রোগীরাই এটি খেতে পারেন। নিম্নশক্তিতে ১০ ফোটা করে রোজ দুই-তিন বার করে খান। প্রয়োজনে মাত্রা আরও বাড়িয়ে খেতে পারেন।

Conium maculatum : সাধারণত উচপ রক্তচাপের সাথে যদি মাথাঘুরানি থাকে, তবে কোনায়াম খেতে হবে।

Plumbum metallicum : প্লাম্বাম মেট উচ্চ রক্তচাপের একটি প্রথম শ্রেণীর ঔষধ। বিশেষত উচ্চ রক্তচাপের সাথে যাদের আরো অনেক রকমের হৃদরোগ বা প্যারালাইসিস জাতীয় রোগ আছে। অথবা উচ্চ রক্তচাপ যাদের বংশগত রোগ।

Kali phosphoricum : ক্যালি ফস উচ্চ রক্তচাপের একটি সেরা ঔষধ। বিশেষত এটি দীর্ঘদিন না খেয়ে উচ্চ রক্তচাপ স্থায়ীভাবে সারানোর আশা করাই অমূলক। মাঝে মাঝে সপ্তাহ খানেক বিরতি দিয়ে দীর্ঘদিন খান। হৃদপিন্ড, স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের উপর ইহার প্রশান্তিকারক ক্রিয়া বিদ্যমান। তাছাড়া যেহেতু এটি একটি ভিটামিন জাতীয় ঔষধ, তাই ইহার কোন ক্ষতিকর সাইড-ইফেক্ট নাই বললেই চলে।

## Gangrene (গ্যাংগ্রিন, মাংসের পচন) :-

সেদিন দেখলাম এক ভদ্রলোক তার সরকারী চাকুরি আরো সাত বছর বাকী থাকতেই পায়ের গ্যাংগ্রিনের কারণে স্বেচ্ছায় পেনশানে চলে গেলেন। ডায়াবেটিস রোগীদের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো পায়ের আলসার বা ক্ষত-ঘা। সাধারণত নতুন জুতা ব্যবহার করতে গিয়ে প্রায়ই তাদের পায়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে যায়। দীর্ঘদিন ডায়াবেটিসে ভোগার ফলে যাদের রোগ প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাদের ঘা আর শুকায় না বরং সেটি গ্যাংগ্রিনে পরিণত হয়। সহজ কথায় গ্যাংগ্রিন মানে হলো পঁচন। সাধারণত শরীরের কোন স্থানে ঠিক মতো রক্ত সাপ্লাই না হলে সেখানকার টিস্যু বা মাংস পচেঁ যায়। প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতিতে এর কোন ভালো চিকিৎসা নাই।

অপারেশন করে কেটে ফেলাই তাদের একমাত্র চিকিৎসা কিন্তু অপারেশনে গ্যাংগ্রিন তো সারেই না; বরং ধীরে ধীরে তা আরো মারাত্মক আকার ধারণ করতে থাকে। এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা গ্যাংগ্রিন হলে প্রথমে আঙ্গুল কেটে ফেলে দেয়। তারপর গ্যাংগ্রিন যখন আরো বাড়তে থাকে, তখন ডাক্তাররা পায়ের গোড়ালী পযর্ন্ত কেটে ফেলে দেয়। তারপর হাটু পযর্ন্ত এবং শেষে কোমর পযর্ন্ত কেটে ফেলে দেয়। এই ধরণের বর্বর চিকিৎসার কারণে গ্যাংগ্রিনের যে-কোন রোগী সাধারণত অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

অথচ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় বিনা অপারেশনে শুধু ঔষধের মাধ্যমে গ্যাংগ্রিন খুব সহজেই নিরাময় করা যায়। কিন্তু না জানার কারণে গ্যাংগ্রিনের এসব অসহায় রোগীদের অনেকেই হোমিও চিকিৎসা করাতে আসেন না। আমাদের সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, ছুরি-চাকু দিয়ে কখনও রোগ সারানো যায় না। অপারেশনের মাধ্যমে কেবল রোগের ফলটা কিছু দিনের জন্য দূর করা যায় ঠিকই কিন্তু এতে মূল রোগটির গায়ে সামান্য ফুলের আচড়ও লাগে না। ফলে মূল রোগটি কিছুদিন পরপর বার বার ফিরে আসতে থাকে। যেহেতু অপারেশনের ফলে রোগী দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে, ফলে রোগীর দুর্বলতার সুযোগে মূল রোগটিও দিন দিন শক্তিশালী হতে থাকে। অজ্ঞতার কারণে ডায়াবেটিস রোগীরা চিকিৎসার নামে যে কতো রকমের বর্বরতা এবং ব্যবসায়িক ফন্দির অসহায় শিকারে পরিণত হয়, তা ভাবলে সত্যি বিবেক দংশন করতে থাকে ।

গ্যাংগ্রিন মানে হলো শরীরের কোন একটি অংশে রক্ত সরবরাহ না থাকার কারণে সেখানকার মাংস পঁচে যাওয়া। ইহা যদিও শরীরের যে-কোন স্থানে দেখা দিতে পারে, তথাপি গ্যাংগ্রিন সবচেয়ে বেশী দেখা দেয় হাতের এবং পায়ের আঙুলে। রক্তনালীর রোগ, বড় ধরণের এক্সিডেন্ট, মাত্রাতিরিক্ত টাইট ব্যান্ডেজ, ডায়াবেটিস প্রভৃতি কারণে গ্যাংগ্রিন হয়ে থাকে। ইদানীং ডায়াবেটিস রোগী বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্যাংগ্রিনের রোগীও বৃদ্ধি পেয়েছে। এলোপ্যাথিতে এই রোগের কোন চিকিৎসা নাই বিধায় এবং হোমিও চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায়, গ্যাংগ্রিনের রোগীরা সাধারণত অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা পায়ের আঙুলে গ্যাংগ্রিন হলে প্রথমে আঙুল কেটে ফেলে দেয়, তারপর গ্যাংগ্রিন আরেকটু অগ্রসর হলে পায়ের গোড়ালী পযর্ন্ত কেটে ফেলে, তারপর হাটু পযর্ন্ত কাটে এবং শেষে কোমর পযর্ন্ত কেটে ফেলে।

এভাবে বারবার অপারেশনের ধাক্কায় রোগীরা অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। অথচ উপযুক্ত হোমিও চিকিৎসা অবলম্বন করলে অপারেশন ছাড়াই এই রোগ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূল করা যায়। একজন হোমিও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যদি চেষ্টা করেন, তবে মাত্র পাঁচ টাকার ঔষধেই যে-কোন গ্যাংগ্রিনের রোগীকে সারিয়ে দিতে পারেন। অথচ এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় গ্যাংগ্রিন তো সারেই না, তারপরও রোগীরা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে পথের ভিখারীতে পরিণত হয়।

Arsenicum album : গ্যাংগ্রিনে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত ঔষধ হলো আর্সেনিক। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **ছুরি মারার মতো ভয়ঙ্কর ব্যথা, আক্রান্ত স্থান কালচে রঙ ধারণ করে, ভীষণ জ্বালাপোড়া ভাব,** অস্থিরতা, ওজন কমে যাওয়া, ভীষণ দুর্বলতা ইত্যাদি। ব্যথা সাধারণত মধ্যরাতে বৃদ্ধি পায় এবং গরম শেক দিলে কমে যায়। রোগী মৃত্যুর ভয়ে কাতর হয়ে পড়ে। সাধারণত উচ্চ শক্তিতে খাওয়া উচিত এবং বিনা প্রয়োজনে ঘনঘন খাওয়া উচিত নয়।

Lachesis : ল্যাকেসিস গ্যাংগ্রিনের আরেকটি শ্রেষ্ট ঔষধ। সাপের বিষ থেকে তৈরী এই ঔষধটির প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **আক্রান্ত স্থান নীলচে অথবা বেগুনি রঙ ধারণ করে**, অল্প একটু কাটা থেকে প্রচুর রক্ত যায়, বেশী ভাগ ক্ষেত্রে **রোগ প্রথমে শরীরের বাম পাশে আক্রমণ করে এবং সেখান থেকে ডান পাশে চলে যায়**, সাংঘাতিক ব্যথার কারণে আক্রান্ত স্থান স্পর্শই করা যায় না, **ঘুমের মধ্যে রোগের মাত্রা বৃদ্ধি পায়**, বেশী বেশী কথা বলে, হিংসুটে স্বভাবের ইত্যাদি ইত্যাদি।

Crotalus Horridus : এটি শরীরের ভিজা অংশের গ্যাংগ্রিনে প্রায়ই কাজে লাগে ; যেমন জিহ্বা, টনসিল ইত্যাদিতে। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **দাঁতের মাড়ি-নাক-পাকস্থলী-ফুসফুস-মুত্রনালী-জরায়ু ইত্যাদি থেকে রক্ত ক্ষরণ**, এমনকি পশমের গোড়া থেকেও রক্ত ক্ষরণ হয়, ঘনঘন জন্ডিসে ভোগে, মুখমন্ডল ফোলাফোলা, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, রোগ প্রথমে শরীরের ডান পাশে আক্রমণ করে ইত্যাদি।

Secale cornutum : বৃদ্ধ বয়সের গ্যাংগ্রিনে এটি বেশী ফলপ্রদ। মৌমাছির হুল ফোটানোর মতো ব্যথা এবং **গরমে সব সমস্যা বৃদ্ধি পায় আর ঠান্ডা প্রয়োগে আরাম লাগে**। চামড়া থাকে কুচঁকানো এবং শুকনো। আক্রান্ত অঙ্গ থাকে ঠান্ডা কিন্তু কাপড়-চোপড় দিয়ে আবৃত করা সহ্য হয় না। ক্ষুধা থাকে খুবই বেশী এবং সামান্য একটি ক্ষত থেকে পাঁচ-সাত দিন পযর্ন্ত রক্ত ঝরতে থাকে।

Carbo vegetabilis : বার্ধক্যজনিত গ্যাংগ্রিন, লালচে-বেগুনি রঙের, আক্রান্ত অঙ্গ বরফের মতো ঠান্ডা। দীর্ঘদিন রোগ ভোগার কারণে দুর্বল-অবসন্ন হওয়া রোগী, **পেটে প্রচুর গ্যাস হয়, জীবনীশক্তি ক্ষয় পাওয়া কংকালসার ব্যক্তি, খোলা বাতাসের জন্য পাগল** ইত্যাদি ইত্যাদি লক্ষণে কার্বো ভেজ প্রযোজ্য।

Arnica montana : সাধারণত আঘাত পাওয়ার পরে সেই স্থানে গ্যাংগ্রিন দেখা দিলে তাতে আর্নিকা সেবন করা উচিত।

Silicea : সিলিসিয়া ঔষধটি যাদের হাড়ের বৃদ্ধিজনিত সমস্যা আছে অর্থাৎ রিকেটগ্রস্থ লোকদের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে। এই ঔষধে **মেরুদন্ডের সাথে সম্পর্কিত কোন না কোন রোগ লক্ষণ থাকবেই**। সিলিশিয়ার রোগীরা হয় শীতকাতর, রিকেটগ্রস্থ, এদের জন্মগত হাড়ের সমস্যা থাকে, মারাত্মক ধরণের বাতের সমস্যা থাকে, অমাবশ্যা-পূর্ণিমায় রোগের মাত্রা বেড়ে যায়, **মনের জোর বা আত্মবিশ্বাস কমে যায়** ইত্যাদি ইত্যাদি। সিলিশিয়ার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো শরীর বা মনের জোর কমে যাওয়া, আঙুলের মাথায় শুকনা শুকনা লাগা, আলো অসহ্য লাগা, **কোষ্টকাঠিন্য,** ঘনঘন মাথা ব্যথা হওয়া, চোখ থেকে পানি পড়া, মুখের স্বাদ নষ্ট হওয়া, মাংস-চর্বি জাতীয় খাবার অপছন্দ করা, **আঙুলের মাথা অথবা গলায় আলপিন দিয়ে খোচা দেওয়ার মতো ব্যথা**, পাতলা চুল, **অপুষ্টি** ইত্যাদি। সিলিশিয়ার পুঁজ থাকে পানির মতো পাতলা।

## Headache, Migraine (মাথা ব্যথা, শিরশূল, অর্ধেক মাথাব্যথা) :

মাথা ব্যথা অনেক রকমের আছে, এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা এদের অনেক রকমের সুন্দর সুন্দর নাম দিয়েছেন (migraine, hemicrania, histamine headache, sick headache, sinus headache, tension headache, cluster headache, school girl headache)। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে নাম দিয়ে কাম নাই। লক্ষণ এবং কারণ অনুযায়ী ঔষধ নির্বাচন করতে হবে।

Melilotus alba : মাথাব্যথার এক নাম্বার ঔষধ হলো Melilotus alba (শক্তি ৩,৬,১২,৩০,২০০) বিশেষত যখন মাথায় অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চয়ের (congestion) কারণে মুখ জ্বলজ্বলে লাল রঙ ধারণ করে এবং গলার দুপাশের রক্তবাহী ধমনী দপদপ করতে থাকে।

Lycopodium : মাথাধরার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুইটি ঔষধ হলো Lycopodium এবং Silicea। যদি মাথা ঢেকে রাখলে ভালো লাগে তবে Silicea (শক্তি ৩,৬,১২,৩০,২০০) খান আর যদি মাথা খোলা রাখলে আরাম লাগে তবে Lycopodium (শক্তি ৩,৬,১২,৩০,২০০) দশ/বিশ মিনিট পরপর খেতে থাকুন।

Glonoine : দীর্ঘক্ষণ রৌদ্রে থাকার কারণে অথবা গরমে থাকার কারণে কিংবা হাই পাওয়ারের ভালবের নীচে কাজ করার কারণে মাথাধরায় Glonoine (শক্তি ৩,৬,১২,৩০,200) কিছুক্ষণ পরপর খেতে থাকুন।

Belledonna : যে-কোন ধরনের মাথাব্যথাই হোক না কেন, Melilotus alba এবং Belledonna ঔষধ দুটি একত্রে মিশিয়ে খেতে থাকুন নিশ্চিত যাবে।

Ruta graveolans : চোখের অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে মাথাধরায় Ruta graveolans (শক্তি ৩,৬,১২,৩০) খান।
Ipecac : মাথাব্যথার সাথে বমিবমি ভাব থাকলে Ipecac (শক্তি ৩,৬,১২,৩০) অব্যর্থ।

Coffea cruda : দুঃশ্চিন-া বা মানসিক উত্তেজনার কারণে মাথা ব্যথায় Coffea cruda (শক্তি ৩,৬,১২,৩০) খান।

Tabacum : ধূমপানের কারণে মাথাব্যথা হলে Tabacum অথবা China খেতে পারেন।

মাথা ব্যথার সাথে ঘুমঘুম ভাব থাকলে ষ্ট্রিকনিন, নেট্রাম সালফ, জেলসিমিয়াম, নাক্স মস্কেটা প্রযোজ্য।

Belladonna : **যে-কোনো তীব্র ব্যথা যতক্ষণই থাকুক না কেন, যদি হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলে যায়,** তবে বেলেডোনা ঔষধটি খেতে থাকুন।

Ignatia amara : দুঃসংবাদ শোনার পরে অথবা বিরহ-বিচ্ছেদ-ছ্যাকা খাওয়ার কারণে, মনে কষ্ট পাওয়ার কারণে মাথা ব্যথা হলে ইগ্নেশিয়া খেতে হবে।

Chamomilla : যদি মাথা ব্যথা বা অন্য কোন ব্যথার তীব্রতায় কোন রোগী দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূণ্য হয়ে পড়ে, তার ভদ্রতাজ্ঞানও লোপ পেয়ে যায়, সে ডাক্তার বা নার্সকে পর্যন্ত গালাগালি দিতে থাকে; তবে তাকে ক্যামোমিলা খাওয়াতে হবে। ক্যামোমিলা হলো অভদ্র রোগীদের ঔষধ। শিক্ষকদের হাতে শিশুরা মার খাওয়ার ফলে এবং কোন কারণে ভীষণ রেগে যাওয়ার ফলে পেট ব্যথা শুরু হলে ক্যামোমিলা খাওয়াতে হবে। যারা ব্যথা একদম সহ্য করতে পারে না, ক্যামোমিলা হলো তাদের ঔষধ। ব্যথার সময় গাল গরম হয়ে যায়, মুখ লাল হয়ে যায় এবং ঘামতে থাকে।

China officinalis : ব্যথা যদি নির্দিষ্ট সময় পরপর একেবারে ঘড়ির কাটা কাটায় আসে, তবে তাতে চায়না প্রযোজ্য। পেটে প্রচুর গ্যাস হয় ।

Magnesia phosphorica : বিজলীর মতো মাথা ব্যথা, একবার আসে একবার যায়। ব্যথা চাপ দিলে এবং গরম শেক দিলে কমে। ঠান্ডা বাতাসে বা ঠান্ডা পানি লাগলে ব্যথা বৃদ্ধি পায়। ম্যাগ ফস স্নায়বিক ব্যথার এক নম্বর ঔষধ। **ইহার ব্যথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছুড়ি মারা অথবা চিড়িক মারা ধরণের মারাত্মক ব্যথা।** আক্রান্ত অঙ্গকে মনে হবে কেউ যেন লোহার হাত দিয়ে চেপে ধরেছে।

Pulsatilla : গুরুপাক খাবার অর্থাৎ তেল-চর্বি জাতীয় খাবার খাওয়ার কারণে মাথা ব্যথা হলে পালসেটিলা খাওয়াতে হবে।

Bryonia alba : মাথা ব্যথা, জয়েন্টের ব্যথা, হাড়ের ব্যথা, মাংশের ব্যথা, বুকের ব্যথা, বাতের ব্যথা প্রভৃতিতে ব্রায়োনিয়া সেবন করতে পারেন যদি সেই ব্যথা নড়াচড়া করলে বেড়ে যায়। ব্রায়োনিয়ার লক্ষণ হলো আক্রান্ত অঙ্গ **যত বেশী নড়াচড়া করবে, ব্যথা তত বেশী বৃদ্ধি পেতে থাকে**।

Chamomilla : যদি ব্যথার তীব্রতায় কোন রোগী দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূণ্য হয়ে পড়ে, **তার ভদ্রতাজ্ঞানও লোপ পেয়ে যায়, সে ডাক্তার বা নার্সকে পর্যন্ত গালাগালি দিতে থাকে;** তবে তাকে ক্যামোমিলা খাওয়াতে হবে। ক্যামোমিলা হলো অভদ্র রোগীদের ঔষধ।

Colchicum autumnale : **কলচিকামের প্রধান লক্ষণ হলো খাবারের গন্ধে বমি আসে এবং আক্রান্ত অঙ্গের জোর/শক্তি কমে যায়।**

Kali bichromicum : ক্যালি বাইক্রোম প্রধান লক্ষণ হলো **ব্যথা আঙুলের মাথার মতো খুবই অল্প জায়গায় হয়ে থাকে, ব্যথা ঘন ঘন জায়গা বদল করে, কফ-থুতু-নাকের শ্লেষ্মা খুবই আঠালো হয় এবং টানলে রশির মতো লম্বা হয়ে যায়** ইত্যাদি ইত্যাদি।

Pulsatilla pratensis : পালসেটিলা'র ব্যথার প্রধান লক্ষণ হলো **ব্যথা ঘনঘন স্থান পরিবর্তন করে**। আজ এক জায়গায় তো কাল অন্য জায়গায় কিংবা সকালে এক জায়গায় তো বিকালে অন্য জায়গায়।

Lac caninum : ল্যাক ক্যান-এর ব্যথার প্রধান লক্ষণ হলো **ব্যথা ঘনঘন সাইড/ পার্শ্ব পরিবর্তন করে**। আজ ডান পাশে তো কাল বাম পাশে কিংবা সকালে সামনের দিকে তো বিকালে পেছনের দিকে।

Spigelia anthelmia : স্পাইজেলিয়া মাথা ব্যথার শ্রেষ্ট ঔষধগুলির একটি। **মাথার বাম দিকের ব্যথায় এটি ভালো কাজ করে**। তার মানে এই নয় যে, ডানদিকের ব্যথায় বা সামনে-পেছনের-উপরের ব্যথায় কাজ করবে না। ব্যথা সাধারণত খুবই মারাত্মক হয়ে থাকে। **চেপে ধরার মতো, ছুড়ি মারার মতো, সুই ফোটানোর মতো, জ্বালাপোড়া থাকতে পারে, ছিড়ে ফেলার মতো**। মাথা ব্যথার সাথে সাথে চোখ, মুখ, দাত এবং হৃদপিন্ডের ব্যথাতেও এটি একটি সেরা ঔষধ। **এই ঔষধের দুইটি অদ্ভুত লক্ষণ হইল ব্যথার সাথে ডায়েরিয়া শুরু হয় এবং আলপিন বা এই রকম চৌকো/সূচালো জিনিসকে ভয় পায় (fear of pointed things as pins)** । ব্যথা নীচের থেকে উপরের দিকে যায়। এটি গলগন্ডের (exophthalmic goitre) একটি শ্রেষ্ট ঔষধ। এটি কৃমিরও সমস্যা এবং বাতের সমস্যাতেও এটি দারুণ কাজ করে। **দুর্গন্ধযুক্ত নিঃশ্বাস এবং দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু ত্যাগ করা স্পাইজেলিয়া দুইটি বড় লক্ষণ।** স্পাইজেলিয়াকে বলা হয় সূর্য মার্কা ঔষধ (sun remedy) ; কারণ ইহার রোগ সূর্য ওঠলে শুরু হয় এবং **সূর্য যত উপরে উঠতে থাকে রোগের মাত্রা তত বাড়তে থাকে, তারপর সূর্য যত নীচে নামতে থাকে, রোগের মাত্রা তত কমতে থাকে।** সূর্য মার্কা আরেকটি ঔষধ হলো নেট্রাম মিউর (Natrum muriaticum) । স্পাইজেলিয়া মূলত হৃদরোগের ঔষধ। এটি তোতলামিরও (Stammering) একটি প্রধান ঔষধ যারা প্রথম শব্দটি তিন / চার বার উচ্চারণ করে। সে যাক, ওপরের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলো থাকলে যে-কোন রোগে স্পাইজেলিয়া খাওয়াতে পারেন।

Bacillinum : মাইগ্রেন বা এই জাতীয় মারাত্মক মাথা ব্যথার একটি মূল কারণ হলো বিসিজি টিকা ()। যদি রোগীর যক্ষা বা হাঁপানি রোগের পারিবারিক / বংশগত ইতিহাস থাকে অথবা ঘনঘন সর্দি-কাশি হওয়ার অভ্যাস থাকে অথবা বিসিজি টিকা নিয়ে থাকেন, তবে ব্যাসিলিনাম ১০০০ শক্তিতে (Bacillinum 1M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান, তার তিন মাস বিরতির পরে ব্যাসিলিনাম ১০,০০০ শক্তিতে (Bacillinum 10M) এক মাত্রা

(অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান এবং তারও তিন মাস বিরতির পরে ব্যাসিলিনাম ৫০,০০০ শক্তিতে (Bacillinum 50M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান।

Thuja occidentalis : **টিকা (বিসিজি, ডিপিটি, এটিএস, পোলিও, হেপাটাইটিস, এটিএস ইত্যাদি) নেওয়ার কারণে ব্যথা হলে থুজা খেতে হবে**। শতকরা ৯৯ ভাগ মাথা ব্যথার কারণ টিকা (vaccine)। কাজেই যারা অতীতে বিভিন্ন রকমের টিকা নিয়েছেন, তাদেরকে অবশ্যই উচ্চ শক্তিতে দুই / তিন মাত্রা থুজা খাওয়া উচিত। যারা টিকা নেন নাই, তাদেরও থুজা খাওয়া উচিত। আপনি না নিলেও হয়ত আপনার পিতা-মাতা অথবা ছেলে-মেয়ে-নাতি-নাতনীরা নিয়েছে। কারণ টিকার ক্ষতি কয়েক জেনারেশান পর্যন্ত চলে যায়। টিকা নেওয়ার কারণে শরীরের বিভিন্ন স্থানে চিড়িক মারা ব্যথা (neuralgia, sciatica) অর্থাৎ স্নায়বিক ব্যথা হয় এবং বার্নেটের মতে থুজা হলো ইহার শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

**Hemorrhage, Bleeding (রক্তক্ষরণ, রক্তপাত)** ঃ- রক্তক্ষরণের চিকিৎসাতে রক্তক্ষরণের কারণ, রক্তক্ষরণের ধরন, রক্তক্ষরণের লক্ষণ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে ঔষধ নিবার্চন করতে হবে। পাশাপাশি রক্তক্ষরণের ফলে রোগীর কি ধরনের বিপদ হতে পারে বা কত দ্রুত সে বিপদে পড়তে পারে, তার ওপর ভিত্তি করে ঔষধ ধীরে ধীরে অথবা ঘনঘন খাওয়াতে হবে ।

☆ কেটে গিয়ে বা অন্যকোন কারণে হাত, পা, দাঁত, নাক প্রভৃতি স্থান থেকে রক্তক্ষরণ হলে তা বন্ধ করতে Calendula Officinalis অথবা Trillium (শক্তি কিউ,৩,৬) তুলায় নিয়ে বাহ্য প্রয়োগ করুন।

☆ শরীরের কোথাও থেকে বেশী লাল রক্তপাত হলে Millefolium ঔষধটি দশ/বিশ মিনিট পরপর খেতে থাকুন।

☆ অন্যদিকে কালো রক্তপাত হলে Hamamelis Virginica ঔষধটি দশ/বিশ মিনিট পরপর খেতে থাকুন।

☆ নাক থেকে রক্তক্ষরণ হলে ক্যালেন্ডুলা (Calendula Officinalis) তুলায় ভিজিয়ে নাকে ঢুকিয়ে দিন। পাশাপাশি নাকের ওপর বরফ ঘষতে পারেন।

☆ দাঁত ওঠানো পরে রক্তক্ষরণ হলে Phosphorus (শক্তি ৬,১২,৩০) দশ/বিশ মিনিট পরপর খেতে থাকুন। দাঁত ওঠানোর পূর্বে কয়েক মাত্রা মিলিফোলিয়াম অথবা আর্নিকা (শক্তি ৩০,২০০) খেয়ে নিলে রক্তপাত হবে না।

☆ আঘাতের কারণে যদি রক্তপাত হয় সেক্ষেত্রে প্রথমে অবশ্যই কয়েক মাত্রা Arnica (শক্তি ৩০,২০০) খেয়ে নিবেন।

☆ সন্তান প্রসবের পরবর্তী রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে মিলিফোলিয়াম তিন ঘণ্টা পরপর খাওয়াতে থাকুন আর রক্তক্ষরণ প্রতিরোধের জন্য প্রসবের পূর্বেই দু'তিন মাত্রা Millefolium খেয়ে নিতে পারেন। প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণের কারণ যেহেতু আঘাত, তাই এতে আরনিকা ঔষধটিও ভাল কাজ করে।

☆ রক্তের রঙ যদি হয় উজ্জ্বল লাল এবং রক্তক্ষরণের সাথে যদি বমি বমি ভাব থাকে, তবে তাতে ইপিকাক Ipecac খাওয়াতে হবে।

☆ রক্তক্ষরণের সাথে যদি রোগী সাংঘাতিকভাবে মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে, তবে তাতে একোনাইট (Aconitum napellus) খাওয়াতে হবে।

☆ Hamamelis Virginica হলো শিরা থেকে (কালচে) রক্তক্ষরণের জন্য আর Millefolium হলো ধমনী থেকে (লালচে) রক্তক্ষরণের জন্য প্রযোজ্য।

☆ জেরানিয়াম (Geranium maculatum) ঔষধটিও রক্তপাত বন্ধে এক সেরা ঔষধ। এটি প্রধানত ফুসফুল, পাকস্থলী এবং জরায়ু থেকে রক্তক্ষরণে ব্যবহৃত হয়। এটি সেবনে পাতলা রক্ত ধীরে ধীরে গাঢ় হতে থাকে এবং জমাট বাধতে শুরু করে।

☆ ডাঃ জর্জ রয়েলের মতে, ট্রিলিয়াম (Trillium pendulum) ঔষধটি জরায়ুতে টিউমারের (uterine fibroid) কারণে রক্তক্ষরণ হওয়া বন্ধ করে এবং পাশাপাশি টিউমারের বৃদ্ধি ঠেকাতে পারে এবং টিউমারকে নির্মূল (absorb) করে দিতে পারে। ট্রিলিয়াম প্রধানত রক্তক্ষরণের ঔষধ ; তাই দাঁত-নাক থেকে রক্তক্ষরণে এবং কফ-পায়খানার সাথে রক্ত গেলে তাতেও ট্রিলিয়াম ব্যবহার করতে পারেন।

## Head injury (মাথায় আঘাত পাওয়া) :-

গাড়ি দুর্ঘটনা বা বিভিন্নভাবে মানুষ মাথায় আঘাত পেয়ে থাকে। এমনকি শিশুরা জন্মের সময়ও মাথায় আঘাত পেতে পারে- মাথার আকৃতি বড় হওয়ার কারণে অথবা প্রসবের রাস্তা সরু হওয়ার কারণে (ফোরসেপ দিয়ে মাথা চেপে ছোট করে বের করার কারণে)। সে যাক, মাথায় আঘাত পাওয়ার কারণে সাথে সাথে অথবা ধীরে ধীরে অনেক দিন পরে সেই ব্যক্তি অনেক জটিল রোগে আক্রান্ত হতে পারে। যেমন- আংশিক বা সম্পূর্ণ শরীর প্যারালাইসিস হওয়া, অন্ধ হওয়া, বোবা হয়ে যাওয়া, বিভিন্ন ধরণের মানসিক রোগ হওয়া ইত্যাদি। হোমিওপ্যাথিক Natrum Sulphuricum ঔষধটি আপনাকে মাথায় আঘাতজনিত যে-কোন শারীরিক বা মানসিক রোগ থেকে রক্ষা করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। মাথায় আঘাত পাওয়ার ফলে শরীরে বা মনে কোন রোগ লক্ষণ দেখা দেওয়া মাত্র Natrum Sulphuricum উচ্চ শক্তিতে (১০,০০০) সপ্তাহে একবার করে তিন মাত্রা খান।

## Heart diseases, Cardiac disease (হৃদরোগের চিকিৎসা) :

আমাদের দেশের মানুষ যে দুটি রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে পথের ভিখারীতে পরিণত হয়, তার একটি হলো ক্যান্সার এবং অন্যটি হলো হৃদরোগ বা হার্ট ডিজিজ। অথচ অন্যান্য জটিল রোগের মতো হৃদরোগের চিকিৎসাতেও হোমিও ঔষধ শ্রেষ্টত্বের দাবীদার। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থের কারণে প্রতিহিংষা বশত হোমিওপ্যাথি সম্পর্কে নানা রকমের বদনাম ছড়ায়। তারমধ্যে একটি বড় অপপ্রচার হলো হোমিও ঔষধ দেরীতে কাজ করে। অথচ হাই ব্লাড প্রেসার, ডায়ারেটিস, মাইগ্রেন, হৃদরোগ, কোষ্টকাঠিন্য, গ্যাসট্রিক আলসার প্রভৃতি অনেক রোগের জন্য মানুষেরা পঞ্চাশ বছরও এলোপ্যাথিক ঔষধ খেয়ে পুরোপুরি রোগমুক্ত হতে পারে না। দুর্ভাগ্যজনক হলো তারপরও কেউ বলে না যে, এলোপ্যাথিক ঔষধ বিলম্বে কাজ করে। হোমিওপ্যাথি সম্পর্কে প্রচলিত বদনামগুলির মার্কেট পাওয়ার একটি মুল কারণ হলো নামডাকওয়ালা দক্ষ হোমিও চিকিৎসকের যথেষ্ট অভাব ; বলা যায় খুবই অভাব। হোমিও চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের হৃদরোগ চিকিৎসায় সফলতার বিবরণী পড়লে হতাশ প্রাণে আশার আলো দেখা দেয়।

হার্টের রক্তনালীতে চর্বি জমা (heart block), হার্টে রিং লাগানো, হার্টের ভাল্ব নষ্ট হওয়া, হার্টে ছিদ্র হওয়া, হার্টের বাইপাস সার্জারী, ওপেন হার্ট সার্জারী, হার্টে পেসমেকার (pacemaker) লাগানোর মতো জটিল হৃদরোগও হোমিওপ্যাথিতে বিনা অপারেশনে স্রেফ ঔষধেই নিরাময় করা যায়। এক কথায় বলা যায়, মহাপরাক্রমশালী হোমিও

ঔষধের কাছে হৃদরোগ একেবারে তুচ্ছ। হোমিওপ্যাথি আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে, রোগ এবং রোগের কারণ থাকে মানুষের শক্তি স্তরে (Energy level) যাকে জীবনীশক্তি (Vital force) বলা হয়। পক্ষান্তরে শরীরে এবং মনে আমরা রোগ নামে যাকিছু দেখি, এগুলো আসলে রোগ নয় বরং রোগের ফলাফল মাত্র। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, যেহেতু রোগ এবং রোগের কারণ থাকে মানুষের শক্তি স্তরে (energy level) ; কাজেই রোগ নিরাময়কারী ঔষধকেও হতে হবে শক্তি ঔষধ (Energy medicine)। কেননা শক্তিই কেবল শক্তির ওপর প্রভাব বিসতার (influence) করতে পারে, পরিবর্তন (modification) করতে পারে। ক্রুড মেডিসিন কখনও জীবনীশক্তিকে সপর্শ করতে পারে না। যেহেতু জীবনীশক্তি একটি রহস্যময় শক্তি। হোমিও ঔষধ যেহেতু লক্ষ লক্ষ বার ঘর্ষণ (trituration) এবং ঝাঁকুনির (succussion) মাধ্যমে তৈরী করা হয়, সেহেতু এগুলো শক্তিতে (energy) পরিণত হয়। এই দৃষ্টিতে এলোপ্যাথিক এবং অন্যান্য ঔষধকে বলা যায় অপরিশোধিত ঔষধ (crude drug)।

আমাদের জীবনী শক্তি বিকৃত (deviate) হলেই শরীর ও মনে নানারকম রোগের উৎপত্তি হয়। জীবনী শক্তি তার স্বাভাবিক পথ থেকে লাইনচ্যুত (out of track) হলেই শরীর এবং মনে ধ্বংসাত্মক (destructive) ক্রিয়াকলাপের সুচনা হয়। যেমন টিউমারের সৃষ্টি হওয়া (neoplasm), পাথর তৈরী হওয়া (calculus), ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাসের আক্রমণ (germ infection), কোন অঙ্গ সরু হওয়া (atrophy), কোন অঙ্গ মোটা হওয়া বা ফুলে যাওয়া (hypertrophy) ইত্যাদি ইত্যাদি। পরবর্তীতে ঔষধের মাধ্যমে যদি আমরা জীবনী শক্তিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে (back to the track) আনতে পারি, তবে শরীর ও মনে আবার বিপরীতমুখী ক্রিয়ার (reverse action), মেরামতকরণ (reconstructive) ক্রিয়া আরম্ভ হয়। আমাদের শরীর তখন নিজেই টিউমারকে শোষণ (absorb) করে নেয়, পাথরকে গলিয়ে (dissolve) বের করে দেয়, জীবাণুকে তাড়িয়ে দেয়, সরু এবং ফুলা অঙ্গকে স্বাভাবিক করে দেয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এভাবে ঔষধ প্রয়োগে জীবনীশক্তিকে উজ্জীবিত করার মাধ্যমে শরীরের নিজস্ব রোগ নিরাময় ক্ষমতাকে ব্যবহার করে রোগমুক্তি অর্জন করাই হলো প্রাকৃতিক (natural) এবং সঠিক পদ্ধতি।

হৃদপিন্ডে (heart) ছুরি-চাকু চালানো, স্টিলের রিং লাগানো, বৈদ্যুতিক ব্যাটারী লাগানো ইত্যাদি কখনও সঠিক চিকিৎসা হতে পারে না। কারণ এতে রোগের ফলাফলটা কিছুদিনের জন্য চলে গেলেও, রোগের কারণটা কিন্তু ঠিকই রয়ে যায়। ফলে সেটি ভেতরে ভেতরে অন্য রোগ সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করে। আপনার হার্টের কোন রক্তনালীতে চর্বি জমে ব্লক হয়ে গেলো আর আপনি অপারেশন করে তাতে লোহার পাইপ বসিয়ে দিলেন। এতে আপনি একটি ব্লকের হাত থেকে বেঁচে গেলেন সত্য কিন্তু যে-কারণে ব্লকটি সৃষ্টি হয়েছিল, সেটি ত রয়েই গেলো। ফলে কিছুদিন পরপর একটার পর একটা ব্লক পড়তে থাকবে। তখন আপনি কতবার অপারেশন করে লোহার পাইপ (ring) বসাবেন। আপনি হয়ত ভাবছেন যে, আপনার রোগটি সেরে গেছে। আসলে এতে আপনার আয়ু হ্রাস পেয়েছে চল্লিশ বছর। হৃৎপিন্ড এবং ব্রেন মানুষের সবচেয়ে সেনসেটিভ অঙ্গ। এগুলোতে ছুরি চালানো এবং লোহা-লক্কড় ফিট করে দেওয়া চরম নির্বুদ্ধিতা। হৃদপিন্ডের যেখানে নিজের বোঝাই বহন করার ক্ষমতা নাই, সেখানে আপনার ফিট করা লোহা-লক্কড়ের বোঝা সে কতদিন বইতে পারবে ?
এতে পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে আপনার হার্ট ফেইল করে কবরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে নিরানব্বই ভাগ। আমার পরিচিত একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের কথা মনে পড়ছে, যাকে হার্টের ডাক্তাররা বিশ বছর পূর্বে হার্টের ব্লকের (block) জন্য রিং লাগানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি আজ পর্যন্ত রিং লাগান নাই। এলোপ্যাথিক ঔষধ খেয়ে এবং নিয়ম-কানুন মেনে চলে বিশ বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। বাস্তবে দেখা যায়, ডাক্তাররা রোগীদেরকে দেয় এক

রকম পরামর্শ আর নিজেরা চলেন অন্যভাবে। রোগীদেরকে বলেন, "তাড়াতাড়ি অপারেশন করেন, সারাজীবন ঔষধ চালিয়ে যেতে হবে" ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু নিজেরা পারতপক্ষে অপারেশান বা ঔষধের নিকটবর্তী হন না।

একবার একজন মহৎপ্রাণ শিশু বিশেষজ্ঞের নিকট শুনেছিলাম যে, এক বছরের একটি শিশুকে তার নিকট চিকিৎসার জন্য আনা হয়েছিল যার হার্টে একটি ছিদ্র (hole) ধরা পড়েছে। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা এক মাস পরে তার হার্টে অপারেশন করে ছিদ্র বন্ধ করার তারিখ দিয়েছেন। ভদ্রলোক ভাবলেন, শিশুটিকে কিভাবে অপারেশনের হাত থেকে বাঁচানো যায় এবং শিশুটির দরিদ্র অভিভাবকদের এতগুলো টাকা কিভাবে বাচাঁনো যায় ? তিনি ভাবলেন, শিশুটি তার মায়ের পেটে যখন বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তখন নিশ্চয় কোন ত্রুটির কারণে হৃদপিন্ডের এই স্থানের মাংস বৃদ্ধি পায় নাই এবং এখানে একটি ছিদ্র রয়ে গেছে। যেহেতু চিনি বা মিষ্টি জাতীয় খাবারে তাড়াতাড়ি মাংস বৃদ্ধি পায়, তাই তিনি শিশুটিকে বেশী বেশী করে গ্লুকোজ (glucose) খাওয়ানোর পরামর্শ দিলেন। একমাস গ্লুকোজ খাওয়ানোর ফলে দেখা গেলো চারপাশের মাংস বৃদ্ধি পেয়ে শিশুটির হার্টের ছিদ্র বন্ধ গেছে। ফলে শিশুটি অপারেশনের হাত থেকে বেচেঁ গেলো। এভাবে আমাদের শরীরকেই প্রথমে সুযোগ দিতে হবে তার নিজেকে মেরামত করার জন্য। কেননা আমাদের শরীর নিজেই হলো তার নিজের সবচেয়ে বড় ডাক্তার।

উচ্চ রক্তচাপ (high blood pressure) সহ যাবতীয় হৃদরোগের একটি মূল কারণ হলো মনকে বেশী বেশী খাটানো (অর্থাৎ টেনশান করা) এবং শরীরকে আরামে রাখা। ফলে শরীর এবং মনের ক্রিয়াকর্মের ভারসাম্য (balance) নষ্ট হয়ে যায়। মহান আলল্লাহ পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন যে, "নিশ্চয় মানুষকে পরিশ্রম নির্ভর করে সৃষ্টি করা হয়েছে"। এজন্য মানুষকে পেটের জন্য পরিশ্রম করতে হয়, বাড়ি-গাড়ির জন্য পরিশ্রম করতে হয়, জ্ঞানার্জনের জন্য পরিশ্রম করতে হয় ; এমনকি কোন অপকর্ম করতে গেলেও আমাদেরকে পরিশ্রম করতে হয়। হ্যাঁ, সত্যি বিনা পরিশ্রমে এই জগতে কিছুই পাওয়া যায় না। আবার চিকিৎসা বিজ্ঞানও বলে যে, সুস্থ থাকতে চাইলেও আপনাকে অবশ্যই শারীরিক পরিশ্রম করতে হবে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে সুস্থ রাখার জন্য দুনিয়াতে এমন সিষ্টেম করে দিয়েছেন যে, সবাইকে একভাবে না একভাবে পরিশ্রম/ব্যায়াম করতেই হচ্ছে। শিশু-কিশোররা সারাক্ষণ খেলাধুলা, দৌড়াদৌড়ি, হুড়োহুড়ি করার মাধ্যমে শারীরিক পরিশ্রম/ব্যায়াম করছে। এই কারণে শিশু-কিশোরদের সাধারণত অসুখ-বিসুখ অনেক কম হয় (শিশু-কিশোরদের বেশীর ভাগ অসুখের মূল কারণ হলো বেশী বেশী টিকা [vaccine] নেওয়া)। যৌবনে যুবক-যুবতীরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে এবং স্বামী-স্ত্রীর দৈনন্দিন শারীরিক মিলন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শারীরিক পরিশ্রম/ব্যায়াম। এই কারণে যুবক-যুবতীদেরও সাধারণত অসুখ-বিসুখ অনেক কম হয়।

তাছাড়া আল্লাহপাক মানুষের জন্য যে নামাজ, রোজ, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন, তাও এক ধরণের উত্তম শারীরিক পরিশ্রম/ব্যায়াম। বিশেষত নামাজ যে কতো বড় একটি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যায়াম তা একজন ব্যায়াম বিশেষজ্ঞ / ফিজিওথেরাপী বিশেষজ্ঞ ছাড়া অন্য কেউ পুরোপুরি বুঝতে পারবে না। এইজন্য বেশী বেশী ব্যায়াম করার চাইতে বরং আমাদের উচিত বেশী বেশী নামাজ পড়া। ভারতীয় টিভি চেনেলগুলোতে দেখা যায়, জংলী টাইপের দাড়ি-মোচওয়ালা এক লোক নেংটি পড়ে একটি বিরাট মাঠে হাজার হাজার নারী-পুরুষকে বাদর-নৃত্যের ন্যায় নানারকমের ব্যায়াম (ইউগা) শিক্ষা দিচ্ছে। এতে কেবল শরীরই সুস্থ থাকে। অথচ মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ট শিক্ষক মহানবী (সঃ) মানুষকে এমন এক পদ্ধতিতে শ্রষ্ঠার উপাসনা শিক্ষা দিয়েছেন (নামাজ), যাতে শরীরের সাথে সাথে মানুষের আত্মাও সুস্থ থাকে। শহুরে লোকদের জীবনে প্রযুক্তির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে শারীরিক পরিশ্রম নাই বললেই চলে। কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম ছাড়া টাকা উপার্জন করা সম্ভব হলেও সুস্থ থাকা সম্ভব নয়। সাধারণত শহরের

মানুষরা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু সমস্যা হলো যখন আমাদের বয়স চল্লিশের উপরে চলে যায় ; এই বয়সে মানুষরা শিশু-কিশোরদের মতো খেলাধুলা-হুড়োহুড়িও করে না আবার স্বামী-স্ত্রীর যে শারীরিক মিলন, তাও অনেক কমে যায়। আর এই কারণেই সাধারণত চল্লিশের দিকে এসে মানুষ হৃদরোগে আক্রান্ত হতে থাকে। কৃষক, কুলি, মজুর, রিক্সাচালক ইত্যাদি পরিশ্রমের পেশায় যারা আছেন, তাদেরকে কখনও উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হতে দেখেছেন ?

এবার আমি খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে এমন কিছু কথা বলব যা এমনকি অনেক ডাক্তাররাও জানেন না। প্রথম কথা হলো আমরা প্রতিদিন যে-সব খাবার খাই, সেগুলোর মূল নির্যাস আমাদের পাকস্থলী (stomach) এবং ক্ষুদ্রান্ত-বৃহদ্রান্তের (intestine) মাধ্যমে শোষিত হয়ে রক্তের মাধ্যমে প্রতিটি কোষে কোষে পৌঁছে যায়। সেখানে নানারকমের রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্যের এসব মূল উপাদানগুলো থেকে তিনটি অক্সিজেনের পরমাণু তৈরী হয়। তার মধ্যকার দুইটি অক্সিজেন পরমাণু আমাদের শরীরের উপকারে লাগে এবং অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় একটি অক্সিজেন পরমাণূ শরীরের ক্ষতি করতে থাকে। এই কারণে যে যত বেশী খায়, সে তত বেশী বেশী রোগে আক্রান্ত হয় এবং তত কম বয়সে মৃত্যুবরণ করে। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ বা বেশী বেশী রোজা রাখা এমন একটি ব্যবস্থা যা দ্বারা আপনি উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হাঁপানি এমনকি ক্যানসার পযর্ন্ত সারিয়ে ফেলতে পারেন। এগুলো এখন একেবারেই বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত সত্য। জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ এম আর খান একদিন একটি টিভি অনুষ্টানে বলেছিলেন যে, “আমার যদি ক্ষমতা থাকত, তবে আমি সপ্তাহে দুই দিন রোজা রাখা বাধ্যতামূলক করে আইন পাশ করে দিতাম। কেননা ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ নিরাময়ে ইহার কোন তুলনা হয় না”। একই অনুষ্টানে তিনি আরও বলেছিলেন যে, “উচ্চ রক্তচাপের সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা হলো ঘন ঘন অজু করা (অর্থাৎ মুখ-হাত-পা ধৌত করার মাধ্যমে শরীরকে ঠান্ডা রাখা)”। আমি নিজেই আমার কয়েকটি দুরারোগ্য কঠিন রোগ বেশী বেশী খাদ্য নিয়ন্ত্রণের / রোজা রাখার মাধ্যমে সারিয়ে ফেলেছি। যারা রোগমুক্ত দীর্ঘজীবন লাভ করতে চান, তাদের অবশ্যই বেশী বেশী খাদ্য নিয়ন্ত্রণ / রোজা রাখা উচিত। কেউ কেউ ভাবতে পারেন যে, খাবারের পরিমাণ কমালে শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে। কিন্তু এটি একেবারেই ভুল ধারণা। আসল কথা হলো খাবার থেকে আমরা শক্তি পাই ঠিকই ; আবার এই খাবারগুলোকে হজম করতে গিয়েও আমাদের শরীরকে অনেক শক্তি খরচও করতে হয়। আসলে সবকিছুই হলো অভ্যাসের ব্যাপার। কথায় বলে, “শরীরের নাম মহাশয়, যাহা সহাবে তাহাই সয়”। তাই দেখা যায়, ফকির-দরবেশ-পীর-আউলিয়াদের জীবনী পড়লে জানা যায়, তাদের কেউ কেউ তিন দিনে একবেলা খেতেন, কেউ সাত দিনে, কেউ কুড়ি দিনে আবার কেউ চল্লিশ দিনে একবেলা আহার করতেন। তারপরও তাঁরা আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগীতে যতো কঠোর পরিশ্রম করতেন, তা আমাদের পক্ষে তিনবেলা পেট ভরে খেয়েও সম্ভব হবে না। তাদের অনেকে বলতেন যে, অনাহারে থাকলে তারা শক্তি পান এবং খেলে বরং দুর্বলতা বোধ করেন।

তাই হৃদরোগের হাত থেকে বাচাঁর জন্য বয়স চল্লিশ হওয়া মাত্রই আমাদেরকে অবশ্যই নিয়মিত পর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রম/ব্যায়াম করা শুরু করতে হবে। পাশাপাশি খাওয়া-দাওয়ার পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে আগের চাইতে অর্ধেকে। কারণ চল্লিশের পরে আর শারীরিক বৃদ্ধি ঘটে না। ফলে শরীরের চাহিদা কমে যায়। তাই খাওয়া-দাওয়ার পরিমাণ না কমালে অতিরিক্ত ক্যালরি শরীরে চর্বিরূপে জমে শরীর মোটা হয়ে যায়। আর মোটা হওয়া বা শরীরের ওজন বেড়ে যাওয়া হলো হৃদরোগের একটি সবচেয়ে বড় কারণ। তবে যারা শারীরিক পরিশ্রমযুক্ত কোন পেশায় আছেন (যেমন - রিক্সা চালানো, কৃষি কাজ ইত্যাদি), তাদের খাওয়া-দাওয়ার পরিমাণ কমানোর কোন প্রয়োজন নাই। সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হলো, উচ্চ রক্তচাপের (hypertension) চিকিৎসার জন্য রোগীরা ডাক্তারের কাছে গেলেও

ডাক্তাররা কেবল একটি বা দুটি ঔষধ ধরিয়ে দিয়ে বিদায় করেন। ব্যায়াম করা, খাবার নিয়ন্ত্রণ করা, টেনশান পরিহার করা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে রোগীদের বুঝিয়ে বলেন না। ফলে হাইপ্রেসারের রোগীরা যতই ঔষধ খান না কেন তাদের প্রেসারও দিনদিন কেবল বাড়তেই থাকে। তাছাড়া হাই ব্লাড প্রেসারের ঔষধগুলো হার্টের পেশীকে এতই দুর্বল করে ফেলে যে, এগুলো পাঁচ-দশ বছর খাওয়ার পরে নিরানব্বই ভাগ রোগী হার্ট ফেইল (heart failure) করে মারা পড়েন। হাই প্রেসারের জন্য যুগের পর যুগ এলোপ্যাথিক ঔষধ খাওয়ার চাইতে হোমিও চিকিৎসা অবলম্বন করা উচিত। হোমিও ঔষধের মাধ্যমে দুয়েক বছরের মধ্যেই হাই ব্লাড প্রেসার স্থায়ীভাবে নিরাময় করা যায়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানকে যিনি রোগের নামের গোলামী থেকে মুক্তি দিয়েছেন তার নাম হ্যানিম্যান। এই কৃতিত্বের দাবীদার একমাত্র তিনি। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা রোগের যত কঠিন কঠিন নামই দেন না কেন, তাতে একজন হোমিও ডাক্তারের ভয় পাওয়ার বা দুঃশ্চিন্তা করার কিছু নাই। রোগের লক্ষণ এবং রোগীর শারীরিক-মানসিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ঔষধ দিতে থাকুন। রোগের নাম যাই হোক না কেন, তা সারতে বাধ্য। হ্যানিম্যান তাই শত-সহস্রবার প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। রোগীর মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পযর্ন্ত সমস্ত লক্ষণ সংগ্রহ করুন এবং তার মনে গহীনে অন্তরের অলিতে-গলিতে যত ঘটনা-দুর্ঘটনা জমা আছে, তার সংবাদ জেনে নিন। তারপর সেই অনুযায়ী ঔষধ নির্বাচন করে খাওয়াতে থাকুন। হৃদরোগ বাপ বাপ ডাক ছেড়ে পালাবে। রোগের নাম নিয়ে অযথা সময় নষ্ট করার কোন দরকার নাই। হোমিও চিকিৎসায় যদি আপনার হৃদরোগ নির্মূল না হয় (অথবা কোন উন্নতি না হয়), তবে হোমিওপ্যাথির ওপর বিশ্বাস হারাবেন না। কেননা এটি সেই হোমিও ডাক্তারের ব্যর্থতা।

যদিও সমগ্র লক্ষণ অনুসারে নির্বাচিত যে-কোন হোমিও ঔষধেই যে-কোন হৃদরোগ নিরাময় হয়ে যায়, তথাপিও এমন কিছু হোমিও ঔষধ আছে যারা হোমিওপ্যাথিতে হৃদরোগের চিকিৎসায় বেশী বেশী ব্যবহৃত হয়। তাদের মধ্যে আছে Adonis vernalis, Amylenum nitrosum, Arnica montana, Cactus grandiflorus, Convallaria majalis, Crataegus oxyacantha, Digitalis purpurea, Iberis amara, Kalmia Latifolia, Lachesis mutus, Latrodectus mactans, Laurocerasus, Lilium tig, Lycopus virginicus, Naja tripudians, Natrum muriaticum, Aurum metallicum, vanadium, Spigelia anthelmintica ইত্যাদি। কাজেই হৃদরোগ চিকিৎসায়ও আমাদের সকলেরই উচিত প্রথমে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অবলম্বন করা। কেননা অন্যান্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের তুলনায় কমপক্ষে একশ ভাগ কম খরচে হোমিও চিকিৎসায় হৃদরোগ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। অপরদিকে অন্যান্য জাতীয় ঔষধ এবং অপারেশন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হৃদরোগীর মৃত্যুকে দ্রুত ডেকে আনে। সে যাক, হৃদরোগ চিকিৎসায় ভালো নামডাকওয়ালা বিশেষজ্ঞ হোমিও ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হওয়া উচিত। কেননা সাধারণ হোমিও ডাক্তারদের দ্বারা হৃদরোগের চিকিৎসা সফল হওয়ার সম্ভাবনা নাই ; বরং হোমিওপ্যাথিতে প্রচণ্ড দক্ষতা আছে এমন চিকিৎসক প্রয়োজন।

Crataegus oxyacantha : হোমিওপ্যাথিতে প্রচলিত হৃদরোগের ঔষধগুলোর মধ্যে ক্রেটিগাস ঔষধটি হলো হার্টের জন্য ভিটামিন / টনিকের মতো যার তেমন কোন সাইড-ইফেক্ট নাই। এটি একাই শতকরা ৯৫% ভাগ হৃদরোগ নিরাময়ের ক্ষমতা রাখে। আজ থেকে একশ বছর পূর্বে আয়ারল্যান্ডের ডাঃ গ্রীন নামক একজন হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানী এটি আবিষ্কার করেন। তিনি শুধু এই একটি ঔষধ দিয়ে এত এত হৃদরোগী আরোগ্য করেছিলেন যে, সারা পৃথিবীতে হৃদরোগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হিসেবে তার নাম ছড়িয়ে পড়েছিল এবং দুনিয়ার সকল প্রান্ত থেকে হৃদরোগীরা পঙপালের

ন্যায় আয়ারল্যান্ডে ছুটে যেতো। তিনি নিম্নশক্তিতে পাঁচ ফোটা করে রোজ ৪ বার করে খাইয়ে অধিকাংশ হৃদরোগীকে রোগমুক্ত করতে সক্ষম হতেন।

Aurum metallicum : ব্রিটিশ হোমিও চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডাঃ বার্নেট অগণিত জটিল হৃদরোগীকে আরোগ্য করে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, স্বর্ণ থেকে প্রস্তুত এই হোমিও ঔষধটি হৃদরোগের একটি অতি প্রয়োজনীয় এবং সেরা ঔষধ। অরাম মেটের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো দুই-তিন সেকেন্ডের জন্য মনে হয় হৃৎপিন্ড বন্ধ হয়ে গেছে, তারপর আবার খুব জোরে চলতে শুরু করেছে, বুক ধড়ফড়ানি, নাড়ির গতি দ্রুত-ক্ষীন এবং অনিয়মিত, হৃৎপিন্ডের আকৃতি বৃদ্ধি পাওয়া (Hypertrophy), হার্টের ভালবের বা পেশীর বিকৃতি (Valvular lesions of arterio-sclerotic nature), রক্তনালীর প্রাচীর মোটা হওয়া (Arterio-sclerosis), উচচ রক্ত চাপ (increased blood pressure), হৃদরোগের কারণে শরীরে পানি নামা (Ascites), হৃৎপিন্ডের বৈদ্যুতিক ভল্টেজ কমে যাওয়া (pacemaker), বিষন্নতা বা দুঃখবোধ (depression), হতাশা, আত্মহত্যার ইচ্ছা ইত্যাদি ইত্যাদি। সাধারণত রোগীর বা তাহার পিতা-মাতা-স্বামীর অতীতে সিফিলিস রোগ হয়ে থাকলে অরাম মেট দারুন ফল দেবে। মোটামুটি বলা যায়, অরাম মেট একাই এ যুগের বহুল প্রচলিত হৃদরোগসমূহের শতকরা ৯৫% ভাগ হৃদরোগ নিরাময়ের ক্ষমতা রাখে।

Digitalis purpurea : কোন হৃদরোগীর নাড়ির গতি যদি মিনিটে ৫০ বার অথবা তারও কম হয়, তবে তাকে ডিজিটালিস খাওয়ান। তার হৃদরোগের নাম যা-ই হোক না কেন, সেটি অবশ্যই সেরে যাবে। ডিজিটালিসের অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে আছে নাড়িরগতি দুর্বল, অনিয়মিত, বিরতিযুক্ত, খুবই ধীরগতি সম্পন্ন, শরীরের বাইরের এবং ভেতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পানি নামা / শোথ (dropsy), মায়োকার্ডিয়ামের বৃদ্ধি (dilatation of the myocardium), অরিকুলার ফ্লুটার এন্ড ফিব্রিলেশান (auricular flutter and fibrillation), হার্ট ব্লক (Heart block), মাইট্রাল ডিজিজ (mitral disease), অত্যন্ত দুর্বলতা, অল্পতে বেহুঁশ হওয়া, চামড়া ঠান্ডা, শ্বাস-প্রশ্বাস অনিয়মিত, জন্ডিস, মুখমন্ডল নীলচে, সামান্য নড়াচড়াতেই ভীষণ বুক ধড়ফড়ানি, নড়লেই মনে হয় হৃৎপিন্ড বন্ধ হয়ে যাবে, পেরিকার্ডাইটিস (Pericarditis), ইত্যাদি ইত্যাদি।

Lachesis mutus : কারো হৃদরোগের কষ্টগুলো যদি ঘুমালে বেড়ে যায়, অর্থাৎ নিদ্রা গেলে বৃদ্ধি পায়, তবে তাকে ল্যাকেসিস খাওয়াতে হবে। তার হৃদরোগের নাম যা-ই হোক না কেন, তার নিশ্চিত রোগমুক্তি আশা করতে পারেন।

Adonis vernalis : সাধারণত বাতের আক্রমণ, ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ব্রাইটস ডিজিজের পরে হৃদরোগ দেখা দিলে তাতে এডোনিজ প্রযোজ্য। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো হৃদপেশীর ফ্যাটি ডিজেনারেশান (fatty degeneration), হৃদরোগের কারণে শরীরে পানি নামা (cardiac dropsy), দুর্বল হার্ট এবং দুর্বল নাড়ি, মাইট্রাল এবং এওরটিক রিগারজিটেশান (Mitral and aortic regurgitation), এওরটার পুরাতন প্রদাহ (Chronic aortitis), ফ্যাটি হার্ট পেরিকার্ডাইটিস (Fatty heart pericarditis), বাতজনিত এন্ডোকার্ডাইটিস (Rheumatic Endocarditis), হৃৎপিন্ডে ব্যথা (Preæcordial pain), বুক ধড়ফড়ানি *(palpitation)*, শ্বাসকষ্ট *(dyspnœa)*, হৃদরোগজনিত হাঁপানি (Cardiac asthma), মায়োকার্ডাইটিস (Myocarditis) ইত্যাদি। হার্টের ভাল্বের সমস্যায় ইহা ব্যবহৃত হয়ে থাকে ।

**Arnica montana :** আর্নিকা হৃৎপিন্ডের ব্যথার সবচেয়ে ভালো ঔষধ। যাদের ঘনঘন বুকে ব্যথা উঠে অথবা যাদের একবার হার্ট এটাক (স্ট্রোক) হয়েছে, তাদের সব সময় আর্নিকা ঔষধটি পকেটে নিয়ে চলাফেরা করা উচিত। এটি আপনাকে হার্ট এটাকে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে যাওয়া বা অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবে।

**Latrodectus mactans :** হৃৎপিন্ডের ব্যথার সবচেয়ে ভালো ঔষধ হলো লেট্রোডেক্টাস ম্যাকটেনস (Latrodectus mactans) বিশেষত ব্যথা যখন বাম হাতের দিকে ছড়াতে থাকে। মনে হয় কেউ যেন শক্ত হাতে গলা চেপে ধরেছে ; দম বন্ধ হয়ে এখনই মারা যাবে।

**Amylenum nitrosum :** এটি হৃৎপিন্ডের ব্যথার সবচেয়ে কমন ঔষধ। এটি হৃৎপিন্ড এবং শরীরের ওপরের অংশের রক্তনালীকে প্রসারিত করার মাধ্যমে বুকের ব্যথা নিরাময় করে।

**Glonoine :** গ্লোনইন হলো হৃৎপিন্ডের ব্যথার এক নাম্বার ঔষধ যা সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষণ ছাড়াই দেওয়া যায়। পাশাপাশি এটি হাই ব্লাড প্রেসারেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ।

**Cactus grandiflorus :** ইহাও হৃৎপিন্ডের রোগের একটি উল্লেখযোগ্য ঔষধ। ইহার প্রধান লক্ষণ হলো মনে হবে হৃৎপিন্ডকে কেউ তার লোহার হাত দিয়ে এমনভাবে চেপে ধরেছে যে, সেটি নড়াচড়া করতে পারছে না।

Convallaria majalis : কনভেলেরিয়া রেগুলার অথবা ইরেগুলার হার্ট বিট বিশিষ্ট দুর্বল হৃদপিন্ডের জন্য একটি মূল্যবান ঔষধ, সাথে ভাল্বের সমস্যা থাকুক অথবা নাই থাকুক। ইহার প্রধান লক্ষণ হলো রোগী শুইতে পারে না (অর্থাৎ শুইলে রোগ মাত্রা বেড়ে যায়)।

Vanadium : সাধারণত বয়স চল্লিশের দিকে আসলে মানুষ নানা রকমের রক্তনালী সংক্রান্ত রোগে বা হৃদরোগে আক্রান্ত হতে শুরু করে। এজন্য এই বয়স থেকে প্রত্যকেরই (নিম্নশক্তিতে বছরে অন্তত একমাস) ভ্যানাডিয়াম খাওয়া উচিত। তাহলে হৃদরোগ ধারেকাছে আসতে পারবে না।

## Hepatitis, Jaundice (যকৃত প্রদাহ, জন্ডিস, পান্ডুরোগ) :-

ইদানীং হেপাটাইটিস নামক রোগটি নিয়ে চিকিৎসক সমাজ এবং ঔষধ কোম্পানিগুলি তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে জনগণের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করতেছে। এই কাজে সুবিধার জন্য রোগটিকে তারা আবার এ. বি. সি. ডি. প্রভৃতি ভাগে ভাগ করে নিয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস একটি ভাইরাসঘটিত রোগ। একথা ঠিক যে, হেপাটাইটিস ভাইরাসটি আমাদের লিভারের স্ট্রাকচারকে ধ্বংস করার মাধ্যমে লিভার সিরোসিস বা লিভার ক্যান্সার সৃষ্টি করে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়ে থাকে । অর্থাৎ হেপাটাইটিসকে বিনা চিকিৎসায় রেখে দিলে তা যে কাউকে নির্ঘাত স্বর্গে পাঠিয়ে দেবে । তবে সমগ্র প্রক্রিয়াটি সমপন্ন করতে ভাইরাসটির আনুমানিক পনের থেকে বিশ বছর সময় লাগে। এলোপ্যাথিতে ভাইরাস নিধনকারী কোন ঔষধ না থাকাতে তারা হেপাটাইটিসকে ভীতিকর রোগরূপে প্রচার করছে। ভাইরাসটি যথেষ্ট মারাত্মক একথা যেমন সত্য; তেমনি এটাও সত্য যে, বিশুদ্ধ পানি এবং পুষ্টিকর খাবার গ্রহন করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাইরাসটি নিজে নিজেই শরীর থেকে চলে যায়। তারপরও যারা অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে চান, তারা নিম পাতার রস বা চিরতার রস দু-চার-ছ'মাস খেতে পারেন। হেপাটাইটিসের জন্য যারা চিকিৎসা নিতে চান, তাদের অবশ্যই একজন ভালো হোমিও চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হওয়া উচিত। কেননা কম খরচ এবং কম কষ্ট ভোগ করার মাধ্যমে একমাত্র হোমিওপ্যাথিই আপনাকে হেপাটাইটিস থেকে মুক্ত করতে সক্ষম। রোগীর শারীরিক লক্ষণ, মানসিক লক্ষণ এবং বংশগত রোগ লক্ষণের ভিত্তিতে ঔষধ প্রয়োগ করলে ভাইরাস বাপ-বাপ ডাক ছেড়ে পালাবে। হ্যাঁ, রোগীর কোন রকম শারীরিক-মানসিক দুর্বলতা থাকলে টনিক জাতীয় কিছু ঔষধও সেবন করানো যেতে পারে। একই প্রক্রিয়ায় কিছুদিন পূর্বে আমি একটি রোগীকে হেপাটাইটিস থেকে মুক্ত করেছিলাম যাতে সময় লেগেছিল ছয়মাস এবং খরচ হয়েছিল তিনশ টাকার মতো। সে যাক, ব্রিটিশ হোমিও চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডাঃ বার্নেট বলেছিলেন, "এলোপ্যাথির দৈত্যাকার বিশেষজ্ঞও একজন সামান্য হোমিও চিকিৎসকের নিকট ব্যর্থ হতে বাধ্য যদি সে হ্যানিম্যানের পদাঙ্ক যথাযথভাবে অনুসরণ করে"। কাজেই ইদানিং হেপাটাইটিস নিয়ে যারা বিপাকে আছেন তাদেরকে আমি দিশাহারা না হওয়ার অনুরোধ করব ।

হেপাটাইটিস বা জন্ডিস বর্তমানে সবচেয়ে কমন সংক্রামক রোগে পরিণত হয়েছে। পাইপ লাইনের ময়লা পানি এবং হোটেল-রেস্তোরার পচাঁ-বাসি খাবার খাওয়ার কারণে শহরের মানুষদের মধ্যে এই রোগের উৎপাত বেশী দেখ যায়। যৌনকম, মাদকসেবন এমনকি হ্যাণ্ডশ্যাকের মাধ্যমেও এই রোগ ছড়াতে পারে। নানা রকমের ভাইরাস আমাদের লিভারকে আক্রমণ করে। হেপাটাইটিসের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো জণ্ডিস বা হলুদ প্রস্রাব, লিভার বড় হয়ে যাওয়া, লিভারের কাজে গোলমাল, মাটির মতো পায়খানা, ক্ষুধাহীনতা, হজমে গোলমাল ইত্যাদি।

যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই রোগ বিনা চিকিৎসাতেই ভাল হয়ে যায় ; তথাপি যাদের শরীরে বিভিন্ন দোষ-ত্রুটিতে ভরা তারা ধীরে ধীরে লিভার ড্যামেজ এবং লিভার ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে অকাল মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে। যদিও অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে হেপাটাইটিসের নিরাময়ে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হয়, কিন্তু হোমিও চিকিৎসায় অন্তত একশগুণ কম খরচে হেপাটাইটিস থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। অনেকে হেপাটাইটিসের হাত থেকে বাচাঁর জন্য জলদি জলদি হেপাটাইটিসের টিকা (vaccine) নিয়ে ফেলেন। কিন্তু এতে আপনার ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, ব্রেন ড্যামেজ, প্যারালাইসিস, হাপাঁনি, অটিজম, ধ্বজভঙ্গ ইত্যাদি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে আরো বেশী বিপদে পড়ার সম্ভাবনা আছে।

Nux vomica : হেপাটাইটিস বা জণ্ডিসের বা লিভারের রোগের একটি প্রধান ঔষধ হলো নাক্স ভমিকা। **যারা অধিকাংশ সময়ে পেটের অসুখে-বদহজমে-কোষ্টকাঠিন্যে ভোগে**, বদমেজাজী, ঝগড়াটে, **বেশীর ভাগ সময় শুয়ে-বসে কাটায়**, কথার বিরোধীতা সহ্য করতে পারে না এবং **অল্প শীতেই কাতর হয়ে পড়ে**, এটি তাদের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে। পান-সিগারেট-মদ-গাজা-ফেনসিডিল-হিরোইন দীর্ঘদিন সেবনে হেপাটাইটিস হলে নাক্স খেতে হবে। মাত্রা হবে নিম্নশক্তিতে (Q, ৩, ৬ ইত্যাদি) ৫ থেকে ১০ ফোটা করে রোজ তিনবার।

Podophyllum ঃ পডোফাইলাম হেপাটাইটিসের একটি সেরা ঔষধ। দুরবলতা, কোষ্ঠকাঠিন্য, মাটি রঙের পায়খানা, জিহ্বায় জ্বালাপোড়া, জ্বরের সময় প্রলাপ বকা, ক্ষুধাহীনতা ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে নিশ্চিন্তে পডোফাইলাম খেতে পারেন।

Chelidonium : চেলিডোনিয়াম লিভারের রোগের একটি শ্রেষ্ট ঔষধ। ডান কাধের পেছনে ব্যথা, ডান ফুসফুস এবং তলপেটের ডান পাশে ব্যথা, মাটির রঙের বা হলুদ পায়খানা, কোষ্টকাঠিন্য, বাতের ব্যথা, অতিরিক্ত গরম খাবার-পানীয় না খেলে বমি হওয়া, পনির খেতে অনিচ্ছা, চেহারা হলদেটে হওয়া, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে চেলিডোনিয়াম সেবন করুন।

Digitalis : ডিজিটালিস লিভারের রোগের আরেকটি প্রধান ঔষধ। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো মাটির রঙের পায়খানা, অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা, খিটখিটে মেজাজ, একলা থাকতে চায়, অতীতে যাদের গনোরিয়া বা প্রস্রাবের ইনফেকশান হয়েছিল, **নাড়ির গতি খুবই কম (মিনিটে ৫০ বা তারও কম)**, হাত-পা বরফের মতো ঠান্ডা, চেহারা নীলচে হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

Myrica cerifera : মাইরিকা লিভারের রোগের শ্রেষ্ট ঔষধগুলির মধ্যে একটি। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণগুলো হলো গলায় প্রচুর আঠালো মিউকাস হওয়া, ছাই রঙের পায়খানা, লিভারের জায়গায় ব্যথা, ঘুমঘুম ভাব, বিরক্তিকর মাথাব্যথা, হলুদ চক্ষু, হলুদ জিহ্বা, শরীর ব্যথা, কাধের ভেতরে ব্যথা, চুলকানি, মুখের ওপর পোকামাকড় হাঁটতেছে এমন মনে হওয়া ইত্যাদি।

Lycopodium clavatum : লাইকোপোডিয়াম লিভারে রোগের একটি শক্তিশালী ঔষধ। লাইকোপোডিয়ামের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **রোগের মাত্রা বিকাল ৪-৮টার সময় বৃদ্ধি পায়**, এদের রোগ ডান পাশে বেশী হয়, রোগ ডান পাশ থেকে বাম পাশে যায়, **এদের পেটে প্রচুর গ্যাস হয়**, এদের সারা বৎসর প্রস্রাবের বা হজমের সমস্যা লেগেই

থাকে, এদের দেখতে তাদের বয়সের চাইতেও বেশী বয়স্ক মনে হয়, স্বাস্থ্যের অবস্থা খারাপ কিন্তু ব্রেন খুব ভালো, এরা খুবই সেনসিটিভ এমনকি ধন্যবাদ দিলেও কেদে ফেলে ইত্যাদি ইত্যাদি।

Carduus marianus : কারডুয়াস মেরি লিভারের রোগের আরেকটি যাদুকরী ক্ষমতাসম্পন্ন ঔষধ। হেপাটাইটিস, জন্ডিস, ভেরিকজ ভেইন, লিভার সিরোসিস, লিভার ক্যানসার ইত্যাদি রোগে এটি দারুণ কাজ করে থাকে। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো মাটির মতো চেহারা, ক্ষুধাহীনতা, বুক ধড়ফড়ানি, পেট ফাঁপা, মাথাঘুড়ানি, পেটের ভেতরে গড়গড় শব্দ, একবার কোষ্টকাঠিন্য একবার ডায়েরিয়া, আড়াআড়িভাবে লিভারের স্ফীতি, রক্তবমি, নাক থেকে রক্তপাত, অতিরিক্ত ঋতুস্রাব, লিভারে ব্যথা, ভীষণ দুর্বলতা ইত্যাদি ইত্যাদি।

## Homeopathy & longivity (হোমিওপ্যাথি মানবজীবনকে দীর্ঘায়িত করে) :-

চিকিৎসাবিজ্ঞানী মহাত্মা স্যামুয়েল হ্যানিম্যান এবং তাঁর অনেক উত্তরসুরি বিগত দুইশ বছর যাবত দাবী করে আসছেন যে, এলোপ্যাথিক চিকিৎসা আয়ু হ্রাস করে থাকে এবং বিপরীতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দীর্ঘায়ু নিশ্চিত করে। কিন্তু হোমিওপ্যাথিকে যারা এলোপ্যাথির চাইতে উৎকৃষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতি মনে করে না, তাদের কাছে এটি একটি ফালতু এবং ফাঁকা বুলি হিসেবে গণ্য। যতটুকু জানা যায়, বিষয়টিকে তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে প্রমাণ করার কোন প্রচেষ্টা নেওয়া হয়নি। তারপরও এটি সহজেই প্রণিধানযোগ্য যে, হোমিওপ্যাথি তার অনুসারীদের দীর্ঘজীবন নিশ্চিত করার বাস্তব ভিত্তিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। ইহা সর্ববিদিত যে, জীবনবীমার দৃষ্টিতে চিকিৎসকদের জীবনকে মন্দ জীবন হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে, যদিও মদ্যপ বা মাদক ব্যবসায়ীদের মতো ততটা নয়। জীবনবীমা কোম্পানির পরিসংখ্যানে বিংশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের এক বছরের পেশাদার পুরুষদের তুলনামূলক মৃত্যুহার ছিল এই রকম ঃ - (১) পাদরী, পুরোহিত, ধর্মযাজক- ৪৪৩, (২) কৃষি শ্রমিক- ৪৭০, (৩) খামার মালিক- ৪৯৫, (৪) রেলওয়ে রক্ষী, দাড়োয়ান- ৬০৭, (৫) ব্যারিষ্টার, উকিল- ৬২৭, (৬) গৃহনির্মাণ কর্মী- ৬৫৬, (৭) চিকিৎসক এবং শল্যচিকিৎসক- ৬৯৩, (৮) কয়লাখনি শ্রমিক- ৭২৭ এবং মদ ব্যবসায়ী- ১৭২৪। উক্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ডাক্তার এবং সার্জনদের মৃত্যুহার প্রায় ৫০% যা সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র, রোদ-বৃষ্টিতে খেটে খাওয়া, অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস করা আর সবচেয়ে বেশি চিকিৎসাসেবা বঞ্চিত কৃষি শ্রমিকদের চেয়েও বেশী। চিকিৎসক এবং সার্জনদের উচ্চ মৃত্যুহারের কারণরূপে উল্লেখ করা যায় তাদের অত্যন্ত কর্মব্যস্ত জীবন, অনিয়মিত পানাহার, ঘনঘন রোগ-জীবাণুর সংস্পর্শ ইত্যাদিকে। আমি বিশ্বাস করি যে, চিকিৎসা পেশাজীবিদের আপত্তিকর স্বাস্থ্য পরিস্থিতির কারণ তাদের নিজেদের ওপর দ্রুত ঔষধ প্রয়োগের প্রবনতা এবং খাবার-পানীয় সম্পর্কিত স্বাস্থ্যবিধির মৌলিক ধারাগুলোকে অবহেলা করা ইত্যাদি ইত্যাদি, যা সম্পর্কে অনেক চিকিৎসকেরই অল্প ধারণা বিদ্যমান। ব্রাইটস ডিজিজ, ডায়াবেটিস, যকৃত রোগ এবং পরিপাকতন্ত্রের রোগে চিকিৎসকদের মৃত্যুহার অত্যধিক বেশী হওয়া তাদের ত্রুটিযুক্ত পুষ্টি অবস্থাকে নির্দেশ করে।

চিকিৎসকদের উচ্চ মৃত্যুহারের কারণকে যদি ধরে নেওয়া হয় তাদের পেশাকে তবে একই যুক্তি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তব পরিসংখ্যান সেটি বলে না। হ্যানিম্যান নিজে ৮৮ বছর বেচে ছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পযর্ন্ত পূর্ণ উদ্যমে কাজ করে গেছেন। তিনি ৮০ বছর বয়সে প্যারিসে হিজরত করেন এবং অর্গাননের ষষ্ট সংস্করণ লেখার জন্য জীবনের এই অবশিষ্ট আট বছরে যতো পরিশ্রম করেছেন, সারাজীবনেও তিনি অতোটা কঠোর পরিশ্রম করেননি। বিপুল সংখ্যক হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসক তাদের জীবনের চূড়ান্ত বার্ধক্যে পৌঁছে ছিলেন এবং তাদের অধিকাংশই জীবনের শেষ মুহূর্ত পযর্ন্ত কর্মঠ ছিলেন। কোন হোমিওপ্যাথ যদি একটু ক্লেশ স্বীকার করে গত বিশ বছরের এলোপ্যাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের মৃত্যুর রেকর্ড পর্যালোচনা করতেন; তবে দাবীটি সহজে প্রমাণ হতো যে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা গ্রহনকারীরা দীর্ঘ জীবন

লাভ করে থাকে। ব্রিটিশ হোমিওপ্যাথিক জার্নালসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, হোমিওপ্যাথির আবিষ্কারক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান বেঁচে ছিলেন ৮৮ বছর এবং তাঁর সহধর্মীনী মেলানী বেঁচে ছিলেন ৮৮ বৎসর যিনি ছিলেন পৃথিবীর প্রথম মহিলা ডাক্তার এবং হোমিওপ্যাথ। হ্যানিম্যানের নাতী ডাঃ লিওপোল্ড বেঁচে ছিলেন ৮৮ বছর। অন্যান্য হোমিও চিকিৎসাবিজ্ঞানী এবং ডাক্তারদের মধ্যে ডাঃ কনস্ট্যান্টাইন হেরিং ৮০, ডাঃ হেইল ৭৯, ডাঃ এলেন ৭৫, ডাঃ স্ক্রিনার ৮১, ডাঃ ভন বয়েনিংহুসেন ৮৩, ডাঃ ড্রিসডেল ৭৫, ডাঃ ফিঙ্কি ৮৫, ডাঃ বরিক ৮০, ডাঃ গারসটাল ৮৩, ডাঃ ডাডজেন ৮৪, ডাঃ গারসডরফ ৭৭, ডাঃ মারেনজিলার ৮৯, ডাঃ কাউন্ট ডি গাইডি ৯৪, ডাঃ কুইন ৭৯, ডাঃ রিচার্ট ৮৬, ডাঃ পেসচার ৭২, ডাঃ লেম্যান ৭৭ বছর আয়ু লাভ করেছেন। তালিকাটি যদিও অসম্পূর্ণ কিন্তু বেশ চিত্তাকর্ষক।

ইলিস বারকার জি নামক একজন গবেষক "হোমিওপ্যাথিক ওয়ার্ল্ড" নামক একটি ব্রিটিশ চিকিৎসা সাময়িকীতে ত্রিশ বছরে প্রকাশিত ডাক্তারদের মৃত্যুসংবাদ বা কুলখানি সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত বয়সের পরিসংখ্যান নিয়ে দেখেন যে, অধিকাংশ হোমিও চিকিৎসক গড়ে ৮০ বছর আয়ু লাভ করেছেন। সর্বোপরি এসব হোমিও চিকিৎসাবিজ্ঞানী এবং ডাক্তারগণের অনেকেই ঔষধ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে মারাত্মক মারাত্মক সব ঔষধ প্রচুর পরিমাণে খেয়ে নিজেদের দেহ-মনের উপর তাদের গুণাগুণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন যা খুবই বিপজ্জনক এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। তারপরও গড়ে তাহারা যে পরিমাণ আয়ু পেয়েছেন তা এলোপ্যাথিক ডাক্তারদের তুলনায় অনেক বেশী। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, হোমিওপ্যাথি তার অনুসারীদের জীবনকাল নিশ্চিতভাবেই দীর্ঘায়িত করে থাকে।

## Hydrophobia, Rabies (জলাতঙ্ক) :

জলাতঙ্ক একটি ভাইরাস ঘটিত মারাত্মক রোগ যাতে আক্রান্ত ব্যক্তি জল বা পানিকে ভয় পায়। এজন্য এই রোগের নাম দেওয়া হয়েছে জলাতঙ্ক। সাধারণত জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত অথবা জলাতঙ্ক রোগের ভাইরাস বহনকারী কুকুর, বিড়াল, শিয়াল, বাদুর, খাটাশ ইত্যাদি প্রাণীর কামড় থেকে মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়। এমনকি জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত মানুষের কামড়েও অন্য কোন মানুষ বা পশু-পাখি জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। পাগলা কুকুরের কামড়ে এই রোগ হয় বলে সাধারণ মানুষের নিকট বহুল প্রচলিত। সাধারণত রক্ত, মাংস এবং লালার মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়। কামড় খাওয়ার পরে রোগটি দেখা দিতে ১০ দিন থেকে ১ বৎসর পযর্ন্ত লাগতে পারে।

এই রোগের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো জ্বর, গলাব্যথা, খিচুঁনি, মুখ দিয়ে ফেনা এবং রক্তযুক্ত লালা র্নিগর্ত হওয়া, ভয়ঙ্কর জিনিস দেখা, খিচুঁনির মধ্যেও জ্ঞান ঠিক থাকা, পিঠ বাঁকা হয়ে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট, প্রচুর লালা নিঃসরণ, সামনে যাকে পায় তাকেই কামড় দিতে চায়, কুকুরের মতো চীৎকার করা, খিচুঁনি (convulsions without loss of consciousness), মুখ দিয়ে ফেনা এবং রক্তযুক্ত লালা র্নিগর্ত হওয়া (frothy- bloody mucus), ভয়ঙ্কর জিনিস দেখা (hallucinations), খিচুঁনির মধ্যেও জ্ঞান ঠিক থাকা, পিঠ বাঁকা হয়ে যাওয়া (opisthotonos), শ্বাসকষ্ট, প্রচুর লালা নিঃসরণ (abundant salivation), সামনে যাকে পায় তাকেই কামড় দিতে চায় (tendency to bite), কুকুরের মতো চীৎকার করা (hoarse cry), সাময়িক প্যারালাইসিস (momentary paralysis) ইত্যাদি ইত্যাদি। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত বলে এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা বলে থাকেন। কেননা এলোপ্যাথিতে এই রোগের কোন চিকিৎসা আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে এই রোগের কাযর্কর চিকিৎসা আছে। তাই এই রোগের জন্য সবারই হোমিও চিকিৎসা অবলম্বন করা উচিত। এবং তাতে অন্তত শতকরা ৫০ ভাগ রোগীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত

থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়ে থাকে। কিন্তু অনেকেই না জানার কারণে হোমিও চিকিৎসা নিতে আসেন না। ভারতে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক মন্দির আছে যার আশেপাশে অনেক বানর এবং হনুমান বসবাস করে। ফলে এসব মন্দিরে আগত তীর্থযাত্রীদের অনেকেই এসব জংলী বানর এবং হনুমানের কামড়ে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হন। ইন্টারনেটে দেখলাম, একজন ভারতীয় হোমিও চিকিৎসক এরকম অগণিত জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত তীর্থযাত্রীকে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত করার ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

কামড় খাওয়ার পরে দংশনকারী প্রাণীটিকে হত্যা করতে নাই। বরং তাকে পনের দিন পযর্ন্ত বেধে রেখে লক্ষ্য করতে হবে যে, তাতে পাগলা (অথাৎ জলাতঙ্ক) রোগের কোন লক্ষণ প্রকাশ পাই কিনা না। এই সময়ের মধ্যে যদি সে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়, তবে আপনাকে অবশ্যই জলাতঙ্ক রোগের টিকা / ভ্যাকসিন নিতে হবে। সাধারণত এসব প্রাণীর কামড় খাওয়ার সাথে সাথেই পাঁচটি টিকা/ ভ্যাকসিন নিয়ে নেওয়া জরুরি। আগে নাভীর গোড়ায় ১৪টি ইনজেকশান নিতে হতো কিন্তু বতর্মানে হাতের পেশীতে ৫টি নিতে হয়। সাধারণত ১, ৭, ১৪, ২৮, ৯০ তম দিন হিসাবে পাঁচটি ইনজেকশান নিতে হয়। তবে এলোপ্যাথিক টিকা/ ভ্যাকসিন ইনজেকশান নেওয়ার পাশাপাশি হোমিওপ্যাথিক টিকা/ ভ্যাকসিনটিও খেয়ে নেওয়া উচিত। তাহলে পুরোপুরি নিশ্চিত থাকা যায়। কেননা ঠিকমতো প্রস্তত না করা, মেয়াদ চলে যাওয়া ইত্যাদি নানান কারণে এলোপ্যাথিক টিকা/ ভ্যাকসিন ইনজেকশান নেওয়ার পরেও আপনি জলাতঙ্ক রোগের আক্রান্ত হতে পারেন। আবার কোন কোন দেশ ভ্যাকসিন উৎপাদনে স্নায়ু কলাতন্তু (nervous tissue) ব্যবহার করে, যার প্রতিক্রিয়ায় ভ্যাকসিন গ্রহীতা প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হতে পারেন। আমেরিকার একজন বিখ্যাত পশুরোগ চিকিৎসাবিজ্ঞানীর মতে, কুকুরের দংশনের শতকরা ৯৯ ভাগ ক্ষেত্রেই জলাতঙ্কের টিকা / ভ্যাকসিন নেওয়া বৃথা।

অনেক চিকিৎসা বিজ্ঞানী মনে করেন, যারা সব রোগীকেই জলাতঙ্কের টিকা নিতে পরামর্শ দেন, তারা বহুজাতিক ভ্যাকসিন কোম্পানীর দালাল ছাড়া কিছুই না।

**<u>Hydrophobin</u>**um / **<u>Lyssin</u>**um : লুই পাস্তর জলাতঙ্কের টিকা আবিস্কারেরও পঞ্চাশ বছর আগে আমেরিকান হোমিও চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডাঃ কন্সট্যান্টাইন হেরিং জলাতঙ্ক (Hydrophobia/Rabies) রোগের ভাইরাস থেকে জলাতঙ্কনাশী ঔষধ হাইড্রোফোবিনাম (Hydrophobinum/ Lyssinum) তৈরী করে জলাতঙ্ক চিকিৎসায় সফলতার সাথে ব্যবহার করেছেন। হাইড্রোফোবিনাম বা লাইসিনাম নামক হোমিও ঔষধটিকে জলাতঙ্ক রোগের একেবারে স্পেসিফিক ঔষধ এবং টিকা (vaccine) হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বুক ফাটা তৃষ্ণা, পানিকে ভয় পাওয়া, চকচকে বা উজ্জ্বল বস্তু বা আলো অসহ্য লাগা, পানির শব্দকে ভয় পাওয়া, পুরুষাঙ্গ শক্ত হয়ে থাকা (permanent erection) ইত্যাদি এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ। জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য অথবা জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হওয়ার পরে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য এই ঔষধটি (২০০ বা আরো ওপরের শক্তিতে) রোজ এক বেলা করে অন্তত তিন দিন খান। পরবর্তীতে সপ্তাহে এক মাত্রা করে কয়েক সপ্তাহ খান।

Tanacetum : টেনাসিটাম জলাতঙ্ক রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। এই ঔষধটি যেই গাছের পাতা ও ফুল থেকে তৈরী করা হয়, সেটি প্রাচীন কাল থেকে রাশিয়ায় জলাতঙ্ক রোগের কবিরাজি ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পশুদের উপর পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এই ঔষধটি তাদের মধ্যে খিচুঁনি (convulsions without loss of

consciousness), মুখ দিয়ে ফেনা এবং রক্তযুক্ত লালা নির্গত হওয়া (frothy- bloody mucus), ভয়ঙ্কর জিনিস দেখা (hallucinations), খিচুঁনির মধ্যেও জ্ঞান ঠিক থাকা, পিঠ বাঁকা হয়ে যাওয়া (opisthotonos), শ্বাসকষ্ট, প্রচুর লালা নিঃসরণ (abundant salivation), সামনে যাকে পায় তাকেই কামড় দিতে চায় (tendency to bite), কুকুরের মতো চীৎকার করা (hoarse cry), সাময়িক প্যারালাইসিস (momentary paralysis) ইত্যাদি লক্ষণ উৎপন্ন করতে পারে। কাজেই চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে এটি জলাতঙ্কের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধরূপে গণ্য হয়। এটি একই সাথে জলাতঙ্কের প্রতিষেধক (vaccine) হিসাবেও প্রমাণিত একটি সফল ঔষধ।

**Cantharis** (ক্যান্থারিস) ক্যান্থারিস জলাতঙ্কের সবচেয়ে ভালো ঔষধ ; কেননা কুকুরের মতো আওয়াজ করা, মুখ থেকে ফেনা নির্গত হওয়া, রোগীর চারপাশ সম্পর্কে অসচেতনতা ইত্যাদি প্রধান প্রধান সব লক্ষণই ক্যান্থারিস পরীক্ষায় পাওয়া গেছে।

Belladonna (বেলেডোনা) বেলেডোনা জলাতঙ্কের আরেকটি সেরা ঔষধ। দৈত্য-দানব দেখে, চারপাশের ঘটনা-দুর্ঘটনা সম্পর্কে কোন খবর রাখে না, পানি পিপাসা আছে কিন্তু পানি দেখলে ভয় পায়, কেননা পানির ঢেউ চকচক দেখলে খিচুঁনি বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি ইহার প্রধান লক্ষণ।

Stramonium (স্ট্র্যামোনিয়াম) আগ্রাসী বা **আক্রমণাত্মক ধরনের আচরণ**, লুচ্চা বা লম্পটদের মতো আচরণ ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে স্ট্র্যামোনিয়াম প্রয়োগ করুন।

Chamomilla (ক্যামোমিলা) ক্যামোমিলা ঔষধটি যদিও সচরাচর জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় না কিন্তু একজন ভারতীয় চিকিৎসক ক্যামোমিলার সাহায্যে জলাতঙ্ক নিরাময় করার দাবী করেছেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই ! প্রকৃতেপক্ষে ক্যামোমিলার রোগীরা হয় অত্যন্ত সেনসিটিভ। অন্যদিকে জলাতঙ্ক রোগীরাও হয় অত্যন্ত সেনসিটিভ। তারা আলো সহ্য করতে পারে না, শব্দ/আওয়াজ সহ্য করতে পারে না, স্পর্শ সহ্য করতে পারে না, ব্যথা সহ্য করতে পারে না। কাজেই জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসায় ক্যামোমিলার কথাও আমাদেরকে মনে রাখতে হবে।

Lachesis (ল্যাকেসিস) : পিপাসা, আক্ষেপ, সেনসিটিভনেস, স্নায়বিক বৈকল্য ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে ল্যাকেসিস দিতে পারেন।

## Hot flash, menopause, Cessation of menstruation, change of life, critical age (ঋতুস্রাবের সমাপ্তি) :

সাধারণত নারীদের বয়স ৪৫ থেকে ৫০-এর দিকে আসলে তাদের মাসিক / পিরিয়ড স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু পিরিয়ড পুরোপুরি বন্ধ হওয়ার আগে কয়েক বছর অনিয়মিত হয়ে যায়। এক মাস হয় তো তিন মাস হয় না আবার কোন মাসে রক্তক্ষরণ কম হয় কোন মাসে বেশী হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। সে যাক, এই সময় যে-মাসে পিরিয়ড বন্ধ থাকে এবং পিরিয়ডের সেই নির্দিষ্ট সময় যখন উপস্থিত হয়, তখন মহিলাদের বেশ কিছু শারীরিক-মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। যেমন - হাতের তালু-পায়ের তালু-মাথার তালুতে জ্বালাপোড়া, মুখ লাল হওয়া, বেশী ঘাম হওয়া, বুক ধড়ফড়ানি, নিদ্রাহীনতা, উৎকণ্ঠা বা টেনশান, হঠাৎ গরম লাগা হঠাৎ শীত লাগা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমস্যাগুলোকে হট ফ্লাশ বা তাপের ঝলক ওঠা বলা হয়। মহিলাদের এই সমস্যাগুলো ব্যক্তিভেদে কয়েক বছর থেকে কয়েক যুগ কিংবা কারো কারো ক্ষেত্রে সারাজীবনই থাকতে পারে। সাধারণত এই সময় তাদের শরীরে কিছু হরমোনের উৎপাদন ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায় এবং এই কারণেই শরীরে এসব সমস্যা দেখা দেয়।

Lachesis : হট ফ্লাশ বা মাসিক সমাপ্তিকালীন এসব জটিলতার সবচেয়ে ভালো ঔষধ হলো ল্যাকেসিস। কেননা ল্যাকেসিস ঔষধটির রোগ বৃদ্ধি পায় কোন স্রাব বন্ধ হয়ে গেলে আর হট ফ্লাশেরও মুল কারণ হলো মাসিক স্রাব বন্ধ হওয়া।

☆ ইহা ছাড়াও Cimicifuga, Pulsatilla pratensis, China officinalis, Ferrum metallicum, Aconitum napellus, Bryonia alba, Arsenicum album, Belladonna, Glonoinum, Gelsemium sempervirens, Ignatia amara প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণ মিলিয়ে প্রয়োগ করতে পারেন।

## Impotence (ধ্বজভঙ্গ, যৌন দুর্বলতা) :-

আমাদের দেশে পুরুষদের যৌন দুবর্লতার সমস্যা মনে হয় খুবই বেশী। অন্তত রাস্তাঘাটের দেয়ালে দেয়ালে যে-সব ডাক্তারী বিজ্ঞাপন দেখা যায়, সেগুলো দেখলে যে-কারো এমন ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। আবার এসব বিজ্ঞাপনের বেশীর ভাগই দেখা যায় হোমিও ডাক্তারদের বিজ্ঞাপন। এতে অনেকের মনে হতে পারে যে, সম্ভব হোমিওপ্যাথিতে যৌন রোগের সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা আছে। হ্যাঁ, বাস্তবেও কথাটি সত্য। অন্য যাবতীয় রোগের মতো যৌনরোগেরও সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা আছে হোমিওপ্যাথিতে। আমার কাছে যৌন দুবর্লতার যত রোগী এসেছে, তাদের প্রত্যেকেই বলেছেন যে, এলোপ্যাথিক বা কবিরাজি চিকিৎসায় তারা কোন সত্যিকারের উপকার পান নাই। (যতদিন ঔষধ খাই ততদিনই ভাল থাকি ; ঔষধ বন্ধ করলেই অবস্থা আগের মতো।) অন্যদিকে মহিলাদেরও যৌন দুরবলতা, যৌনকর্মে অনীহা ইত্যাদি থাকতে পারে এবং হোমিওপ্যাথিতে তারও চমৎকার চিকিৎসা আছে। আবার নারী-পুরুষ উভয়েরই যৌনশক্তি মাত্রাতিরিক্ত থাকতে পারে এবং অনেকে সময়মতো বিবাহ করতে না পারার কারণে অথবা অকালে স্ত্রীর মৃত্যু-তালাক-বিধবা হওয়ার কারণে তাদের যৌন চাহিদা পূরণ করতে পারেন না এবং এই সমস্যা নিয়ে তারা বিপদে পড়েন। এসব ক্ষেত্রে হোমিও ঔষধের মাধ্যমে কিছুদিনের জন্য যৌনশক্তি কমিয়ে রাখা যায় এবং এতে আপনার শরীরের বা যৌনশক্তির কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

Origanum marjorana : ওরিগ্যানাম ঔষধটি পুরুষ এবং নারীদের যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধিতে একটি শ্রেষ্ট ঔষধ। তবে এটি নিম্নশক্তিতে খাওয়া উচিত কেননা উচ্চশক্তিতে কোন ফল পাওয়া যায় না।

Moschus Moschiferus : ডায়াবেটিস রোগীদের ধ্বজভঙ্গে এটি ভালো কাজ করে। এটি ক্ষুদ্রাকৃতি হয়ে যাওয়া পুরুষাঙ্গকে পূর্বের আকৃতিতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

Kali Bromatum : বিষন্নতা জনিত কারণে যৌন দুর্বলতায় এটি প্রযোজ্য। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি হলো স্মরণশক্তির দুর্বলতা, স্নায়বিক দুর্বলতা, হাত দুটি সর্বদাই ব্যস্ত থাকে, মৃগী ইত্যাদি ইত্যাদি।

Staphisagria : পুরুষদের যৌন দুর্বলতা দূর করার ক্ষেত্রে স্টেফিসেগ্রিয়া একটি শ্রেষ্ট ঔষধ। বিশেষত **অতিরিক্ত যৌনকর্ম করার কারণে বা মাত্রাতিরিক্ত হস্তমৈথুনের** ফলে যাদের ধ্বজভঙ্গ হয়ে গেছে, তাদের ক্ষেত্রে বেশী প্রযোজ্য। এটি Q, ৩, ৬, ৩০, ২০০ ইত্যাদি যে-কোন শক্তিতে খেতে পারেন ; তবে যত নিম্নশক্তিতে খাওয়া যায় তত উত্তম। রোজ পাঁচ ফোটা করে সকাল-সন্ধ্যা দু'বার। বিয়ের প্রথম কিছুদিনে মেয়েদের প্রস্রাব সম্পর্কিত অথবা যৌনাঙ্গ সম্পর্কিত

কোন সমস্যা হলে নিশ্চিন্তে স্টেফিসেগ্রিয়া নামক ঔষধটি খেতে পারেন। কারণ স্টেফিসেগ্রিয়া একই সাথে যৌনাঙ্গ সম্পর্কিত রোগে এবং আঘাতজনিত রোগে সমান কাযর্কর।

Salix nigra : মাত্রাতিরিক্ত যৌনকর্ম, হস্তমৈথুন, স্বপ্নদোষ প্রভৃতি কারণে সৃষ্ট পুরুষদের যৌনকর্মে দুর্বলতা বা অক্ষমতার একটি শ্রেষ্ট ঔষধ হলো স্যালিক্স নাইগ্রা। এসব কারণে যাদের ওজন কমে গেছে, এই ঔষধ একই সাথে তাদের ওজনও বাড়িয়ে দিয়ে থাকে যথেষ্ট পরিমাণে। পাশাপাশি অবিবাহিত যুবক-যুবতী বা যাদের স্বামী-স্ত্রী বিদেশে আছেন অথবা মারা গেছেন, এই ঔষধ তাদের মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজনা কমিয়ে দিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপনে সাহায্য করে। এটি মাদার টিংচার (Q) শক্তিতে ২০ থেকে ৫০ ফোটা করে রোজ দুবার করে খেতে পারেন। (সোজাকথায়, এই ঔষধটি যাদের যৌনশক্তি স্বাভাবিকের চেয়ে কম তাদেরটা বাড়িয়ে স্বাভাবিক করবে এবং যাদেরটা স্বাভাবিকের চেয়ে অতিরিক্ত বেশী তাদেরটা কমিয়ে স্বাভাবিক করবে।)

Sabal serrulata : সেবাল সেরুলেটা পুরুষদের যৌনশক্তি বৃদ্ধি করে এবং পাশাপাশি হজমশক্তি, ঘুম, শারীরিক শক্তি, ওজন (কম থাকলে) ইত্যাদিও বৃদ্ধি পায়। এটি মেয়েদেরও যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি করে থাকে এবং ক্ষুদ্রাকৃতির স্তনবিশিষ্ট মেয়েদের স্তনের আকৃতি বৃদ্ধি করে থাকে। বয়স্ক পুরুষদের প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধিজনিত যে-কোন সমস্যা এবং ব্রঙ্কাইটিস নির্মূল করতে পারে। এটি মাদার টিংচার (Q) শক্তিতে ২০ থেকে ৫০ ফোটা করে রোজ দুবার করে খেতে পারেন।

Lycopodium clavatum : লাইকোপোডিয়াম ধ্বজভঙ্গের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রাতিরিক্ত ধূমপানের কারণে ধ্বজভঙ্গ হলে এটি খেতে পারেন। লাইকোপোডিয়ামের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **এদের পেটে প্রচুর গ্যাস হয়, এদের ব্রেন খুব ভালো কিন্তু স্বাস্থ্য খুব খারাপ**, এদের প্রস্রাব অথবা পাকস্থলী সংক্রান্ত কোন না কোন সমস্যা থাকবেই, অকাল বার্ধক্য, সকাল বেলা দুর্বলতা ইত্যাদি ইত্যাদি।

Calcarea Carbonica : ক্যালকেরিয়া কার্ব যৌনশক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিশেষত **মোটা, থলথলে স্বাস্থ্যের অধিকারী** লোকদের বেলায় এটি ভালো কাজ করে। এটি ৩০ শক্তিতে ৫ ফোটা করে রোজ সকালে একবার করে খেতে পারেন।

Natrum carbonicum : যে-সব নারীদের পুরুষরা আলিঙ্গন করলেই বীযর্পাত হয়ে যায় (সহবাস ছাড়াই) অর্থাৎ অল্পতেই তাদের তৃপ্তি ঘটে যায় এবং পরে আর সঙ্গমে আগ্রহ থাকে না, তাদের জন্য উৎকৃষ্ট ঔষধ হলো নেট্রাম কার্ব। এই কারণে যদি তাদের সন্তানাদি না হয় (অর্থাৎ বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়), তবে নেট্রাম কার্বে সেই বন্ধ্যাত্বও সেরে যাবে।

Caladium seguinum : যারা যৌনমিলনে কোন আনন্দ পান না বা যৌনমিলনের পর বীরয নির্গত হয় না বা যাদের বীরয তাড়াতাড়ি নির্গত হয়ে যায় বা যারা মাত্রাতিরিক্ত হস্তমৈথুন করে দুবর্ল হয়ে পড়েছেন, তারা ক্যালাডিয়াম খান মাদার টিংচার (Q) শক্তিতে প্রতিদিন ১০ ফোটা করে দুইবেলা।

Agnus Castus: সাধারণত গনোরিয়া রোগের পরে যৌন দুর্বলতা দেখা দিলে এটি ভালো কাজ করে। পুরুষাঙ্গ ছোট এবং নরম হয়ে যায়, পায়খানা এবং প্রস্রাবের আগে-পরে আঠালো পদার্থ নির্গত হয়, ঘনঘন স্বপ্নদোষ হয়।

Nux Vomica: নাক্স ভমিকা ঔষধটি যৌন শক্তি বৃদ্ধিতে একটি শ্রেষ্ট ঔষধ বিশেষত যারা শীতকাতর, যাদের পেটের সমস্যা বেশী হয়, সারাক্ষণ শুয়ে-বসে থাকে, শারীরিক পরিশ্রম কম করে, মানসিক পরিশ্রম বেশী করে ইত্যাদি ইত্যাদি। ভালো ফল পেতে এটিও নিম্নশক্তিতে ঘনঘন খাওয়া উচিত।

Phosphoricum Acidum: সাধারণত টাইফয়েড বা এরকম কোন **মারাত্মক রোগের ভোগার কারণে**, মাত্রাতিরিক্ত যৌনকর্ম, **হস্তমৈথুন**, স্বপ্নদোষ ইত্যাদি কারণে যৌন ক্ষমতা কমে গেলে অথবা একেবারে নষ্ট হয়ে গেলে (এবং সাথে অন্য আরো যে-কোন সমস্যা হউক না কেন) এসিড ফস আপনাকে সব ফিরিয়ে দিবে।

Selenium : যৌন শক্তির দুর্বলতা, দ্রুত বীর্য নির্গত হওয়া, স্বপ্নদোষ, মাথার চুল পড়ে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যায় সেলিনিয়াম একটি প্রথম শ্রেণীর ঔষধ। **বিশেষত যাদের কোষ্টকাঠিন্যের সমস্যা আছে, তাদের ক্ষেত্রে এটি ভালো কাজ করে।**

☆ পুরুষাঙ্গ বড় করার জন্য Agnus castus (অতীতে যৌন অনাচার), Lycopodium (যাদের পেটে গ্যাস হয়) অথবা Baryta carb (জন্মগতভাবে বোকাটে) [শক্তি ২০০] সপ্তাহে একমাত্রা করে কয়েক মাস খান।

☆ মহিলাদের মাত্রাতিরিক্ত যৌন উত্তেজনা দমনের জন্য Platinum, Baryta mur অথবা Salix nigra প্রতিদিন একবার করে খান। পুরুষদের অতিরিক্ত যৌন উত্তেজনা দমনের জন্য Salix nigra অথবা Agnus castus (শক্তি ২০০) তিনবেলা করে পনেরদিন খান।

☆ অবিবাহিত মেয়েদের অতিরিক্ত যৌন উত্তেজনা দমনের জন্য Platinum (শক্তি ২০০) তিনবেলা করে কিছুদিন খেয়ে পরে শক্তি বাড়িয়ে খেতে পারেন।

☆ মহিলাদের যৌন মিলনে বিতৃষ্ণা দূর করতে Agnus castus (শক্তি Q,৩,৬) পাঁচ ফোটা করে দুইবেলা করে পনেরদিন খান।

## Insomnia, Sleeplessness (অনিদ্রা, নিদ্রাহীনতা) ঃ-

আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা মানুষের জীবনযাত্রাকে করেছে ভয়ঙ্কর জটিল আর এই জটিলতা কেড়ে নিয়েছে তার আরামের ঘুম। অনিদ্রা মানে কম সময় ঘুমানো নয়; বরং অনিদ্রা মানে হলো ঘুমিয়ে তৃপ্তি না পাওয়া, ক্লান্তি দূর না হওয়া, দেহ-মনে সতেজ ভাব না আসা। নিদ্রাহীনতা নিয়ে একেক জনের অভিযোগ একেক রকম। কারো ঘুমই আসতে চায় না, কেউ ঘুমিয়ে তৃপ্তি পান না, কারো ঘুম আসতে আসতে অনেক রাত হয়ে যায়, কারো ঘুম খুব ভোরে ভেঙ্গে যায়, কারো ঘুম একটু পরপরই ভেঙ্গে যায় ইত্যাদি। এই অনিদ্রা রোগ বা নিদ্রাহীনতার হাত থেকে বাচাঁর জন্য মানুষ বোতলের পর বোতল ঘুমের ট্যাবলেট সাবাড় করছে; তাতে প্রথমে কিছুদিন ঘুম হলেও পরে আর ঘুমের ট্যাবলেটেও কোন কাজ হয় না। অথচ আমাদের অনেকেই জানি না, নিদ্রাহীনতার সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা আছে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক ডোজ হোমিও ঔষধেই নিদ্রাহীনতা স্থায়ীভাবে সারিয়ে তোলা যায়।

নিদ্রাহীনতা সাধারণত ৩ ধরণের হয়ে থাকে। যথা- সাময়িক (Transient), সবিরাম বা কিছুদিন পরপর দেখা দেওয়া (Intermittent) এবং স্থায়ী বা দীর্ঘ স্থায়ী (Chronic)। অনিদ্রা যদিও নারী-পুরুষ উভয়েরই হতে পারে; তথাপি এটি মহিলাদের মধ্যে বেশী হতে দেখা যায়। অনিদ্রার প্রধান প্রধান কারণগুলোর মধ্যে আছে মানসিক

চাপ/দু শ্চিন্তা (Stress), উৎকণ্ঠা (anxiety), বিষন্নতা (depression), ভীতি (phobia), মানসিক ভারসাম্যহীনতা (schizophrenia), ঘুমের টাইম উলটপালট করা (Reversal of sleep rhythm), বাতের ব্যথা (arthritis), উচ্চ রক্তচাপ (high blood pressure), হৃদরোগ (heart disease), হাঁপানি (asthma), এলার্জি (allergies), থাইরয়েড হরমোনের ত্রুটি (hyperthyroidism/hyperthyroidism), পারকিনসন্স ডিজিজ (Parkinson's disease), মাথায় আঘাত পাওয়া (head injury), গভর্ধারণ (pregnancy), মাদকাসক্তি (addiction), ঘুম-বিষন্নতার ঔষধের অতিরিক্ত সেবন (Drugs withdrawals) ইত্যাদি ইত্যাদি। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের নিদ্রা যাওয়ার ক্ষমতা কমতে থাকে। কিন্তু কেন ? হয়ত আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, বয়স্ক ব্যক্তিরা জীবনের শেষ পযার্য়ে এসে রাত জেগে ইবাদত-বন্দেগী করে করে তাদের স্রষ্টার নৈকট্য অজর্ন করতে যাতে কোন কষ্ট না হয়।

অনিদ্রা রোগের বংশগত সম্পর্ক আছে ; তার মানে পিতা-মাতার অনিদ্রা রোগ থাকলে সন্তানদেরও অনিদ্রা রোগের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সাধারণত নিদ্রাহীনতার কারণে ক্লান্তি, দুবর্ব্লতা, কোন কাজে মনোযোগ দিতে না পারা, খিটখিটে মেজাজ ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে। সাময়িক নিদ্রাহীনতা (Transient insomnia) ঔষধ ছাড়াই কেবল জীবনধারায় (lifestyle) কিছুটা পরিবর্তন আনার মাধ্যমে দূর করা যায়। কিন্তু স্থায়ী বা দীর্ঘ স্থায়ী (Chronic) নিদ্রাহীনতা সারিয়ে তোলতে প্রথমে তার জন্য দায়ী শারীরিক-মানসিক রোগটিকে (underlying causes) চিকিৎসার মাধ্যমে দূর করতে হবে।

বহুল প্রচলিত এলোপ্যাথিক ঘুমের ট্যাবলেটগুলোতে ক্রনিক অনিদ্রা রোগের চিকিৎসায় তেমন কোন উপকার করে না। বরং এগুলো কেহ দীর্ঘদিন খেলে তার প্রতি নেশা (dependency) হয়ে যায়। তাছাড়া এই ঔষধগুলো আমাদের বিবেক, বিচারক্ষমতা, স্মরণশক্তি, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদির সমূহ ক্ষতি করে থাকে। আর গবেষণায় দেখা গেছে যে, যারা নিয়মিত এসব ঘুমের ট্যাবলেট খান, তাদের অকাল মৃত্যুর হার অন্যদের চাইতে বেশী। ঘুমের ট্যাবলেটের প্রতিক্রিয়ায় দিনের বেলায় কাজ-কর্ম, ইবাদত-বন্দেগী, গাড়িচালানো, হাঁটার সময় ব্যালেন্স রক্ষা করা ইত্যাদি কাজ করতে অনেক অসুবিধা হয় কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ঘুমের ঔষধগুলোতে এসব সমস্যা নাই। অনেকে একসাথে অনেকগুলো ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে আত্মহত্যা করে বসে কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ঘুমের ঔষধগুলো কেউ একসাথে অনেক পরিমাণে খেলেও মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই।

Nux vomica : রাতে বিছানায় যাওয়ার পরে সারাদিনের কাজ-কর্মের চিন্তা মাথার ভিতরে কিলবিল করতে থাকে ; ফলে ঘুম আসতে চায় না। বিশেষত যারা বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য সেবন করে, বেশী বেশী চা-কফি পান করেন, যাদের পেটের অসুখ বেশী হয়, নাক্স তাদের অনিদ্রায় ভালো কাজ করে থাকে।

Opium : ঘুমঘুম ভাব কিন্তু ঘুম আসে না। খুবই সেনসিটিভ, ঘড়ির কাটার শব্দ কিংবা দূরের কোন মোরগের ডাকেও তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। দুঃস্বপ্ন দেখে, কুকুর, বিড়াল, প্রেতাত্মা, বোবায়ধরা স্বপ্নে দেখে, ঘুমের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসে ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে অপিয়াম ঔষধটি খেতে হবে।

Kali phosphoricum : ক্যালি ফস অনিদ্রার একটি সেরা ঔষধ। বিভিন্ন কঠিন রোগ ভোগ, অত্যধিক শারীরিক-মানসিক পরিশ্রম, অপুষ্টি, দীর্ঘদিন যাবত স্তন্যদান করা ইত্যাদির মাধ্যমে সৃষ্ট নিদ্রাহীনতায় (বা অন্যকোন রোগে) ক্যালি ফস খেতে হয়। মাঝে মাঝে সপ্তাহ খানেক বিরতি দিয়ে দীর্ঘদিন খান। হৃদপিন্ড, স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের উপর ইহার

প্রশান্তিকারক ক্রিয়া বিদ্যমান। তাছাড়া যেহেতু এটি একটি ভিটামিন জাতীয় ঔষধ, তাই ইহার কোন ক্ষতিকর সাইড-ইফেক্ট নাই বললেই চলে।

Coffea cruda : মানসিক উত্তেজনা, উৎকন্ঠা, দুঃশ্চিন্তা থেকে অনিদ্রা দেখা দিলে তাতে কফিয়া প্রযোজ্য। সুসংবাদ শুনে, আনন্দের আতিশয্যে, শিশুদের দাঁত ওঠার বয়সে বা রাত জাগার কারণে অনিদ্রা হলে তাতে কফিয়ার কথা ভাবতে হবে। মহিলাদের সন্তান প্রসব পরবর্তী সময়ের অনিদ্রায় কফিয়া ভালো কাজ করে। খুবই সেনসেটিভ রোগীদের ক্ষেত্রে কফিয়া প্রযোজ্য যারা আওয়াজ সহ্য করতে পারে না, গন্ধ সহ্য করতে পারে না, স্পর্শ সহ্য করতে পারে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

Ambra Grisea : সাধারণত চাকুরি বা ব্যবসা সংক্রান্ত দুঃশ্চিন্তার কারণে নিদ্রাহীনতা হলে তাতে এমব্রাগ্রিসিয়া প্রযোজ্য। সারাদিন পরিশ্রম করে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে কিন্তু যখনই বালিশে মাথা রাখে, সাথে সাথেই ঘুম চলে যায়। এই ঔষধের একটি অদ্ভুত লক্ষণ হলো এরা অপরিচিত কেউ সামনে বা আশেপাশে থাকলে, পায়খানা করতে পারে না।

Hyoscyamus niger : মাত্রাতিরিক্ত মাথা খাটুনির কাজ (brainwork) করার কারণে অনিদ্রা দেখা দিলে তাতে হায়োসাইয়েমাস খেয়ে উপকার পাবেন। মাথার মধ্যে জোয়ারের পানির মতো ফালতু চিন্তার স্রোত বইতে থাকে। যদি শিশুরা ঘুমের মধ্যে চীৎকার করে ওঠে, কাঁপতে থাকে ; তবে তাতে হায়োসায়েমাস প্রযোজ্য।

Sulphur : সকাল ১১টার দিকে ভীষণ খিদে পাওয়া, শরীর গরম লাগা, মাথা গরম কিন্তু পা ঠান্ডা, মাথার তালু-পায়ের তালুতে জ্বালাপোড়া ইত্যাদি লক্ষণ পাওয়া গেলে নিদ্রাহীনতা রোগেও সালফার প্রয়োগ করে দারুণ ফল পাবেন।

Belladonna : যদি মুখমন্ডল **বা মাথা গরম বা লাল হয়ে থাকে,** মাথা ব্যথার থাকে, **শরীরে জ্বালা-পোড়াভাব থাকে ইত্যাদি কারণে নিদ্রাহীনতা দেখা দেয়,** তবে তাতে বেলেডোনা প্রযোজ্য।

Chamomilla : শরীরের কোথাও মারাত্মক ব্যথার কারণে ঘুমাতে না পারলে, সেক্ষেত্রে ক্যামোমিলা প্রয়োগ করতে হবে। যারা অর্থহীন আজেবাজে স্বপ্নের কারণে শান্তিতে ঘুমাতে পারে না, ঘুমের ভেতরে ছটফট করতে থাকে, দুবর্ল-নার্ভাস মহিলা, শরীর গরম, প্রচুর পিপাসা ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে ক্যামোমিলা উপকার দিবে।

Arsenic album : মাত্রাতিরিক্ত অস্থিরতা, এক মুহূর্তও এক পজিশনে স্থির থাকতে পারে না, লক্ষণ থাকলে তাতে আর্সেনিক খেতে হবে। রাতে একবার ঘুম ভাঙলে আর ঘুম আসে না।

Gelsemium : সাধারণত যারা অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করেন অথবা বিষন্নতায় ভোগেন, তাদের অনিদ্রা দূর করতে ব্যবহৃত হয়।

Ignatia amara : সাধারণত শোক-দুঃখ-বিরহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদি কারণে ঘুম না আসলে তাতে ইগ্নেশিয়া প্রযোজ্য। এদের ঘুম এত পাতলা হয় যে, তারা ঘুমের মধ্যে চারপাশের সবকিছুই শুনতে পায়।

Magnesium carbonica : সাধারণত পেটের কোন অস্বস্তি, ভীষণ শীতকাতর-জামাকাপড় খুলতে চান না, পেটে গ্যাসের উৎপাত, আক্কেল দাঁত ওঠা, সারারাত ঘুমিয়েও ফ্রেস লাগে না বরং ঘুম থেকে ওঠার পরে খুবই টায়ার্ড লাগে-মনে হয় সারারাত কুস্তি খেলেছেন, আগুন-ডাকাত-ঝগড়া-মরা মানুষ ইত্যাদি স্বপ্ন দেখে ইত্যাদি লক্ষণে ম্যাগ কার্ব খেতে পারেন।

Cocculus indicus : সাধারণত ভীতু, নার্ভাস, অত্যধিক পড়াশোনা করে এমন লোকদের ক্ষেত্রে কুকুলাস প্রয়োগ করতে হয়। রাত জেগে কাজ করার কারণে যদি অনিদ্রা দেখা দেয়, তবে অবশ্যই ককুলাস খাবেন।

Cannabis indica : ক্যানাবিস ইন্ডিকা সাধারণত দীর্ঘদিনের পুরনো এবং দুরারোগ্য অনিদ্রা রোগে প্রযোজ্য। যাদের একেক দিন একেক টাইমে ঘুম আসে, দিনে ঘুম আসে প্রচুর, রাতের ঘুমে কোন আরাম পাওয়া যায় না, রাতে গরম লাগে যেন কেউ তার গায়ে গরম পানি ঢালতেছে ইত্যাদি লক্ষণে ক্যানাবিস খেতে পারেন। যেহেতু এই ঔষধটি গাঁজা থেকে তৈরী করা হয়, তাই বলা যায় গাঁজার নেশা করার কারণে যদি কারো অনিদ্রা দেখা দেয়, তারা এটি খেয়ে উপকৃত হবেন।

## কিডনী রোগের প্রকৃত চিকিৎসা (Kidney diseases, Nephrological diseases) :

সমপ্রতি বাংলাদেশে কিডনী নষ্ট হওয়াসহ অন্যান্য মারাত্মক কিডনী রোগ বৃদ্ধির যে পিলে চমকানো খবর বেরিয়েছে, তাতে যে-কোন সচেতন ব্যক্তিমাত্র মর্মাহত হবেন। পরিসংখ্যান মতে, বাংলাদেশে ষোল কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় দুই কোটি লোক কিডনী রোগে আক্রান্ত। এদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী জটিল কিডনী রোগে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় এক কোটি আশি লক্ষ। এই রোগে প্রতি ঘণ্টায় মৃত্যুবরণ করছে ৫ জন। যেহেতু কিডনী ডায়ালাইসিস (haemodialysis) এবং নতুন কিডনী লাগানোর (kidney transplantation) মতো চিকিৎসায় লক্ষ লক্ষ খরচ করতে হয়, সেহেতু বেশীর ভাগ রোগীই বলতে গেলে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করে। তাছাড়া দীর্ঘস্থায়ী কিডনী রোগীদের বেশীর ভাগই হার্টএটাকে মারা যায়। কারণ কিডনী রোগ, হার্টএটাক এবং ডায়াবেটিস একেবারে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, এসব প্রাণনাশী কিডনী রোগের সংখ্যা কল্পনাতীত হারে বৃদ্ধির মুল কারণ হলো ভেজাল খাবার (Contaminated food), ডায়াবেটিস (Diabetes mellitus) এবং উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension)। এই তিনটি কারণকে এলোপ্যাথিক কিডনী বিশেষজ্ঞরা প্রকৃত কারণ বললেও আসলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বরং বেশী বেশী এলোপ্যাথিক ঔষধ খাওয়াকেই কিডনী নষ্ট হওয়ার মূল কারণ বলতে হবে। কেননা আমরা অনেকেই জানি না যে, আমরা যতো ঔষধ খাই তার অধিকাংশই রক্তে প্রবেশ করে তাদের কাজ-কর্ম পরিচালনা করে থাকে। পরবর্তীতে তাদেরকে রক্ত থেকে সংগ্রহ করে ছেকে ছেকে শরীর থেকে বের করার দ্বায়িত্ব পালন করতে হয় এই কিডনী দুটিকে। ফলে আমরা যতো বেশী ঔষধ খাই, আমাদের কিডনীকে তত বেশী পরিশ্রম করতে হয় এবং ফলস্রুতিতে কিডনী দুটি তত বেশী দুর্বল-ক্লান্ত-শ্রান্ত-অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাছাড়া বেশী বেশী ঔষধ খেলে তাদেরকে শরীর থেকে বের করে দেওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে হয়।

কিন্তু আমাদের অনেকেই বেশী বেশী পানি খাওয়ার বিষয়টি মেনে চলি না। কিডনী ড্যামেজ হওয়ার মূল কারণ হিসেবে যে রোগকে বিবেচনা করা হয় তার নাম নেফ্রাইটিস (Nephritis/ Bright's disease) এবং নেফ্রাইটিস হওয়ার মুল কারণও এই ঔষধ। কিডনী যদিও নিয়মিত আমাদের খাওয়া সকল ঔষধসমুহ নিষ্কাশন করে কিন্তু তার মাঝেও ঔষধের দুয়েকটা কণা কিডনীর অজান্তেই কিডনীর গায়ে লেগে থাকে। পরবর্তীতে সেই কণাটির ওপর নানারকমের জীবাণু, ক্যামিকেল, মৃতকোষ ইত্যাদি জমতে জমতে সেটির গঠন বদলে যায়। ফলে কিডনী আর সেই কণাটিকে চিনতে পারে না। এক সময় কণাটি নিজে কিডনীর একটি অংশ হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু কিডনী সেই কণাটিকে গ্রহন করতে রাজী হয় না। শেষ পরযন্ত কিডনীর ভিতরে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় যাকে ডাক্তারী ভাষায় বলে অটোইমিউন রিয়েকশান (Auto immune reaction)। এভাবে কিডনীর এক অংশ অন্য অংশকে চিনতে না পেরে শত্রু হিসেবে গণ্য করে এবং তাকে ধ্বংস করার জন্য উঠেপড়ে লেগে যায়। ফলে কিডনী নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে আনে এবং আমরা কবরের বাসিন্দা হয়ে যাই। সাথে সাথে আমাদের সন্তান-সন্ততিদের করে যাই পথের ভিখারী। কেননা এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় কিডনী রোগের যে চিকিৎসা খরচ, তাতে যে-কোন কিডনী রোগীর পরিবারকে পথে নামতে ছয় মাসের বেশী লাগে না। কাজেই বলা যায় যে, উচ্চরক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস আমাদের কিডনীর যতটা ক্ষতি না করে, তারচেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি করে এসব রোগ চিকিৎসার নামে যুগের পর যুগ খাওয়া মারাত্মক ক্ষতিকর এলোপ্যাথিক কেমিক্যাল ঔষধগুলি।

বিশেষ করে যে-সব এলোপ্যাথিক ঔষধ মানুষ বেশী বেশী খায় (যেমন-এন্টিবায়োটিক, ব্যথার ঔষধ, বাতের ঔষধ, ঘুমের ঔষধ, ব্লাড প্রেসারের ঔষধ, মানসিক রোগের ঔষধ ইত্যাদি), এগুলো কিডনীর এতই ক্ষতি করে যে, এদেরকে কিডনীর যম বলাই উচিত। একটি বাস-ব সত্য কথা হলো, প্রচলিত অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ কখনও সারে না ; বলা হয় এগুলো "নিয়ন্ত্রণে থাকে"। আসল কথা হলো, কোন ঔষধ যখন বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ খাওয়া হয়, তখন সেই ঔষধ আর রোগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না বরং রোগই সেই ঔষধকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে। ফলে এসব কুচিকিৎসায় ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ তো সারেই না বরং দিন দিন আরো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। মাঝখানে মারাত্মক মারাত্মক ঔষধের ধাক্কায় কিডনীর বারোটা বেজে যায়। অথচ একজন বিশেষজ্ঞ হোমিও ডাক্তারের অধীনে চিকিৎসা নিলে ডায়াবেটিস, উচ রক্তচাপ এবং নেফ্রাইটিস দুয়েক বছরের মধ্যেই কেবল নিয়নত্রণ (control) নয় বরং একেবারে নির্মুল (cure) হয়ে যায়। এমনকি যদি এসব রোগ নিরাময়ের জন্য যুগের পর যুগও হোমিও ঔষধ খেতে হয়, তথাপি হোমিও চিকিৎসা করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে। কেননা হোমিও ঔষধে যেহেতু ঔষধের পরিমাণ থাকে খুবই কম, সেহেতু এগুলো কয়েক যুগ খেলেও কিডনীতে জমে কিডনী নষ্ট হওয়ার সম্ভাবণা নাই। হ্যাঁ, অন্যান্য রোগের মতো কিডনী রোগের চিকিৎসাতেও হোমিও ঔষধ শ্রেষ্টত্বের দাবীদার। কারণ প্রচলিত অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে কিডনী রোগের কষ্টগুলো নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও কিডনী রোগের পেছনের মূল কারণসমূহ (Link) দূর করা যায় না। একমাত্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মাধ্যমেই কেবল কিডনী রোগের পেছনের মূল কারণসমূহ দূর করা সম্ভব হয় এবং এভাবে একই রোগ কয়েক বছর পরপর ঘুরে ফিরে বার বার ফিরে আসা ঠেকানো যায়।

কিডনী নষ্ট হওয়ার কারণে যারা ডায়ালাইসিস (haemodialysis) করে বেঁচে আছেন, তারাও ডায়ালাইসিসের পাশাপাশি হোমিও চিকিৎসা গ্রহন করে তাদের বিকল কিডনীকে ধীরে ধীরে সচল করে তুলতে পারেন। হ্যাঁ, হোমিওপ্যাথিতে বংশগত রোগ প্রবনতার (Chronic miasm) ইতিহাস এবং শারীরিক-মানসিক গঠনগত (Constitutional traits) বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ করলে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস'া (immune system) উজ্জীবিত হয় এবং ফলশ্রুতিতে দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে নষ্ট কিডনী আবার ভালোভাবে কাজ করতে শুরু করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিডনী পুরোপুরি ভালো না হলেও যথেষ্ট উন্নতি হওয়ার ফলে ডায়ালাইসিসের সংখ্যা কমানো যায়। যেমন- দেখা যায় যেই রোগীর প্রতি সপ্তাহে দুইবার ডায়ালাইসিস করতে হতো, তার হয়ত এখন পনের দিনে বা মাসে একবার ডায়ালাইসিস করলেই চলে। আর কিডনী পুরোপুরি ভালো হয়ে গেলে ডায়ালাইসিস পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া যায়। অথচ প্রচলিত অন্যান্য চিকিৎসায় একবার ডায়ালাইসিস শুরু করলে কিডনী না পাল্টানো (kidney transplantation) পর্যন্ত আর সেটি বন্ধ করা যায় না। বরং যত দিন যায় ডায়ালাইসিস তত বেশী ঘন ঘন করতে হয়। আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, ডায়ালাইসিসের মাধ্যমে নষ্ট কিডনী (CRF) কখনও ভালো করা যায় না বরং ইহার মাধ্যমে কেবল কিডনীর কাজ বিকল্প উপায়ে সমপন্ন করে রোগীকে বাঁচিয়ে রাখা হয়। হ্যাঁ, একথা সত্য যে, শতকরা নব্বইভাগ রোগ বিনা চিকিৎসাতেই ভালো হয়ে যায় (আমাদের শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বদৌলতে)। এতে সময় বেশী লাগে কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসা গ্রহন করলে অনেক কম সময়ে রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সেহেতু অনেকের সাময়িকভাবে নষ্ট কিডনীও বিনা চিকিৎসায় ভালো হয়ে যেতে পারে।

সাধারণত কিডনী রোগের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা রোগের ভয়াবহতার মাত্রা এবং রোগের পেছনের অনর্তনিহিত কারণ অনুযায়ী দুই থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে শেষ করা যায়। কিন্তু প্রচলিত অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে কিডনী রোগের চিকিৎসা প্রায় সারাজীবনই চালিয়ে যেতে হয়। নষ্ট কিডনী প্রচলিত অন্যান্য চিকিৎসায় কখনও ভালো হয় না। কারণ তাদের টার্গেট হলো কিডনীকে ভালো করা নয় বরং কৃত্রিম উপায়ে কিডনীর কাজ অন্যভাবে চালিয়ে নেওয়া (যেমন- ডায়ালাইসিস করা এবং কিডনী পাল্টানো)। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মায়াজমেটিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এতে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটতে দেখা যায়, যা অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে অকল্পনীয়। যেমন- হোমিও চিকিৎসায় কিডনীর ধ্বংস হওয়া কোষন্তর (tissue) জায়গায় ভালো টিস্যু গজাতে দেখা যায়। সাধারণত কিডনী পাল্টানোর পরে অনেক ক্ষেত্রে কিডনী গ্রহীতার শরীর এই নতুন কিডনীকে গ্রহন করতে চায় না (immune reaction), নতুন কিডনীকে সে প্রত্যাখান করে (rejection of new kidney)। নতুন কিডনীকে প্রত্যাখ্যানের এই হার বেশ উচ্চ। রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় ছাড়া অন্যদের কিডনী গ্রহন করলে এসব বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে থাকে। প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতিতে নতুন কিডনীর বিরুদ্ধে শরীরের এই বিদ্রোহকে সামাল দিতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হয় ; অথচ এসব ক্ষেত্রে অপারেশনের পূর্ব থেকেই (অথবা অপারেশনের পরেও) যদি হোমিও চিকিৎসা অবলম্বন করা হয় তবে অন্তত একশগুণ কম খরচে বিদ্রোহ সামাল দেওয়া সম্ভব।

নতুন কিডনী সংযোজনের পরে অনেক সময় দেখা যায় কিডনীর সাথে সম্পর্কিত রোগের (যেমন-ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদির) মাত্রা বেড়ে গিয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, তাকে আর নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের মতো কিডনীর সাথে সমপর্কিত রোগসমুহ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় যে কত সহজে দমন করা যায়, তা পুর্বেই বলেছি। কিডনী রোগীদের পাশাপাশি যাদের কিডনী রোগ নাই কিন্তু ফ্যামিলিতে কিডনী রোগের ইতিহাস আছে, তাদের উচিত প্রতিরোধমুলক (Preventive) হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নিয়ে কিডনী নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকা। কারণ একজন দক্ষ হোমিও ডাক্তার যে-কোন মানুষের সামগ্রিক ইতিহাস শুনলে অদুর অথবা দুর ভবিষ্যতে তার কি কি রোগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তা বুঝতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ করে তাকে সে রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থেকে রক্ষা করতে পারেন। যারা জন্মের পর থেকেই একজন হোমিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসার অধীনে থাকেন, তাদের কিডনী নষ্ট হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। আবার যে-সব ডায়াবেটিস রোগী একই সাথে উচ্চ রক্তচাপেও ভোগছেন, তাদের কিডনী নষ্ট হওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য হোমিও চিকিৎসা গ্রহন করা একেবারে ফরজ। যে-সব কিডনী রোগীর রোগের কারণ অজ্ঞাত বলে ডাক্তাররা মতামত দেন, তাদের জন্যও হোমিও চিকিৎসা অবলম্বন করা ফরজ।

আপনার কিডনী রোগ হালকা, মাঝারি, মারাত্মক বা চরম মারাত্মক যে পর্যায়েই থাকুক না কেন, (কিডনী একশভাগ নষ্ট হওয়ার পুবেই) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার হোমিও চিকিৎসা অবলম্বন করা উচিত। কারণ হোমিওপ্যাথিতে "অনেক দেরি হয়েছে গেছে" বলে কোন কথা নাই। যে-সব কিডনী রোগী জরুরি ভিত্তিতে কিডনী পাল্টানোর চেষ্টা করছেন, তারাও হোমিও চিকিৎসার মাধ্যমে কিডনী পাল্টানোর জন্য বেশী সময় পেতে পারেন। আরেকটি কথা হলো, অন্য যে-কোন পদ্ধতির চিকিৎসার পাশাপাশিও আপনি হোমিও চিকিৎসা গ্রহন করতে পারেন ; এতে কোন সমস্যা হয় না। পরিশেষে কিডনীরোগ বিশেষজ্ঞসহ সেবার মানসিকতা সমপন্ন সকল মেধাবী ডাক্তারদের প্রতি আমাদের আহ্বান, আপনারা সামান্য কষ্ট শিকার করে হোমিওপ্যাথি আয়ত্ত করে নিন এবং হোমিও ঔষধ প্রেসক্রাইব করুন যাতে কিডনী রোগীরা বহুগুণ কম খরচে, কম সময়ে এবং কম ভোগান্তির মাধ্যমে রোগমুক্ত হতে পারেন।

☆ **কিডনী রোগ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, হাঁপানি ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক রোগের চিকিৎসায় ক্যানসারের চিকিৎসায় বর্নিত পলিসিগুলো ফলো করতে হবে। কিডনী রোগে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান হোমিও ঔষধসমূহের মধ্যে আছে** Apocynum, Berberis vul., Chimaphila umb., Equisetum, Ocimum can, Pareira, Scarlatininum, Scilla maritima, Solidago, Vipera, Alfalfa, Collinsonia canadensis, Corallium rubrum, Apis, Galium aparine, Guaiacum officinale, Kali aceticum, Kali nitricum, Liatris spicata, Magnesia sulphurica, Scilla maritima, Solanum nigrum, Thyroidinum, Urea, Chimaphila umbellata **ইত্যাদি ইত্যাদি।**

Thuja occidentalis : রোগী যদি টিকা (vaccine) নেওয়ার কারণে (অর্থাৎ রোগীর যদি বেশী বেশী টিকা নেওয়ার অভ্যাস থাকে) কারণে কিডনী রোগে আক্রান্ত হন, তবে থুজা অক্সিডেন্টালিস ১০০০ শক্তিতে (Thuja occidentalis 1M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান, তার একমাস বিরতির পরে থুজা অক্সিডেন্টালিস ১০,০০০ শক্তিতে (Thuja occidentalis 10M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান এবং তারও দুই মাস বিরতির পরে থুজা অক্সিডেন্টালিস ৫০,০০০ শক্তিতে (Thuja occidentalis 50M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান। (রোগীর শরীর যদি বেশ দুর্বল হয়, তাহলে সব ঔষধের ক্ষেত্রেই ৩০, ২০০ ইত্যাদি নিম্ন শক্তি ব্যবহার করবেন।)

Urtica urens : যদি জানতে পারেন যে শারীরিক আঘাত পাওয়ার কারণে রোগী কিডনী রোগে আক্রান্ত হয়েছে, তবে তাকে কিছুদিন আর্টিকা (Urtica urens) ঔষধগুলো খাওয়ান। **সাধারণত নিম্নশক্তিতে (কিউ) ৫ ফোটা করে রোজ ৩ বার করে কয়েক সপ্তাহ খান।**

Natrum muriaticum : রোগী যদি বড় ধরনের কোন মানসিক আঘাতের (যেমন- প্রেমে ব্যর্থতা, আপনজনের মৃত্যু, তালাক, চাকরি হারানো ইত্যাদি) কারণে কিডনী রোগে আক্রান্ত হন, তবে নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম ১০০০ শক্তিতে (Natrum muriaticum 1M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান, তার একমাস বিরতির পরে নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম ১০,০০০ শক্তিতে (Natrum muriaticum 10M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান এবং তারও একমাস বিরতির পরে নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম ৫০,০০০ শক্তিতে (Natrum muriaticum 50M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান। পক্ষান্তরে শরীর দুর্বল থাকলে ৩০ শক্তিতে রোজ একবার করে কয়েক সপ্তাহ খাওয়ান।

Syphilinum : যদি রোগী বা রোগীর পিতা-মাতা-স্বামী-স্ত্রী অতীতে সিফিলিসে আক্রান্ত হয়ে থাকে, তবে সিফিলিনাম ১০০০ শক্তিতে (Syphilinum 1M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান, তার একমাস বিরতির পরে সিফিলিনাম ১০,০০০ শক্তিতে (Syphilinum 10M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান এবং তারও একমাস বিরতির পরে সিফিলিনাম ৫০,০০০ শক্তিতে (Syphilinum 50M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান।

Bacillinum : যদি রোগীর যক্ষা বা হাঁপানি রোগের পারিবারিক / বংশগত ইতিহাস থাকে (অথবা ঘনঘন সর্দি-কাশি হওয়ার অভ্যাস থাকে), তবে ব্যাসিলিনাম ১০০০ শক্তিতে (Bacillinum 1M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান, তার তিন মাস বিরতির পরে ব্যাসিলিনাম ১০,০০০ শক্তিতে (Bacillinum 10M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান এবং তারও তিন মাস বিরতির পরে ব্যাসিলিনাম ৫০,০০০ শক্তিতে (Bacillinum 50M) এক মাত্রা (অর্থাৎ এক ফোটা বা দশটি বড়ি) ঔষধ খান।

Medorrhinum : অতীতে যাদের গনোরিয়া হয়েছিল অথবা যাদের পিতা-মাতা-স্বামীর গনোরিয়া ছিল, তাদেরকে মেডোরিনাম না খাইয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদেরকে স্থায়ীভাবে রোগমুক্ত করা যায় না। মেডোরিনামের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো পেট নীচের দিকে দিয়ে ঘুমায়, চকোলেট-কমলা খুবই পছন্দ করে, অন্ধকারে ভয় পায়, গতকালের ঘটনাকে মনে হয় অনেক বছর আগের ঘটনা, সব কাজে তাড়াহুড়া করে ইত্যাদি ইত্যাদি। ঔষধটি ১০,০০০ শক্তিতে ৩ মাস পরপর একমাত্রা করে খাওয়া উচিত এবং প্রয়োজন হলে পরবতীতে শক্তি বাড়িয়ে খাওয়া যেতে পারে।

Psorinum : অতীতে যাদের দুর্গন্ধযুক্ত চর্মরোগ হওয়ার ইতিহাস আছে, তাদেরকে অবশ্যই কয়েক মাত্রা সোরিনাম খাওয়াতে হবে।

Arsenicum album : রোগীর মধ্যে **প্রচণ্ড অস্থিরতা (অর্থাৎ রোগী এক জায়গায় বা এক পজিশনে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। এমনকি গভীর ঘুমের মধ্যেও সে নড়াচড়া করতে থাকে।), শরীরের বিভিন্ন স্থানে ভীষণ জ্বালা-পোড়া ভাব, অল্প সময়ের মধ্যেই রোগী দুর্বল-কাহিল-নিস্তেজ হয়ে পড়ে,** রোগীর বাইরে থাকে ঠান্ডা কিন্তু ভেতরে থাকে জ্বালা-পোড়া, অতিমাত্রায় মৃত্যুভয়, **রোগী মনে করে ঔষধ খেয়ে কোন লাভ নেই- তার মৃত্যু নিশ্চিত**, গরম পানি খাওয়ার জন্য পাগল কিন্তু খাওয়ার সময় খাবে দুয়েক চুমুক ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে অবশ্যই আর্সেনিক খওিয়াতে হবে।

Silicea : যাদের হাড় বিকৃতির রোগ থাকলে কয়েক মাত্রা সিলিশিয়া খাওয়ান।

Carbo animalis : কারবো এনি কিডনী রোগীদের দুর্বলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ ।

**Labour / Delivery / Childbirth (প্রসব, সন্তান জন্মদান) :** দীর্ঘ দশমাস গর্ভধারণের পর সন্তান প্রসব বা জন্মদান হলো মাতৃত্বের চূড়ান্ত বা শেষ ধাপ। প্রতিটি মায়ের কাছেই সন্তান ডেলিভারির বিষয়টি একটি পরম কাঙ্খিত আবার একই সাথে একটি ভীতিকর ঘটনা। সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে দুই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে কোন কোন মায়েরা সিজারিয়ান অপারেশানের ভয়ে হাসপাতাল বা ক্লিনিকেই যান না আবার কোন কোন মায়েরা প্রসব ব্যথার হাত থেকে বাচাঁর জন্য সিজার করতে নিজেরাই ডাক্তারদেরকে বার বার অনুরোধ করতে থাকেন। আসলে প্রসব ব্যথাটি খুবই ভয়ঙ্কর এতে সন্দেহ নেই কিন্তু এটি এমন কোন ব্যথা নয় যে আপনি একেবারে প্রাণে মারা যাবেন। সে যাক, নরমাল ডেলিভারি হোক আর সিজারিয়ান অপারেশানই হোক, মোটকথা প্রসব কাজটি কোন হাসপাতাল বা ক্লিনিকে হওয়া ভাল। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় (শিশুর ওজন বেশী হলে) মায়েদের প্রসবদ্বার (birth canal) একটু- আধটু ছিড়ে যায়। ফলে হাসপাতালে হলে ডাক্তার বা নার্সরা ছেড়া অংশটুকু সেলাই (stitch) করে দেন এবং এতে সংশ্লিষ্ট অঙ্গটির গঠন এবং সৌন্দরয ঠিক থাকে। পক্ষান্তরে বাড়িতে সন্তান প্রসব করলে যেহেতু ছেড়া-ফাঁটা অংশটুকু আর সেলাই করা হয় না ; তাই সেই অঙ্গটির সৌন্দরয বিকৃত হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে সেটি স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক মিলনে আনন্দের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

ইদানীং অবশ্য উন্নত বিশ্বের মহিলারাও দেখা যাচ্ছে হাসপাতালের চাইতে বরং বাড়িতেই সন্তানের জন্ম দিতে বেশী স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। এতে অবশ্য তেমন কোন সমস্যা নেই। এজন্য ডেলিভারির ওপর লেখা কিছু বই পড়ে নিন এবং (ইন্টারনেট থেকে) এই সংক্রান্ত কিছু ভিডিও দেখে নিতে পারেন। পাশাপাশি একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রী (midwife) অথবা নার্সের সাহায্য নিতে ভুলবেন না। বিশেষত যারা গর্ভকালীন সময়ে হোমিও ঔষধ সেবন করেছেন এবং সন্তানের প্রসবের সময়ও হোমিও ঔষধের সাহায্য নিয়ে থাকেন, তাদের বেলায় সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে কোন জটিলতা/ঝামেলার সম্ভাবনা নাই। এবং তাদের সন্তানদের জন্মের ঘটনাটি অনেকটা "জলবৎ তরলঙ্গ" অর্র্থাৎ পানির মতো সহজ ব্যাপারে পরিণত হয়। এমনকি যাদের কোমরের বা তলপেটের (pelvic cavity) গঠন ভালো নয় বলে ডাক্তাররা সিজার করতে বলেন, তাদেরও দেখেছি শিশু এবং মায়ের কোন ক্ষতি ছাড়াই নরমাল ডেলিভারি হয়ে যায়। তাছাড়া অতীতে যাদের সিজার হয়েছে, তারাও হোমিও চিকিৎসকের পরামর্শ মতো চললে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে সন্তান জন্ম দিতে পারেন, নিজের এবং শিশুর কোন ক্ষতি ছাড়াই।

Pulsatilla pratensis ঃ সহজ এবং ঝামেলামুক্ত ডেলিভারির জন্য খাওয়াবেন পালসেটিলা (Pulsatilla pratensis) নামক ঔষধটি। যদি ডেলিভারি ডেট অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ব্যথা না ওঠে অথবা প্রসবব্যথা কম ওঠে অথবা ব্যথা একবার আসে আবার চলে যায়, তবে পালসেটিলা (Pulsatilla pratensis) নামক হোমিও ঔষধটি আধা ঘণ্টা পরপর খাওয়াতে থাকুন। এটি প্রসব ব্যথাকে বাড়িয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি প্রসব কাজ সমাধা করার ব্যাপারে একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। এমনকি ডাক্তাররা যদি সিজারিয়ান অপারেশান করার জন্য ছুড়িতে ধার দিতে থাকে, তখনও আপনি পালসেটিলা খাওয়াতে থাকুন। দেখবেন ছুড়ি ধার হওয়ার পূবেই বাচ্চা নরমাল ডেলিভারি হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, এমনকি গর্ভস্থ শিশুর পজিশন যদি ঠিক না থাকে, তবে পালসেটিলা তাও ঠিক করতে পারে। শিশুর মাথা যদি উপরের দিকে অথবা ডান্তেবামে ঘুরে থাকে, তবে দুয়েক মাত্রা পালসেটিলা খাওয়ালেই দেখবেন শিশুর মাথা ঘুরিয়ে অটোমেটিকভাবে নীচের দিকে নিয়ে এসেছে। সাধারণত **কথায় কথায় কেঁদে ফেলে,** মন খুবই নরম - স্নেহপরায়ন,

শীতের চাইতে গরম লাগে বেশী, খুব সহজেই মোটা হয়ে যায়, **ব্যথা ঘনঘন স্থান পরিবর্তন করে** ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে পালসেটিলা যাদুর মতো কাজ করে।

Actea racemosa / Cimicifuga ঃ একটিয়া রেসিমোসা বা সিমিসিফিউগা নামক হোমিও ঔষধটি ডেলিভারিতে বহুল ব্যবহৃত একটি ঔষধ। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ হইল প্রসবের প্রথম পর্যায়ে কাঁপুনি দেখা দেয়, ভয়জনিত উত্তেজনা থেকে খিচুনি হয়, **জরায়ু মুখ শক্ত হয়ে যায়- খুলতে চায় না,** ব্যথা খুবই তীব্র, গোলমালে বৃদ্ধি পায়, থেকে থেকে বাড়ে-কমে, প্রসব ক্রিয়া মনে হয় বেশ ঢিমেতালে চলছে।

Gelsemium sempervirens : জেলসিমিয়ামের জ্বরের প্রধান লক্ষণ হলো সাহসহীনতা, শরীরের জোর বা মনের জোর কম হওয়া, **রোগীর মধ্যে ঘুমঘুম ভাব থাকে বেশী,** শরীর ভারভার লাগে, **মাত্রাতিরিক্ত দুর্বলতার কারণে রোগী নড়াচড়া করতে পারে না এবং একটু নড়াচড়া করতে গেলে শরীর কাঁপতে থাকে,** ওপর থেকে পড়ে যাওয়ার ভয় এবং হৃৎপিন্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় ইত্যাদি লক্ষণ আছে।

Chamomilla ঃ ক্যামোমিলার প্রধান লক্ষণ হলো ইহার রোগীরা ব্যথার প্রতি অত্যন্ত সেনসিটিভ হয় অর্থাৎ ব্যথা একদম সহ্যই করতে পারে না। **ব্যথার তীব্রতায় রোগী দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূণ্য হয়ে পড়ে , তার ভদ্রতাজ্ঞানও লোপ পেয়ে যায়, সে ডাক্তার বা নার্সকে পযর্ন্ত গালাগালি দিতে থাকে ; তবে তাকে ক্যামোমিলা খাওয়াতে হবে।** ক্যামোমিলা হলো অভদ্র রোগীদের ঔষধ। কোন রোগী যদি ব্যথার হাত থেকে বাঁচার জন্য ডাক্তারকে সিজার করতে বার বার কাকুতি-মিনতি করতে থাকে, তবে বুঝতে হবে যে সে ক্যামোমিলার রোগী অর্থাৎ তাকে ক্যামোমিলা খাওয়ানো একেবারে ফরজ।

☆ প্রসবের পরে অতিরিক্ত রক্তস্রাবের প্রবনতা থাকলে প্রসবের পূর্বে দু’তিন মাত্রা Millefolium (শক্তি ৩০, ২০০) খেয়ে নিন।

☆ যারা প্রতিবারই মৃত সন্তান প্রসব করে তাদের গর্ভের শেষ দুমাস প্রত্যহ সিমিসিফিউগা (Cimicifuga শক্তি Q,৩,৬) খাওয়ান এবং স্বামীর যৌনরোগের ইতিহাস থাকলে Aurum metallicum (শক্তি ২০০) সপ্তাহে একমাত্রা করে দুই মাস খান।

☆ যাদের ঠোককাটা, জন্মান্ধ, পঙ্গু, বোবা, বোকা, প্রতিবন্ধি সন্তান হয়েছে, তাদের পরবর্তী সন্তান গর্ভে আসার সাথে সাথে Sulphur, Thuja occidentalis এবং Calcarea phos (শক্তি ২০০) প্রতিটি ঔষধ সপ্তায় একমাত্রা করে একমাস হিসাবে খাওয়ান (অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসকের পরামর্শ নিন)।

☆ hviv cÖwZeviB g„„Z সন্তান cÖme K‡i Zv‡`i M‡f©i †kl `ygvm cÖZ¨n Cimicifuga (kw³ 3,6) LvIqvb Ges ¯^vgxi †hŠb‡iv‡Mi BwZnvm _vK‡j Syphilinum (kw³ 200) mßv‡n GKgvÎv K‡i `yB gvm Lvb|

☆ hv‡`i †VvKKvUv, Rb¥vÜ, c½y, †evev, †evKv, cÖwZewÜ সন্তান n‡q‡Q, Zv‡`i cieZx© সন্তান M‡f© Avmvi mv‡_ mv‡_ Sulphur, Thuja Ges Calcarea phos (kw³ 200) cÖwZwU Jla mßvq GKgvÎv K‡i GKgvm wnmv‡e LvIqvb (AwfÁ †nvwgI wPwKrm‡Ki civgk© wbb)|

☆ cÖm‡ei ci cÖmªve eÜ n‡q †M‡j Arnica ev Causticum (kw³ 30, 200) wKQz¶b cici LvIqv‡Z _vKzb| ☆ cÖm‡ei `yyB NÈv c‡iI dzj (placenta) bv co‡j Gossypium, Sabina A_ev Pulsatila (kw³ 30,200) NÈvq NÈvq LvIqv‡Z _vKzb|

☆ cÖm‡ei ci mywZKv R¡i †`Lv w`‡j Pyrogen A_ev Echinacea ang (kw³ 30,200) wZb NÈv cici †L‡Z _vKzb|

☆ cÖm‡ei cieZx© `yye©jZvi Rb¨ Kali phos, Ferrum met, China (kw³ wKD, 3, 6) BZ¨vw` Jla¸wj wZb‡ejv K‡i `y‡qK mßvn LvIqvb|

## Mental / Psychiatric diseases (মানসিক রোগ)ঃ-

আমরা শারীরিক বা মানসিকভাবে অসুস্থ হলে কোন চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করে চিকিৎসা করলে সবচেয়ে দ্রুত, আরামের সাথে আর কম খরচে সম্পূর্ণরূপে স্থায়ীভাবে রোগমুক্ত হতে পারব, তা ঠিক করতে প্রায়ই ভুল করে থাকি। সোজা কথায় শারীরিক বা মানসিক যে-কোন ধরণের রোগেই আমরা আক্রান্ত হই না কেন, প্রথমেই আমাদের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অবলম্বন করা উচিত। কেননা ঔষধের যাদুকরী শক্তি বলতে যা বোঝায়, তা কেবল হোমিওপ্যাথিক ঔষধেরই আছে। হোমিও চিকিৎসার ব্যর্থতার পরেই কেবল আমাদের সার্জারী বা অস্ত্রচিকিৎসার কথা স্মরণ করা উচিত। মানসিক রোগের চিকিৎসায়ও প্রথমেই আমাদের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অবলম্বন করা উচিত।

কেননা মানুষের মনকে পরিবর্তন বা প্রভাবিত করার ক্ষমতা কেবল হোমিওপ্যাথিক ঔষধেরই আছে। এলোপ্যাথিক, ইউনানী, আয়ুর্বেদিক প্রভৃতি ঔষধের মানুষের মনের উপর কোন ক্রিয়া করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, অধিকাংশ মানুষ মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য হোমিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের কাছে না গিয়ে বরং মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞদের স্মরণাপন্ন হয়ে থাকেন। মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমরা যাদেরকে জানি, তাদের সবাই এলোপ্যাথিক ডাক্তার। ওনারা খুবই মেধাবী, জ্ঞানী, গুণী, সুদীর্ঘ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইত্যাদি ইত্যাদি সবই সত্য। কিন্তু মানসিক রোগের চিকিৎসা করার মতো ঔষধ ওনাদের হাতে নাই। ফলে তাদের দৃষ্টান্ত অনেকটা "ঢাল নাই তলোয়ার নাই, নিধিরাম সরদার"-এর মতো। কেননা তাদের কোন ঔষধই মানুষের মনের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় নাই। ফলে মানসিক রোগীদেরকে তারা কেবল মাথা ঠান্ডা করার ঔষধ (Tranquillizer) অথবা ঘুমের ঔষধ (Hypnotic) দিয়ে যুগের পর যুগ চিকিৎসা চালিয়ে যান। আমাদের শরীরের একটি নিজস্ব শক্তিশালী রোগ নিরাময় ক্ষমতা আছে। এই কারণে অধিকাংশ ছোট-বড় শারীরিক রোগ বিনা চিকিৎসাতেই সেরে যায়। তেমনিভাবে অধিকাংশ মানসিক রোগও শরীরের নিজস্ব রোগ নিরাময় ক্ষমতার (immune system) বদৌলতে বিনা ঔষধেই সেরে যায়। মাঝখানে এসব ঘুমের ঔষধের (Sedative) সুনাম বেড়ে যায় ।

আকস্মিক মানসিক উত্তেজনা (anxiety) থেকে যে-সব মানসিক রোগ হয়, সে-সব রোগ কিছুদিন ঘুমের ঔষধ (sedative) খেলেই সেরে যেতে দেখা যায়। কিন্তু সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, যে-সব মানসিক রোগের মুল কারণ অনেক গভীরে প্রোথিত (miasmatic/ constitutional) ; সে-সব রোগ দীর্ঘদিন যাবত ঘুমের ঔষধ খাওয়ার ফলে ভালো তো হয়ই না, বরং নিশ্চিতভাবে আরোও খারাপের দিকে চলে যায়। বিভিন্ন স্বনামধন্য চিকিৎসা গবেষণা প্রতিষ্টানের গবেষণায় অনেক পুর্বে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, এসব মাথা ঠান্ডা রাখার ঔষধ/ ঘুমের ঔষধ আমাদের

মস্তিষ্কের নিজেকে নিজে নিরাময় করার প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে। এভাবে এসব ঘুমের ঔষধ আমাদের মস্তিষ্ককে স্থায়ীভাবে নষ্ট করে দেয় এবং তখন মানসিক রোগটি আর আরোগ্যের কোন আশাই থাকে না। তাই বলা যায়, এসব জটিল মানসিক রোগীদেরকে যদি বছরের পর বছর ঘুমের ঔষধ খাওয়ানোর পরিবর্তে বিনা ঔষধেও ফেলে রাখা হতো, তাহলেও দেখা যেতো শরীরের নিজস্ব রোগ নিরাময় ক্ষমতার বদৌলতেই এদের অধিকাংশই এক সময় রোগমুক্ত হয়ে যেতো। মানসিক রোগীদের চিকিৎসার নামে আমাদের মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞরা জেনেশুনেই এভাবে তাদের সর্বনাশ করে থাকেন।

আমাদের জানতে ইচ্ছে করে, এজন্য তারা কোন বিবেকের পীড়া অনুভব করেন কিনা ?
হয়ত (হোমিওপ্যাথি সম্পর্কে) অজ্ঞতার কারণে তাও তারা অনুভব করেন না ; হয়ত তারা ভাবেন আমরা আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতা দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি ! এমনকি এলোপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের তথাকথিত এই চরম উন্নতির (!) যুগেও এলোপ্যাথিক মানসিকরোগ বিশেষজ্ঞরা মানসিক রোগীদের ওপর নানানভাবে অত্যাচার-নিরযাতন করে থাকেন ; যেমন- মানসিক রোগের চিকিৎসার নামে মস্তিষ্কের সামনের দিকের নার্ভ (neurotransmitters) কেটে দেওয়া (frontal lobotomies), বিদ্যুতের শক দেওয়া (etectroshock therapy), নারীদের যৌন উন্মত্ততার (nymphomaniacs) চিকিৎসার জন্য ডিম্বাশয় (ovary) কেটে ফেলে দেওয়া (ovarectomies) ইত্যাদি ইত্যাদি । তাই বলা যায়, এখনকার দিনে মনোরোগ চিকিৎসা বিজ্ঞান যে স্ট্যান্ডার্ডে এসে পৌঁছেছে, আজ থেকে দুইশ বছর পূর্বেও হ্যানিম্যানের স্ট্যান্ডার্ড ইহার চাইতে অনেক ভালো ছিল এবং মানসিক রোগীরা এখনকার মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে যতটুকু সদয় ব্যবহার পেয়ে থাকেন, দুইশ বছর পূর্বেই হ্যানিম্যান তাঁর অনুসারী হোমিও ডাক্তারদেরকে ইহার চাইতেও অধিক সদয় ব্যবহারের শিক্ষা দিয়ে গেছেন । হ্যানিম্যান প্রমাণ করে গেছেন যে, শারীরিক কোন রোগের কুচিকিৎসাই হলো অধিকাংশ মানসিক রোগের মূল কারণ। মানসিক রোগের চিকিৎসাতে হোমিও ঔষধ সাধারণত উচ্চ শক্তিতে খাওয়ানো নিয়ম। তবে সংগ্রহে না থাকলে নিম্নশক্তিতেও খাওয়াতে পারেন। সাধারণত এক-দুই-তিন মাত্রা ঔষধ খাওয়ানোর পরেও যদি কোন পরিবর্তন না হয়, তবে বুঝতে হবে ঔষধ নিবার্চন ভুল হয়েছে। নতুন করে চিন্তা করে অন্য ঔষধ প্রয়োগ করুন।



(ক) মজার মজার বিষয় কল্পনায় দেখে বা শোনে, **ভীষণ ক্রুদ্ধ, হিংস্র চাহনি, রক্তচক্ষু,** আঘাত করা বা কামড়ানোর প্রবনতা, কল্পনায় দৈত্য-দানব, ভূ-প্রেত, পোকা-মাকড় ইত্যাদি দেখা, **আলোকভীতি,** ভীতিকর স্বপ্নের জন্য ঘুমাতে না পারা, মস্তিষ্কের রক্তসঞ্চয় (অর্থাৎ নাক-মুখ-চোখ গরম বা লাল হয়ে থাকা) ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত মানসিক রোগে বেলেডোনা (Belladonna) ঔষধটি অব্যর্থ ঔষধ।

(খ) **প্রচণ্ড উন্মত্ততা**, প্রলাপ, বকবকানি, **অন্ধকারভীতি,** পানিভীতি, মাথায় রক্তসঞ্চয়, নিঃসঙ্গতায় ভয়, **পলায়ণপর ভাব**, প্রচণ্ড ভীতিভাব ইত্যাদি লক্ষণে স্ট্র্যামোনিয়াম (Stramonium) ঔষধটি কাযর্করী।

(গ) মানসিক অসুস্থতার সাথে **অশ্লীল কথা, অশ্লীল গান বা অঙ্গভঙ্গি, গায়ের কাপড় ফেলে দেয়া বা যৌনাঙ্গ প্রদর্শন করা**, একা থাকতে ভয়, অন্যরা তাকে কামড়াবে বা বিষপ্রয়োগে হত্যার ভয়, কিছু দিলে নিতে অস্বীকার করা, সবাই তার বিরুদ্ধে চক্রান- করতেছে, পানিভীতি ইত্যাদি লক্ষণে হায়োসাইয়েমাস (Hyoscyamus niger) ঔষধটি অব্যর্থ।

(ঘ) শারীরিক বা মানসিক ব্যাধির সাথে যদি সবাইকে সন্দেহ করার প্রবনতা, স্মরণশক্তি হ্রাস পায়, হিংসুটে ভাব, অযথা অভিসমপাত এবং মিথ্যা কসম খাওয়া, **হাঁটার সময় মনে হয় কেউ তাকে অনুসরণ করছে,** এখনই ভয়ঙ্কর

কিছু একটা ঘটবে এমন ভয়, **অশরীরি কে যেনো তাকে আদেশ করছে এবং অন্যজন তাকে নিষেধ করছে,** নিজের বা অন্যের উপর আস্থার অভাব ইত্যাদি লক্ষণে এনাকার্ডিয়াম (Anacardium oriental) যাদুর ন্যায় কাজ করে।

(ঙ) কোন মানসিক রোগী যদি **ধর্মীয় কথাবার্তা বেশী বলে (অর্থাৎ ইনশাল্লাহ, মাশায়াল্লাহ, সোবহানাল্লাহ, আল্লাহ, রাসুল, নামায, রোজা, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদি),** তবে তার রোগের নাম যা-ই হোক না কেন, তাকে উচ্চ শক্তিতে একমাত্রা ল্যাকেসিস (Lachesis) ঔষধটি খাইয়ে দিন। সে মুহূর্তে মধ্যে সুস্থ হয়ে যাবে। ল্যাকেসিস ঔষধটির আরেকটি প্রধান লক্ষণ হলো ইহার রোগীরা হিংসুটে হয়ে থাকে ; অর্থাৎ রোগীর কথা-বার্তায় যদি অন্যদের প্রতি হিংসা প্রকাশ পায়, তবে তাকে ল্যাকেসিস খাওয়াতে হবে। ল্যাকেসিসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হলো এদের শরীরে এনার্জি থাকে প্রচুর অর্থাৎ এরা অনেক পরিশ্রম করেও কাহিল হয় না।

(চ) **প্রেমে ব্যর্থতা, আপনজনের মৃত্যু, বিরহ,** তালাক, চাকুতিতে বা ব্যবসায়ে লোকসান, ভীষণ মানসিক আঘাত ইত্যাদির কারণে কোন রোগ হলে প্রথমে ইগ্নেশিয়া (Ignatia amara) খাওয়াতে হবে। ইগ্নেশিয়া খাওয়ার পরেও যদি একশ ভাগ রোগমুক্তি না হয়, তবে অসমাপ্ত নিরাময় শেষ করার জন্য নেট্রাম মিউর (Natrum muriaticum) খাওয়া জরুরি। অর্থাৎ নতুন মনোকষ্টে ইগ্নেশিয়া এবং পুরনো মনোকষ্টের চিকিৎসায় নেট্রাম মিউর।

(ছ) ঝগড়া-ঝাটি, অপমান, ধর্ষন, তালাক, পিতা-মাতা-স্বামী-শিক্ষকের পিটুনি ইত্যাদির পরে কোন শারীরিক বা মানসিক রোগ হলে Staphisagria খান, আপনার শরীর-মন স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

(জ) শিশুদের মাত্রাতিরিক্ত দুষ্টুমির জন্য Medorrhinum (পেট নীচে দিয়ে ঘুমায় এবং কমলা-চকোলেট খেতে বেশী পছন্দ করে) খাওয়ান। পক্ষান্তরে যে-সব শিশুরা ঘরের ভেতর স্বৈরাচারী কিন্তু বাইরে অতিশয় ভদ্রলোক তাদের জন্য Lycopodium (শক্তি ১০,০০০) ঔষধটি খুবই ফলদায়ক।

(ঝ) কথায় কথায় ভাঙচুর বা ধ্বংসাত্মক আচরণে অভ্যস', অল্পতেই ভীষণ ক্ষেপে যায়, কুকুরকে ভয় পায়, ভ্রমণ করা পছন্দ লক্ষণে Bacillinum (শক্তি ১০০০) মাসে একমাত্রা করে তিন মাস খান এবং দরকার হলে পরবর্তীতে শক্তি বৃদ্ধি করে খান। সাধারণত বিসিজি (BCG) টিকা নিলে শিশুরা খুবই দুষ্টু, স্বৈরাচারী স্বভাব পেয়ে যায় এবং ব্যাসিলিনাম হলো বিসিজির একশান নষ্ট করার সেরা ঔষধ ।

(ঞ) চরমমাত্রায় অস্থিরতা, **সর্বদা একটা না একটা কিছু করতেই হয়, নড়াচড়া ছাড়া থাকতে পারে না,** এমনকি রোগীকে যদি দড়ি দিয়ে টাইট করে বেধেও রাখে তথাপি সে একটি আঙ্গুল হলেও নাড়াতে থাকবে, অপ্রয়োজনে চুরি করার স্বভাব ইত্যাদি লক্ষণে Tarentula hispanica ভালো।

(ট) অহংকারী সুন্দরী নারী, নিজেকে খুব বড় মনে করা, নিজেকে ব্যতীত সবকিছু তুচ্ছ মনে করা, সাংঘাতিক রকমের যৌন উন্মাদ, ঘনঘন পুরুষ সঙ্গী পাল্টায়, কেউ কেউ দৈনিক বিশ-পঞ্চাশবার যৌনকর্ম করে ইত্যাদি লক্ষণে প্ল্যাটিনাম (Platinum metallicum) খাওয়াতে হবে।

(ঠ) পক্ষান্তরে কোন পুরুষের মধ্যে যদি মাত্রাতিরিক্ত যৌনশক্তি / যৌন উত্তেজনা থাকে, লুচ্চা স্বভাবের, রাস্তায় দাঁড়িয়ে মহিলাদের উত্যক্ত করতে থাকে, শরীরের প্রচুর শক্তি, অনেক পরিশ্রম বা ব্যায়াম করেও দুর্বল লাগে না ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে ফ্লোরিক এসিড (Acidum Fluoricum) খাওয়াতে হবে।

(ড) ভয়ানক বদমেজাজের জন্য Nux vomica, Chamomilla কিংবা Kali iodatum (শক্তি ৩০,২০০) খান।

(ঢ) যারা নিজের চাইতে অন্যের দুঃখ-কষ্টে বেশী কাতর হয়ে পড়েন, তাদের যে-কোন রোগের জন্য Causticum (শক্তি ৩০,২০০) খাওয়ান।

(ণ) শীঘ্রই পাগল হয়ে যাব মনে হলে Calcarea carb অথবা Actea racemosa আপনার উদ্ধারকারী ঔষধ (শক্তি ২০০ বা আরো উচ্চ খাওয়ান)।

(ত) গাজা খাওয়ার পরে মনে যেমন স্ফূর্তির ভাব হয়, তেমন মানসিক অবস্থায় অথবা মানসিক হীনমন্যতার (inferiority complex) জন্য Cannabis indica খাওয়ান।

(থ) অত্যন্ত অস্থিরতা, অতীব মৃত্যুভয়, আমার রোগ কখনও ভালো হবে না, মৃত্যু নিশ্চিত ইত্যাদি লক্ষণে Arsenic album আপনাকে আরোগ্য করবে। (দ) শুঁচিবাইয়ের জন্য (অর্থাৎ যারা সারাক্ষণ ধোয়ামোছা নিয়ে ব্যস্ত) Thuja খান পক্ষান্তরে নোংরা বা অপরিচ্ছন্ন স্বভাবের জন্য Sulphur বিধেয়। ১০,০০০ শক্তি মাসে একবার করে দুইমাস খান। রাস্তাঘাটে অনেক পাগল দেখা যায়, যারা এতো নোংরাভাবে থাকে যে, মনে হবে একটি চলমান ডাস্টবিন। এদেরকে যদি একমাত্রা সালফার (Sulphur) খাওয়ানো যায়, তবে দেখা যাবে এদের পাগলামীও ভালো হয়ে গেছে এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকারও চেষ্টা করতেছে।

(ধ) নোংরামি, লুচ্চামি, লাম্পট্য, হস্তমৈথুন ইত্যাদি স্বভাব দূর করার জন্য Bufo rana (শক্তি ২০০) সপ্তায় একমাত্রা করে খান।

(ন) অতিরিক্ত লবণ খাওয়ার জন্য Natrum mur আর অতিরিক্ত মিষ্টি খাওয়ার জন্য Argentum nitricum অব্যর্থ ঔষধ। শক্তি ২০০ চারদিন পরপর একমাত্রা করে দু'তিন মাস খাওয়ান। (প) মেয়েদের সমকামিতা (homosexuality) দূর করার জন্য প্লাটিনাম মেট (Platinum metallicum) অথবা পালসেটিলা (Pulsatilla pratensis) ঔষধগুলো লক্ষণ অনুযায়ী প্রযোজ্য এবং পুরুষদের সমকামিতা নিরাময়ের জন্য ল্যাকেসিস (Lachesis), সালফার (Sulphur) ঔষধগুলো লক্ষণ অনুযায়ী প্রয়োগ করুন।

(য) কোন শারীরিক বা মানসিক রোগী যদি আলপিনের মতো চৌকো বা সূচালো (fear of pointed things) জিনিসকে মাত্রাতিরিক্ত ভয় পায়, তবে তাকে Spigelia ঔষধটি খাওয়াতে হবে। অন্যদিকে কোন রোগী যদি সারাক্ষন আলপিন নিয়ে খেলা করতে থাকে, তবে তার ঔষধ হলো সিলিশিয়া (Silicea)।

(র) মার্ক সল (Mercurious solbulis) ঔষধটির প্রধান লক্ষণ হলো মতবিরোধে রোগের সৃষ্টি বা বৃদ্ধি (aggravation from contradiction)। তার কথার / কাজের কেউ বিরোধীতা করলে বা বাধা দিলে, তা সে সহ্য করতে পারে না। তার ভেতরে বিরাট রিয়েকশান / প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ফলে সে কোন না কোন শারীরিক বা মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। মনে করুন, আপনার ছেলেটি জন্ম থেকেই বাম হাতে লিখতে অভ্যস্ত। হঠাৎ আপনি তাকে বাধা দিলেন এবং ডান হাতে লিখতে বাধ্য করলেন। কিছুদিন পর দেখা গেল সে ধীরে ধীরে লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়ছে, পরীক্ষায় ফেল করছে, পড়াশুনাকে শত্রুর ন্যায় দেখছে। এমনকি সে আপনাকে অপছন্দ করছে। তাকে উচ্চশক্তিতে একমাত্রা মার্ক সল খাইয়ে দিন, দেখবেন সে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাবে।

(ল) কারো স্বভাব হঠাৎ পরিবর্তন হয়ে বিপরীত ধরনের হয়ে গেলে তাকে হাইড্রোফোবিনাম (Hydrophobinum / Lyssinum) ঔষধটি খাওয়াতে হবে। এই ঔষধটি পাগলা কুকুরের জীবাণু থেকে তৈরী করা হয়। একটি কুকুর যা এক সময় আপনার অনুগত ছিল, বাধ্য ছিল, আপনাকে ভালবাসত, আপনার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল ; সেটি হঠাৎ পাগলা কুকুর হয়ে গেলো। সেটি এখন আর আপনার কথা শুনে না, আপনাকে ভালোবাসে না বরং আপনাকে কামড়াতে চায়। ঠিক এই রকম পরিস্থিতি যদি কোন মানসিক রোগীর মধ্যে দেখা যায়, তবে তাকে হাইড্রোফোবিনাম খাওয়ান। মনে করুন, আপনার প্রাণপ্রিয় পুত্র যে আপনাকে মনে-প্রাণে ভালোবাসত, সে এখন আপনাকে মা / বাবা বলে স্বীকার করে না, আপনাকে খুন করতে চায় । হাইড্রোফোবিনামের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো বুক ফাটা তৃষ্ণা,

পানিকে ভয় পাওয়া, চকচকে বা উজ্জ্বল বস্তু বা আলো অসহ্য লাগা, **মুখ থেকে লালা পড়া,** পানির শব্দকে ভয় পাওয়া, পুরুষাঙ্গ শক্ত হয়ে থাকা (permanent erection) ইত্যাদি।

**(শ) কোন করুণ, দুঃখজনক, মর্মান্তিক কাহিনী শুনলে বা নাটক-সিনেমা দেখলে যদি কেউ খুবই কষ্ট পায় / কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে** (Horrible things, sad stories affect profoundly), তবে তার যে-কোন শারীরিক-মানসিক রোগে সিকিউটা (Cicuta virosa) ঔষধটি ব্যবহারে দারুন ফল পাবেন।

**(ষ)** অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনার জন্য Coffea cruda (শক্তি কিউ, ৩,৬,৩০,২০০) ।

(হ) অন্ধবিশ্বাস, অমূলক বিশ্বাস বা ফিক্সড আইডিয়া (Fixed idea) হলো এমন বিশ্বাস যার পেছনে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। এসব রোগীর শ্রেষ্ট ঔষধ হলো থুজা (Thuja occidentalis)। উদাহরণস্বরূপ একজন রোগীর কথা বলা যায় যিনি ছিলেন একজন স্বনামধন্য ব্যাংকার। তিনি যেই বিল্ডিংয়ে থাকতেন তাতে ছিল একুশটি ফ্ল্যাট। কিন্তু যখনই কোন গাড়ি এসে বাড়ির সামনে থামত, তখনই ভদ্রলোকের মনে হতো সেই লোকটি এসে এখনই তার দরজায় কড়া নাড়বে। অথচ গাড়ি দিয়ে আগত লোকটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় অন্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দা অথবা মেহমান। এই কারণে যখনই রাতে তিনি কাপড়-চোপড় খুলে স্ত্রীর নিকট যেতেন আর তখন নীচে কোন গাড়ি থামার আওয়াজ শুনতেন, সাথে সাথেই ঝটপট কাপড়-চোপড় পড়ে মেহমানের দরজায় কড়া নাড়ার জন্য অপেক্ষা করা শুরু করতেন।

(য) ঠান্ডা পানিতে, ঠান্ডা বাতাসে, বরফ বা তুষারপাতের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ কাজ করার কারণে যদি কোন মানসিক রোগ হয়, তবে বেলেডোনা (Belladonna) হলো তার সঠিক ঔষধ।

(ৎ) যৌনকর্মের পরে মন ভালো হয়ে গেলে নেট্রাম মিউর (Natrum muriaticum) খেতে হবে। পক্ষান্তরে যৌনকর্মের পরে মন খারাপ হয়ে গেলে সিপিয়া (Sepia) খেতে হবে।

(ং) সারাক্ষন মাথাঘুরানি, শরীরের বিভিন্ন পেশীতে (বিশেষত চোখের ও মুখের) কম্পন এবং ঝাকুঁনি, ছড়া-কবিতা বানিয়ে বলতে থাকে, শিশুদের মতো ছেলেমানুষি আচরণ, সামনে যাকে পায় চুম্পন করে, রাক্ষুসে ক্ষুধা, ভালো মতো না চিবিয়েই খেয়ে ফেলে, মাথা ঘোরাতে থাকে, পিছনের দিকে পড়ে যাওয়া প্রবনতা, বজ্রপাতের সময় রোগের মাত্রা বেড়ে যায়, পায়ের বুড়ো আঙুলের ফুলা-ব্যথা, ঠান্ডা বাতাসে হাঁটলে রোগের মাত্রা বেড়ে যায় ইত্যাদি লক্ষন থাকলে এগারিকাস (Agaricus muscarius) প্রয়োগ করুন।

**Neuralgia (স্নায়ুসুল)** ঃ - স্নায়ুশূল বা চিরিকমারা ভয়ঙ্কর ব্যথার মূল কারণ হলো টিকা (vaccine) ; তাই এই ধরনের ব্যথার প্রধান ঔষধ হলো Thuja occidentalis যা স্নায়ুশুলের মূল কারণটি দূর করে স্থায়ীভাবে নিরাময় করবে। নিউরালজিয়ার আরেকটি গুরুত্বপূণ ঔষধ হলো Magnesia phosphorica । তাছাড়া Colocynthis, Plumbum metallicum, Oxalicum acidum, Dioscorea ইত্যাদি ঔষধগুলি দুইটিও ব্যবহার করতে পারেন। এক্ষেত্রে Aconitum napellus ঔষধটির কথাও আমাদের ভুললে চলবে না।

**Nausea in pregnancy (গর্ভকালীন বমিবমি ভাব)** ঃ- গর্ভধারণের প্রথম দিকে বমিবমি ভাব, খাবারে অরুচি, নিদ্রাহীনতা, পেটে প্রসবের ন্যায় ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণ মারাত্মকভাবে দেখা দিলে Actea racemosa বা Ipecac (শক্তি ৩,৬,১২,৩০,২০০) তিনবেলা করে দুয়েক দিন খান। প্রয়োজনে আরো বেশী দিন খেতে পারেন।

**Obesity (মেদভূড়ি, অস্বাভাবিক ওজন বৃদ্ধি) :** অস্বাভাবিক ওজন কমিয়ে আনার জন্য নীচে প্রদত্ত তিনটি ঔষধ নিয়ম মতো সেবন করুন। এই তিনটি ঔষধ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এক বৎসর বা আরো বেশী সময় খান, যতদিন না আপনার ওজন যথেষ্ট পরিমাণে কমে আসে। তিনটি ঔষধের তালিকা ঃ-

(১) Natrum sulphuricum Q/3x/6x/12x/3c/6c/3/6

(এই হোমিওপ্যাথিক ঔষধটি ৫ ফোটা করে রোজ দুই বেলা করে এক সপ্তাহ খান। আধা গ্লাস পানির সাথে মিশিয়ে)

(২) Phytolacca decandra Q/3x/6x/12x/3c/6c/3/6

(এই হোমিওপ্যাথিক ঔষধটি ২০ ফোটা করে রোজ দুই বেলা করে এক মাস খান। আধা গ্লাস পানির সাথে মিশিয়ে)

(৩) Fucus vesiculosis Q/3x/6x/12x/3c/6c/3/6

(এই হোমিওপ্যাথিক ঔষধটি ২০ ফোটা করে রোজ দুই বেলা করে এক মাস খান। আধা গ্লাস পানির সাথে মিশিয়ে। এরপর পূণরায় এক নাম্বার ঔষধ থেকে একই নিয়মে খাওয়া আরম্ভ করুন।)

**Pathological tests are seriously harmful (প্যাথলজিক্যাল টেস্ট মারাত্মক ক্ষতিকর) :** প্রথম কথা হলো ডাক্তাররা তাদের পেশাগত ডিগ্রি অর্জনের জন্য যত ব্যাপক পড়াশোনা করেন, তাতে ৯৫ ভাগ রোগ তারা কোন প্রকার টেস্ট না করেই নির্ণয় করতে পারেন। রোগীকে দুই-চারটি প্রশ্ন করলেই তিনি রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডাক্তাররা এক বস্তা টেস্ট দেন, তাদের দায়িত্ব ফাঁকি দেওয়ার জন্য এবং ডায়াগনস্টিক কোম্পানির কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা কমিশন খাওয়ার জন্য। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, ডাক্তার সাহেব টেস্ট দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন না অথচ রোগীরাই জোর করে টেস্ট লিখিয়ে নিচ্ছেন। ভাবখানা এমন যে, এসব টেস্ট করা খুবই জরুরি কিংবা শরীরের জন্য সাংঘাতিক উপকারী। অনেকে প্রত্যাশা করতে পারেন যে, চিকিৎসা কাজে গোজামিল থাকলেও প্রচলিত রোগ নির্ণয় পদ্ধতি (pathology) নিশ্চয় একশ ভাগ বিজ্ঞানসম্মত। কেননা ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোতে খুবই উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিয়তির পরিহাস যে, বাস্তব পরিসংখ্যান এমনটা প্রমাণ করে না। সমপ্রতি দুইজন রোগ নির্ণয় বিজ্ঞানী (pathologist) ৪০০ রোগীর মৃতদেহ ময়না তদন্ত (autopsy- postmortem) করে দেখতে পেয়েছেন যে, অর্ধেকেরও বেশী রোগীর ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় ভুল ছিল। সহজ কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, এদেরকে ভুল চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল এবং আরো সহজ কথায় বলতে গেলে বলা যায় যে, ভুল চিকিৎসার কারণেই এদের মর্মান্তিক অকালমৃত্যু হয়েছে। হায় ডাক্তার ! হায় রোগ নির্ণয় !! হায় ঔষধ !!! হায় এলোপ্যাথি !!!! এই দুইজন প্যাথলজিষ্ট তাদের গবেষণায় আরো দেখিয়েছেন যে, অত্যাধুনিক সব প্যাথলজিক্যাল টেস্ট করার পরও ১৩৪ টি নিউমোনিয়ার কেইসে ৬৫ টির বেলায় ডাক্তাররা রোগ নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং ৫১ টি হার্ট এটাকের ক্ষেত্রে ১৮ টিতে রোগ নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়েছে। এজন্য বলা হয় যে, অজ্ঞতা এখনও ডাক্তারী পেশায় মাশায়াল্লাহ তার দাপট বজায় রেখেছে। হ্যাঁ, প্যাথলজিক্যাল টেস্ট হলো আরেকটি বড় ধরণের প্রতারণা।

অধিকাংশ হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা প্যাথলজিক্যাল টেস্টকে একশ বছর আগেও "রক্ত গণনার ফ্যাশন" (blood counting fashion) নামে অভিহিত করে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতেন, এখনও তাই মনে করেন। কেননা এগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাই-টেক প্রতারণা। যেমন ডাক্তাররা বলবে যে, আপনার রক্তের অমুক উপাদানের মাত্রা বেড়ে গিয়ে আপনার অমুক রোগ হয়েছে। তারপর এক বস্তা ক্ষতিকর ক্যামিকেল ঔষধ খাওয়ানোর পর দেখা গেলো যে, আপনার রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট স্বাভাবিক এসেছে। ডাক্তার বলবে, এখন আপনি সুস্থ (!) অথচ বাস্তবে আপনার অবস্থা আগে চাইতেও খারাপ হয়ে গেছে। আবার অনেক সময় ব্লাড টেস্ট, পায়খানা, প্রস্রাব, এক্সরে, আল্ট্রাসনোগ্রাম, ইসিজি, এমআরআই, সিটিস্ক্যান ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য টেস্ট করে রিপোর্ট দেখে বলবে, আপনার কোন রোগই নাই ; অথচ ব্যথার চোটে আপনার দম বেরিয়ে যাচ্ছে, ঘুম হারাম হয়ে গেছে ! কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, এসব প্যাথলজিক্যাল টেস্টে কেবল টাকা নস্ট হয় কিন্তু শরীরের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু এটি একটি বিরাট ভুল ধারণা। রক্ত পরীক্ষার জন্য সুই দিয়ে ছিদ্র করে যখন রক্ত বের করা হয়, তাতে আপনার শরীরের অনেকগুলো স্মায়ু কোষ (nerve cell) ছিড়ে যায়। ফলে স্নায়ুতে উত্তেজনার (upheaval) সৃষ্টি হয়।

আপনি যত বেশী ইনজেকশান নিবেন অথবা শরীরের উপর ছুরি-চাকু (surgical procedure) ব্যবহার করবেন, স্নায়ুতন্তুতে (nervous tissue) তত বেশী উত্তেজনার সৃষ্টি হবে। এভাবে বেশী বেশী উত্তেজনার ফলে আপনার কোষতন্তুতে বিদ্রোহ (revolt) দেখা দিবে। আর ডাক্তারী ভাষায় কোষতন্তুর (tissue) বিদ্রোহকে বলা হয় ক্যান্সার (cancer)। হ্যাঁ, চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, বিভিন্নভাবে আঘাতের মাধ্যমে স্নায়ুতন্তুকে উত্যক্ত করাই ক্যান্সারের মূল কারণ। তারপর আসে এক্স-রে। বেশী বেশী এক্স-রে করলে ক্যান্সার হয়, এটি বহু পুরনো কথা। আল্ট্রাসনোগ্রাম করা হয় খুবই সূক্ষ্মমাত্রার শব্দ তরঙ্গ (micro wave) ব্যবহার করে, যারা এমনকি জীবাণুকে পযর্ন্ত ধ্বংস করতে পারে। কাজেই এটিও আপনার শরীরের ক্ষতি করে থাকে এবং শরীরের মধ্যে থাকা উপকারী জীবাণুকেও হত্যা করতে পারে। এমআরআই (MRI), সিটিস্ক্যান (CT scan) হলো এক ধরণের এক্স-রে। কাজেই এগুলো শরীরে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে। এমআরআই (Magnetic resonance imaging-MRI) টেস্ট করার সময় আপনার মৃত্যু এবং অন্যান্য বড় ধরনের ক্ষতিও হতে পারে। যাদের হার্টে পেসমেকার (**Pacemakers**) বা শরীরে অন্যকোন ধাতব যন্ত্রপাতি ফিট করা আছে, তাদের এমআরআই করা নিষিদ্ধ।

স্তন ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য মেমোগ্রাফী (Mammography) নামে একটি টেস্ট করা হয়, যাতে স্তনকে একটি যন্ত্রের মাধ্যমে চেপে ধরে বিভিন্ন এংগেলে (angle) কয়েকটি এক্স-রে করা হয়। এই টেস্ট করতে যেহেতু রেডিয়েশন (X-ray) ব্যবহৃত হয়, তাই এতে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা আছে ষোলআনা। পত্র-পত্রিকা-রেডিও-টিভিতে প্রায়ই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যে, তাড়াতাড়ি স্তন ক্যান্সার সনাক্ত (early detection) করার জন্য প্রতিটি সচেতন নারীর উচিত বছরে একবার করে মেমোগ্রাফী টেস্ট করা। অথচ আপনি যদি দুই/চার বার মেমোগ্রাফী করেন, তবে মেমোগ্রাফী টেস্টের কারণেই বরং আপনি আরো আগে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হবেন। কেননা রেডিয়েশানই (radiation) হলো ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার একটি বহুল প্রমাণিত বড় কারণ। বলা হয়ে থাকে, যখন থেকে চিকিৎসা ক্ষেত্রে এক্স-রে (X-ray) চালু হয়েছে, তখন থেকেই ক্যান্সারের হার বৃদ্ধি পেয়েছে দ্রুতগতিতে। বিশেষজ্ঞদের মতে, একজন মহিলা যদি বছরের একবার করে ১০ বছর মেমোগ্রাফী করেন, তবে সে যে পরিমাণ রেডিয়েশনের শিকার হবে, তা হিরোশিমার এটম বোমার রেডিয়েশনের প্রায় অর্ধেক। এই কারণে ১৯৭৬ সালে আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটি এবং ন্যাশনাল ক্যানসার ইনিষ্টিটিউট তাদের এক ঘোষণায় অপ্রয়োজনে মেমোগ্রাফী টেস্ট করাতে সবাইকে নিষেধ করেছেন। তাছাড়া এই মেমোগ্রাফী টেস্ট অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুয়া রিপোর্ট দিয়ে থাকে। ক্যানসার না থাকলে বলবে আছে আবার

ক্যানসার থাকলে বলবে নাই ; অন্যদিকে নরমাল টিউমারকে বলবে ক্যানসার এবং ক্যানসারকে বলবে নরমাল টিউমার। ১৯৯৩ সালের ২৬ মে আমেরিকান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় বলা হয়েছে যে, মেমোগ্রাফী টেস্টে ২০% থেকে ৬৩% ক্ষেত্রে ভুল রিপোর্ট আসতে পারে। কাজেই নিয়মিত মেমোগ্রাফী টেস্ট করতে বিজ্ঞাপন দিয়ে নারীদের উৎসাহিত করা নেহায়েত হাস্যকর ধান্ধাবাজি ছাড়া আর কিছুই না।

ক্যান্সার নির্ণয়ের একটি বহুল ব্যবহৃত পরীক্ষা পদ্ধতির নাম হলো বায়োপসী (biopsy), যাতে টিউমারের ভেতরে সুই ঢুকিয়ে কিছু মাংস ছিড়ে এনে মাইক্রোস্কোপের নীচে রেখে পরীক্ষা করা হয়, তাতে ক্যান্সার কোষ আছে কিনা। কিন্তু সমপ্রতি বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন যে, এভাবে টিউমারকে ছিদ্র করার কারণে সেই ছিদ্র দিয়ে ক্যান্সার কোষ বেরিয়ে দ্রুত সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে (metastasis)। তখন ক্যানসার রোগীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে যায় এবং তাদেরকে বাচাঁনো অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা টিউমারগুলো আসলে ক্যান্সার নামক এই ভয়ঙ্কর বিষাক্ত পদার্থকে চারদিক থেকে গ্রেফতার করে, বন্দি করে রাখে। ইহা হলো ক্যানসারের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার একটি প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (natural defense)। ফলে ইহারা সহজে সারা শরীরে ছড়াতে পারে না। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে ছিদ্র করে তাদেরকে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ করে দেওয়া একটি জঘন্য মূর্খতাসুলভ কাজ। তারপর এই বায়োপসীতে ক্যানসার নির্ণয়ের ১০০% নিশ্চয়তা নাই। প্রায়ই মিথ্যা পজিটিভ অথবা ভুয়া নেগেটিভ রিপোর্ট আসে। অনেক বিজ্ঞানীর মতে, ডাক্তাররা নারীদের জরায়ু মুখের রস (Pap smears) নিয়ে মাক্রোস্কোপে নীচে যে পরীক্ষা করেন, যে জরায়ু মুখে (cervix) কোন অসুখ আছে কিনা, তা পুরোপুরি একটি ভুয়া কারসাজি। এসব ভুয়া টেস্টের মাধ্যমে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞরা (gynaecologist) নারীদেরকে বায়োপসী এবং সাজারীর দিকে নিয়ে যায় এবং নিজেদের পকেট ভারী করে।

আরেকটি টেস্ট হলো সিডি ফোর টেস্ট (CD 4 Test) যা এইডস রোগীদের ওপর এন্টিভাইরাল ঔষধ কতটা কাজ করছে, জানার জন্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু ল্যানসেট নামক মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় বিজ্ঞানীরা দাবী করেছেন যে, সিডি ফোর টেস্টের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। তারপরও এই ভুয়া টেস্ট (বিষাক্ত এবং বাজে সব) এইডস ড্রাগের তথাকথিত কাযর্কারিতা প্রমাণের জন্য ডাক্তাররা সমানে করে চলেছেন ! নিরপেক্ষ চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, হেপাটাইটিস-সি (hepatitis C virus) নামে কোন ভাইরাসের অস্তিত্বই নাই। অথচ বাস্তবে হেপাটাইটিস-সি ভাইরাসের নামে নানারকম টেস্ট করা হচ্ছে এবং তাদের জন্য টিকাও (vaccine) দেওয়া হচ্ছে। সভ্য জগতে এসব গাজাঁখুড়ি কারবার কিভাবে চলছে, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ বলতে পারবে না ! আরেকটি জঘন্য কারবার হলো স্ক্যানিং (scanning) ; যেমন- সিটি স্ক্যান (CT scans), ক্যাট স্ক্যান (CAT scans), থাইরয়েড স্ক্যানিং (thyroid scaning) ইত্যাদি ইত্যাদি। স্ক্যানিং-এ যেহেতু এক্স-রে বা রেডিয়েশান ব্যবহৃত হয়, তাই এতে ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় এবং সারা শরীর স্ক্যানিং সবচেয়ে বিপজ্জনক। বিজ্ঞানীদের মতে, সামান্য একটা মাত্র এক্স-রে আপনার শিশুর মস্তিষ্কের (brain) এত ক্ষতি করতে পারে যে, (বুদ্ধিপ্রতিবন্দি হয়ে) তার জীবনটাই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

নিরপেক্ষ চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে যদি আইন-কানুনের কড়াকড়ি থাকতো, তবে অবশ্যই সিগারেটের প্যাকেটের "ধূমপান ফুসফুসে ক্যানসার সৃষ্টি করে" এর মতো এইডস বা এইচআইভি টেস্টের (**HIV tests**) রিপোর্টেও "এই টেস্টে ১০০ ভাগ নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, আপনি এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন কি

হন নাই” ধরনের স্বীকারোক্তি লেখা থাকতো। যেখানে টেস্টের রিপোর্টেরই কোন গ্যারান্টি নাই, সেখানে সেই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ভয়ঙ্কর-বিষাক্ত সব ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে কোটি কোটি বনি আদমকে কবরে পাঠানো গণহত্যা ছাড়া আর কি বলা যায়। এই জন্যই অনেক চিকিৎসা বিজ্ঞানী এইচআইভি টেস্টকে এই যুগের হিটলারের ইহুদী নিধনের (holocaust) ঘটনার সাথে তুলনা করেছেন। আরেকটি ভুয়া টেস্ট হলো পিএসএ টেস্ট (PSA-prostate specific antigen) যা পুরুষদের প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের ক্যানসার নির্ণয়ের করা হয়ে থাকে। যেহেতু এটি শতকরা ৫০ ভাগ ক্ষেত্রে ভুয়া রেজাল্ট দিয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে এই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে অপারেশন (prostatectomy) বা রেডিয়েশান (radiotherapy) প্রভৃতি চিকিৎসা নিয়ে অগণিত পুরুষ অকালে অযথা যৌন অক্ষমতা (impotence), প্রস্রাব ধরে রাখার অক্ষমতা (incontinence) ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, পুরুষদের প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের ক্যানসার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি ভুয়া রোগ, ইহার চিকিৎসা করার চাইতে বরং না করলে আরো বেশী দিন আয়ু পাওয়া যায়। শুধু পিএসএ টেস্টই নয়, বিজ্ঞানীদের মতে সকল প্রকারের এন্টিবডি (Antibody) টেস্টই ভুয়া থিওরীর ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সঙ্গত কারণেই ভুয়া রিপোর্ট প্রদানকারী।

গবেষকদের মতে, যক্ষা রোগ নির্ণয়ের চর্ম পরীক্ষা (**TB test / Mantoux test / MT test**)ও একটি ক্ষতিকর এবং ভুয়া টেস্ট যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিথ্যা পজিটিভ রিপোর্ট দিয়ে থাকে। ফলে এই ভেজাল রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবতীর্রে্ত মানুষকে যে চিকিৎসা দেওয়া হয়, তাতে কেবল সে একা নয় বরং তার বংশশুদ্ধ যক্ষা রোগীতে (tubercular miasm) পরিণত হয়। অথচ দাবী করা হয় যে, এমটি টেস্ট কোন ক্ষতি করে না এবং একই সাথে এটি যক্ষার প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে। এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় এলার্জি, হাপানি, বাত (rheumatism), স্নায়বিক ব্যথা (neuralgia) ইত্যাদি রোগ না সারলেও এসব রোগ নির্ণয়ের নামে তারা মাল কামানোর জন্য অনেক কষ্টদায়ক পৈশাচিক টেস্ট-ফেস্ট আবিষ্কার করেছেন। যেমন- ইলেক্ট্রনিক শক টেস্ট (EDS -electrodermal testing)। কিছু কিছু টেস্টে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আলপিন ঢুকানো হয় আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাত-পায়ের চামড়ার নীচে বৈদ্যুতিক তার ঢুকিয়ে ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়। এতে ছেলে-বুড়ো সকলেই ব্যথার চোটে ব্যাঙের মতো লাফ দিয়ে ওঠে।

মহিলারা গভর্ধারণ করলে আর রক্ষা নাই। গাইনী ডাক্তাররা তাদেরকে পায়খানা, প্রস্রাব, রক্ত, এক্স-রে, আলট্রাসনোগ্রাম ইত্যাদি ইত্যাদি এক বস্তা টেস্ট করতে দিবেন। কিন্তু কেন ?

গভর্ধারণ করা কি কোন অপরাধ ?

ববরর্তার একটা সীমা থাকা দরকার ! তারপর দিবে এক বস্তা ঔষধ / ইনজেকশান / ভ্যাকসিন, মাসের পর মাস খেতে থাক ! কেন ?

এখন আমরা তো সবাই স্বচক্ষেই দেখি, জিওগ্রাফী / ডিসকভারী টিভি চেনেলগুলোতে, গরু-ছাগল-হরিণ-বাঘ-সিংহ-হাতি সবাই গর্ভধারণ করছে এবং সুস্থ-সুন্দর বাচ্চা জন্ম দিচ্ছে। কই, তাদের তো গাইনী ডাক্তারদের কাছেও যেতে হয় না, এক বস্তা টেস্টও করতে হয় না, মাসকে মাস ঔষধও খেতে হয় না কিংবা সিজারিয়ান অপারেশানও লাগে না। হাস্যকর কিছু বললাম ?

না, আসলে আত্মিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে আমরা ভিন্ন হলেও জৈবিক দিক দিয়ে কিন্তু পশু-পাখিদের সাথে আমাদের কোন পার্থক্য নাই। প্রচলিত এলোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির নিষ্ঠুরতার সবচেয়ে বেশী শিকার হয়ে থাকেন ডায়াবেটিস রোগীরা। সুগার টেস্ট করতে করতে আর ইনসুলিন ইনজেকশান নিতে নিতে তাদের শরীর একেবারে ঝাঝড়া হয়ে যায়, চালুনির মতো ছিদ্র ছিদ্র হয়ে যায়। অথচ আমরা অনেকেই জানি না যে, এলোপ্যাথিতে

ডায়াবেটিসের কোন কাযর্কর চিকিৎসাই নাই। আপনি যদি ডায়াবেটিসের জন্য দশ বছর এলোপ্যাথিক চিকিৎসা নেন, তবে আপনার লিভার-কিডনী-হার্ট-চোখ ইত্যাদি ড্যামেজ হয়ে নিশ্চিতভাবেই কবরের বাসিন্দা হয়ে যাবেন।

অধিকাংশ ডাক্তাররা মহিলাদেরকে তাদের স্তনে টিউমার/ ক্যানসার হলো কিনা সে বিষয়ে সচেতন করার জন্য কিছুদিন পরপর নিজেদের স্তন নিজেরাই টিপে টিপে (তাতে কোন চাকা আছে কিনা) পরীক্ষা করার জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকেন । আসলে এভাবে রোগের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির নামে ডাক্তাররা বরং মানুষের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করেন এবং এতে করে স্তন টিউমার/ ক্যানসারের আক্রমণের হার আরো বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। বাস্তবে দেখা গেছে, টিভিতে ব্লাড প্রেসারের (hypertension) অনুষ্টান দেখে ভয়ের চোটে আরো বেশী বেশী মানুষ ব্লাড প্রেসারে আক্রান্ত হচ্ছে । হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের ওপর গবেষণা করে দেখেছেন যে, অধিকাংশ ক্যানসার রোগীর মনেই ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার অনেক বছর পূর্ব থেকেই ক্যানসারের প্রতি একটি ভয় কাজ করত । এবং এই অস্বাভাবিক ক্যানসার ভীতি তাদেরকে শেষ পযর্ন্ত ক্যানসারের শিকারে পরিণত করেছে । কাজেই আপনার সত্মনে যখন টিউমার / ক্যানসার হবে ,তখন এটি এমনিতেই চোখে পড়বে । এজন্য ভয়ে ভয়ে রোজ রোজ টিপে টিপে দেখার কোন প্রয়োজন নাই । একইভাবে চিকিৎসা বিষয়ক যাবতীয় বিজ্ঞাপন থেকে সযত্নে একশ মাইল দূরে থাকা সকলেরই উচিত বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ।

## Penis length, increasing (পুরুষাঙ্গের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করা) :-

যারা তাদের শারীরিক ওজন বৃদ্ধি করতে চান, তারা আমার নির্দেশনা মতো নীচের তিনটি ঔষধ সেবন করুন।

(1) Alfalfa Q

(এই হোমিও ঔষধটি প্রতিদিন সকালে ২০ ফোটা করে ৩ মাস অথবা আরো বেশী দিন খান - আধা গ্লাস পানির সাথে মিশিয়ে)।

(2) Kali phos 6x

(এই হোমিও ঔষধটি প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ বড়ি করে ৩ মাস অথবা আরো বেশী দিন খান)।

(3) Thyroidinum 30

(এই হোমিও ঔষধটি ১ ফোটা / ১০ বড়ি করে সপ্তাহে একবার খান এবং এই নিয়মে ৩ মাস খান।)

## Haemorrhoids, Piles (পাইলস, অর্শ, গেজ) :-

পাইলস বা অর্শ রোগের আসলে কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নাই। মোটকথা পায়খানার রাস্তা ফোলে যাওয়া, ব্যথা করা, রক্ত পড়া, ফেটে যাওয়া, মাংস খন্ড বেরিয়ে পড়া ইত্যাদিকে একত্রে পাইলস বা অর্শ রোগ বলে। ইহার মতো কষ্টদায়ক রোগ মনে হয় মানুষের জীবনে কমই আছে। একে তো পায়খানার সময় ব্যথার চোটে জান বেরিয়ে যাওয়ার জোগার ; তারপর আবার বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ ভদ্র সমাজে রক্তক্ষরণ হয়ে কাপড়-চোপড় নষ্ট হয়ে ইজ্জত নিয়ে টানাটানি। পাইলস হওয়ার মূল কারণ হলো দীর্ঘদিন কোষ্টকাঠিন্য বা পায়খানা শক্ত থাকা। পাইলসের আরেকটি কারণ হলো তলপেটের ভেতরে থাকা রক্তনালীর গঠণগত ত্রুটি (Portal congestion)। সে যাক, সামান্য কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চললে (যেমন পায়খানা নরম রাখা / কোষ্টকাঠিন্য থেকে দূরে থাকা) এবং দু'চার'ছ মাস হোমিও ঔষধ খেলে পাইলস পুরোপুরি সেরে যায় (তা যত মারাত্মক পাইলসই হোক না কেন)। তবে যাদের পাইলসের টেনডেনসি আছে, তাদেরকে সারাজীবনই সতর্ক থাকতে হবে যাতে পায়খানা কোন অবস্থাতেই শক্ত হতে না পারে। অনেকেই না জানার কারণে অপারেশান করে পাইলস সারাতে চেষ্টা করেন কিন্তু এতে আপনি নির্ঘাত পায়খানার রাস্তায় ক্যানসারে আক্রান্ত হবেন।
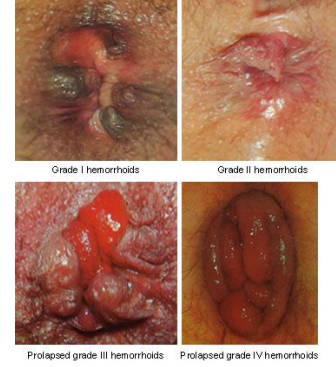
☆ পাইলসের চিকিৎসায় প্রথম কথা হলো যদি কোষ্টকাঠিন্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন অর্থাৎ পায়খানা নরম রাখতে পারেন, তবে ৯৯% পাইলস বিনা ঔষধেই সেরে যাবে। আর কোষ্টকাঠিন্য চিরতরে নির্মূল করার জন্য কোষ্টকাঠিন্য অধ্যায়ে আলোচিত ঔষধগুলি প্রয়োগ করবেন।

☆ অনেক হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানী পাইলসের রোগীদেরকে সকালে Sulphur এবং সন্ধ্যায় Nux vomica ঔষধ দুইটি খেতে দিতেন। সাধারণত ৩০ শক্তিতে কয়েক মাস খেলে অধিকাংশ পাইলস ভালো হয়ে যায়। অন্য কোন ঔষধের প্রয়োজন হয় না। এই ঔষধ দুটি সরাসরি পাইলস নিরাময় করে না বরং কোষ্টকাঠিন্য সারানোর মাধ্যমে এরা পাইলস নির্মূল করে থাকে। এমনকি কোন কোন চিকিৎসাবিজ্ঞানী এমনও বলেছেন যে, সালফার, নাক্স ভমিকা এবং থুজা মাত্র এই তিনটি ঔষধ দিয়ে পৃথিবীর এমন কোন রোগ নাই যা সারানো যায় না (সুবহানাল্লাহ !)। এই কথার রহস্য কি ?
আসলে আমাদের শরীরে যত রকমের বিষ তৈরী হয় এবং যত রকমের বিষ বাইরে থেকে ঢুকে, তাদের শরীর থেকে বের করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো পায়খানা। ঢাকা শহরের সমস্ত ড্রেন এবং সোয়ারেজ লাইনগুলি যদি সাতদিনের জন্য বন্ধ করে দিলে যেমন সমস্ত শহরের পরিবেশ দূষিত-বিষাক্ত হয়ে অগণিত মারাত্মক মারাত্মক রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়বে, তেমনি যে-সব মানুষের নিয়মিত পায়খানা হয় না তাদেরও ধীরে ধীরে শরীর বিষাক্ত হয়ে (হৃদরোগ-কিডনীরোগ-স্নায়ুরোগ-ক্যানসার-ডায়াবেটিস ইত্যাদি) মারাত্মক মারাত্মক রোগ পয়দা হতে থাকে। আর এই তিনটি ঔষধই মোটামুটি কোষ্টকাঠিন্যের শ্রেষ্ট ঔষধ।

☆ যাদের কোষ্টকাঠিন্য খুবই জটিল, সারতেই চায় না, তারা অবশ্যই কোষ্টকাঠিন্য অধ্যায়ে বর্ণিত ঔষধগুলো লক্ষণ অনুযায়ী প্রয়োগ করবেন।

Calendula officinalis : পায়খানার রাস্তা যদি মাত্রাতিরিক্ত ফোলে যায়, ইনফেকশান হয়ে যায়, ঘায়ের মতো হয়ে যায়, ব্যথায় টনটন করতে থাকে, তবে ক্যালেন্ডুলা ঔষধটি নিম্নশক্তিতে (মাদার টিংচার) কিছু পানির সাথে মিশিয়ে তাতে তুলা ভিজিয়ে সেখানে দু'চার ঘন্টা পরপর প্রয়োগ করুন। দু'চার ঘণ্টা পরপর বা অথবা আরো ঘনঘন প্রয়োগ করুন। যত মারাত্মক ইনফেকশান বা ফোলা-ব্যথা-আলসার হোক না কেন, দেখবেন দুয়েক দিনের মধ্যে সব চলে গেছে। এলোপ্যাথিতে যেমন ডেটল, স্যাভলন, হেক্সিসল ইত্যাদি আছে, তেমনি হোমিওপ্যাথিতে আছে ক্যালেন্ডুলা। তবে ক্যালেন্ডুলার ক্ষমতা তুলনাবিহীন। আক্রান্ত স্থানে লাগানোর পাশাপাশি দশ / বিশ ফোটা করে খেতেও পারেন। অথবা লক্ষণ মতে অন্য কোন ঔষধ খান। পাশাপাশি যে-কোন ধরনের কাটা-ছেড়া-ঘা-ইনফেকশানে ক্যালেন্ডুলার সাহায্য নিতে ভুলবেন না।
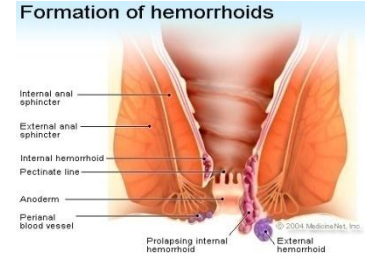
☆ পাইলস থেকে উজ্জল লাল রঙের রক্তপাত হলে Millefolium ঔষধটি দশ/বিশ মিনিট পরপর খেতে থাকুন যতক্ষণ না রক্তপাত বন্ধ হয়। অন্যদিকে কালো / কালচে রক্তপাত হলে Hamamelis Virginica ঔষধটি দশ/বিশ মিনিট পরপর খেতে থাকুন। পায়খানার রাস্তা থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে শরীর দুরবল হয়ে পড়লে, রক্তশূণ্যতা দেখা দিলে China officinalis অথবা Acidum Phosphoricum ঔষধটি খান। পাশাপাশি ভিটামিন জাতীয় অন্যান্য ঔষধগুলিও খেতে পারেন।

Aesculus Hippocastanum : এসকিউলাসকে বলা যায় সবচেয়ে সেরা পাইলসের ঔষধ। এই ঔষধের কাজের মূল কেন্দ্র হইল তলপেটের যন্ত্রপাতি। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো কোষ্টকাঠিন্য (পায়খানার সাইজ বড় বড় এবং শক্ত), রক্তক্ষরণযুক্ত অথবা রক্তক্ষরণবিহীন পাইলস, পায়খানার রাস্তায় কেহ আলপিন দিয়ে খোচা মারছে এমন ব্যথা, পায়খানার রাস্তা শুকনা শুকনা লাগা, তলপেটে দুরবলতা, পায়ে অবশ অবশ ভাব, হাটঁলে রোগের মাত্রা বেড়ে যায়, রোগী খুবই বদমেজাজি ইত্যাদি। ঔষধ নিম্নশক্তিতে খেলে রোজ দুই/তিন বার করে খাবেন আর উচ্চ শক্তিতে খেলে দশ/পনের/বিশ দিন পরপর এক মাত্রা করে।

Collinsonia canadensis : ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ পেট এবং পায়খানার রাস্তার অসুখের সাথে মাথাব্যথা, নাভী এবং তলপেটে ব্যথা, কোষ্টকাঠিন্য, কোথানি, অবসন্নতা, আম ও রক্তযুক্ত পায়খানা, মাসিকের সময় পাইলস, পায়খানার রাস্তার মাংস বেরিয়ে পড়া (Prolapse of the rectum), রোগের লক্ষণ শরীরের ওপর থেকে নীচের দিকে যায়, হার্টের সমস্যা এবং পাইলসের রক্তক্ষরণ ঘুরেফিরে আসে, বিভিন্ন জয়েন্টের বাতের ব্যথা, বুকে ব্যথা ইত্যাদি ইত্যাদি।

Aloe socotrina : এলু সকোট্রিনার প্রধান প্রধান লক্ষণ কোষ্টকাঠিন্য, পেট, তলপেট এবং মাথায় রক্তসঞ্চয়, অদল-বদল করে মাথাব্যথা এবং কোমরের বাত, শীতকালে পাইলসের উৎপাত বৃদ্ধি পায়, দুরবলতা, খাওয়ার পরপরই পায়খানার বেগ হওয়া, শক্ত পায়খানা (ঘুমের মধ্যে) নিজের অজান্তেই বিছানায় পড়ে থাকে, পাইলেসের চেহারা দেখতে আঙুরের থোকার মতো, সারাক্ষণ নীচের দিকে ঠেলামারা ব্যথা, রক্তক্ষরণ, টনটনে ব্যথা, স্পর্শ করা যায় না, গরম, ঠান্ডা পানিতে আরাম লাগে ইত্যাদি ইত্যাদি।

Peonia officinalis : পিওনিয়ার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো পায়খানার রাস্তায় জ্বালাপোড়া, চুলকানি, ফোলে যাওয়া, (বিছানা-জুতার) চাপ থেকে ঘা হওয়া, পায়খানার রাস্তার ফোড়া, ফেটে যাওয়া (fissure), ভগন্দর (fistula), রক্তনালী

ফোলে যাওয়া (varicose veins), ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখা (nightmare), নড়াচড়া-হাঁটা-স্পর্শে রোগের কষ্ট বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

Nitricum acidum : নাইট্রিক এসিডের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো কোষ্টকাঠিন্য, (শক্ত হউক বা নরম) পায়খানার পরে ব্যথা, মেজ (wart), **প্রস্রাবের গন্ধ গরুর প্রস্রাবের মতো (খুবই কড়া),** আবহাওয়া পরিবর্তন হলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে, **শরীরের ছিদ্রযুক্ত স্থানের ক্ষত,** খিটখিটে মেজাজ, ঘনঘন ডায়েরিয়ায় ভোগে, চোখের নালী ক্ষত, রাতের বেলা হাড়ের ব্যথা, হাড়ের ক্ষত, **যে-কোন ঘা/ক্ষত সহজে সারতে চায় না,** শরীরে পানির পরিমাণ বেশী ইত্যাদি ইত্যাদি।

Muriaticum acidum : মিউরিয়েটিক এসিডের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো কান্ডজ্ঞান লোপকারী মাথাব্যথা, চোখে অন্ধকার এবং উল্টাপাল্টা দেখা, অনিচ্ছাকৃতভাবে পায়খানা-প্রস্রাব বেরিয়ে যাওয়া, প্যারালাইসিস, পাইলসে বা পায়খানার রাস্তায় জ্বালাপোড়া, মাঝারি বা মারাত্মক ধরনের ইনফেকশান, পূজঁ-নিঃশ্বাস-শরীরের গন্ধ সবই দূর্গন্ধযুক্ত, **পাইলস দেখতে আঙুরের থোকার মতো, পিঙল বর্ণের, স্পর্শ করলে জ্বালা করে, কোথানি দিলে আলিশ বেরিয়ে যায়,** জিহ্বায় ইনফেকশান, কানপচাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি।

Sepia officinalis : সিপিয়ার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **পেশা এবং পরিবারের লোকজনদের প্রতিও উদাসীনতা,** রোগের গতি শরীরের নীচে থেকে উপরের দিকে, রোগী সবর্দা শীতে কাঁপতে থাকে, **পেটের ভিতরে চাকার মতো কিছু একটা নড়াচড়া করছে মনে হওয়া, পাইলস, পায়খানার রাস্তা বা জরায়ু ঝুলে পড়া (prolapse),** খাওয়া-দাওয়া ভালো লাগে না, **পায়খানার রাস্তা ভারী মনে হয়,** শিশুরা ঘুমানোর সাথে সাথেই বিছানায় প্রস্রাব করে দেয়, মুখের মেছতা (Chloasma), পুরুষাঙ্গের মাথার চারদিকে গোটা (condylomata), ঘনঘন গর্ভপাত (abortion), **যৌনাঙ্গে এবং পায়খানার রাস্তায় ভীষণ চুলকানি,** দীর্ঘদিনের পুরনো সর্দি, অল্পতেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে, দুধ হজম করতে পারে না, স্বভাবে কৃপন-লোভী, একলা থাকতে ভয় পায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

## Paralysis, palsy, paresis, hemiplegia, paraplegia (প্যারালাইসিস, পক্ষাঘাত)

: যদিও নিউরোলজিষ্টরা প্যারালাইসিসের অনেক রকমের নাম দিয়ে থাকেন, কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে নাম দিয়া কাম নাই। লক্ষণ অনুযায়ী ঔষধ খান, তাইলেই কাম অইব।

Causticum : নির্দিষ্ট একটি অঙ্গ প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হলে তাতে কষ্টিকাম প্রয়োগ করতে হয় ।যেমন - একটি আঙ্গুল বা একটি পা ইত্যাদি। ঔষধ নিম্নশক্তিতে খেলে রোজ দুই-তিন বার করে কয়েক সপ্তাহ খান। আর উচ্চ শক্তিতে খেলে সাতদিন বা পনের দিন পরপর এক মাত্রা করে খান।

Mercurius solubilis : মার্ক সল ঔষধটির প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **প্রচুর ঘাম হয় কিন্তু রোগী আরাম পায় না,** ঘামে দুর্গন্ধ বা মিষ্টি গন্ধ থাকে, **কথার বিরোধীতা সহ্য করতে পারে না,** ঘুমের মধ্যে মুখ থেকে লালা ঝরে, পায়খানা করার সময় কোথানি, পায়খানা করেও মনে হয় আরো রয়ে গেছে, **অধিকাংশ রোগ রাতের বেলা বেড়ে যায়।** রোগী ঠান্ডা পানির জন্য পাগল, ঘামের কারণে কাপড়ে হলুদ দাগ পড়ে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। প্যারালাইসিস প্রথমে শরীরের উপরের অংশে দেখা দেয় এবং পরে ধীরে ধীরে নীচের দিকে যায়।

Asterias rubens : এস্টেরিয়াস রুবেন্স ব্রেন স্ট্রোকের একটি সেরা ঔষধ। এই কারণে ব্রেন স্ট্রোকের পরে যে-সব প্যারালাইসিস হয়, তাদেরও সেরা ঔষধ। বিশেষ করে জিহ্বার প্যারালাইসিস।

Conium maculatum : কোনায়াম প্যারালাইসিসের একটি সেরা ঔষধ। সাধারণত আঘাত পাওয়ার কারণে অথবা অতিরিক্ত খাটুনির কারণে প্যারালাইসিস হলে তাতে কোনায়ামের কথা চিন্তা করা উচিত।

Agaricus muscarius : একগারিকাস প্যারালাইসিসের একটি প্রধান ঔষধ। সারাক্ষন মাথাঘুরানি, শরীরের বিভিন্ন পেশীতে (বিশেষত চোখের ও মুখের) কম্পন এবং ঝাকুঁনি, ছড়া-কবিতা বানিয়ে বলতে থাকে, শিশুদের মতো ছেলেমানুষি আচরণ, সামনে যাকে পায় চুম্পন করে, রাক্ষুসে ক্ষুধা, ভালো মতো না চিবিয়েই খেয়ে ফেলে, মাথা ঘোরাতে থাকে, পিছনের দিকে পড়ে যাওয়া প্রবনতা, বজ্রপাতের সময় রোগের মাত্রা বেড়ে যায়, পায়ের বুড়ো আঙুলের ফুলা-ব্যথা, ঠান্ডা বাতাসে হাঁটলে রোগের মাত্রা বেড়ে যায় ইত্যাদি লক্ষন থাকলে এগারিকাস প্রয়োগ করুন।

Aconitum napellus : সাধারণত ঠান্ডা বাতাস লেগে মুখে প্যারালাইসিস হলে একোনাইট প্রয়োগ করুন। তবে একোনাইটের লক্ষণ থাকলে যে-কোন ধরনের প্যারালাইসিসেই একোনাইট দিতে পারেন।

Dulcamara : সাধারণত ভেজা, ঠান্ডা, স্যাতস্যাতে ফ্লোরে ঘুমানোর কারণে প্যারালাইসিস হলে ডালকামারা খাওয়াতে হবে। জিহ্বা, ফুসফুস, হৃদপিন্ড, কন্ঠনালী ইত্যাদির প্যারালাইসিসে ডালকামারা প্রযোজ্য।

Lathyrus sativus : কলাই বা খেসারীর ডাল থেকে তৈরী করা লেথিরাস নামক ঔষধটি প্যারালাইসিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ। প্রধানত শরীরের নিম্নভাগের প্যারালাইসিসে এটি ভাল কাজ করে।

Lobelia purpurascens : লোবেলিয়া প্যারালাইসিসের একটি উত্তম ঔষধ। সাংঘাতিক মাথাঘুরানি, মাথা ব্যথা, জ্বর, শারীরিক ও স্নায়বিক দুর্বলতা, ফুসফুসের প্যারালাইসিস ইত্যাদি ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ।

Lycopodium clavatum : লাইকোপোডিয়ামের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **রোগের মাত্রা বিকাল ৪-৮টার সময় বৃদ্ধি পায়**, এদের রোগ ডান পাশে বেশী হয়, রোগ ডান পাশ থেকে বাম পাশে যায়, **এদের পেটে প্রচুর গ্যাস হয়**, এদের সারা বৎসর প্রস্রাবের বা হজমের সমস্যা লেগেই থাকে, এদের দেখতে তাদের বয়সের চাইতেও বেশী বয়স্ক মনে হয়, **এদের স্বাস্থ্য খারাপ কিন্তু ব্রেন খুব ভালো,** এরা খুবই সেনসিটিভ এমনকি ধন্যবাদ দিলেও কেঁদে ফেলে ইত্যাদি ইত্যাদি। উপরের লক্ষণগুলোর দু'তিনটিও কোন রোগীর মধ্যে থাকলে লাইকোপোডিয়াম তার প্যারালাইসিস সারিয়ে দেবে।

Alumina : এলুমিনা প্যারালাইসিসের একটি সেরা ঔষধ বিশেষত যদি সাথে কোষ্টকাঠিন্য থাকে। এলুমিনার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো পায়খানা নরম কিন্তু তারপরও বের করতে কোথানি লাগে, সর্বদা মাথাঘুরানি, জিনিসপত্রকে মনে হয় বৃত্তাকারে ঘুরতেছে, চোখের পাতার প্যারালাইসিস, টেরা চোখ, অন্ধকারে অথবা চোখ বন্ধ করে হাঁটতে পারে না, পিঠে অথবা পায়ে মনে হয় পিপঁড়া হাঁটতেছে, মুখে মনে হয় মাকড়সার জাল আটকে আছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

## Pregnancy & vitamine (গর্ভকালীন সময়ে ভিটামিন সেবন) :-

মহিলারা গভর্ধারণ করলে আর রক্ষা নাই। গাইনী ডাক্তাররা তাদেরকে পায়খানা, প্রস্রাব, রক্ত, এক্স-রে, আলট্রাসনোগ্রাম, এমআরআই, সিটিস্ক্যান ইত্যাদি ইত্যাদি এক বস্তা টেস্ট করতে দিবেন। কিন্তু কেন ?
গভর্ধারণ করা কি কোন অপরাধ ?
ববরর্তার একটা সীমা থাকা দরকার ! তারপর দিবে এক বস্তা ঔষধ / ইনজেকশান / ভ্যাকসিন, মাসের পর মাস খেতে থাক ! কেন ?
এখন আমরা তো সবাই স্বচক্ষেই দেখি, জিওগ্রাফী / ডিসকভারী টিভি চেনেলগুলোতে, গরু-ছাগল-হরিণ-বাঘ-সিংহ-হাতি সবাই গর্ভধারণ করছে এবং সুস্থ-সুন্দর বাচ্চা জন্ম দিচ্ছে। কই, তাদের তো গাইনী ডাক্তারদের কাছেও যেতে হয়

না, এক বস্তা টেস্টও করতে হয় না, মাসকে মাস ঔষধও খেতে হয় না কিংবা সিজারিয়ান অপারেশনও লাগে না। হাস্যকর কিছু বললাম ?

না, আসলে আত্মিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে আমরা ভিন্ন হলেও জৈবিক দিক দিয়ে কিন্তু পশু-পাখিদের সাথে আমাদের কোন পার্থক্য নাই।

এবার আসা যাক গর্ভকালীন সময়ে ঔষধ খাওয়া প্রসংগে। অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে গর্ভবতীদেরকে ভিটামিন, ক্যালশিয়াম, আয়রণ, ফলিক এসিড ইত্যাদি খাওয়ানো হয় বস্তায় বস্তায়। তাদের সমস্ত ঔষধই এতবেশী ক্ষতিকর সাইড-ইফেক্টযুক্ত যে, তারা সেগুলো গর্ভবতীদের খাওয়াতে সাহস পায় না। ফলে তারা এসব ভিটামিন, ক্যালশিয়াম, আয়রণ, ফলিক এসিড ইত্যাদি খাওয়াতে থাকে জন্মের মতো। যেহেতু তারা এগুলোকে গর্ভবতীদের জন্য নিরাপদ মনে করে থাকেন। তবে এসব ঔষধের কারণে গর্ভবতী ও গর্ভস্থ শিশুর কি কি ক্ষতি হয়, তা জানার কোন উপায় নেই। কারণ প্রথমত বড় বড় ঔষধ কোম্পানীগুলো সাধারণত তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থের কারণে ঔষধের ক্ষতিকর দিকটি প্রকাশ করে না। দ্বিতীয়ত তাদের এসব ঔষধ যেহেতু ইদুঁর-বাদর-খরগোস-গিনিপিগের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আবিষ্কার করা হয় ; কাজেই কোন ঔষধ ইদুঁর-বাদর-খরগোস-গিনিপেগের ক্ষতি করে না বলে মানুষেরও ক্ষতি করবে না- এমনটা বলা যাবে না। তাছাড়া বস্তা বস্তা ক্যালশিয়াম খাওয়া যে কিডনীতে পাথর (Renal calculus) হওয়ার একটি মূল কারণ, এটা আমরা অনেকেই জানি। ইদানীং চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন যে, বেশী মাত্রায় আয়রণ খাওয়া মহিলাদের স্তন ক্যানসারের একটি বড় কারণ (হে আল্লাহ্! রক্ষে করো !!)। প্রকৃতপক্ষে এসব ভিটামিন, ক্যালশিয়াম, আয়রণ ইত্যাদি যেহেতু আমাদের দৈনন্দিন খাবারেই যথেষ্ট পরিমাণে থাকে, কাজেই ট্যাবলেট, ক্যাপসুল ইত্যাদি ঔষধ আকারে বস্তা বস্তা খেলে তাতে শরীরে এসব উপাদানের ভারসাম্যহীনতা (imbalance) সৃষ্ঠি হওয়াই স্বাভাবিক। এসব ভারসাম্যহীনতার কারণেই সম্ভবত গভবতী মায়েদের পেটের পানির (placenta fluid) পরিমাণ কমে যায়, ঠিকমতো প্রসব ব্যথা উঠতে চায় না। ফলে সিজারিয়ান অপারেশনের (Cesarean operation) সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। এসব ভিটামিন, ক্যালশিয়াম, আয়রণ, ফলিক এসিড ইত্যাদি বস্তায় বস্তায় খাওয়ার কারণে সবচেয়ে বেশী নগদ যে ক্ষতিটি প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়, তাহলো এতে অধিকাংশ মহিলাই ভীষণ রকমে মোটা (obese) হয়ে যান। আর এখনকার সকল চিকিৎসা বিজ্ঞানীই একমত যে, মোটা মানুষরা (এযুগের প্রধান প্রধান ঘাতক রোগ) ক্যানসার, হৃদরোগ (heart disease), হাঁপানী, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হার্ট এটাক, জয়েন্টে ব্যথা (Arthritis) ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয় বেশী হারে।

সে যাক, হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা গর্ভকালীন সময়ে বাধ্যতামূলকভাবে কোন (ভিটামিন, আয়রণ, ক্যালশিয়াম জাতীয়) ঔষধ খাওয়ানোর পক্ষপাতী নন। বিশেষত যাদের হজমশক্তি ভালো আছে এবং মাছ-গোশত-শাক-সবজি-ফল-মূল ইত্যাদি কিনে খাওয়ার মতো সামর্থ আছে, তাদের কোন (ভিটামিন জাতীয়) ঔষধ খাওয়ার প্রয়োজন নাই। তবে যে-সব গর্ভবতী মায়েরা শরীরিক-মানসিক দুর্বলতা, রক্তশূণ্যতা ইত্যাদিতে ভোগছেন, অথবা যারা অভাব-অনটনের কারণে প্রয়োজনীয় পুষ্ঠিকর খাবার-দাবার কিনে খেতে পারেন না কিংবা যারা পুষ্ঠিকর খাবার কিনে খেতে পারলেও শারীরিক ত্রুটির কারণে সেগুলো যথাযথভাবে শরীরে শোষিত (absorption) হয় না, তাদেরকে **ক্যালকেরিয়া ফস** (Calcarea phos), **ফেরাম ফস** (Ferrum phos), **ক্যালি ফস** (Kali phos), **লিসিথিন** (Lecithinum) ইত্যাদি হোমিও ভিটামিন / টনিক জাতীয় ঔষধগুলো নিম্নশক্তিতে (6X) অল্প মাত্রায় খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এই ঔষধগুলি মানব শরীরের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ক্যালশিয়াম, আয়রণ, পটাশিয়াম এবং ফসফরাস সরবরাহ করে থাকে। পাশাপাশি এই ঔষধগুলো

আমাদের শরীরকে এমনভাবে গড়ে তোলে যাতে আমাদের শরীর নিজেই তার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্ঠিকর উপাদানগুলো আমাদের দৈনন্দিন খাবার থেকে শোষণ করার / গ্রহন করার যোগ্যতা লাভ করে।

গর্ভকালীন সময়ে খেলে এই ঔষধগুলো আপনার গভর্স্থ সন্তানের হাড় (bone), দাঁত (teeth), নাক (nose), চোখ (eye), মস্তিষ্ক (brain) ইত্যাদির গঠন খুব ভালো এবং নিখুঁত করতে সাহায্য করবে এবং আপনার সন্তান ঠোট কাটা (harelip), তালু কাটা (cleft palate), হাড় বাঁকা (rickets), খোঁজা (epicene), বামন (dwarfish), পিঠ বাঁকা (Spina bifida), বুদ্ধি প্রতিবন্ধি (autism), হৃদরোগ, চর্মরোগ, কিডনীরোগ প্রভৃতি দোষ নিয়ে জন্মনোর হাত থেকে রক্ষা পাবে। এই জন্য যাদের বংশে শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্দ্বি শিশু জন্মের ইতিহাস আছে, তাদের গর্ভকালীন সময় এই ঔষধগুলো অবশ্যই খাওয়া উচিত। ভিটামিন জাতীয় এই হোমিও ঔষধগুলো গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্যের এত চমৎকার যত্ন নেয় যে, এগুলো বেশ কয়েক মাস খেলে তাদের উচ্চ রক্তচাপ (hypertension), হাঁপানী (asthma), ডায়াবেটিস (diabetes), মাথাব্যথা, বমিবমিভাব, ছোটখাট জ্বর-কাশি, খিচুঁনি (eclampsia) ইত্যাদি রোগ এমনিতেই সেরে যায়। অন্যদিকে যাদের উচ্চ রক্তচাপ, হাঁপানী, ডায়াবেটিস, খিচুঁনি, ধনুষ্টংকার ইত্যাদি রোগ নাই, তারাও এই ঔষধ তিনটি খাওয়ার মাধ্যমে সে-সব রোগে আক্রান্ত হওয়ার হাত থেকে বাঁচতে পারবেন।

**ঔষধ চারটি একসাথে খাওয়া উচিত নয় ; বরং একটি একটি করে খাওয়া উচিত। যেমন- ক্যালকেরিয়া ফস সাত দিন, তারপর ফেরাম ফস সাত দিন, তারপর ক্যালি ফস সাত দিন, তারপর লিসিথিন সাতদিন - এইভাবে চক্রাকারে একটির পর একটি করে খান। সাধারণত 1X, 3X, 6X, 12X ইত্যাদি নিম্নশক্তিতে খাওয়া উচিত ; যেটি মার্কেটে পাওয়া যায়। ১০ টি বড়ি করে সকাল-বিকাল রোজ দুইবার করে খান**। প্রয়োজন মনে করলে গর্ভকালীন পুরো দশ মাসই খেতে পারেন এবং সন্তানকে স্তন্যদানকালীন দুই বছরও খেতে পারেন। তবে মাঝে মধ্যে সাতদিন বা পনের দিন মধ্যবর্তী বিরতি দিয়ে খাওয়াও একটি ভালো রীতি। mnR, Avivg`vqK Ges wmRvwiqvbgy³ †Wwj‌ভvwii Rb¨ কলোফাইলাম (Caulophyllum thalictroides) ঔষধটি (3, 6, 12 ইত্যাদি নিম্নশক্তিতে) cÖm‡ei দুইgvm c~e© (অর্থাৎ আট মাস) †_‡K (১০ বড়ি করে) †ivR GKevi K‡i †L‡q hvb| এটি গর্ভ রক্ষার অর্থাৎ গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষার একটি শ্রেষ্ট ঔষধ। এটি গর্ভস্থ শিশুর চারদিকে পানির (placenta fluid) পরিমাণ সঠিক মাত্রায় বজায় রাখে এবং পানির পরিমাণ কমতে দেয় না, ফলে অধিকাংশ শিশু সিজারিয়ান অপারেশন ছাড়াই স্বাভাবিক পথে (vaginal route) জন্ম নিয়ে থাকে। এমনকি যাদের কোমরের বা তলপেটের (pelvic cavity) গঠন ভালো নয় বলে ডাক্তাররা সিজার করতে বলে, তাদেরও দেখেছি শিশু এবং মায়ের কোন ক্ষতি ছাড়াই নরমাল ডেলিভারি হয়ে যায়। তাছাড়া অতীতে যাদের সিজার হয়েছে, তারাও কলোফাইলাম খেয়ে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে সন্তান জন্ম দিতে পারেন, নিজের এবং শিশুর কোন ক্ষতি ছাড়াই।

কলোফাইলাম গর্ভপাতেরও (abortion) একটি উত্তম ঔষধ, যাতে ভুয়া প্রসব ব্যথা দেখা দিলে এটি প্রয়োগ করতে হয়। যাদের প্রতিবারই (তৃতীয় মাস, পঞ্চম মাস ইত্যাদি) একটি নির্দিষ্ট সময়ে গর্ভ নষ্ট হয়ে যায়, তারা সেই নির্দিষ্ট সময়ের একমাস পূর্ব থেকেই অগ্রিম এই ঔষধটি খাওয়া শুরু করতে পারেন । অন্যদিকে ডেলিভারির জন্য খাওয়াবেন পালসেটিলা (Pulsatilla pratensis) নামক ঔষধটি। যদি ডেলিভারি ডেট অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ব্যথা না ওঠে অথবা প্রসবব্যথা কম ওঠে অথবা ব্যথা একবার আসে আবার চলে যায়, তবে পালসেটিলা (Pulsatilla pratensis) নামক হোমিও ঔষধটি আধা ঘণ্টা পরপর খাওয়াতে থাকুন। এটি প্রসব ব্যথাকে বাড়িয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি প্রসব কাজ সমাধা করার ব্যাপারে একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। এমনকি ডাক্তাররা যদি সিজারিয়ান অপারেশান করার জন্য

ছুড়িতে ধার দিতে থাকে, তখনও আপনি পালসেটিলা খাওয়াতে থাকুন। দেখবেন ছুড়ি ধার হওয়ার পূবেই বাচ্চা নরমাল ডেলিভারি হয়ে গেছে। মনে রাখবেন, নরমাল ডেলিভারির কষ্ট থাকে দুয়েক দিন, কিন্তু সিজারিয়ান অপারেশানের কষ্ট দুয়েক বছরেও যায় না। ক্ষেত্রবিশেষে অপারেশানের কষ্ট সারাজীবনই ভোগ করতে হয়। শুধু তাই নয়, সন্তানের পজিশন যদি ঠিক না থাকে, তবে পালসেটিলা তাও ঠিক করতে পারে। শিশুর মাথা যদি উপরের দিকে অথবা ডান্তেবামে ঘুরে থাকে, তবে দুয়েক মাত্রা পালসেটিলা খাওয়ালেই দেখবেন শিশুর মাথা ঘুরিয়ে অটোমেটিকভাবে নীচের দিকে নিয়ে এসেছে।

## Pregnancy, nausea & vomiting in (গর্ভকালীন বমিবমি ভাব এবং বমি) :-

কোন নারী গর্ভধারনের পর তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গে যে-সব প্রতিক্রিয়া দেয়, তার মধ্যে পাকস্থলী বা পেটের উৎপাত একটি সাধারণ ঘটনা। পেটের সমস্যাগুলির মধ্যে ক্ষুধা বৃদ্ধি পাওয়া, বমিবমি ভাব, বমি হওয়া, মুখে পানি উঠা, এসিডিটি বা বুকজ্বালা, টক ঢেকুর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বিশেষত বমিবমি ভাব ও বমি'র সমস্যাটি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে মা ও শিশুর জীবন নিয়ে টানাটানি পড়ে যেতে পারে। এই সমস্যাটির মাত্রা অবস্থাভেদে কম-বেশি হতে দেখা যায়। আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, গর্ভাবস্থায় বমিবমি ভাব কম হলে গর্ভস্থ শিশু মেয়ে হবে আর বমিবমি ভাব বেশী হলে শিশু ছেলে হবে। বিষয়টি কতটা প্রমাণিত সত্য তা জানি না। এজন্য বমির সমস্যা বেশী হলেই বরং মেয়েরা বেশী খুশি হয়, কেননা কিছুদিন পরই সে পুত্র সন্তানের মা হতে যাচ্ছে ভাবখানা এই রকম।

সে যাক, কুসংস্কার নিয়ে আলোচনা করা আমাদের বিষয় নয়। গর্ভকালীন সময়ে বমিবমি ভাব ও বমি'র সমস্যাটি সাধারণত প্রথম পাঁচ মাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই সমস্যাটি যখন খুবই মারাত্মক আকার ধারণ করে, তখন তাকে hyperemesis gravidarum বলা হয়। এই পরিস্থিতিকে এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা ঔষধে সামলাতে ব্যর্থ হলে গর্ভ খালাস করে দেয় অর্থাৎ শিশুকে মেরে মাকে বাঁচায়। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে ইনশায়াল্লাহ্ নরহত্যার কোন প্রয়োজন পড়ে না। আমাদের ঔষধ এতটাই শক্তিশালী যে, ছুরি-চাকুর কাজ সে কেবল ঔষধের মাধ্যমেই অনায়াসে সেরে ফেলতে পারে। গর্ভাবস্থায় বমিবমি ভাব ও বমি'র সমস্যাটি নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে কার্যকর ঔষধগুলো হচ্ছে আর্সেনিক, ইপিকাক, মেডোরিনাম, ক্রিয়োজোট, নাক্স ভমিকা এবং পালসেটিলা।

☆ বার্নেটের মতে, গর্ভকালীন বমির সমস্যার সবচেয়ে ভালো ঔষধ হলো Medorrhinum এবং এটি সাধারণত এক মাত্রা খাওয়াই যথেষ্ট। ক্ষেত্র বিশেষে পনের দিন পর পর কয়েক মাত্রা খাওয়া লাগতে পারে।

☆ অধিকাংশ ক্ষেত্রে Ipecac ঔষধটাতেই ভালো ফল পাওয়া যায়।

☆ যদি এমন হয় যে, কেবল খাবারের গন্ধে বা রান্নার গন্ধ পেলেই বমিবমি ভাব আসে, সেক্ষেত্রে Colchicum autumnale হলো উপযুক্ত ঔষধ। অবশ্য এই লক্ষণে Arsenic album ঔষধটিও খাওয়াতে পারেন, যদি অস্থিরতা

ও জ্বালাপোড়া ভাব থাকে। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুযায়ী ঘণ্টায় ঘণ্টায় বা দিনে তিনবেলা করে খেতে পারেন যতদিন সমস্যা থাকে। কারো কারো ক্ষেত্রে সকালে ঘুম থেকে উঠার পর সমস্যাটি দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে ঘুম থেকে উঠে সাথে সাথে একমাত্রা ঔষধ খেয়ে নিতে পারেন।

☆ বমিবমি ভাবের সাথে কারো মধ্যে আবার বুকজ্বালা বা পেটে গ্যাসের সমস্যা থাকতে পারে। এক্ষেত্রে ইপিকাক (Ipecac) -এ ভালো ফল না হলে পরিবর্তে Nux vomica দিতে পারেন। কিংবা ইপিকাক এবং নাক্স ভমিকা এক সাথেও দিতে পারেন বা একবার ইপিকাক-একবার নাক্স ভমিকা এভাবেও দিতে পারেন। পেট-ফাঁপা সমস্যার জন্য লক্ষণ মিললে China বা Carbo veg দিতে পারেন। এসব সমস্যা বাচ্চাকে স্তন্যদানের সময় দেখা দিলেও একই পন্থা অবলম্বন করুন।

**Pruritus (চুলকানি) :** প্রুরিটাস বা চুলকানি হলো একটি রোগ লক্ষণ। এটি সাধারণত দু'ধরনের হয়ে থাকে। মহিলাদের বাহ্যিক যৌনাঙ্গের চুলকানি (Pruritus vulvae ev Pruritus vaginae) এবং পায়খানার রাস্তার চারপাশে চুলকানি (Pruritus ani)। এটি এমন এক অশান্তিদায়ক অনুভূতি যা মানুষকে খামচাতে অর্থাৎ চুলকাতে উৎসাহিত করে থাকে। খামচানো থেকে মাঝে মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের রোগের সংক্রমণ (secondary infection) দেখা দেয়। প্রুরিটাস বা এসব রোমাঞ্চকর চুলকানির উল্লেখযোগ্য কারণগুলির মধ্যে আছে এলার্জি, জীবাণু সংক্রমণ, জন্ডিস, লিম্ফোমা, পাইলস, ডারমাটাইটিস (contact dermatitis), সোরিয়াসিস (psoriasis), ট্রাইকোমোনিয়াসিস (trichomoniasis), সুতা কৃমি, ত্বকের ইরিটেশন, ক্যানডিডিয়াসিস, ছত্রাকের (fungus) আক্রমণ ইত্যাদি। সর্বোপরি মানসিক (psychogenic) কারণেও প্রুরিটাস হতে পারে। এসব জায়গা দীর্ঘদিন একনাগারে চুলকানোর কারণে ফুলে মোটা হয়ে যেতে পারে এবং শক্ত হয়ে যেতে পারে। সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হলো এটি ক্যান্সারে রূপ নিয়ে রোগীর জীবনকে মৃত্যুর দুয়ারে নিয়ে হাজির করতে পারে।



Calendula Officinalis : ক্যালেন্ডুলা (ঔষধটি ভ্যাসেলিনের সাথে মিশিয়ে মলম আকারে ব্যবহার করে) অথবা আরো কিছু ঔষধ আছে যা ব্যবহার করে সাময়িক আরাম পেতে পারেন। কিন্তু এই জাতীয় চিকিৎসার উপকার নেহায়েত সাময়িক এবং সেই কারণেই অযৌক্তিক। স্থায়ীভাবে রোগ নিরাময়ের জন্য চিকিৎসা করতে হবে রোগের কারণ অনুযায়ী। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো রোগীর মায়াজম বা রোগপ্রবনতা (Miasm/ susceptibility) অর্থাৎ সামগ্রিক মনো-দৈহিক বা ধাতুগত দিকে লক্ষ্য রেখে ঔষধ নির্বাচন করতে হবে। তবে প্রায় ক্ষেত্রেই নোসোড (nosode) বা জীবাণু থেকে তৈরী ঔষধগুলির সাহায্য নিতে পারেন। পাশাপাশি যকৃত (liver) এবং প্লীহাতে (spleen) কোন সমস্যা আছে কিনা তাও লক্ষ্য করা দরকার। সেক্ষেত্রে এসব সমস্যা আগে দূর করতে হবে।

Caladium seguinum : বার্নেটের মতে ক্যালাডিয়াম ঔষধটি (শক্তি ৬,১২,৩০,২০০) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রুরিটাস নির্মূলে সফল হয়ে থাকে।

Mercurius solubilis : মার্ক সল ঔষধটির প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **প্রচুর ঘাম হয় কিন্তু রোগী আরাম পায় না,** ঘামে দুর্গন্ধ বা মিষ্টি গন্ধ থাকে, ঘুমের মধ্যে মুখ থেকে লালা ঝরে, পায়খানা করার সময় কোথানি, পায়খানা করেও মনে হয় আরো রয়ে গেছে, **অধিকাংশ রোগ রাতের বেলা বেড়ে যায়।** রোগী ঠান্ডা পানির জন্য পাগল। ঘামের কারণে যাদের কাপড়ে হলুদ দাগ পড়ে যায়, তাদের যে-কোন রোগে মার্ক সল উপকারী।

Sepia : ক্যালাডিয়াম ঔষধটির পরে আসে সিপিয়া ঔষধটির পালা। এটিও প্রুরিটাসের একটি সেরা ঔষধ।

Sulphur : সালফার চুলকানির একটি শ্রেষ্ট ঔষধ। সালফারের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলো যেমন সকাল ১১টার দিকে ভীষণ খিদে পাওয়া, শরীর গরম লাগা, রাতে চুলকানি বৃদ্ধি পাওয়া, গরমে চুলকানি বৃদ্ধি পাওয়া, মাথা গরম কিন্তু পা ঠান্ডা, মাথার তালু-পায়ের তালুসহ শরীরে জ্বালাপোড়া ইত্যাদি পাওয়া গেলে অবশ্যই সালফার প্রয়োগ করতে হবে।

Lapis alba : লেপিস স্ত্রী যৌনাঙ্গের চুলকানিতে একটি কাযর্কর ঔষধ। ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো জ্বালাপোড়া, সূঁই ফোটানো-হুল ফোটানো ব্যথা, রাক্ষুসে ক্ষুধা, মিষ্টি খাবারের প্রতি ভীষণ লোভ ইত্যাদি।

## Rice is the worst enemy of mankind (ভাত মানবজাতির সবচেয়ে বড় শত্রু) :-

আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতি-অগ্রগতি-সমৃদ্ধির পথে সবচেয়ে বড় বাধা কি জিজ্ঞাসা করলে একেক জন একেক উত্তর দিবেন। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যদি বিবেচনা করেন, তবে আমি বলব ভাতই আমাদের এক নম্বর জাতীয় শত্রু। চাল বা ভাত এমন একটি প্রধান খাদ্য যাতে চিনি (শর্করা/ শ্বেতসার/কাবোর্হাইড্রেট) বেশী পরিমাণে থাকে। ফলে আমাদের শারীরিক বৃদ্ধি বা যৌবন প্রাপ্তি ঘটে খুবই দ্রুতগতিতে। ফলে আমরা বিয়ে করি দ্রুত এবং বাচ্চা-কাচ্চা উৎপাদন করি দ্রুত। মনে হয় সেদিন যাকে দেখলাম হাফ-পেন্ট পড়ে খেলছে, দুদিন পরই দেখি বাচ্চা-কাচ্চার মাতা-পিতা হয়ে সে অবসন্ন হয়ে পড়ছে। অর্থাৎ ভাত খাওয়া আমাদের ভয়ঙ্কর গতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি বড় মূল কারণ। বিশ্বাস না হলে চীন-ভারত-ইন্দোনেশিয়া-জাপান-কোরিয়া প্রভৃতি ভাত খাওয়া দেশের দিকে তাকাতে পারেন, প্রতিটি দেশই জনসংখ্যার ভারে বিপযর্স্ত। জনসংখ্যার কল্পনাতীত বিস্ফোরণের কারণে সরকার প্রতিবছর হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেও আমাদের সকলের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারছে না। ভাত আমাদের কেবল দ্রুত যৌবন প্রাপ্তিই ঘটায় না, পাশাপাশি আমাদেরকে ফটাফট্ বুড়ো-বুড়িতেও রূপান্তরিত করে থাকে। ফলে আমরা তাড়াতাড়ি অকর্মণ্য হয়ে পরিবার-সমাজ-দেশের বোঝায় পরিণত হয়ে যাই। কেননা বুড়ো হলে একদিকে কাজ করার শক্তি কমে যায়, অন্যদিকে অসুখ-বিসুখে একেবারে কাবু করে ফেলে। এটা ঠিক যে, চিনি/শর্করা/শ্বেতসার/ কাবোর্হাইড্রেট আমাদের সকল শক্তির মূল উৎস এবং এগুলো ছাড়া আমরা অচল। আবার এটাও সত্য যে, শরীরে অতিরিক্ত (চিনি/শর্করা/শ্বেতসার) কাবোর্হাইড্রেটের সরবরাহ আমাদের জন্য ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর। বিষয়টিকে পানির সাথে তুলনা করলে সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত হয়। আমরা সবাই জানি যে, স্বাভাবিক পানি আমাদের বেঁচে থাকার মূল কারণ আবার বন্যার (অতিরিক্ত) পানি আমাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে।

আমাদের দেশে ডাক্তারদের কাছে যত লোক যায়, তাদের শতকরা ৯০ ভাগেরই দেখা যায় গ্যাস্ট্রিক আলসারের সমস্যা আছে। ভাতে থাকা অতিরিক্ত চিনি থেকেই পেটে গ্যাস হয়, গ্যাস থেকে হয় এসিডিটি এবং এসিডিটি থেকে হয় আলসার। ভাত খাওয়া (অর্থাৎ ভাত খাওয়ার মাধ্যমে বছরের পর বছর শরীরে মাত্রাতিরিক্ত চিনি সরবরাহ করা) যে ডায়াবেটিস হওয়ারও সবচেয়ে বড় কারণ, সেটি নিশ্চয় কেউ অস্বীকার করবেন না। রুটি যে-সব দেশের প্রধান খাদ্য, সে-সব দেশে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন, সেখানে ডায়াবেটিস এবং গ্যাসট্রিক আলসারের কোন মহামারী নাই। এই পর্যায়ে বলা যায় যে, প্রতি বছর এই দুইটি মহামারী রোগের চিকিৎসার জন্য এই গরীব দেশটিকে হাজার হাজার কোটি টাকার ঔষধ বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। কেউ কেউ বলতে পারেন যে, এই দুটি রোগের জন্য ব্যবহৃত বেশীর ভাগ ঔষধই দেশে তৈরী হয়ে থাকে। হ্যাঁ, ঔষধগুলো দেশে তৈরী হয় বটে ; তবে ঔষধ তৈরীর যন্ত্রপাতি, ক্যামিকেল, প্যাকিং সামগ্রী ইত্যাদি সবই কিন্তু বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়।

তাছাড়া এসব রোগ নির্ণয় করার জন্য যে-সব প্যাথলজিক্যাল টেস্ট করতে হয় ; তাদের যনত্রপাতি, রিয়েজেন্ট ইত্যাদিও বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। ডাক্তারের চেম্বারে বা হাসপাতালে লাইন দিয়ে বসে থাকা এবং দিনের পর দিন বিছানায় পড়ে থেকে যত মূল্যবান সময়ের অপচয় হয়, সেই কথা না হয় বাদই দিলাম। কেবল এই দুইটি রোগই নয়, ছোট-বড় আরো শত শত রোগের উৎপত্তির সাথেই এই খতরনাক ভাতের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাবে (অর্থাৎ রক্তে চিনির ভারসাম্যহীনতার)। ডাক্তারদের মতে, এক মুঠো ভাত খাওয়া আর এক মুঠো চিনি খাওয়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য নাই।

আপনি যদি বলেন যে, ভাত নয় বরং অলসতাই হলো আমাদের জাতীয় উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির পথে প্রধান বাধা ; তবে আমি বলবো ভাতই আমাদের দেহ-মনে অলসতা সৃষ্টি করে। ভাতের মধ্যে থাকা মাত্রাতিরিক্ত চিনি / শ্বেতসার অলসতার একটি মুল কারণ। আমরা যে সামান্য একটু পরিশ্রম করলেই কাহিল হয়ে পড়ি, ভাতে থাকা মাত্রাতিরিক্ত সুগারই ইহার জন্য দায়ী। ভাতে যেহেতু প্রচুর চিনি থাকে এবং ভাত দ্রুত হজম হয়ে তার মূল খাদ্য উপাদান শোষিত হয়ে রক্তে চলে যায়, সেহেতু ভাত খাওয়ার ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই হঠাৎ করে আমাদের রক্তে সুগারের মাত্রা অনেক বেড়ে যায় এবং আমরা ডায়াবেটিস রোগীদের মতো ঘুমঘুমভাব, দুর্বলতা, অলসতা অনুভব করতে থাকি। তবে প্রশ্ন করতে পারেন, জাপানী-কোরিয়ানরা তো ভাত খাওয়া সত্ত্বেও আমাদের মতো অলস নয় বরং কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত এবং অল্প পরিশ্রমে ক্লান্ত-শ্রান্তও হয় না। হ্যাঁ, এক্ষেত্রে আবহাওয়াগত কিছু সুবিধা তারা পেয়েছে। তাদের জলবায়ু শীত প্রধান হওয়ার কারণে যথেষ্ট পরিশ্রম করলেও তাদের শরীর ঘামায় না। ফলে তারা আমাদের মতো সামান্য পরিশ্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে না। আর মঙ্গোলীয়ান গোষ্টির লোকেরা (অর্থাৎ নাক বোচা মানুষরা) নৃতাত্ত্বিকভাবেই খুবই পরিশ্রমী হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে আবহাওয়াজনিত কারণে আমাদের শরীর ঘামায় বেশী এবং ঘামের সাথে প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ বেড়িয়ে যাওয়ার কারণে আমরা সহজেই দুর্বল হয়ে পড়ি। এক্ষেত্রে ভাত এবং ঘামানো দুটোই আমাদের অলসতা-দুর্বলতা-কর্মবিমুখতার জন্য সমানভাবে দায়ী।

কোনো কোনো পন্ডিত ব্যক্তি যুক্তি দেখান যে, পরিমাণ মতো ভাত খাওয়া ক্ষতিকর নয় বরং মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে ভাত খাওয়াই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু সমস্যা হলো ভাতের মধ্যে এমনই এক অদ্ভূত দুর্দমনীয় আকর্ষণ আছে যে, ভাত খাওয়ার সময় মাত্রা মতো খাওয়ায়ই কষ্টকর বরং মাত্রাতিরিক্ত খাওয়াই সহজ। পক্ষান্তরে আটার রুটি মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া যে-কোরো পক্ষেই কঠিন। কেননা ভাত নরম এবং ভেজাভেজা আর রুটি শক্ত এবং শুকনা। কেউ কেউ বলবেন যে, দারিদ্রতাই আমাদের মুল সমস্যা। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, ভাতই আমাদের দুরারোগ্য দারিদ্রের মূল কারণ। কেননা ভাত গলা পযর্ন্ত খেলেও দুই ঘণ্টার মধ্যেই হজম হয়ে যায়। ফলে (ভাত) খেতে হয় প্রচুর এবং এজন্য খাওয়ার পেছনে ব্যয় বেড়ে যাওয়ার কারণে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমাদেরকে বাধ্য হয়ে ব্যয় সঙ্কোচন করতে হয়। আমাদের শক্তি-সামর্থ বলুন আর (তালপাতার সেপাই মার্কা) হাস্যকর শারীরিক আকার-আকৃতিই বলুন, সবই করুণার উদ্রেক করে (যাচ্ছেতাই !)। আর ইহার জন্য দায়ী এই কুলাঙার ভাত। ভাত খাওয়া চীনা, ভারতীয় আর ইন্দোনেশিয়ানদের স্বাস্থ্য দেখেন আর রুটি খাওয়া এরাবিয়ান, ইউরোপীয়ান ও আমেরিকানদের স্বাস্থ্য দেখেন, তাহলেই ভাতের মহিমা বুঝতে পারবেন। ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদির মতো পরিশ্রম সাধ্য খেলাগুলোতেও দেখবেন ভাত খাওয়া দেশের ছেলে-মেয়েরা তেমন সুবিধা করতে পারে না। কারণ একটাই আর তাহলো ভাত খেলে অল্প সময়ের জন্য প্রচুর শক্তি (ক্যালরি) সাপ্লাই পাওয়া যায় ঠিকই কিন্তু তার কিছুক্ষণ পরই রক্তে ক্যালরির সাপ্লাই একেবারে বিপজ্জনকভাবে কমে যায়। পক্ষান্তরে রুটি খেলে সেটি ধীরে ধীরে হজম (অর্থাৎ রক্তে শোষিত) হয়, ফলে রক্তে এনার্জি/ ক্যালরির মাত্রা একই রকম থাকে

দীর্ঘ সময় যাবত। ভাতের মতো অল্প সময়ের জন্য ভীষণ বেড়েও যায় না এবং তারপর একেবারে মুশকিলে ফালানোর মতো কমেও যায় না। আমরা যদি ভাত খাওয়া বাদ দিয়ে দ্রুত রুটি খাওয়ায় অভ্যস্ত না হই, তবে সরকার দীর্ঘদিন যাবত ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের পেছনে যে প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা অপচয় করছে, তা আরো কত যুগ চালিয়ে যেতে হবে আল্লাহ্ই ভালো জানেন। অথচ আরবদেশ, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি রুটি খাওয়া দেশের সরকারগুলো দম্পতিদের হাজার হাজার মিলিয়ন ডলার বোনাস দিয়েও তাদের দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারছে না। কোন কোন বিশ্লেষক মনে করেন যে, ভাত নয় বরং অশিক্ষা এবং দারিদ্রের কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাহলে আরব দেশগুলোর দিকে লক্ষ্য করুন, তাদের শিক্ষার হার অনেক কম তারপরও তাদের জনসংখ্যার বিস্ফোরণ নাই। এমনকি কয়েক দশক পূর্বে যখন তারা দরিদ্র ছিল, তখনও তাদের জনসংখ্যার কোন সমস্যা ছিল না।

অনেকে মনে করেন, অশিক্ষাই আমাদের সমৃদ্ধির পথে সবচেয়ে বড় বাধা। এক্ষেত্রে বলা যায় অভাব অশিক্ষার মূল কারণ, অভাবের মূল কারণ জনসংখ্যার লাগামহীন বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যার লাগামহীন বৃদ্ধির মূল কারণ ভাত। ইদানীং অনেকে বলছেন যে, দুর্নীতি আমাদের প্রধান সমস্যা। ভেবে দেখুন, দুর্নীতির মূলে আছে দারিদ্র-অশিক্ষা-অসচেতনতা আর আমাদের দেশে দারিদ্র-অশিক্ষার একটি বড় কারণ হলো জনসংখ্যার বিস্ফোরণ এবং জনসংখ্যা যে আর্শিবাদ না হয়ে বিরাট সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে, তার মূলে আছে এই কমবখ্ত ভাত। কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি মনে করেন যে, জাপান উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তার বিশাল জনসংখ্যাকে অভিশাপ থেকে আশির্বাদে রূপান্তরিত করেছে। সত্যি সত্যি জাপানের দৃষ্টান্তটি একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম আর ব্যতিক্রম কখনও সমাধান হতে পারে না। কাজেই রোগ-ব্যাধিমুক্ত শরীর-স্বাস্থ্য এবং সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমাদের সকলেরই উচিত হবে এখন থেকে ভাত খাওয়া পুরোপুরি বর্জন করা এবং গমের আটার রুটি খাওয়া শুরু করা। (অবশ্য যবের আটার রুটি খাওয়াটা আরো পুষ্টিকর এবং কল্যাণকর। কেননা পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম একটি ভিটামিন ঔষধ যবের পাতার রস থেকে তৈরী করা হয়।) আমি জানি কাজটি খুবই কঠিন এবং রাতারাতি করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আরেকটি সমস্যা হলো, আমাদের নারী সমাজ রুটি পাকানোর চাইতে ভাত রান্না করতে বেশী আগ্রহী। কেননা ভাত রান্না করা খুবই সহজ কিন্তু রুটি বানানো খুবই কষ্টকর কাজ। তবে পাশাপাশি এটাও চিন্তা করে দেখতে হবে যে, ভাত খাওয়ার জন্য নানা রকমের মজাদার তরকারী রান্না করতে হয় কিন্তু রুটি খাওয়ার জন্য তার কোন দরকার নেই। রুটি খাওয়ার জন্য স্রেফ আলু ভাজি অথবা ডাল হলেই যথেষ্ট। সেক্ষেত্রে যে পয়সা দিয়ে আমরা তরকারী ক্রয় করি, তা দিয়ে আমরা দেশী-বিদেশী মৌসুমী ফল-মূল খেতে পারি। বিষয়টি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্যও হবে অধিক উপকারী।

তরকারীর যে আকাশ ছোয়া দাম, তিন কেজি করলা না খেয়ে বরং এক কেজি আপেল খাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কেননা একে তো শাক-সবজিতে তেমন কোন ভিটামিন থাকে না, তারপরেও যা থাকে সেগুলো আবার রান্নার সময় আগুনের তাপে নষ্ট হয়ে যায়। রুটি বানানোর ঝামেলা থেকে আমাদের নারী সমাজকে রক্ষা করার জন্য দেশের হোটেল-রেস্তোরা-খাবার দোকান মালিকদের এগিয়ে আসতে হবে। তাদেরকে বাতাসের মতো পাতলা আর ছয় মাসের পোড়া তেলে ভাজা পরোটা বানানোর অভ্যাস ছেড়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মতো মেগা সাইজের রুটি বানানোর তরিকা চালু করতে হবে যাতে এক রুটিতেই এক পরিবারের সকলের পেট ভরে যায়। আবার ইউরোপ-আমেরিকার মতো পাউরুটি তৈরীর মেশিন ঘরে ঘরে সহজলভ্য করা যেতে পারে। কেহ কেহ চালের চাইতে আটার দাম বেশী ইত্যাদি অজুহাত দেখাতে পারেন, কিন্তু বিস্তর অসুখ-বিসুখ আর অকাল বার্ধক্যের কথাও পাশাপাশি তাদের

চিন্তা করা উচিত। আটা রুটির শতভাগ ফজিলত পেতে চাইলে আমাদেরকে আবার খোলা আটা খাওয়া শুরু করতে হবে ; কেননা যে-সব কোম্পানী প্যাকেটে করে আটা মার্কেটে ছাড়ে তারা আটাকে সাদা করার নামে আটার আসল জিনিসটাই ছেঁকে ফেলে দেয়। সরকারের নিকট আমাদের দাবী থাকবে, গম চাষকে সর্বাত্মকভাবে পৃষ্টপোষকতা প্রদান করা হউক এবং ধান চাষকে নিরুৎসাহিত করা হউক। প্রয়োজনে জেনেটিক্যালি মোডিফাইড গমের চাষ করা হউক। কেননা ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলোতে জিএম ফুড স্বীকৃতি পেয়েছে ; আমাদের অযথা দ্বিধা-দন্দ্ব করে সাতপাঁচ ভেবে বসে থাকলে চলবে না। সর্বোপরি মহানবী (দঃ) ও এই জিএম ফুডের পক্ষে মতামত দিয়েছেন। কেননা এক বাণীতে তিনি বলেছিলেন যে, "আখেরী জামানায় খাদ্য-শস্যে খুবই বরকত হবে"। তার মানে হলো মেগা সাইজের চাল-গম-পেয়াজ-রসুন-ফলমুল-তরিতরকারি ইত্যাদির প্রচলন হবে এবং দুর্ভিক্ষ ঠেকাতে (জনসংখ্যার ভারে নুহ্য) মানবজাতির পক্ষে সেগুলো খাওয়া ছাড়া কোন বিকল্প থাকবে না।

## Salt/sugar eating habit, Excess (অতিরিক্ত লবণ/ চিনি খাওয়ার অভ্যাস) ঃ

– আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনে বহুল ব্যবহৃত খাবার লবণ একই সাথে একটি ভয়ঙ্কর বিষও। যারা নিয়মিতভাবে বেশী বেশী করে লবণ খান অথবা লবণ বেশী দেওয়া খাবার খান (যেমন- চিপস, কাবাব, চটপটি, ফোস্কা, আচার ইত্যাদি), তারা মারাত্মক ধরণের শারীরিক-মানসিক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হন এবং অকালে মৃত্যুবরণ করতে পারেন। লবণ আমাদের শরীরের উপর কি ধরণের ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে, এই সম্পর্কে সর্বপ্রথম বাস্তবসম্মত গবেষণা পরিচালনা করেন ডাঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যান। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কারক এই মহান জার্মান চিকিৎসা বিজ্ঞানী আজ থেকে প্রায় দুইশ বছর পুর্বে দীর্ঘদিন যাবত নিজে লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড (sodium chloride) খেয়ে শরীরের উপর তার ক্ষতিকর প্রভাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। পাশাপাশি তিনি তাঁর ভক্ত অনুসারী অনেক হোমিও চিকিৎসকদের শরীরেও লবণের গুণাগুণ যাচাই করেন। প্রাপ্ত গবেষণায় তিনি দেখতে পান যে, লবণ প্রথমত মানুষের শরীরের রক্ত ধ্বংস করার মাধ্যমে রক্তস্বল্পতা (Anemia) সৃষ্টি করে। ইহার ফলশ্রুতিতে শরীর শুকিয়ে শীর্ণ বা চিকন হয়ে যায়। সময়মতো ইহার চিকিৎসা করা না গেলে মানুষ কংকালসার হতে হতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। দীর্ঘদিন বেশী বেশী লবণ খাওয়ার ফলে কোষ্টকাঠিন্য দেখা দেয় অর্থাৎ পায়খানা শক্ত হয়ে যায় এবং তার থেকে পাইলস দেখা দেয়। লবণ মানুষের ব্রেনের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয় ; ফলে মানুষের বুদ্ধি-মেধা, স্মরণশক্তি ইত্যাদি কমে যায়। লবণ মানুষের ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল করে দেয় ; ফলে মানুষ ঘনঘন সর্দি, কাশি, ডায়েরিয়া ইত্যাদি নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়। চামড়া দুর্বল হয়ে যায় ফলে অল্পতেই চামড়া ফেটে যাওয়াসহ বিভিন্ন চর্মরোগ দেখা দেয়।

বেশী বেশী লবণ খাওয়ার ফলে গেটেবাত, রিউমেটিক ফিভার, মুখের ঘা, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, মাথাব্যথা, অর্ধেক মাথাব্যথা/মাইগ্রেন, গলগন্ড, বিভিন্ন গ্ল্যান্ডের রোগ, মাসিকের গন্ডগোল, হৃদরোগ, মৃগীরোগ, বন্ধ্যাত্ব, গ্যাস্ট্রিক আলসার, ক্যান্সার প্রভৃতি মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। বেশী বেশী লবণ খাওয়ার ফলে যে-সব মানসিক সমস্যা দেখা দেয়, তাদের মধ্যে প্রথমেই দেখা দেয় বদমেজাজ বা খিটখিটে মেজাজ । তারপরে আসে বিষন্নতা বা মনমরাভাব, হতাশা । বিষন্নতা বা হতাশা থেকে মানুষের মধ্যে আত্মহত্যা করার প্রবল ঝোঁকের সৃষ্টি হয় এবং এদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশ সত্যিসত্যি আত্মহত্যা করে বসে (গলায় দড়ি দিয়ে, উপর থেকে লাফ দিয়ে, ঘুমের বড়ি খেয়ে কিংবা মাথায় গুলি করে)। ইহার পরে দেখা দেয় খুতঁখুতেঁ স্বভাব বা সাধারণভাবে যাকে শুচিবাই (Fastidiousness) বলা হয়। সারাক্ষণ সে হাত ধুঁতে থাকে ; প্লেট, বিছানার চাদর ইত্যাদি পরিষ্কার করতে থাকে।

আর সবশেষে আসে উন্মত্ততা বা পাগলামি (schizophrenia) ; তখন হয়ত দেখা যাবে সে উলঙ্গ হয়ে রাজপথের ট্রাফিক কনট্রোল করতে শুরু করেছে। অতিরিক্ত লবণ খাওয়ার অভ্যাস পরিবর্তন এবং শরীরের ওপর তজ্জনিত ক্ষতিকর প্রভাব দূর করার জন্য Natrum muriaticum (শক্তি ৩০) রোজ একমাত্রা করে একমাস খান।

☆ যারা অতিরিক্ত মিষ্টি জাতীয় খাবার খায় কিংবা মিষ্টি জাতীয় খাবার খেয়ে কারো কোনো অসুখ হলে Argentum nitricum রোজ একবার করে কয়েক সপ্তাহ খেতে থাকুন।

**Pain, ache, Rheumatism, Arthritis, Joint pain (ব্যথা, বেদনা, বাত, বাতের ব্যথা, গিরা ব্যথা)** ঃ- ব্যথার ধরন, ব্যথার কারণ ইত্যাদি লক্ষণ মিলিয়ে ঔষধ খেতে হবে। সব ধরনের ব্যথায় একই ঔষধ খেলে চলবে না।

Aconitum napellus : একোনাইট ব্যথার একটি সেরা ঔষধ। সাধারণত ভয়ঙ্কর ধরণের ব্যথা, ছুড়ি মারার মতো ব্যথা, হুল ফোটানোর ব্যথা, ব্যথার চোটে দম বন্ধ হয়ে আসে, ব্যথা যদি হঠাৎ দেখা দেয় এবং ব্যথার চোটে যদি 'এখনই মরে যাব' এমন ভয় হতে থাকে, তবে একোনাইট খেতে হবে।

Arnica montana : **যে-কোন ধরনের আঘাত, থেতলানো, মচকানো, মোচড়ানো বা উপর থেকে পতনজনিত ব্যথায় আর্নিকা খেতে হবে।** পেশী বা মাংশের ব্যথায় আর্নিকা এক নম্বর ঔষধ। শরীরের কোন একটি অঙ্গের বেশী ব্যবহারের ফলে যদি তাতে ব্যথা শুরু হয়, তবে আর্নিকা খেতে ভুলবেন না। যদি শরীরের কোন অংশে এমন তীব্র ব্যথা থাকে যে, কাউকে তার দিকে আসতে দেখলেই সে ভয় পেয়ে যায় (কারণ ধাক্কা লাগলে ব্যথার চোটে তার প্রাণ বেরিয়ে যাবে); এমন লক্ষণে আর্নিকা প্রযোজ্য। আঘাত পাওয়ার কয়েক বছর পরেও যদি সেখানে কোন সমস্যা দেখা দেয়, তবে আর্নিকা সেটি নিরাময় করবে।

Bryonia alba : মাথা ব্যথা, জয়েন্টের ব্যথা, হাড়ের ব্যথা, মাংশের ব্যথা, বুকের ব্যথা, বাতের ব্যথা প্রভৃতিতে ব্রায়োনিয়া সেবন করতে পারেন যদি সেই ব্যথা নড়াচড়া করলে বেড়ে যায়। ব্রায়োনিয়ার লক্ষণ হলো আক্রান্ত অঙ্গ **যত বেশী নড়াচড়া করবে, ব্যথা তত বেশী বৃদ্ধি পেতে থাকে।**

Rhus Toxicodendron : পক্ষান্তরে মাথা ব্যথা, জয়েন্টের ব্যথা, হাড়ের ব্যথা, মাংশের ব্যথা, বুকের ব্যথা, বাতের ব্যথা প্রভৃতিতে রাস টক্স সেবন করতে পারেন যদি সেই ব্যথা নড়াচড়া করলে কমে যায়। রাস টক্সের লক্ষণ হলো **আক্রান্ত অঙ্গ যত বেশী নড়াচড়া করবে, ব্যথা তত বেশী কমতে থাকে।** খুব ভারী কিছু উঠাতে গিয়ে কোমরে বা শরীরের অন্য কোন স্থানে ব্যথা পেলে রাস টক্স এক নাম্বার ঔষধ।

Chamomilla : যদি ব্যথার তীব্রতায় কোন রোগী দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূণ্য হয়ে পড়ে, **তার ভদ্রতাজ্ঞানও লোপ পেয়ে যায়, সে ডাক্তার বা নার্সকে পযর্ন্ত গালাগালি দিতে থাকে;** তবে তাকে ক্যামোমিলা খাওয়াতে হবে। ক্যামোমিলা হলো অভদ্র রোগীদের ঔষধ।

Colchicum autumnale : কলচিকাম গেটে বাত বা জয়েন্টের ব্যথায় ব্যবহৃত হয়। ছোট ছোট জয়েন্টের বাতে এবং বিশেষত পায়ের বৃদ্ধাঙুলের বাতের ব্যথায় কলচিকাম প্রযোজ্য। **কলচিকামের প্রধান লক্ষণ হলো খাবারের গন্ধে বমি আসে এবং আক্রান্ত অঙের জোর/শক্তি কমে যায়।**

Hypericum perforatum : যে-সব আঘাতে কোন স্নায়ু ছিড়ে যায়, তাতে খুবই মারাত্মক ব্যথা শুরু হয়, যা নিবারণে হাইপেরিকাম খাওয়া ছাড়া গতি নেই। **শরীরের সপর্শকাতর স্থানে আঘাত পেলে বা কিছু বিদ্ধ হলে হাইপেরিকাম খেতে হবে ঘনঘন। যেমন- ব্রেন বা মাথা, মেরুদন্ড, (পাছার নিকটে) কণ্ডার হাড়ে, আঙুলের মাথায়, অণ্ডকোষে ইত্যাদি ইত্যাদি।** (তবে যে-সব ক্ষেত্রে পেশী এবং স্নায়ু দুটোই আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে বলে মনে হয়, তাতে আনির্কা এবং হাইপেরিকাম একত্রে মিশিয়ে খেতে পারেন।) আঘাতের স্থান থেকে প্রচণ্ড ব্যথা যদি চারদিকে ছড়াতে থাকে বা খিঁচুনি দেখা দেয় অথবা শরীর ধনুকের ন্যায় বাঁকা হয়ে যায় (ধনুষ্টঙ্কার), তবে হাইপেরিকাম ঘনঘন খাওয়াতে থাকুন।

Ledum palustre : সূচ, আলপিন, তারকাটা, পেরেক, টেটা প্রভৃতি বিদ্ধ হলে ব্যথা কমাতে এবং ধনুষ্টঙ্কার / খিচুনি ঠেকাতে লিডাম ঘনঘন খাওয়ান। অর্থাৎ **যে-সব ক্ষেত্রে কোনকিছু শরীরের অনেক ভেতরে ঢুকে যায়, তাতে লিডাম প্রযোজ্য।** এই ক্ষেত্রে লিডাম ব্যথাও দূর করবে এবং ধনুষ্টংকার হলে তাও সারিয়ে দেবে। চোখে ঘুষি বা এই জাতীয় কোনো আঘাত লাগলে লিডাম এক ঘণ্টা পরপর খেতে থাকুন। বাতের ব্যথায় উপকারী বিশেষত যাদের পা দুটি সব সময় ঠান্ডা থাকে।

Kali bichromicum : ক্যালি বাইক্রোম প্রধান লক্ষণ হলো **ব্যথা আঙুলের মাথার মতো খুবই অল্প জায়গায় হয়ে থাকে, ব্যথা ঘন ঘন জায়গা বদল করে** ইত্যাদি ইত্যাদি।

Plantago Major : **দাঁত, কান এবং মুখের ব্যথায় প্লানটাগো মেজর এমন চমৎকার কাজ করে যে, তাকে এক কথায় যাদু বলাই যুক্তিসঙ্গত।** পত্রিকায় দেখলাম, একজন প্রখ্যাত সাংবাদিকের দাঁতব্যথা সারাতে না পেরে ডেন্টিস্টরা শেষ পযর্ন্ত একে একে তাঁর ভালো ভালো চারটি দাঁতই তুলে ফেলেছেন। আহা ! বেচারা ডেন্টিস্টরা যদি প্লানটাগো'র গুণের কথা জানত, তবে প্রবীন এই সাংবাদিকের দাঁতগুলো বেচেঁ যেতো।

Pulsatilla pratensis : পালসেটিলা'র ব্যথার প্রধান লক্ষণ হলো **ব্যথা ঘনঘন স্থান পরিবর্তন করে।** আজ এক জায়গায় তো কাল অন্য জায়গায় কিংবা সকালে এক জায়গায় তো বিকালে অন্য জায়গায়।

Lac caninum : ল্যাক ক্যান-এর ব্যথার প্রধান লক্ষণ হলো **ব্যথা ঘনঘন সাইড/ পার্শ্ব পরিবর্তন করে।** আজ ডান পাশে তো কাল বাম পাশে কিংবা সকালে সামনের দিকে তো বিকালে পেছনের দিকে।

Bellis perennis : **প্রচণ্ড গরমের সময় অথবা পরিশ্রম করে ঘর্মাক্ত শরীরে আইসক্রিম বা খুব ঠান্ডা পানি খাওয়ার** পরে যদি ব্যথা বা অন্য যে-কোন রোগ দেখা দেয়, তবে বেলিস পিরেনিস খাওয়া ছাড়া আপনার মুক্তির কোন বিকল্প রাস্তা নাই।

Magnesia phosphorica : ম্যাগ ফস স্নায়বিক ব্যথার এক নম্বর ঔষধ। **ইহার ব্যথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছুড়ি মারা অথবা চিড়িক মারা ধরণের মারাত্মক ব্যথা।** আক্রান্ত অঙ্গকে মনে হবে কেউ যেন লোহার হাত দিয়ে চেপে ধরেছে।

Thuja occidentalis : **টিকা (বিসিজি, ডিপিটি, এটিএস, পোলিও, হেপাটাইটিস, এটিএস ইত্যাদি) নেওয়ার কারণে ব্যথা হলে থুজা খেতে হবে।** টিকা নেওয়ার কারণে শরীরের বিভিন্ন স্থানে চিড়িক মারা ব্যথা (neuralgia, sciatica) অর্থাৎ স্নায়বিক ব্যথা হয় এবং বার্নেটের মতে থুজা হলো ইহার শ্রেষ্ট ঔষধ।

(বিঃ দ্রঃ- ইহা ছাড়াও Colic (পেট ব্যথা, শূলবেদনা) অধ্যায়ে আলোচিত ঔষধগুলোও লক্ষণ মিলে গেলে খেতে পারেন।)

## Pneumonia (নিউমোনিয়া, ফুসফুসের প্রদাহ):-

ঈদ উপলক্ষে সেদিন বেড়াতে গিয়েছিলাম শ্বশুরবাড়িতে। সকালে শুনলাম ওদের এক প্রতিবেশীর দুতিন বছরের একটি ছেলে মারা গেছে। নিজের দুই বাচ্চাকে নিয়ে দেখতে গেলাম। ঐ বাড়ির এক মুরব্বী শিশুটির মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে দেখার সুযোগ করে দিলেন। মৃত শিশুটির নিষ্পাপ মুখটি দেখে মুহূর্তের মধ্যে মনটি বিষাদে ভরে উঠল। একবার ভাবলাম এই শিশুটির মতো আমার বাচ্চাদের এই অবস্থা হলে আমার মনের অবস্থা কেমন হতো ? ভেতরের রুম থেকে শিশুটির মায়ের বুকফাটা কান্নার আওয়াজ আসছিল। এতো বড়ো শোক কী সহ্য করার মতো ? শুনেছি আল্লাহ্ এই শিশুদেরকে তাদের পিতা-মাতার চাইতেও শতগুণ বেশী ভালোবাসেন। তাহলে এই নিষ্পাপ শিশুদের মৃত্যু কি তাকে ব্যথিত করে না ?
মনে হয় করে না। কারণ মৃত শিশুরা মা-বাবার চোখের আড়ালে চলে গেলেও আল্লাহর চোখ থেকে আড়ালে যেতে পারে না। বরং তারা আল্লাহর আরো অধিকতর নিকটেই চলে যায়। পাপ-পঙ্কিলতায় জড়িত হওয়ার সুযোগ না পাওয়ার কারণে এসব শিশুরা বিনা হিসাবে বেহেশতে চলে যাবে বলে কোরআন-হাদীসে বলা হয়েছে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে এসব শিশুরা তাদের পাপী মাতা-পিতাকে দোযখে রেখে নিজেরা বেহেশতে যেতে অস্বীকার করবে বলে, মহান আল্লাহ শিশুদের সন্তুষ্টির জন্য দয়াপরবশ হয়ে তাদের পিতা-মাতাকেও দোযখ থেকে মুক্তি দিয়ে একসাথে বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন।

শোনলাম শিশুটির পিতা রংপুরের কৃষি ব্যাংকে চাকরি করেন। ঢাকা এসেছিল ঈদ করার জন্য। শিশুটি হয়ত জান্নাতে চমৎকার ঈদ করবে কিন্তু তার মা-বাবার ঈদকে একেবারে মাটি করে দিয়ে গেলো। মুরব্বীর কাছে জানতে পারলাম যে, শিশুটির নিউমোনিয়া হয়েছিল। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলোতে একশটি শিশু মারা গেলে দেখা যায় তার পঁচানব্বই জনেরই মৃত্যুর কারণ নিউমোনিয়া। নিউমোনিয়ার মূল লক্ষণ হলো ঘনঘন শ্বাস নেওয়া এবং শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া। সাথে জ্বর, কাশি, মাথা ব্যথা, বুকে ব্যথা, ভীষণ শীত বোধ করা ইত্যাদি থাকে। শিশুদের শ্বাস নিতে কষ্ট হলে প্রত্যেক পিতা-মাতাকে অবশ্যই বিষয়টিকে একটি ইমারজেন্সী সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। এই রকম বিপজ্জনক অবস্থায় শিশুকে অবশ্যই সুদক্ষ, নামডাকওয়ালা, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন- তা সে এলোপ্যাথিক ডাক্তার হউক আর হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হোক। নিউমোনিয়া রোগটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় খুব সহজেই সারানো যায়, এমনকি এলোপ্যাথিক চিকিৎসায়ও সারানো যায়।

তবে নিউমোনিয়ার এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় যে-সব হাই পাওয়ারের ভয়ঙ্কর বিষাক্ত এন্টিবায়োটিক শিশুদের খাওয়ানো হয়, তাদের বিষাক্ত ছোবলে শিশুদের স্বাস্থ্য চিরস্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে কেউ কেউ কয়েক বছরের জন্য এবং কেউ কেউ সারাজীবনের জন্য কঙ্কালে পরিণত হয়ে থাকে। যেহেতু অধিকাংশ শিশুই এসব তিতা সিরাপ খেতে চায় না অথবা খেলেও বমি করে ফেলে দেয়, সেহেতু এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা তাদেরকে ইনজেকশনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। যেহেতু অধিকাংশ শিশুরই শরীরে মাংশ কম, ফলে ইনজেকশান নিতে এই নিষ্পাপ শিশুদের যে অবনর্ণীয় যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, তা স্বচক্ষে না দেখলে কেউ অনুভব করতে পারবেন না। অথচ হোমিওপ্যাথিতে

কেবল মিষ্টি মিষ্টি ঔষধ মুখে খাওয়ানোর মাধ্যমে খুব সহজেই নিউমোনিয়া এবং টাইফয়েডসহ শিশুদের অধিকাংশ জটিল ইমারজেন্সী রোগ সারিয়ে দেওয়া যায়। এমনকি ঔষধ খাওয়াও লাগেনা, কেবল জিহ্বার ওপরে রাখতে পারলেই চলে। তাছাড়া খরচও এলোপ্যাথিক চিকিৎসার তুলনায় অন্তত একহাজার গুণ কম। আর সময় ?
যদি রোগীর সমস্ত লক্ষণের সাথে মিলিয়ে সঠিক হোমিও ঔষধটি রোগীকে দেওয়া যায়, তবে রোগমুক্তি হবে অন্য যে-কোন চিকিৎসার চাইতে অন্তত দশগুণ দ্রুত গতিতে। পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ?
বিষক্রিয়া ?
এসব হোমিও ঔষধের ক্ষতিকর কোন প্রতিক্রিয়া তো নাই-ই ; বরং এগুলো একই সাথে শরীরের জন্য ভিটামিনের কাজও করে থাকে।

Bryonia Alba : ব্রায়োনিয়া ঔষধটি নিউমোনিয়ার জন্য আল্লাহ্‌র একটি বিরাট রহমত স্বরূপ। সাধারণত নিম্নশক্তিতে খাওয়ালে ঘনঘন খাওয়াতে হয় কয়েকদিন কিন্তু (১০,০০০ বা ৫০,০০০ ইত্যাদি) উচ্চশক্তিতে খাওয়ালে দুয়েক ডোজই যথেষ্ট। হ্যাঁ, অধিকতর জটিল কেইসের ক্ষেত্রে কয়েকদিন খাওয়ানো লাগতে পারে। আপনি যদি বড়িতে উচ্চশক্তির এক ড্রাম ব্রায়োনিয়া কিনে আনেন এবং তা থেকে একটি বড়ি আধা বোতল পানির সাথে মিশান এবং তা থেকে এক চায়ের চামচ পানি করে রোগীকে রোজ ৩ বার করে অথবা আরো ঘনঘন খাওয়ান ; এভাবে দুইদিন, চারদিন অথবা ছয়দিন পর যখন নিউমোনিয়া সেরে যাবে, তখন যদি আপনি হিসেব করেন তবে দেখতে পাবেন যে, নিউমোনিয়া সারাতে আপনার খরচ হয়েছে ১০ পয়সা অথবা বেশীর পক্ষে ২০ পয়সা। অথচ এলোপ্যাথিতে নিউমোনিয়া সারাতে ৫০০ টাকা দামের হাই-পাওয়ারের এন্টিবায়োটিক ইনজেকশান দিতে হয় ১৪টি। ডাক্তারের ফি, নানা রকমের টেস্ট, হাসপাতালের বেড চার্জ ইত্যাদি সব মিলিয়ে অনেক ক্ষেত্রে অর্ধ লক্ষ টাকার মতো বিল আসতে দেখা যায়। এখন বলুন, হোমিওপ্যাথি মানবজাতির জন্য আল্লাহ্‌র এক বিরাট রহমত কি না ?

Ranunculus bulbosus : রেনানকুলাস বালবুসাস ঔষধটিও নিউমোনিয়ার আরেকটি শ্রেষ্ট ঔষধ।

Antimonium tartaricum : **এন্টিম টার্টের প্রধান লক্ষণ হলো কাশির আওয়াজ শুনলে মনে হয় বুকের ভেতর প্রচুর কফ জমেছে কিন্তু কাশলে কোন কফ বের হয় না।** রেগে গেলে অথবা খাওয়া-দাওয়া করলে কাশি বেড়ে যায়। **জিহ্বায় সাদা রঙের মোটা স্তর পড়বে**, শরীরের ভেতরে কাঁপুনি, ঘুমঘুম ভাব এবং সাথে পেটের কোন না কোন সমস্যা থাকবেই। কাশতে কাশতে শিশুরা বমি করে দেয় এবং বমি করার পর সে কিছুক্ষণের জন্য আরাম পায়। **শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়ার কারণে নাকের পাখা দ্রুত উঠানামা করতে থাকে।**

Ipecac : ইপিকাক শিশুদের নিউমোনিয়ার আরেকটি জরুরি ঔষধ। ইহার প্রধান লক্ষণ হলো (যে-কোন রোগই হোক না কেন, তার সাথে) **বমিবমি ভাব থাকে এবং জিহ্বা পরিষ্কার থাকে।** এই ঔষধটি শিশুদের সবচেয়ে বড় বন্ধু। কারণ শিশুদের পেটের অসুখ এবং কাশি-নিউমোনিয়া বেশী হয় আর ইপিকাক এইসব রোগে দারুণ কাজ করে।

Phosphorus : নিউমোনিয়া বা এই জাতীয় বিপদজ্জনক রোগে আমাদেরকে অবশ্যই কথা মাথায় রাখতে হবে। ফসফরাসের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **রোগী বরফের মতো কড়া ঠান্ডা পানি খেতে চায়,** মেরুদন্ড থেকে মনে হয় তাপ বেরুচ্ছে, **হাতের তালুতে জ্বালাপোড়া,** একা থাকতে ভয় পায়, **অন্ধকারে ভয় পায়** ইত্যাদি ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে সেটি আপনার চোখে ছানি সারিয়ে দিবে।

Sulphur : সালফার হলো বহুমুখী গুণাবলীসম্পন্ন ঔষধগুলোর একটি। নিউমোনিয়াতে যদি সালফারের লক্ষণ পাওয়া যায়, তবে সালফার প্রয়োগ করতে হবে। কোন রোগীকে সালফার দিতে হবে, তা চেনার সবচেয়ে সহজ উপায়

হলো, দেখবেন রোগী শরীরে যত ছিদ্র আছে সেখানকার রঙ টকটকে লাল হয়ে যাবে। যদি দেখেন যে, রোগী মুখের ভেতরটা, নাকের ভেতরটা, পায়খানার রাস্তা অথবা প্রস্রাবের রাস্তার রঙ টকটকে লাল হয়ে আছে, তবে তাকে নিশ্চিন্তে সালফার দিতে পারেন। সালফারের অন্য কোন লক্ষণ না থাকলেও চলবে। সে যাক, সালফারের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলোর মধ্যে আছে সকাল ১১টার দিকে ভীষণ খিদে পাওয়া, রোগ রাতে বৃদ্ধি পাওয়া, রোগ গরমে বৃদ্ধি পাওয়া, **মাথার তালু-পায়ের তালুসহ শরীরে জ্বালাপোড়া, গরম লাগে বেশী, শরীরে চুলকানী বেশী,** সকাল ১১টার দিকে ভীষণ খিদে পাওয়া, **মাথা গরম কিন্তু পা ঠান্ডা, গোসল করা অপছন্দ করে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে কোন খেয়াল নাই** ইত্যাদি।

Baptisia tinctoria : (ব্রায়োনিয়া বা রেনানকুলাস ব্যবহারে) মোটামুটি নিউমোনিয়ার অবস্থা যথেষ্ট উন্নতি হলে অথবা নিয়ন্ত্রণে এসে গেলে তখন এন্টিবায়োটিক হিসাবে ব্যাপটিশিয়া ব্যবহার করতে পারেন।

## পটেটো চিপস্ শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর (Potato chips are dangerous for kids health) :-

সমপ্রতি জাতীয় দৈনিকগুলোতে একটি রিপোর্ট বেড়িয়েছিল যে, পটেটো চিপস্ শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। তাতে আরো দাবী করা হয়েছিল যে, চিপসে নাকি অনেকগুলো প্রয়োজনীয় ভিটামিন থাকে যা শিশুদের স্বাস্থ্যের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে। জনস্বার্থে এই ধরণের বিভ্রানিতকর সংবাদের প্রতিবাদ করা জরুরি মনে করছি। এটি পুরোপুরি একটি মিথ্যা এবং ক্ষতিকর প্রচারণা। বাস্তব সত্য হলো সব ধরণের চিপস্ই শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর, সেটি পটেটো, বেনানা, ম্যাংগো কিংবা টমেটো যে-কোন জিনিস থেকেই তৈরী করা হউক না কেন। তবে আমাদেরকে জানতে হবে চিপসের কোন উপাদানটি শিশুদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে থাকে ?
হ্যাঁ, সেই উপাদানটি হলো লবণ। সাধারণত চিপসের সাথে প্রচুর পরিমাণে লবণ থাকে এবং সেগুলো শিশুদের পেটে চলে যায়। এই লবণই হলো মানব শরীরের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর পদার্থ। সবাই হয়তো বলবেন যে, লবণ আমাদের শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং ক্ষয়রোধের জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। হ্যাঁ, তা ঠিক কিন্তু বিতর্কটা হলো লবণের পরিমাণ নিয়ে। সাধারণত ডাল-ভাত, মাছ-মাংস, ফল-মুল, শাক-সবজি ইত্যাদিতে প্রাকৃতিকভাবে যে পরিমাণে লবণ থাকে, তাতেই আমাদের শরীরের দৈনন্দিন লবণের চাহিদা পুরণ হয়ে যায়। ইহার অতিরিক্ত যে লবণ আমরা খাই, সেগুলো আমাদের শরীরের ভয়ঙ্কর ক্ষতি করে থাকে।

লবণ আমাদের শরীরের উপর কি ধরণের ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে, এই সম্পর্কে সর্বপ্রথম বাস্তবসম্মত গবেষণা পরিচালনা করেন ডাঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যান। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কারক এই মহান জার্মান চিকিৎসা বিজ্ঞানী আজ থেকে প্রায় দুইশ বছর পুর্বে দীর্ঘদিন যাবত নিজে লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড (sodium chloride) খেয়ে শরীরের উপর তার ক্ষতিকর প্রভাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। পাশাপাশি তিনি তাঁর ভক্ত অনুসারী অনেক হোমিও চিকিৎসকদের শরীরেও লবণের গুণাগুণ যাচাই করেন। প্রাপ্ত গবেষণায় তিনি দেখতে পান যে, লবণ প্রথমত মানুষের শরীরের রক্ত ধ্বংস করার মাধ্যমে রক্তস্বল্পতা (Anemia) সৃষ্টি করে। ইহার ফলস্রুতিতে শরীর শুকিয়ে শীর্ণ বা চিকন হয়ে যায়। সময়মতো ইহার চিকিৎসা করা না গেলে মানুষ কংকালসার হতে হতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। দীর্ঘদিন বেশী বেশী লবণ খাওয়ার ফলে কোষ্টকাঠিন্য দেখা দেয় অর্থাৎ পায়খানা শক্ত হয়ে যায় এবং তার থেকে পাইলস দেখা দেয়। লবণ মানুষের ব্রেনের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয় ; ফলে মানুষের বুদ্ধি-মেধা, স্মরণশক্তি ইত্যাদি কমে যায়।

লবণ মানুষের ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল করে দেয় ; ফলে মানুষ ঘনঘন সর্দি, কাশি, ডায়েরিয়া ইত্যাদি নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়। চামড়া দুর্বল হয়ে যায় ফলে অল্পতেই চামড়া ফেটে যাওয়াসহ বিভিন্ন চর্মরোগ দেখা দেয়।

বেশী বেশী লবণ খাওয়ার ফলে গেটেবাত, রিউমেটিক ফিভার, মুখের ঘা, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, মাথাব্যথা, অর্ধেক মাথাব্যথা/মাইগ্রেন, গলগন্ড, বিভিন্ন গ্ল্যান্ডের রোগ, মাসিকের গন্ডগোল, হৃদরোগ, মৃগীরোগ, বন্ধ্যাত্ব, গ্যাস্ট্রিক আলসার, ক্যান্সার প্রভৃতি মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। বেশী বেশী লবণ খাওয়ার ফলে যে-সব মানসিক সমস্যা দেখা দেয়, তাদের মধ্যে প্রথমেই দেখা দেয় বদমেজাজ বা খিটখিটে মেজাজ । তারপরে আসে বিষন্নতা বা মনমরাভাব, হতাশা । বিষন্নতা বা হতাশা থেকে মানুষের মধ্যে আত্মহত্যা করার প্রবল ঝোঁকের সৃষ্টি হয় এবং এদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশ সত্যিসত্যি আত্মহত্যা করে বসে (গলায় দড়ি দিয়ে, উপর থেকে লাফ দিয়ে, ঘুমের বড়ি খেয়ে কিংবা মাথায় গুলি করে)। ইহার পরে দেখা দেয় খুতঁখুতেঁ স্বভাব বা সাধারণভাবে যাকে শুচিবাই (Fastidiousness) বলা হয়। সারাক্ষণ সে হাত ধুঁতে থাকে ; প্লেট, বিছানার চাদর ইত্যাদি পরিষ্কার করতে থাকে। আর সবশেষে আসে উন্মত্ততা বা পাগলামি (schizophrenia) ; তখন হয়ত দেখা যাবে সে উলঙ্গ হয়ে রাজপথের ট্রাফিক কনট্রোল করতে শুরু করেছে। এই তো গেলো খাবার লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইডের তেলেসমাতি। খাবার লবণের পাশাপাশি চিপসগুলোতে আরেক ধরণের লবণও ব্যবহার করা হয়, যাকে টেস্টিং সল্ট বা সোডিয়াম গ্লোটামেট (sodium glutamate) বলা হয়। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন এটি কিডনী এবং মুত্রনালীতে ক্যান্সার সৃষ্টি করে থাকে। কাজেই যারা হরহামেশা সকাল-বিকাল শিশুদের নানা রকমের চিপস্ খেতে দেন, এখন থেকে এই কাজ করার পুর্বে তাদের অবশ্যই দ্বিতীয়বার ভেবে নেওয়া উচিত। তবে দুয়েকটি ব্রান্ডের চিপসে দেখেছি লবণ থাকে না কিংবা বলা যায় লবণ খুবই কম থাকে। এসব ব্রান্ডের চিপস্ নিশ্চিতভাবেই শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ। এই লবণমুক্ত চিপসগুলো শিশুদের খাওয়াতে পারেন।

## Smoking (ধূমপান) :-

ধূমপান মানবজাতির জন্য মনে হয় সবচেয়ে বড় অভিশাপ। আজকের দুনিয়ায় ক্যানসার, যক্ষা, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি রোগের মহামারীর পেছনে ধূমপানের ভূমিকাই সবাধির্ক। বলা হয়ে থাকে যে, ধূমপানের নেশা ছাড়া যায় না। কিন্তু তাহা একেবারেই সত্যি নয়। উপযুক্ত হোমিও চিকিৎসা অবলম্বন করলে এই নেশা সহজেই দূর হয়ে যায়। নীচে বর্ণির্ত র্তিনটি ঔষধের সাহায্যে সহজেই ধূমপানের নেশা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। প্রয়োজনে একজন হোমিও স্পেশালিষ্টের সাহায্য নিন।

China officinalis : ধূমপানের নেশা ছাড়াতে আরেকটি উৎকৃষ্ট ঔষধ হলো চায়না। এটি খুব সেনসেটিভ লোকদের ঔষধ। ফলে এটি কয়েক সপ্তাহ খেলে দেখবেন সিগারেট আপনার সহ্যই হচ্ছে না। এটি Q, ৩, ৬, ৩০ ইত্যাদি যে-কোন শক্তিতে খেতে পারেন ; তবে যত নিম্নশক্তিতে খাওয়া যায় তত উত্তম। রোজ পাঁচ ফোটা করে সকাল-সন্ধ্যা দু'বার।

Tabacum : টেবেকাম নামক ঔষধটিও ধূমপানের নেশা দূর করতে সাহায্য করে। তামাক পাতার রস থেকে তৈরী করা এই ঔষধটি তামাকের নেশা দূর করার একটি সেরা ঔষধ। এটিও একই নিয়মে খেতে পারেন।

Staphisagria : বিড়ি-সিগারেট অর্থাৎ ধূমপানের নেশা ছাড়াতে স্টেফিসেগ্রিয়া একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। এটি ধূমপানের প্রতি আকর্ষণ কমিয়ে দিয়ে সেটি বন্ধ করতে সাহায্য করে। এটি Q, ৩, ৬, ৩০ ইত্যাদি যে-কোন শক্তিতে খেতে পারেন ; তবে যত নিম্নশক্তিতে খাওয়া যায় তত উত্তম। রোজ পাঁচ ফোটা করে সকাল-সন্ধ্যা দু'বার।

**Wound, Ulcer (ক্ষত/ঘা)** ঃ- যে-কোনো ধরনের ক্ষত আরোগ্য করতে Merc sol অথবা Hepar sulph (শক্তি ২০০ বা তার উপরে) তিনবেলা করে আরোগ্য না হওয়া পযর্ন্ত খেতে থাকুন। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে শক্তি বাড়িয়ে খেয়ে যান। কোনো স্থানে আঘাত লেগে ক্ষত হওয়ার পর তাতে পঁচন ধরলে Sulphuricum acidum (শক্তি ৩০,২০০) তিনবেলা করে খেতে থাকুন।

## Mental shock (মানসিক আঘাত) ঃ-

প্রেমে ব্যর্থ হয়ে, আপনজনের মৃত্যু, চাকুরি-ব্যবসায়িক ক্ষতি ইত্যাদি কারণে শারীরিক বা মানসিক কোন রোগ দেখা দিলে Ignatia amara (শক্তি ৬,১২,৩০) তিনবেলা করে খান। অপমানিত হয়ে কোন রোগ দেখা দিলে Staphisagria (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২,৩০) দু'চার ঘন্টা পরপর খেতে থাকুন। শিশুদেরকে শিক্ষক বা বড়রা মারধর করার কারণে কোন রোগ হলে Chamomilla ঔষধটি খাওয়াতে ভুলবেন না।

## Nasal polypus (পলিপাস) ঃ -

নাকের পলিপ সারানোর জন্য Calcarea phos, Aurum metallicum কিংবা Lemna minor (শক্তি 3x, 6x) রোজ তিনবেলা করে একমাস খান। তারপর একদিন পরপর একমাত্রা করে এক মাস খান। পরবর্তীতে শক্তি এবং মধ্যবর্তী বিরতি বাড়িয়ে খেতে পারেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেহেতু টিকা নেওয়ার কারণে পলিপ হয়, তাই প্রত্যেকেরই Thuja occidentalis ঔষধটি (শক্তি ১০,০০০) মাসে এক মাত্রা করে তিন মাসে তিন মাত্রা খাওয়া উচিত। আবার যাদের ঘন ঘন সর্দি-কাশি হয়, তাদের Bacillinum ঔষধটি (শক্তি ১০,০০০) মাসে এক মাত্রা করে তিন মাসে তিন মাত্রা খাওয়া উচিত।

## SurgeonS, medicine for (অস্ত্রচিকিৎসকদের যাদুকরী ঔষধ) :-

স্ট্রনটিয়াম ঔষধটিকে বলা হয় সার্জনদের / অস্ত্রচিকিৎসকদের জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ। কেননা অপারেশানের পরে অনেক রোগীই শকে (shock) চলে যায় এবং মৃত্যুবরণ করে। স্ট্রনটিয়াম খুব সহজেই এসব রোগীদের শকে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে রেখে জীবন রক্ষায় সাহায্য করে। এই জন্য সকল সার্জনদের ব্যাগেই এই ঔষধটি সারাক্ষণ মওজুদ রাখা আবশ্যক। সাধারণত দুর্বল রোগী, বেশী বয়স্ক রোগী, মারাত্মকভাবে অসুস্থ রোগীদের অনেকেই জটিল বা বড় ধরনের অপারেশানের পর শকে চলে যায় এবং মৃত্যুবরণ করে। সাধারণত অস্থিরতা (restlessness), মস্তিষ্কে বা হৃৎপিন্ডে অক্সিজেন সরবরাহ কমে যাওয়া (hypoxia), রক্তচাপ কমে যাওয়া (**Hypotension**), নাড়ির গতি দ্রুত এবং ক্ষীণ হওয়া (tachycardia, thready pulse), শরীর ঘেমে যাওয়া (Cool, clammy skin), দ্রুত নিঃশ্বাস (Rapid respirations), শরীর ঠান্ডা হয়ে যাওয়া (**Hypothermia**) ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দিলেই বুঝতে হবে যে, রোগী শকে চলে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে রোগীর জীবন বাচাঁতে নামক Strontiana carbonica ঔষধটি ঘন ঘন দুই-তিন মাত্রা খাইয়ে দিন। সাধারণত ৩০ বা ২০০ শক্তিতে খাওয়াতে পারেন ; তবে যে-কোন শক্তিই আপনার হাতে থাকুক তা-ই প্রয়োগ করতে হবে। স্ট্রনটিয়ামের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো মুখমন্ডল লাল-গরম হয়ে ওঠা (flushing of face),

রক্তনালীতে দপদপানি (violent pulsation of the arteries), হৃৎপিন্ড, ফুসফুস এবং মাথায় রক্তসঞ্চয় (congestion to heart, lungs, and head), গরমে ভালো থাকে এবং ঠান্ডায় রোগীর অবস্থা হয়ে যায়, মাথার ভেতরে ছিদ্র করার ন্যায় ব্যথা (boring headaches), শ্বাসকষ্ট (dyspnoea), বুকের ছাতার ওপর চাপ বোধ করা (pressure in sternum), সারা শরীরে ব্যথা (soreness), অবশতা (numbness) ইত্যাদি ইত্যাদি।

**Beware of Vaccines (টিকা থেকে সাবধান) ঃ -** সেদিন একজন সরকারী কর্মকর্তার শিশু সন্তানকে যখন টিকা দেওয়া হলো তখন সাথে সাথেই শিশুটির সমস্ত শরীর প্যারালাইজড হয়ে মরণাপন্ন দশায় উপনীত হয়। দ্রুত একটি দামী ক্লিনিকে ভর্তি করে প্রায় অর্ধ লক্ষাধিক টাকা খরচ করে শিশুটিকে প্রাণে বাচাঁনো সম্ভব হয়। এই ঘটনায় তার সহকর্মী এবং অধীনস্থ কর্মচারীদের অনেকেই আড়ালে-আবডালে মন্তব্য করছিল যে, "ঘুষখোরের উপর আল্লাহর গযব পড়েছে"। আসলেই কি এটি গজব ছিল ?
ধর্মীয় বা নীতি-নৈতিকতার দৃষ্টিতে মন্তব্যটি সঠিক হলেও বিজ্ঞান কিন্তু তা বলে না। হ্যাঁ, টিকার যতগুলো মারাত্মক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে, তার মধ্যে একটি হলো 'সাডেন ইনফেন্ট ডেথ সিনড্রোম' বা শিশুর হঠাৎ মৃত্যু (SIDS-Sudden Infant Death Syndrome)। বেশ কিছু রোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য বা রোগের বিরুদ্ধে শরীরে প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টির জন্য আমরা অনেকেই এলোপ্যাথিক টিকাগুলো নিয়ে থাকি। যেমন-বিসিজি, ডিপিটি, এমএমআর, হাম, পোলিও, হেপাটাইটিস, এটিএস ইত্যাদি। অথচ টিকার (vaccine) মারাত্মক ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আমরা অনেকেই খবর রাখি না। টিকার ক্রিয়াকৌশল হলো অনেকটা 'কাটা দিয়ে কাটা তোলা' কিংবা 'চোর ধরতে চোর নিয়োগ দেওয়া'র মতো। যে রোগের টিকা আমরা নিয়ে থাকি, সেটি বস্তুত তৈরী করা হয়ে থাকে সেই রোগেরই জীবাণু থেকে। অর্থাৎ যে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস যে-ই রোগের সৃষ্টি করে থাকে, সেই ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস থেকেই সেই রোগের টিকা প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট মারাত্মক ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসকে নাকি নানাবিধ জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'দুর্বল' করে টিকা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। টিকা মুখে খাওয়ানো হউক বা ইনজেকশনের মাধ্যমে দেওয়া হউক, সবগুলোই এই তথাকথিত 'দুর্বল' কিন্তু জীবিত জীবাণু দিয়ে তৈরী করা হয়। এসব ভয়ানক ক্ষতিকর জীবাণুকে 'দুর্বল' করার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করে একই সাথে বিখ্যাত এবং পরবর্তীতে কুখ্যাত হয়েছিলেন ফ্রান্সের বিজ্ঞানী লুই পাস্তর। কেননা লুই পাস্তরের আবিষ্কৃত জলাতঙ্কের টিকা নিয়েই বরং বিপুল সংখ্যক লোক জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল। দাবী করা হয়ে থাকে যে, জীবাণুদের এই 'দুর্বলতা' একটি স্থায়ী বিষয়; কাজেই তারা কখনও শক্তিশালী হতে পারে না এবং কোন ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু নিরপেক্ষ চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, কারো শরীরে উপযুক্ত পরিবেশ পেলে জীবাণুরা ঠিকই শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে এবং ভয়ঙ্কর ক্ষতিসাধন করতে পারে। বাস্তবে এমন ভুড়িভুড়ি প্রমাণ পাওয়া যায়।

আরেকটি চিন্তার কথা হলো, শক্তিশালী কেউটে সাপে দংশন করলে মানুষ মরবে আর দুর্বল কেউটে সাপে কামড়ালে মানুষ মরবেও না আর কোন ক্ষতিও হবে না, এমনটা বলা কতটা যুক্তিসঙ্গত ?
দাবী করা হয়ে থাকে যে, কোন রোগের টিকা নিলে শরীরে সেই রোগের বিরুদ্ধে একটি ক্ষণস্থায়ী প্রতিরোধ শক্তির (antibody) সৃষ্টি হয়; ফলে আগামী কয়েক বছর সেই ব্যক্তির ঐ রোগটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু এই দাবীর একশ ভাগ গ্যারান্টি আজ পর্যনত্ম পাওয়া যায় নাই। বোয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী অধিকাংশ ব্রিটিশ সৈন্যকে টাইফয়েডের টিকা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তারপরও ৫১,০০০ সৈন্য টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়েছিল যাদের মধ্যে ৮০০০ সৈন্য মৃত্যুবরণ করে। অন্যদিকে ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় রাশিয়া-জাপান যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অনুসারে ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টের সৈন্যদেরকে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়েছিল। ফলে টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়েছিল মাত্র ৭০০০ সৈন্য যাদের অর্ধেক ছিল টাইফয়েডের টিকা নেওয়া এবং অর্ধেক ছিল টিকা ছাড়া। আবার

গেলিপোলির যুদ্ধে সমস্ত সৈন্যকে আমাশয়ের টিকা দেওয়ার পরও ৯৬,০০০ সৈন্য আমাশয়ে আক্রান্ত হয়েছিল কেবল বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা যায়নি বলে। ১৯৪৮ সালে যুক্তরাজ্যে বাধ্যতামূলক বসন্তের টিকা নেওয়ার আইনটি যখন বাতিল করা হয়; তার পরের পরিসংখ্যানে কিন্তু যুক্তরাজ্যে বসন্ত মহামারীর সংখ্যা বা বসন্ত রোগে (small pox) মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়নি। মোটামুটি সকল টিকার শিক্ষা একটিই আর তাহলো পুষ্টিকর খাবার, বিশুদ্ধ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন, স্বাস্থ্যকর বাসস্থান ইত্যাদির অভাবকে হাজারবার টিকা দিয়েও সামলানো যায় না। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো- শরীরে রোগ প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টি করার পাশাপাশি টিকা নামক এই জৈব বিষ (Biological poison) অর্থাৎ জীবাণু মানুষের রোগ প্রতিরোধ শক্তি বা ইমিউন সিস্টেমে (immune system) মারাত্মক বিশৃঙখলার সৃষ্টি করে থাকে। আর এই বিশৃঙখলার সুযোগে ক্যান্সারের মতো প্রাণঘাতী রোগ আমাদের শরীরে বাসা বাধার উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে যায়। ইহা আজ প্রমাণিত সত্য যে, ইমিউনিটির সর্বনাশ না হলে শরীরে ক্যান্সার বা ম্যালিগন্যান্সি (malignancy) আসতে পারে না। পৃথিবীতে রোগ-ব্যাধিকে যিনি সবার চাইতে বেশী বুঝতে পেরেছিলেন, সেই চিকিৎসা মহাবিজ্ঞানী জার্মান ডাঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যান টিকাকে অভিহিত করেছেন - মানবজাতিকে ধ্বংসের একটি ভয়ানক মারনাস্ত্ররূপে।

টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা ক্ষতিকর ক্রিয়া এবং তা থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক গবেষনা করেছেন ব্রিটিশ হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাঃ জে. সি. বার্নেট (Dr. James Compton Burnett, M.D.)। ১৮৮০ সালে তিনি তাঁর সুদীর্ঘ ক্লিনিক্যাল অবজার্বেশন থেকে ঘোষণা করেন যে, টিউমার এবং ক্যান্সারের একটি অন্যতম মূল কারণ হলো এসব টিকা। বার্নেট প্রথম প্রমাণ করেন যে, থুজা (Thuja occidentalis) নামক হোমিও ঔষধটি টিকার অধিকাংশ ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিরাময় করতে সক্ষম। বার্নেটের মতে, মানুষ জন্মের সময় আল্লাহ প্রদত্ত যে স্বাস্থ্য নিয়ে জন্মায় তা হলো সবচেয়ে উৎকৃষ্ঠ স্বাস্থ্য (perfect health)। আর এই কারণে টিকা দিয়ে বা অন্য-কোন ঔষধ প্রয়োগে তাকে পরিবর্তন করা হলো একটি মাইনাস পয়েন্ট অর্থাৎ সুস্বাস্থ্যের ক্ষতি করার নামান্তর। তার মানে হলো টিকা দেওয়ার ফলে একজন মানুষ তার সবচেয়ে উত্তম স্বাস্থ্য থেকে বিচ্যুত/ অধঃপতন হলো। আর সবচেয়ে উৎকৃষ্ঠ স্বাস্থ্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার মানে হলো অসুস্থ্য হওয়া। কাজেই টিকা নেওয়ার ফলে শরীরের যে অবস্থা হয়, তাকে সহজ ভাষায় বলা যায় অসুস্থ অবস্থা বা রোগ আক্রান্ত অবস্থা বা পীড়াগ্রস্থ হওয়া। স্টুয়ার্ট ক্লোজ (Dr. Stuart M Close, M.D.) নামক আরেকজন ব্রিটিশ চিকিৎসা বিজ্ঞানী টিকার ন্যায় যাবতীয় পাইকারী চিকিৎসাকে সম্পূর্ণরূপে 'এক পাক্ষিক বা এক আঙ্গিক' (unholistic) ঘোষণা করে ইহার নিন্দা করেছেন ; কেননা ইহা চিকিৎসা বিজ্ঞানের সংবেদনশীলতা (Susceptibility) নামক সার্বজনীন নীতির পরিপন্থী। সাসসেপটিভিলিটি নীতির মানে হলো একই ঔষধ একজনের উপকার করতে পারে, আরেকজনের ক্ষতি করতে পারে আবার অন্যজনের উপকার-ক্ষতি কোনটাই নাও করতে পারে।

হ্যারিস কালটার (Harris Culter) নামক একজন আমেরিকান মেডিক্যাল ঐতিহাসিক তাঁর দীঘ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে এখনকার সমাজে মানসিক রোগ এবং অপরাধ প্রবনতা বৃদ্ধির জন্য এবং সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের জন্য টিকাদান কর্মসূচীকে দায়ী করেছেন। টিকা কেবল আমাদের শরীরকে নয়, আমাদের মনকেও বিষিয়ে তুলেছে। মানুষের মধ্যে আজকাল যে উগ্রমেজাজ, প্রতিশোধ প্রবনতা, অপরাধে আসক্তি, কথায় কথায় খুন করার মানসিকতা, মাদকাসক্তি, সমকামিতা, আত্মহত্যার প্রবনতা প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায় তারও মূলে রয়েছে এই কুলাঙ্গার টিকা। বিশেষত বিসিজি টিকা শিশুদের মনে ধ্বংসাত্মক প্রবণতা সৃষ্টি করে। ইহার ফলে শিশুরা এমন দুর্দান্ত স্বভাবের হয় যে, তাদেরকে শাসন বা নিয়নত্রণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এরা হয় গোয়ার, কথায় কথায় মারামারি এবং

ভাঙচুড়ে ওস্তাদ। বর্তমানে প্রচলিত মারাত্মক মারাত্মক অনেক চর্মরোগেরও মূল কারণ এই খতরনাক টিকা। একটি ওয়েবসাইটে টিকা নেওয়ার ফলে শিশুদের যে-সব মারাত্মক মারাত্মক চর্মরোগ হয়েছে, তাদের অনেকগুলো ছবি দেওয়া আছে, যা দেখলে যে-কেউ শিউরে উঠবেন। সম্প্রতি একটি গবেষণায় ঈঙ্গিত করা হয়েছে যে, একিউট ডিজিজের (acute diseases) পরিমাণ কমে গিয়ে এলার্জি, হাঁপানি, ডায়াবেটিস, টিউমার, ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ক্রনিক ডিজিজের সংখ্যা মহামারী আকারে বৃদ্ধি পাওয়ার মূলে আছে এসব পাইকারী টিকাদান কর্মসুচী। কুলকান (Kulcan) নামক একজন ব্রিটিশ গবেষক লক্ষ্য করেন যে, মানুষের চুল টিকার দ্বারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় থাকে। টিকা নেওয়ার ফলে কারো কারো চুল পাতলা হয়ে যায়, কারো কারো চুল পড়ে টাঁক হয়ে যায় এবং কারো কারো ক্ষেত্রে অনাকাঙিখত স্থানে বেশী বেশী চুল গজাতে থাকে। ডাঃ বার্নেট দীর্ঘ গবেষণায় প্রমাণ করেছেন যে, টাক (Alopecia areata) পড়ার মূল কারণ হলো দাদ (Ringworm) এবং দাদের মূল কারণ হলো টিকা। এই কারণে দেখা যায় শহরে মানুষদের মধ্যে টাক পড়ে বেশী এবং গ্রামের মানুষদের মধ্যে টাক পড়ার হার খুবই কম ; কেননা গ্রামের লোকেরা টিকা/ ভ্যাকসিন তেমন একটা নেয় না। আমার দ্বিতীয় মেয়েটির ঘটনা মনে আছে, জন্মের সময় তার মাথা ভরা চুল ছিল এবং জন্মের একমাস পর তাকে এক ডোজ পোলিও টিকার খাওয়ানোর পর থেকে দুই-তিন মাসের মধ্যেই তার চুল পড়তে পড়তে অর্ধেক মাথা টাক পড়ে যায়। তখন আমি টিকার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। তারপর তাকে কয়েক মাত্রা থুজা খাওয়ানোর পর আবার ধীরে ধীরে চুল গজাতে শুরু করে।

সম্প্রতি ডাঃ রিচার্ড পিটকেয়ার্ন (Dr. Richard Pitcairn) নামক একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী আমেরিকার গৃহপালিত পোষা প্রাণীদের ওপর গবেষণা করে দেখতে পান যে, যেসব পশুদের টিকা দেওয়া হয়েছে তদের দাঁত ক্ষয় (dental caries) হয় বেশী বেশী। আমেরিকানরা কেবল পাইকারী হারে টিকা নিতেই অভ্যস্থ নয় বরং একই সাথে তাদের গৃহপালিত পোষা প্রাণীদেরকেও পাইকারী হারে টিকা দিতে ওস্তাদ। আবার একই অবস্থা দেখা গেছে মানুষের ক্ষেত্রেও ; টিকা না নেওয়া শিশুদের চাইতে টিকা নেওয়া শিশুদের দাঁত ক্ষয় হয় বেশী মাত্রায়। এমনকি গবেষণায় দেখা গেছে যে, টিকা নেওয়া শিশুদেরকে যতই পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো হোক না কেন, তাদের দাঁত ধ্বংস হবেই এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাঁত ক্ষয় হয় দাঁতের বাহিরের দিকে মাড়ির কাছাকাছি (neck lesions)। যেহেতু দাঁতের সাথে হাড়ের গঠনের খুবই ঘনিষ্ট মিল আছে ; তাই বলা যায় এসব খতরনাক টিকা আমাদের হাড়েরও ক্ষতি করে থাকে সমানভাবে। আর হাড়ের ক্ষতি হলে শরীরে রক্ত কমে যায় ; কেননা আমাদের রক্ত উৎপন্ন হয় হাড়ের ভিতরে (bone marrow)। আর রক্ত কমে গেলে বা রক্তের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কোন ত্রুটি দেখা দিলে মানুষ অস্থিচর্মসাঁর বা কঙ্কালে (emaciated) পরিণত হয়। তাই বলা যায়, ব্লাড ক্যানসারেরও (blood cancer) একটি বড় কারণ এসব টিকা। ডিপিটি টিকার কুফলে আপনার শিশুর তাৎক্ষণিক মৃত্যু হতে পারে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুর ব্রেনও ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে। ফলে সে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধি বা অটিজমের (Autism) স্বীকার হতে পারে। অবশ্য অনেক গবেষণায় দেখা গেছে যে, হাম (measles), মাম্পস বা কর্ণমূল প্রদাহ (mumps), হেপাটাইটিস এবং রুবেলা (rubella) ভ্যাকসিনেরও মানুষ এবং পোষাজন্তুদের ব্রেন ড্যামেজ করার ক্ষমতা আছে। বতমানে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধি শিশুদের সংখ্যা এতো বৃদ্ধি পেয়েছে যে, সচেতন ব্যক্তিরা মানবজাতির ভবিষ্যত নিয়ে শংকিত হয়ে পড়েছেন। কেননা ভবিষ্যৎ পৃথিবীর নেতৃত্ব তো আজকের শিশুদেরকেই নিতে হবে। শিশুদের বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিত্ব বা অটিজমে (Autism) আক্রান্ত হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ যে এইসব টিকা, তা অগণিত গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। ইন্টারনেটে সামান্য খোজাঁখুঁজি করলেই এসব টিকা নেওয়ার ফলে অগণিত শিশুর করুণ মৃত্যু, ব্রেন ড্যামেজ হওয়া, ক্যান্সার, টিউমার, ব্লাড ক্যানসার প্রভৃতি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়ার এমন অগণিত কেইস হিস্ট্রি দেখতে পাবেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক জরিপে দেখা গেছে, যে-সব দেশে টিকা নেওয়ার হার বেশী, সে সব দেশে ক্যান্সারে মৃত্যুর হারও বেশী। শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানো থেকে স্বয়ং তার পিতা-মাতা পোলিও রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। কেননা পোলিও টিকাতে পোলিও রোগের জীবিত ভাইরাস থাকে যা অনেকদিন পযর্ন্ত শিশুর মল-মুত্র-থুথু-কাশিতে অবস'ান করে। এসময় শিশুকে চুমু খেলে বা শিশুর পায়খানা-প্রস্রাব স্পর্শ করার মাধ্যমে পিতা-মাতা-দাদা-দাদীও পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে পঙ্গু হয়ে যেতে পারেন, যদি তাদের শরীরে পোলিও রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি বিদ্যমান না থাকে বা তাদের রোগ প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল হয়ে থাকে। হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের প্রফেসর রোনাল্ড ডেসরোজিয়ারের মতে, পোলিও টিকাতে আরেকটি ভয়ঙ্কর বিপদ আছে যা ভবিষ্যতে টাইম বোমার মতো বিস্ফোণের সৃষ্টি করতে পারে। আর তা হলো পোলিও টিকা তৈরীতে বানরের কিডনীর টিস্যু ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ফলে বানরদের শরীরে থাকা মারাত্মক সব ভাইরাস পোলিও টিকার মাধ্যমে মানবজাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে যা অকল্পনীয় বিপর্যয় ডেকে আনবে। ডেসরোজিয়ারের মতে, 'আপনি হয়ত বলতে পারেন যে, ভাইরাসমুক্ত বানরের টিস্যু ব্যবহার করলেই হলো। কিন্তু সমস্যা হলো বানরের শরীরে থাকা মাত্র ২% ভাইরাস সম্পর্কে মানুষ অবহিত। কাজেই অবশিষ্ট বিপুল সংখ্যক ভাইরাস থেকে ক্ষতির আশংকা থেকেই যায়'। ১৯৫৯ সালে বহুজাতিক ঔষধ কোম্পানির মার্ক-এর বেন সুইট নামক এক বিজ্ঞানী পোলিও টিকাতে এসভি-৪০ নামক বানরের নতুন একটি ভাইরাস সনাক্ত করেন যেই ব্যাচের টিকা পূর্ববর্তী পাঁচ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোটি কোটি শিশুকে খাওয়ানো হয়েছিল। গবেষনায় যখন প্রমাণিত হয় যে, এসভি-৪০ একটি ক্যান্সার সৃষ্টিকারী এজেন্ট যা গিনিপিগের শরীরে টিউমার তৈরী করেছে; তখন সারা আমেরিকায় হৈচৈ পড়ে যায়। তারপর যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং টিকা প্রস্তুতকারী কোম্পানি সিদ্ধান্ত নেয় যে, এখন থেকে পোলিও টিকা তৈরীতে অন্য প্রজাতির বানরের কোষতন্তু (tissue) ব্যবহার করা হবে।

পরবর্তী গবেষণায় দেখা গেছে যে, এসভি-৪০ ভাইরাস কেবল পোলিও টিকা গ্রহনকারীদের শরীরেই নানা রকম ক্যান্সারের সৃষ্টি করে না, বরং তাদের সন্তানদের দেহেও ক্যান্সার সৃষ্টি করতে সক্ষম। ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাথলজীর প্রফেসর বিজ্ঞানী জন মার্টিন সিমিয়ান সাইটোমেগালোভাইরাস (SCMV) নামক একটি বানরের ভাইরাস নিয়ে গবেষণায় দেখেছেন যে, এটি মানুষের ব্রেনে ছোট-বড় নিউরোলজিক্যাল সমস্যার সৃষ্টি করতে সক্ষম। শিকাগোর লয়ালা ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারের মলিকুলার প্যাথলজিষ্ট মিশেল কার্বন একই ধরণের টিউমার মানুষের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন যেমনটা এসভি-৪০ ভাইরাস গিনিপিগের শরীরে ক্যানসার তৈরী করেছিল। তিনি ৬০% ফুসফুসের ক্যান্সারে এবং ৩৮% হাড়ের ক্যান্সারে এসভি-৪০ ভাইরাসের জিন এবং প্রোটিন আবিষ্কার করেন। তিনি একটি মেডিকেল কনফারেন্সে এসভি-৪০ ভাইরাসের সাথে এসব ক্যান্সারের সম্পর্কের বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে নিশ্চিত করেন। তার সর্বশেষ গবেষণায় এসভি-৪০ ভাইরাস কিভাবে একটি কোষকে ক্যান্সারে রূপান্তরিত করে তার মেকানিজম আবিষ্কার এবং বর্ণনা করেন। মিশেল কার্বনের গবেষণায় দেখা যায় যে, এসভি-৪০ ভাইরাসটি একটি প্রোটিনকে বিকল করে দিয়ে থাকে যা কোষকে ক্যান্সারে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করে। কাজেই কারো কারো মধ্যে ব্রেন, হাড় এবং ফুসফুসে টিউমার সৃষ্টিতে এসভি-৪০ ভাইরাস একটি উপাদানরূপে কাজ করতে পারে। ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা যে, পোলিও টিকা খাওয়ার পর ত্রিশ দিনের মধ্যে যদি কোন শিশু অন্য কোন ইনজেকশন নেয়, তবে তার প্যারালাইসিস এবং পোলিওমায়েলাইটিসে আক্রান্ত হয়ে পঙ্গু হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই বিষয়টি কয়েক বছর পুর্বে ওমানে প্রমাণিত হয়েছে, যেখানে পোলিও টিকা খাওয়ার পরে ডি.পি.টি. ইনজেকশন নেওয়া বিপুল সংখ্যক শিশু প্যারাইসিসে আক্রান্ত হয়েছিল। কেন এমনটা হয় সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা কোন রহস্য কিনারা করতে পারেনি।

ইটালীর ইউনিভার্সিটি অব ফেরারা'র জেনেটিক্সের প্রফেসর মওরো টগনন গত বিশ বছরে যুক্তরাষ্ট্রে ব্রেন টিউমারের সংখ্যা ৩০% বৃদ্ধি পাওয়ার একটি সম্ভাব্য কারণরূপে মনে করেন পোলিও টিকার মাধ্যমে ছড়ানো এসভি-৪০ ভাইরাসকে। আমেরিকার মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত ইটালীর এক ক্যান্সার গবেষণার ফলাফলে সুপারিশ করা হয়েছে যে, বর্তমানে তিন ধরনের ক্যান্সারের আক্রমণের হার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হলো বানরের এসভি-৪০ ভাইরাস পোলিও টিকার মাধ্যমে মানবজাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়া ; যা বর্তমানে যৌনমিলনের মাধ্যমে পুরুষ থেকে নারীতে এবং বংশ পরম্পরায় মা থেকে গর্ভস্থ শিশুতে বিস্তার লাভ করছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের একাংশ মনে করেন, পোলিও টিকার মাধ্যমেই এইডস রোগের ভাইরাস বানরদের শরীর থেকে মানবজাতির মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে। ন্যাশনাল ইনিস্টিটিউট অব হেলথের গবেষক এবং জেনেটিক্স বিজ্ঞানী মার্ক গীয়ার বলেন যে, "সকলের সামনে টিকার ক্ষতিকর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করলে বা টিকা নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের সম্পর্কে কথা বললে অন্যান্য ডাক্তাররা প্রচুর সমালোচনা করে থাকে। কিন্তু একই ডাক্তাররা আবার গোপনে স্বীকার করেন যে, টিকা সম্পর্কে তুমি যা বলেছ তা ঠিক আছে। তবে এসব সবাইকে বলতে থাকলে লোকেরা ভয়ে টিকা নেওয়া বন্ধ করে দিবে"। তার মতে, চিকিৎসকদের এই ধরণের মনোভাব খুবই দুঃখজনক।

ল্যাবরেটরী এক্সপেরিমেন্ট এবং ক্লিনিক্যাল অবজারবেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন টিকার সাথে আরো অনেক মারাত্মক মারাত্মক রোগের সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া গেছে। যেমন- ডিপিটি টিকার সাথে এনাফাইলেকটিক শক (Anaphylactic shock) বা হঠাৎ মৃত্যু, এনসেফালোপ্যাথি (Encephalopathy) ব্রেনের ইনফেকশন, গুলেন বেরি সিনড্রোম (Guillain-Barré Syndrome), ডিমায়েলিনেটিং ডিজিজেজ অব সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ইত্যাদি। হামের টিকার সাথে অপটিক নিউরাইটিস (Optic neuritis) দৃষ্টিশক্তির গোলমাল, মৃগীরোগ (Epilepsy), গুলেন-বেরি সিনড্রোম, ট্রান্সভার্স মায়েলাইটিস (Transverse myelitis), মৃত্যু ইত্যাদি। হেপাটাইটিস বি টিকা থেকে গুলেন-বেরি সিনড্রোম, আথ্রাইটিস (Arthritis), ডিমায়েলিনেটিং ডিজিজেজ অব সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ইত্যাদি হতে পারে। সবচেয়ে বড় বিপদের কথা হলো, একই ব্যক্তি একসাথে অনেকগুলো টিকা নিলে তাদের পারস্পরিক বিক্রিয়ার কারণে আমাদের কি ধরণের ক্ষতি হবে পারে, সে সম্পকে আমরা কিছুই জানি না। হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানী এবং হোমিও ডাক্তাররা শত বষ পূব থেকেই এসব টিকাদান কমসূচীর বিরোধিতা করে আসছেন। ব্রিটিশ সোসাইটি অব হোমিওপ্যাথ-এর দুই হাজার সদস্য রয়েছেন, যাদের কেউ টিকা সমর্থন করেন না। এমনকি যে-সব বিজ্ঞানী এসব টিকা আবিষ্কার করেছিলেন, তারাও কোন রকম মহামারী ছাড়াই বিনা প্রয়োজনে এসব টিকা পাইকারী হারে সবাইকে দেওয়ার সুপারিশ করেন নাই। কিন্তু পরবতীতে এটি একটি বিরাট লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, ১৯৬৮ হামের টিকা চালু হওয়ার বহু পূর্বেই হামে (measles) মৃত্যুর হার ৯৯.৪ ভাগ হ্রাস পেয়েছিল। কাজেই বলা যায় যে, হামের মৃত্যু কমাতে হামের টিকার কোন অবদান নাই। অথচ এখনও অভিভাবকদের বিশ্বাস করতে প্ররোচিত করা হয় যে, হামের টিকার কারণে এই রোগে শিশু মৃত্যুর হার এখন অনেক কম ! ২০০৮ সালে ভারতের চেন্নাই এবং তামিলনাড়ু প্রদেশে হামের টিকা নিয়ে অসংখ্য শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় সরকারীভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সাংবাদিকদের মতে, পযায়ক্রমে হয়ত ভারতের সকল প্রদেশেই হামের টিকাদান কর্মসূচী বন্ধ করা হতে পারে। আফ্রিকার একটি দেশ উগান্ডায় পোলিও ভ্যাকসিন খেয়ে এত বেশী শিশু মৃত্যুবরণ করেছে যে, তাকে স্রেফ গণহত্যা বলে অভিহিত করা যায়। কিহুরা কিউবা (Kihura Nkuba) নামক তথাকার একজন ধর্মযাজক সাংবাদিকদের বলেন যে, এসব হতভাগ্য শিশুদের জানাযা পড়তে পড়তে তার নুতন কুর্তা পুরনো হয়ে ছিড়ে গেছে। তিনি এক মহিলার ঘটনা উল্লেখ করেন, যে কিনা পোলিও টিকা খাওয়ানোর সরকারী নির্দেশ

পেয়ে তার চার শিশু সন্তানের মধ্যে একটিকে লুকিয়ে রেখেছিলেন এবং তিনটিকে পোলিও টিকা খাইয়েছিলেন। ফলে সেই একটিই বেচেঁছিল এবং বাকী তিনটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। বিবেকবান চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, এই পাইকারী টিকাদান কর্মসূচী হলো একটি মেডিক্যাল টাইম বোমা (time bomb) যা খুব শীঘ্রই ফাটবে এবং তখন মানবজাতির অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি শুরু হবে। আসলে কথাটা ভুল বললাম ; টাইমবোমাটির আসলে অলরেডি বিস্ফোরণ (burst) হয়ে গেছে। এলার্জি, হাঁপানি, ডায়াবেটিস, যক্ষ্মা, বুদ্ধি প্রতিবন্দ্বি, টিউমার, ক্যানসার ইত্যাদি মারাত্মক মারাত্মক রোগসমূহ আজ ঘরে ঘরে এমনভাবে আক্রমণ করেছে যে, আর কিছুদিন পরে অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ভাবতেই গা শিউরে উঠে।

সাম্রাজ্যবাদীদের বিভিন্ন পিলে চমকানো চক্রান্ত সম্পর্কে যারা খোঁজ-খবর রাখেন, তাদের কথা শোনলে মনে আরো ভীতির সৃষ্টি হয়। অস্ত্র উৎপাদনকারী দেশ এবং কোম্পানীগুলো যেমন অস্ত্র বিক্রির জন্য বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ-গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দেয়। তেমনি বড় বড় ঔষধ কোম্পানীগুলো তাদের ঔষধ বিক্রি করে টাকার পাহাড় গড়ার জন্য প্রথমে নিজেরাই নাকি মানুষের মধ্যে রোগের সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করে থাকে। এজন্য তারা বিভিন্ন দেশ-মহাদেশের জন্য রোগ নির্দিষ্ট করে নেয়। যেমন- এশিয়ার জন্য ক্যানসার, আফ্রিকার জন্য এইডস, ইউরোপের জন্য মানসিক রোগ, আমেরিকার জন্য হৃদরোগ, অস্ট্রেলিয়ার জন্য মেদভূড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর টিকার সাথে বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ মিশিয়ে এইসব রোগ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়। গবেষকদের মতে, পোলিও টিকার ভেতরে এইডসের জীবাণু মিশিয়ে দিয়ে তারপর সেগুলো (অনেক ক্ষেত্রে বিনামূল্যে) আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে সরবরাহ করে সেখানে এইডসের মহামারী সৃষ্টি করেছে। পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদীরা আফ্রিকার অনেকগুলো দেশের মধ্যে যুদ্ধ এবং গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দিয়েছে। তারপর সাম্রাজ্যবাদীরা আফ্রিকার স্বর্ণ, হীরা, অন্যান্য মূল্যবান খনিজ সম্পদ অল্পমূল্যে (ক্ষেত্র বিশেষে বিনামূল্যে) লুণ্ঠন করে নিজেরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে। অন্যদিকে এতো এতো মূল্যবান প্রাকৃতিক এবং খনিজ সম্পদের মালিক হয়েও আফ্রিকানরা এইডস এবং গৃহযুদ্ধের ছোবলে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে অনাহারে এবং বিনা চিকিৎসায় ধুকে ধুকে মরছে। তাদের যাকিছু আয়-উপার্জন তা এইডসের ঔষধ এবং যুদ্ধের অস্ত্র কিনতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। যেই ঔষধে এইডস সারে না, সেই ঔষধই তাদেরকে খুবই উচ্চ মূল্যে কিনতে হচ্ছে।

টিকার ক্ষতিকর দিক নিয়ে প্রচুর গবেষণা এবং লেখালেখি করেছেন এমন একজন ভারতীয় গবেষক শ্রী জগন্নাথ চ্যাটার্জির মতে, "একজন মানুষের জীবনকে তছনছ/ ছাড়খার করার জন্য মাত্র একডোজ টিকাই যথেষ্ট"। তার এই কথাটি যে কতটা নিদারুণ নির্মম সত্য কথা, তার সাক্ষী আমি নিজে এবং আমার মতো আরো কোটি কোটি আদম সন্তান। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে আমার এক আত্মীয়ের যক্ষ্মা হয়েছে শুনে একজন এলোপ্যাথিক ডাক্তার আমাকে একডোজ বি.সি.জি. টিকা নেওয়ার পরামর্শ দেন। আর বি.সি.জি. টিকা নেওয়ার কারণে সেখানে এমন ঘা/ ক্ষত হয় যে, সেটি শুকাতে প্রায় এক বছর লেগে যায় এবং ডান হাতের সেই মাংস পেশীটি (deltoid muscle) পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে আজ বিশ বছর হলো ডান হাতে আমি কোন শক্ত কাজ করতে পারি না ; এমনকি কমপিউটারের মাউস নিয়ে চাপাচাপি করা (যা পৃথিবীর সবচেয়ে হালকা কাজ), তাও বেশীক্ষণ করতে পারি না। বেশী কাজ করতে গেলেই হাতের জয়েন্টে ব্যথা শুরু হয়, হাত অবশ হয়ে আসে। অথচ প্রতিটি মানুষের জীবনে তার ডান হাতের গুরুত্ব কতো বেশী, তা আমরা সবাই জানি। বিশেষ করে যাদের লেখালেখি বেশী করতে হয়, তাদের তো কথাই নেই। শুধু তাই নয়, বি.সি.জি. টিকা নেওয়ার কারণে আমার স্বাস্থ্য এমনভাবে ভেঙে পড়ে যে, আজ কুড়ি বছর যাবৎ আমি কঙ্কালসারে পরিণত হয়ে আছি। আরো পঞ্চাশ বছর সাধনা করেও আমার হারানো স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়ার কোন সম্ভাবনাও দেখছি না।

যদিও দাবী করা হয়ে থাকে যে, আজ থেকে একশ বছর পূর্বে যখন পাইকারী টিকাদান কর্মসূচী শুরু করা হয়, তখন থেকেই প্রচলিত সংক্রামক ব্যাধিসমূহ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকে। কিন্তু ব্রিটিশ এবং আমেরিকান তৎকালীন মেডিকেল পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ডিপথেরিয়া, যক্ষা এবং হুপিং কাশির মতো রোগসমূহ টিকা আবিষ্কারের পূর্বেই আক্ষরিক অর্থে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, টিকার কারণে নয় বরং বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালীর উন্নতি, খাদ্য পুষ্টিমানের উন্নতি, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের কারণে এসব সংক্রামক ব্যাধি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। শিল্পোন্নত দেশগুলি তাদের আবিষ্কৃত ঔষধ নিজেরা ব্যবহারের পূর্বে প্রথমে আমাদের মতো দরিদ্র-অশিক্ষা জর্জড়িত দেশে অল্পমূল্যে বা ক্ষেত্রবিশেষে বিনামূল্যে পাঠিয়ে দেয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য। এই উদ্দেশ্যে তারা জাতিসংঘকে ব্যবহার করে তাদের ধামাধরা হিসাবে। তাদের কাছে আমরা হলাম গিনিপিগ বা গবাদিপশুতুল্য। আমাদের ওপর দশ-বিশ বছর পরীক্ষার পরে যখন নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সংশ্লিষ্ট ঔষধটির তেমন কোন মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব নেই, তখনই সেটি উন্নত দেশের লোকেরা ব্যবহার করতে শুরু করে। এই কারণে বাজারে আসা সমস্ত নতুন ঔষধ থেকে সযত্নে দুরে থাকা কর্তব্য। শ্রী রাজাজি নামক একজন ভারতীয় চিকিৎসক একটি মেয়ের ঘটনা বর্ণনা করেন, যে বিসিজি টিকা নিয়ে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং অন্য দুইজনের উল্লেখ করেছেন যারা বিসিজি নেওয়ার পরে মৃত্যুবরণ করে। **আর টিকার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে গত একশ বছরের সকল গবেষণার প্রতি যদি আপনি লক্ষ্য করেন, তবে দেখতে পাবেন এদের সবচেয়ে বড় অংশটি দখল করে আছে ব্রেনের** (brain) **রোগসমূহ। অর্থাৎ ভ্যাকসিন থেকে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অঙ্গটি হলো ব্রেন / মস্তিষ্ক বা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম** (central nervous system)**। আর ব্রেন ক্ষতিগ্রস্ত হলে আপনি যে-সব রোগে আক্রান্ত হতে পারেন, সেগুলো হলো ব্রেন টিউমার, অটিজম (বুদ্ধিপ্রতিবন্দ্বি), ব্রেন ড্যামেজ, মৃগীরোগ** (epilepsy), **মাইগ্রেন** (migraine), **বিষন্নতা** (depression), **খুন করার প্রবনতা** (killing instinct), **গুলেন-বেরি সিনড্রোম** (Guillain barré syndrome), **যৌন ক্ষমতা বিনষ্ট হওয়া** (impotancy), **ভাইরাস এনসেফালাইটিস** (viral encephalities), **অন্ধত্ব, বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগ, স্মরণশক্তি নষ্ট হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।**

আরেকটি সমস্যা হলো, কোটি কোটি ইউনিট টিকা উৎপাদনের সময় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে অনেকগুলিতে রোগ সৃষ্টিতে সক্ষম এমন শক্তিশালী জীবাণু থেকে যাওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। তেমনি একটি ঘটনায় গত বৎসর ভারতের মেঘালয় প্রদেশে এগার হাজার শিশুর মৃত্যু হলে ভারত সরকার ইউনিসেফের বিরুদ্ধে আনত্মর্জাতিক আদালতে মামলা দায়ের করে। ভিয়েনা ভিত্তিক একটি অলাভজনক প্রতিষ্টান 'ন্যাশান্যাল ভ্যাকসিন ইনফরমেশন সেন্টার' (যারা টিকার ক্ষতিকর ক্রিয়া সম্পর্কে গবেষনা করে)-এর মতে, টিকা নেওয়ার কারণে শিশুদের হঠাৎ মৃত্যুর সংখ্যা প্রতি দশ লাখে একটি এবং শিশুদের ব্রেন ড্যামেজের হার প্রতি ষিষট্টি হাজারে একটি। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, বাস্তব সংখ্যা তার চাইতেও অনেক অনেক বেশী হওয়াটা স্বাভাবিক। কারণ টিকা নেওয়ার কারণে মৃত্যুবরণ করা অথবা অন্য কোন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়া শিশুদের অনেক পিতা-মাতা অজ্ঞতার কারণে বিষয়টি বুঝতেও পারেন না এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগে অথবা সংবাদপত্রে রিপোর্ট করেন না (এবং দারিদ্রের কারণেও এমনটা ঘটে থাকে)। যুক্তরাষ্ট্রের অফিসিয়াল রেকর্ডে দেখা যায় যে, টিকা নেওয়ার কারণে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটি শিশুর মৃত্যু হয়ে থাকে এবং ডাক্তাররা স্বীকার করেছেন যে, টিকার মাধ্যমে সিফিলিস রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া টিকা দেওয়ার পরে অনেক শিশুই প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং এসব পরিস্থিতিতে পিতা-মাতার অবহেলায় শিশুদের মৃত্যুর ঘটনা হরহামেশা প্রত্রিকায় দেখা যায়। হ্যাঁ, ত্রুটিযুক্ত টিকা বা টিকা প্রয়োগজনিত ত্রুটির কারণে আপনার প্রাণপ্রিয় সন্তান চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। অজ্ঞতার কারণে এক সময় অনেক দেশেই টিকা নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে সে অবস্থা এখন আর নেই। কাজেই

বর্তমানে অভিবাবকদের উচিত প্রতিটি বিষয়ের ভাল-মন্দ জেনে-শুনে তবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া। শিশুদের পাইকারী হারে টিকা দেওয়ার এই রমরমা অবস্থার পেছনের কারণ সম্পূর্ণই বাণিজ্য অর্থাৎ মালের ধান্ধা। যে-সব দেশে এসব টিকা তৈরী হয়, সে-সব দেশের সরকারসমূহ প্রতি বছর এসব টিকা কোম্পানীগুলোর কাছ থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ট্যাক্স পেয়ে থাকে।

ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা টিকার বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক নিয়ে হৈচৈ করলেও ডলারের লোভে সরকারগুলো টিকা কোম্পানীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয় না। এসব টিকা কোম্পানীগুলো রাজনীতিবিদ, ডাক্তার, শিশু বিশেষজ্ঞ, সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের আমলাদের নানা রকম আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে হাত করে থাকে। সরকারী ডাক্তাররা অনেক ক্ষেত্রে এসব পাইকারী টিকাদান কর্মসূচীতে আগ্রহী না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের চাপে বাধ্য হয়ে করতে হয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পাইকারী টিকা কর্মসূচীর মাধ্যমে অজ্ঞ জনসাধারণকে বুঝানোর চেষ্টা করে যে, তাদের দল জনগণের কল্যাণের (?) জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা-তদ্বির করে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য বিভাগের ডাক্তার এবং আমলারা টিকা কোমপানীর কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে সেখানে শিশুদের টিকা নেওয়া বাধ্যতামুলক করে আইন পাশ করিয়েছে। তারপরও সেখানে অনেকে আদালতের অনুমতি নিয়ে নিজেদের শিশুদের টিকা থেকে দুরে রাখেন। যেহেতু টিকা তৈরীতে বানর, শুকর, ইদুর, গিনিপিগ ইত্যাদি প্রাণীর রক্ত, মাংস ব্যবহৃত হয়, এজন্য অনেক বিজ্ঞ আলেম মুসলমানদের জন্য টিকা নেওয়া হারাম ঘোষণা করে ফতোয়া দিয়ে থাকেন। টিকা কোমপানির কাছ থেকে আমেরিকান শিশু বিশেষজ্ঞরা যে বিপুল পরিমান কমিশন পান, তার লোভে জোর করে শিশুদের টিকা দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং টিকা না নেওয়া শিশুরা কোন রোগে আক্রান্ত হলে তাদেরকে চিকিৎসা করতে অস্বীকার করেন। এজন্য শিশুদের সাথে এবং তাদের অভিভাবকদের সাথে বর্বর আচরণ করতেও দ্বিধা করেন না। ফলে বিবেকবান লোকেরা এটিকে চিকিৎসার নামে স্বৈরতন্ত্র হিসেবে অভিহিত করেন। এই কারণে ঐসব শিশুরা সেখানকার হোমিওপ্যাথিক, ন্যাচারোপ্যাথিক, ইউনানী প্রভৃতি চিকিৎসকদের অধীনে চিকিৎসা নিয়ে বেশ ভালই থাকেন। টিকা কোমপানি এবং তাদের দালালদের এসব অমানবিক আচরণ ইদানীং সেখানে অনেক কমে এসেছে। কারণ ইদানীং টিকা নিয়ে মৃত্যুবরণ করা অথবা কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়া শিশুদের পিতা-মাতারা ফটাফট আদালতে মামলা ঠুকে দেন এবং আদালতও ঝটপট টিকা কোম্পানির কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা জরিমানা আদায় করে দেন।

সে যাক, কোন জীবাণু বা কোন ঔষধি পদার্থ যেই রোগ সৃষ্টি করে, সেই জীবাণু বা পদার্থকে একেবারে ক্ষুদ্রতম মাত্রায় ব্যবহার করে সেই রোগের চিকিৎসা করা বা সেই রোগ প্রতিরোধ করা হলো হোমিওপ্যাথির মূলনীতি। এলোপ্যাথিক টিকা হলো হোমিওপ্যাথিক নীতির আংশিক অনুকরণ মাত্র। লুই পাস্তুর জলাতঙ্কের টিকা আবিস্কারেরও পঞ্চাশ বছর আগে আমেরিকান হোমিও চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডাঃ কন্সট্যান্টাইন হেরিং জলাতঙ্ক (Hydrophobia/Rabies) রোগের ভাইরাস থেকে জলাতঙ্কনাশী ঔষধ হাইড্রোফোবিনাম (Hydrophobinum/ Lyssinum) তৈরী করে জলাতঙ্ক চিকিৎসায় সফলতার সাথে ব্যবহার করেছেন। বিজ্ঞানী কচ যক্ষ্মার টিকা আবিষ্কারেরও চার বছর পূর্বে ব্রিটিশ হোমিও চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডাঃ বার্নেট যক্ষ্মার জীবাণু থেকে ব্যাসিলিনাম (Bacillinum) নামক ঔষধ তৈরী করেছেন যা শতবর্ষ পরেও অদ্যাবধি যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধে কার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ঔষধগুলি তৈরীতে সরাসরি রোগের জীবিত জীবাণু ব্যবহৃত হয় না, বরং ক্রমাগত ঘর্ষণের মাধ্যমে জীবাণুকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হয় এবং খুবই সূক্ষ্মমাত্রায় শক্তিকৃত অবস্থায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই কারণে রোগ প্রতিরোধে এগুলো খুবই কার্যকর এবং এদের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নাই বললেই চলে। তাছাড়া এগুলো মুখে খেলেই চলে;

ইনজেকশনের মতো নিষ্ঠুরতাও এতে নেই। তাই রোগ প্রতিরোধ বা টিকা নেওয়ার কথা চিন্তা করলে আমাদের হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ওপরই নির্ভর করা উচিত।

সর্বোপরি ডিপথেরিয়া, ধনুষ্টঙ্কার, হেপাটাইটিস, হাম, পোলিও ইত্যাদি রোগের কার্যকর চিকিৎসা এলোপ্যাথিতে না থাকলেও, হোমিওপ্যাথিতে মাত্র পঞ্চাশ পয়সার ঔষধেই এসব রোগ নিরাময় করা সম্ভব। হল্যাণ্ডের একজন হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানী দাবী করেছেন যে, যে-কোন টিকাকে হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে শক্তিকরণ করে ব্যবহারের মাধ্যমে সেই টিকার ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার চিকিৎসা করা সম্ভব। তার এই ঘোষণাকে সমর্থন করেছেন রাণী এলিজাবেথের প্রাক্তন চিকিৎসক মার্গারি গ্রেস ব্ল্যাকি। অস্ট্রিয়ার হোমিও চিকিৎসাবিজ্ঞানী জর্জ ভিথুলকাস মনে করেন, টিকা প্রথা ঔষধের প্রতি ব্যক্তির সংবেদনশীলতা বা সাসসেপটিভিলিটি নীতিকে লংঘন করে, এটি হোমিওপ্যাথির মূলনীতি বিরোধী এবং সমগ্র মানবজাতির স্বাস্থ্যকে অবনতির দিকে নিয়ে যায়। টিকা হলো নিষ্পাপ এবং অসহায় শিশুদের উপর একটি পৈশাচিক বর্বরতা। যেহেতু আমরা কেউ জানি না, আল্লাহ কোন শিশুর ভাগ্যে যক্ষা-ডিপথেরিয়া লিখে রেখেছেন আর কোন শিশুর ভাগ্যে হুপিং কাশি-ধনুষ্টঙ্কার নির্ধারিত করে রেখেছেন; সেহেতু আন্দাজে আট-দশটি মারাত্মক রোগের জীবিত জীবাণু শিশুর অনুমতি ছাড়াই জোরপূর্বক তার শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়াকে একেবারেই অপ্রয়োজনীয় নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। টিকা নিলে শিশুর কোন না কোন ক্ষতি হবেই; হতে পারে তা ছোট কিংবা বড়। আবার টিকা নেওয়ার ক্ষতিটা প্রকাশ পেতে পারে কয়েক মিনিট, কয়েক ঘণ্টা, কয়েক দিন, কয়েক মাস, কয়েক বছর এমনকি কয়েক যুগ পরে। অনেক জ্ঞানীব্যক্তি মনে করেন যে, শিশুদের রোগ মাত্রই মারাত্মক রোগ এমনটা ধারণা করা সঠিক নয়। তারা বিস্মিত হন এই ভেবে যে, শিশুদের ইমিউনিটি (Immunity) গঠনের জন্য এত কিছু করতে হবে কেন ?
বুকের দুধ এবং স্বাভাবিক খাবারই তাদের ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ শক্তি গঠনের জন্য যথেষ্ট। অনেক পিতা-মাতা প্রথমবার টিকা নেওয়ার পর শিশুর ওপর তাদের ক্ষতিকর ক্রিয়া লক্ষ্য করে ডাক্তারদের বললে (না জানার কারণে বা টিকার বদনাম হবে মনে করে) ডাক্তাররা সেটি টিকার কারণে হয়েছে বলে স্বীকার করেন না। ফলে ডাক্তারদের আশ্বাসে দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার টিকা নেওয়ার ফলে দেখা যায় শিশুর এমন মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যায়, যার আর কোন প্রতিকার করা যায় না।

যদিও বলা হয়ে থাকে যে, টিকা না নেওয়া শিশুরা টিকা নেওয়া শিশুদের জন্য বিপজ্জনক। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, টিকা নেওয়া শিশুরাই বরং অন্য শিশু এবং বয়স্ক লোকদের জন্য বিপজ্জনক। কেননা সমপ্রতি টিকা নেওয়া শিশুরা সে-সব রোগের জীবাণু তাদের শরীরে বহন করে থাকে, তাদের সংস্পর্শে এসে অন্য শিশুরা এবং বয়স্ক লোকেরা সে-সব রোগের আক্রান্ত হতে পারেন, বিশেষত যাদের ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল। আর এভাবেই 'তথাকথিত' অনেক মহামারীর সৃষ্টি এবং বিস্তার করেছে টিকা নেওয়া শিশুরা ; যদিও এজন্য দায়ী করা হয় টিকা না নেওয়া শিশুদেরকে। অন্যদিকে ঠিক একই প্রক্রিয়ায় টিকা না নেওয়া শিশুরা টিকা নেওয়া শিশুদের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট রোগের ইমিউনিটি লাভ করে থাকে। টিকার সমর্থকরা মনে করে থাকেন, এভাবে সম্পূর্ণ ঝুঁকিমুক্তভাবে টিকা না নেওয়া শিশুরা উপকৃত হয়ে থাকেন। এটা একটি অদ্ভুত যুক্তি কেননা তারা একই সাথে বলে থাকেন যে, শিশুকে টিকা না দিয়ে তাদেরকে অতিমাত্রায় ঝুঁকির মধ্যে ফেলে রেখে সংশ্লিষ্ট পিতামাতা একটি দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ করে থাকেন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী পোলিও টিকা নেওয়া শিশুদের সংস্পর্শে আসার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর অন্তত দশ ব্যক্তি পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে চিরতরে পঙ্গু হয়ে থাকে। টিকার ব্যবসায়ের সবচেয়ে শয়তানী দিক হলো, এগুলো কিভাবে তৈরী করা হয় তা টিকা কোমপানিগুলো

বিস্তারিত প্রকাশ করে না। একচেটিয়া মাল কামানোর সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে ভেবে তারা এই গোপনীয়তা অবলম্বন করে। অথচ এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী, আয়ুর্বেদিকসহ পৃথিবীর সকল ঔষধেরই উৎপাদন প্রক্রিয়াতে কোন গোপনীয়তা নেই; এগুলো সবই একটি প্রকাশ্য বিষয়, সবার জন্য উন্মোক্ত।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, টিকার মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করা সংশ্লিষ্ট রোগের ভাইরাস প্রায় সারাজীবনই শরীরে থেকে যায় (এবং নিশ্চয়ই তার অপকর্ম সমানে চালাতে থাকে)। আবার কেউ কোন দেশে পর্যটনের যাওয়ার চেষ্টা করলে টিকা কোম্পানীর লোকেরা তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে যে, সেই দেশে গিয়ে আপনি অমুক অমুক রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। কাজেই যাওয়ার পূর্বেই সে-সব রোগের টিকা নিয়ে যান। ফলে অনেকেই এক বসত্মা টিকা নিয়ে এমনই অসুস' হয়ে পড়েন যে, তার আর সেই দেশে পর্যটনে যাওয়াই সম্ভব হয় না। টিকার অত্যাচার সবচেয়ে বেশী ঘটে থাকে সৈন্যদের ওপরে। ইরাকে পাঠানোর পূর্বেও আমেরিকান সৈন্যদের এনথ্রাক্স (Anthrax), মেনিনজাইটিস (Meningitis) প্রভৃতি রোগের টিকা পাইকারী হারে দেওয়া হয়েছে। ফলশ্রুতিতে অনেক সৈন্য টিকার প্রতিক্রিয়ায় এমনই অসুস' হয়ে পড়েছে যে, তাদের আর ইরাক যুদ্ধেই যাওয়া হয় নাই। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাচারোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির প্রবর্তক বেনেডিক্ট লাস্ট টিকা প্রথার তীব্র বিরোধীতা করে বলেন যে, আগের কালের এসব ভুয়া সিষ্টেমের দ্বারা রোগ চিকিৎসায় কোন উপকার তো হয়ই না বরং ইহার দ্বারা পবিত্র মানব শরীরে মারাত্মক পীড়াদায়ক ক্ষত বা আঘাতের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ন্যাচারোপ্যাথিক ডাক্তারদের মধ্যে পরিচালিত একটি জরিপে দেখা গেছে যে, অধিকাংশ ন্যাচারোপ্যাথিক চিকিৎসক (Naturopathic Doctors) পাইকারী টিকা কর্মসূচীকে মনে করেন প্রাকৃতিক নীতিবিরুদ্ধ, অপ্রয়োজনীয় এবং বড়লোকী কারবার। ন্যাচারোপ্যাথিক চিকিৎসকদের এসোসিয়েশনের এক সাধারণ সভায় যে প্রস্তাব পাশ করা হয়েছে, তাতে সুপারিশ করা হয়েছে যে, টিকা খুবই ক্ষতিকর এবং অদরকারী একটি বিষয় ; সুতরাং এসব বর্জনের জন্য শিশুদের পিতামাতাকে উৎসাহ দিতে হবে। শিশুদের অস্বাভাবিক সামাজিক আচরণ বা বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিত্ব অর্থাৎ অটিজমের একটি মূল কারণ যে এই টিকা, এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যপ্রমাণ সম্বলিত মোটামোটা বই-পুস্তক ইউরোপ-আমেরিকার বইয়ের দোকানগুলোতে দেখতে পাবেন। মেনিনগোকক্কাল মেনিনজাইটিসের টিকা নেওয়ার পরে যখন খবর পাওয়া গেলো যে, অনেক লোক গুলেন-বেরি সিনড্রোমে (Guillain Barrĕ Syndrome) আক্রান্ত হয়ে প্যারালাইসিস বা মৃত্যুর শিকার হচ্ছে, তখন ফ্রান্স সরকার সেটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। টিকার ক্ষতিকর দিক নিয়ে আজ পযর্ন্ত যত গবেষণা হয়েছে, সেগুলো বিস্তারিত অধ্যয়ন করলে যে কারো এমন ধারণা হতে পারে যে, আধুনিক যুগে মানুষ এবং গৃহপালিত পশু-পাখিদের যত রোগ হয়, তার শতকরা নিরানব্বই ভাগ রোগই বুঝি এই টিকার কারণেই হয়। হ্যাঁ, সত্যি তাই ; এমন মনে হওয়াটা মিথ্যে নয়। সম্প্রতি ল্যানসেট (Lancet) নামক একটি বিখ্যাত মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রবন্ধে দাবী করা হয়েছে যে, তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলো জাতিসংঘের কাছ থেকে বেশী বেশী আর্থিক সাহায্যের আশায় তাদের দেশের শিশুদের বেশী বেশী টিকা নেওয়ার মিথ্যা তথ্য দিয়ে থাকে। শেষকথা হলো, রোগমুক্ত থাকার জন্য যে-সব শর্ত আমাদের মেনে চলা উচিত তা হলো- পুষ্টিকর খাবার গ্রহন করা, পর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম করা এবং শরীরের জন্য ক্ষতিকর বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাকা। অন্যথায় আপনি হাজার বার টিকা নিয়েও রোগের হাত থেকে নিস্তার পাবেন না। আসুন আমরা সবকিছু সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি এবং এভাবে নিজেদেরকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করি।

এলোপ্যাথিক টিকা নেওয়ার পর কোন অসুখ হোক বা না হোক Thuja occidentalis (শক্তি ৩০) রোজ একবেলা করে এক সপ্তাহ খেয়ে রাখুন। ঔষধটি বড়িতে কিনবেন এবং প্রতিবার ৪/৫ টি করে বড়ি খাবেন। এতে টিকা নেওয়ার ফলে যে-সব রোগ হয়েছে, সেগুলো চলে যাবে এবং ভবিষ্যতে যে-সব রোগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেগুলো আর হবে না। যখনই কোন টিকা নিবেন, পাশাপাশি থুজা নামক হোমিও ঔষধটিও সেবন করবেন। তাতে টিকার ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে বেচেঁ যাবেন।

☆ যক্ষা প্রতিরোধের জন্য বি.সি.জি. টিকার বদলে Bacillinum (শক্তি ৩০ অথবা ২০০) নামক হোমিও ঔষধটি মাসে একমাত্রা করে তিন মাস খাওয়ান (জন্মের পর থেকে এক বছর বয়সের মধ্যে)।

☆ শিশুর ডিপথেরিয়া প্রতিরোধের জন্য ডি.পি.টি. টিকার বদলে Diphtherinum (শক্তি ৩০ অথবা ২০০) নামক হোমিও ঔষধটি মাসে একমাত্রা করে তিন মাস খাওয়ান (জন্মের নয় থেকে বারো মাসের মধ্যে)।

☆ শিশুর ধনুষ্টঙ্কার প্রতিরোধের জন্য এ.টি.এস. অথবা ডি.পি.টি. টিকার বদলে Hypericum perforatum (শক্তি ৩০ অথবা ২০০) নামক হোমিও ঔষধটি মাসে একমাত্রা করে তিন মাস খাওয়ান (জন্মের ছয় সপ্তাহ পর থেকে)।

☆ শিশুর হুপিং কাশি প্রতিরোধের জন্য ডি.পি.টি. টিকার বদলে Pertussinum (শক্তি ৩০ অথবা ২০০) নামক হোমিও ঔষধটি মাসে একমাত্রা করে তিন মাস খাওয়ান (জন্মের ছয় সপ্তাহ পর থেকে)।

☆ শিশুর পোলিওমায়েলাইটিস রোগ প্রতিরোধের জন্য পোলিও টিকা খাওয়ানোর বদলে Lathyrus sativus (শক্তি ৩০ অথবা ২০০) নামক হোমিও ঔষধটি মাসে একমাত্রা করে তিন মাস খাওয়ান (জন্মের ছয় সপ্তাহ পর থেকে)।

☆ শিশুর হাম প্রতিরোধের জন্য মিজেলস ভ্যাকসিনের বদলে Morbillinum (শক্তি ৩০ অথবা ২০০) নামক হোমিও ঔষধটি মাসে একমাত্রা করে তিন মাস খাওয়ান (জন্মের নয় থেকে বারো মাসের মধ্যে)।

☆ শিশুর বা বয়স্কদের কলেরা বা ডায়েরিয়া প্রতিরোধের জন্য এ.সি.ভি. টিকার বদলে Veratrum album (শক্তি ৩০ অথবা ২০০) নামক হোমিও ঔষধটি মাসে একমাত্রা করে দুই মাস খাওয়ান (জন্মের দুই বছর পরে)।

☆ শিশুর বা বয়স্কদের টাইফয়েড জ্বর প্রতিরোধের জন্য টি.এ.বি. টিকার বদলে Typhoidinum (শক্তি ৩০ অথবা ২০০) নামক হোমিও ঔষধটি মাসে একমাত্রা করে দুই মাস খাওয়ান (জন্মের দুই বছর পরে)।

☆ শিশুর জন্মের ২/১ সপ্তাহের মধ্যে তাকে Sulphur (শক্তি ২০০) একমাত্রা এবং ৪/৫ সপ্তাহের মধ্যে সালফার (শক্তি ২০০) আরেক মাত্রা খাওয়ান। তৃতীয় মাসের পরে Calcarea Carb (শক্তি ২০০) প্রতিমাসে একমাত্রা করে অন্তত তিনমাত্রা খাওয়ান যাতে তার দাঁত ওঠতে কোনো ঝামেলা না হয়।

**পিতা-মাতার দোষ যাতে সন্তানের মধ্যে সংক্রমিত না হয় সেজন্যে গর্ভাবস্থায় গর্ভবতী মাকে নিম্নোক্তভাবে ঔষধ খাওয়ান ঃ-**

☆ পিতা-মাতা বামন (অর্থাৎ একেবারে খুবই বেটে-খাটো) হলে গর্ভাবস্থায় Calcarea carb (শক্তি ২০০) মাসে অন্তত একমাত্রা করে খাওয়ান।

☆ পিতা-মাতার হাঁপানী থাকলে গর্ভাবস্থায় Natrum Sulph (শক্তি ২০০) মাসে অন্তত একমাত্রা করে খাওয়ান।

☆ পিতা-মাতার বাতরোগ থাকলে গর্ভাবস্থায় Medorrhinum (শক্তি ২০০) মাসে অন্তত একমাত্রা করে তিনমাস খাওয়ান।

☆ পিতা-মাতার ক্যান্সার থাকলে গর্ভাবস্থায় Carcinosin (শক্তি ২০০) মাসে একমাত্রা করে খাওয়ান তিনমাস।

☆ পিতা-মাতার ঘনঘন ঠান্ডা লাগার দোষ থাকলে গর্ভাবস্থায় Tuberculinum (শক্তি ২০০) মাসে একমাত্রা করে অন্তত তিনমাস খাওয়ান।

☆ পিতা-মাতার সিফিলিস হয়ে থাকলে গর্ভাবস্থায় Syphilinum (শক্তি ২০০) প্রতিমাসে একমাত্রা করে খাওয়ান চারমাস।

☆ পিতা-মাতার গনোরিয়া থাকলে গর্ভাবস্থায় Medorrhinum (শক্তি ২০০) মাসে একমাত্রা করে খাওয়ান তিনমাস।

☆ পিতা-মাতার চর্মরোগ থেকে থাকলে গর্ভাবস্থায় Sulphur (শক্তি ২০০) মাসে একমাত্রা করে খাওয়ান তিনমাস।

☆ পিতা-মাতার দুর্গন্ধযুক্ত চর্মরোগ থাকলে গর্ভাবস্থায় Psorinum (শক্তি ২০০) মাসে একমাত্রা করে খাওয়ান তিনমাস।

☆ পিতা-মাতার হাড় বিকৃতির রোগ থাকলে গর্ভাবস্থায় Silicea (শক্তি ২০০) মাসে একমাত্রা করে খাওয়ান।

☆ পিতা-মাতার যক্ষারোগ হয়ে থাকলে গর্ভাবস্থায় Bacillinum (শক্তি ২০০) মাসে একমাত্রা করে খাওয়ান তিনমাস।

☆ যে মহিলার একবার রিকেটগ্রস্ত পঙ্গু সন্তান বা ঠোঁটকাটা-তালুকাটা সন্তান হয়েছে তাকে গর্ভাবস্থায় Calcarea phosphoricum (শক্তি ৩০) সপ্তাহে একমাত্রা করে দুই মাস খাওয়ান। যে-মায়ের কখনও পঙ্গু বা ঠোঁট-কাটা, তালু-কাটা সন্তান হয়নি, তারও গর্ভাবস্থায় ক্যালকেরিয়া ফস ঔষধটি অন্তত সপ্তায় একমাত্রা করে খাওয়া উচিত। কেননা এটি আপনার শিশুকে সুন্দর চর্ম, সুন্দর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সুগঠিত হাড়, প্রখর ব্রেন বা উৎকৃষ্ট মেধা নিয়ে জন্ম নিতে সাহায্য করবে।

**Retention of urine (প্রস্রাব বন্ধ) ঃ -** হঠাৎ প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে Aconite অথবা Staphisagria (শক্তি ৩০) এক ঘন্টা পরপর। বড় হয়েও বিছানায় প্রস্রাব করলে Causticum অথবা Medorrhinum (শক্তি ১০,০০০) একমাত্রা খাওয়ান। গর্ভকালীন সময়ে অথবা প্রসবের পর প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে Equisetum অথবা Arnica (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২,৩০) খেতে থাকুন এক ঘণ্টা পরপর।

**Dyspepsia (অরুচি, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, ক্ষুধাহীনতা) ঃ -** যারা অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকেন, পেটের সমস্যায় বেশি ভোগেন এবং মেজাজ কড়া তারা অরুচির জন্য Nux vomica (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২,৩০) তিনবেলা করে দু'য়েক সপ্তাহ খান। Avena sativa (শক্তি কিউ) অথবা Alfalfa (শক্তি কিউ) বিশ ফোটা করে রোজ দুইবার হিসাবে কয়েক মাস খেতে পারেন (এই দুটি ভিটামিন জাতীয় ঔষধ ; কাজেই কোন ক্ষতির ভয় নাই।)। অতিরিক্ত চা-কফি-পান-সিগারেট খাওয়ার কারণে ক্ষুধাহীনতা দেখা দিলে Abies nigra (শক্তি কিউ, ৩,৬) তিনবেলা করে দু'য়েক সপ্তাহ খেয়ে যান। অরুচি বা ক্ষুধামান্দ্য রোগে Calcarea phos (শক্তি কিউ, ৩,৬)ও তিনবেলা করে দুই সপ্তাহ খেতে পারেন। পাকস্থলীর যে-কোন সমস্যার সবচেয়ে সেরা দুটি ঔষধ হলো Cadmium sulph (শান্ত-চুপচাপ) এবং Arsenicum album (অস্থির)। এগুলো নিম্নশক্তিতে রোজ কয়েকবার করে প্রয়োজনে কয়েক সপ্তাহ খেতে পারেন।

## Thalassemia is curable with homeopathic treatment (থ্যালাসিমিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সেরে যায়) :-

থ্যালাসিমিয়া রক্তের এমন একটি মারাত্মক রোগ যা শিশুরা বংশগতভাবে তাদের পিতা-মাতা থেকে পেয়ে থাকে। বিজ্ঞানীদের মতে, সাধারণত চাচাত ভাই-বোনদের মধ্যে বিয়ে হলে সন্তানদের থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা

বেড়ে যায়। এই রোগীদের রক্তের লাল কণিকা (RBC) তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে তাদের রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কম থাকে এবং আয়রণের পরিমাণ বেড়ে যায়। এই কারণে এদেরকে ২০ থেকে ৩০ দিন পরপর রক্ত দিতে হয় এবং শরীর থেকে অতিরিক্ত আয়রণ বের করার জন্য ঔষধ খেতে হয়। খুব ছোট শিশুদের মধ্যে রক্তশূণ্যতা, জ্বর, শারীরিক বৃদ্ধি না হওয়া, প্লীহা বড় হয়ে যাওয়া (Splenomegaly) ইত্যাদি লক্ষণ দেখে থ্যালাসেমিয়া রোগ সন্দেহ করেন এবং রক্তের বিশেষ মাইক্রোসকোপিক পরীক্ষার মাধ্যমে থ্যালাসেমিয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হন। যেহেতু এই রোগের চিকিৎসায় প্রচুর টাকা খরচ হয়, সেহেতু মধ্যবিত্ত বা দরিদ্ররা এই রোগে আক্রান্ত হলে ভিখিরি হতে বেশী সময় লাগে না। এতো পয়সা খরচ করেও এসব শিশুদেরকে সাধারণত বিশ-ত্রিশ বছরের বেশী বাচাঁনো যায় না। ধ্বংসপ্রাপ্ত লাল কণিকা থেকে নির্গত আয়রণ লিভার, হৃৎপিন্ড এবং পেনক্রিয়াসে জমা হতে থাকে এবং শরীরের অতিরিক্ত আয়রণের বিষক্রিয়ায় এরা লিভার সিরোসিস, হার্ট ফেইলিওর, প্লীহা বড় হওয়া ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয় এবং এদের শরীরে যৌবনের আগমণ ঘটে বিলম্বে আর এদের শারীরিক বৃদ্ধিও তেমন একটা ঘটে না।

ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশসমুহে এই রোগের প্রকোপ বেশী। এটি একটি মারাত্মক জেনেটিক ডিজিজ বিধায় খুব একটা নিরাময় হয় না বলে সবাই বিশ্বাস করত। তবে ইদানীং বিভিন্ন দেশের অনেক হোমিও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অগণিত থ্যালাসিমিয়া রোগীকে সমপুর্ণরূপে আরোগ্য করার দাবী করেছেন যাদের ডিসচার্জ করার পর পাচঁ-ছয় বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। হোমিও স্পেশালিষ্টদের মতে, শতকরা ৫০ ভাগ থ্যালাসেমিয়া রোগীকে হোমিও চিকিৎসার মাধ্যমে পুরোপুরি রোগমুক্ত করা সম্ভব। আর অবশিষ্ট থ্যালাসেমিয়া রোগীরা পুরোপুরি রোগমুক্ত না হলেও হোমিও চিকিৎসায় তাদের অবস্থা এতটাই উন্নত হয় যে, ছয়মাসে বা বছরে একবার রক্ত নিলেই চলে। হ্যাঁ, হোমিওপ্যাথিতে মনো-দৈহিক গঠনগত চিকিৎসা (Constitutional treatment) নামে এক ধরণের চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত আছে যার অর্থ হলো রোগের লক্ষণ, রোগীর শারীরিক লক্ষণ, রোগীর মানসিক লক্ষণ, রোগীর বংশগত রোগের ইতিহাস ইত্যাদি বিচার করে ঔষধ প্রেসক্রাইব করা। এতে চিকিৎসককে একজন রোগীর পেছনে প্রচুর সময় দিতে হয় এবং তাকে নিয়ে অনেক চিনতা-ভাবনা করতে হয়। হোমিওপ্যাথির দুইশ বছরের ইতিহাসে দেখা গেছে যে, কন্সটিটিউশনাল ট্রিটমেন্টে এমন সব কঠিন রোগও খুব সহজে নিরাময় হয়ে যায় যা অন্যান্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে একেবারে অবিশ্বাস্য মনে করা হয়ে থাকে। থ্যালাসেমিয়া থেকে মুক্তির জন্য অবশ্যই একজন হোমিও স্পেশালিষ্টের পরামর্শ মতো চলা উচিত (যিনি রোগীর শারীরিক-মানসিক-পারিবারিক লক্ষণ বিবেচনা করে সঠিক ঔষধ নির্বাচন করে প্রয়োগ করবেন)। যারা কোন কারণে হোমিও স্পেশালিষ্টের সাথে যোগাযোগ করতে অক্ষম, তারা নীচের ঔষধগুলো আমার নির্দেশিত নিয়ম অনুসারে খেয়ে দারুণভাবে উপকৃত হবেন। যাদের প্লীহা বড় হয়ে গেছে (Splenomegaly) তারা Ceanothus Americanus (Q) অথবা Carduus marianus (Q) ঔষধ দুইটির মাধ্যমে তা থেকে মুক্তি পেতে পারেন (১০ ফোটা করে রোজ ৩ বার খান)।

Rx

(1) Alfalfa Q/3x/6x/12x/3c/6c/3/6/12

(এই হোমওপ্যাথিক ঔষধটি প্রতিদিন সকালে ২০ ফোটা করে কিছু পানির সাথে মিশিয়ে খান পনের দিন। তারপর Calcarea phos 3x/6x/12x ঔষধটি প্রতিদিন সকালে ৫ বড়ি করে পনের দিন খান। এভাবে অদল-বদল করে দুইট ঔষধ খেতে থাকুন যতদনি না আপনি থ্যালাসেমিয়া থেকে মুক্ত হচ্ছেন অথবা রোগের অবস্থা যথেষ্ট উন্নতি হচ্ছে।)

## (2) Arsenicum album (অস্থির রোগীদের জন্য) / Cadmium Sulfuratum

(শান্ত চুপচাপ রোগীদের জন্য) 3x/6x/12x/3c/6c/12c/3/6/12/30

(এই হোমওপ্যাথিক ঔষধটি প্রতিদিন সকালে ২০ ফোটা করে কিছু পানির সাথে মিশিয়ে খান পনের দিন। তারপর Kali phos 3x/6x/12x ঔষধটি প্রতিদিন সকালে ৫ বড়ি করে পনের দিন খান। এভাবে অদল-বদল করে দুইট ঔষধ খেতে থাকুন যতদনি না আপনি থ্যালাসেমিয়া থেকে মুক্ত হচ্ছেন অথবা রোগের অবস্থা যথেষ্ট উন্নতি হচ্ছে।)

(3) Lecithinum 3x/6x/12x/3c/6c/12c/3/6/12/30 (এই হোমওপ্যাথিক ঔষধটি প্রতিদিন সকালে ৫ ফোটা অথবা ৫ বড়ি করে কিছু পানির সাথে মিশিয়ে খান পনের দিন। তারপর Natrum mur 3x/6x/12x ঔষধটি প্রতিদিন সকালে ৫ বড়ি করে পনের দিন খান। এভাবে অদল-বদল করে দুইট ঔষধ খেতে থাকুন যতদনি না আপনি থ্যালাসেমিয়া থেকে মুক্ত হচ্ছেন অথবা রোগের অবস্থা যথেষ্ট উন্নতি হচ্ছে।)

(4) Thuja occidentalis (শীতকাতর রোগীদরে জন্য) / Medorrhinum (গরমকাতর রোগীদরে জন্য) 10M

(এই হোমিওপ্যাথিক ঔষধটি ১ ফোটা অথবা ১০ বড়ি করে দুই মাস পরপর এক মাত্রা করে খান এবং এভাবে ছয় মাসে তিন মাত্রা খান [মাসের প্রথম সপ্তায়])।

## (5) Calcarea Carbonica 10M

(এই হোমিওপ্যাথিক ঔষধটি ১ ফোটা অথবা ১০ বড়ি করে দুই মাস পরপর এক মাত্রা করে খান এবং এভাবে ছয় মাসে তিন মাত্রা খান [মাসের দ্বিতীয় সপ্তায়])।

## (6) Zincum metallicum 200

(এই হোমিওপ্যাথিক ঔষধটি ১ ফোটা অথবা ১০ বড়ি করে দুই মাস পরপর এক মাত্রা করে খান এবং এভাবে ছয় মাসে তিন মাত্রা খান [মাসের চতুর্থ সপ্তায়])।

**Tonsilitis (টনসিলের প্রদাহ) ঃ-** যাদের ঘন ঘন টনসিলের সমস্যা হয় তারা Phytolacca decandra, Baryta carb কিংবা Calcarea phos (শক্তি ৩০) প্রতিদিন দুইবেলা করে দশ-পনের দিন খান। অতীতে যাদের অথবা যাদের পিতা-মাতা-স্বামীর সিফিলিস হয়েছিল তাদের জন্য ভালো ঔষধ হলো Merc proto iod অথবা Kali iod. এগুলি তিনবেলা করে কয়েক সপ্তাহ খান। প্রয়োজন Thuja (যারা অতীতে টিকা নিয়েছেন) এবং Bacillinum (যাদের ঘনঘন সর্দি-কাশি হয়) ও খাওয়ানো লাগতে পারে (১০,০০০ শক্তিতে মাসে এক মাত্রা করে তিন মাস খান)।

**Salivation (লালা ঝরা) ঃ -** Merc cor কিংবা China officinalis (শক্তি ১০,০০০) একমাত্রা খান। কেবল রাতের বেলা ঘুমের মধ্যে লালা ঝরে লক্ষণে Syphilinum (শক্তি ১০,০০০) একমাত্রা খান।

**Syphilis (সিফিলিস) ঃ-** Merc sol , Kali bichromicum, Kali Iodatum কিংবা Aurum metallicum (শক্তি ৩০) দুইবেলা করে তিন দিন খাওয়ান। প্রয়োজনে পরবর্তীতে শক্তি বাড়িয়ে খেতে পারেন। সিফিলিস/গনোরিয়া হওয়ার পর ভালোভাবে তার চিকিৎসা করা প্রয়োজন অন্যথায় ভবিষ্যতে মারাত্মক বাত , হৃদরোগ , মানসিক রোগ , স্মরণশক্তি লোপ , ধ্বজভঙ্গ , বন্ধ্যাত্ব , বিকলাঙ্গ-প্রতিবন্ধি সন্তান প্রভৃতি ভয়ানক সমস্যায় পড়বেন।

**Gonorrhoea (গনোরিয়া) ঃ-** গনোরিয়ার প্রথম দিকে যখন প্রস্রাবের রাস্তায় ব্যথা, কামড়ানি থাকে ; তখন Cantharis অথবা Cannabis sativa (শক্তি ৩০,২০০) খাওয়াতে পারেন তিন-চার বেলা করে। প্রথম দিকে Aconite nap অথবা Phytolacca (শক্তি ৩০,২০০) ও খাওয়াতে পারেন। পরবর্তীতে গনোরিয়ার স্রাব (discharge) গাঢ় এবং আঠালো হয়ে গেলে Pulsatilla (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২,৩০) খাওয়ান দুইবেলা করে এক সপ্তাহ বা তারও বেশী। গনোরিয়ার কুপ্রভাব থেকে বাঁচার জন্য Medorrhinum (গরমকাতর) অথবা Thuja (শীতকাতর) (শক্তি ১০,০০০) এক মাস পরপর একমাত্রা করে তিন মাসে তিন মাত্রা খান।

## Pediatric diseases (শিশুরোগ) ঃ-

☆ ঘুমের মধ্যে শিশুদের দাঁত কটমট করার জন্য Cina অথবা Cannabis indica প্রতিদিন দুইবার করে তিনদিন খাওয়ান (মোটা শিশুদের অথবা পেট মোটা শিশুদের বেলায় Calcarea carb একই নিয়মে খাওয়ান)।

☆ শিশুদের শরীর বৃদ্ধি না হয়ে বামন হতে থাকলে Thyroidinum অথবা Aurum metallicum (শক্তি ৩০, ২০০) নামক ঔষধটি সাতদিন পরপর একবার করে দুই/তিন মাস খাওয়ান। যথেষ্ট উন্নতি না হলে প্রয়োজনে ছয়মাস পর আবার খাওয়াতে পারেন।

☆ শিশুরা বুকের দুধ খাওয়ার সময় যদি স্তনের বোটায় কাপড় দেয়, তবে শিশুকে কিউপ্রাম মেট (Cuprum metallicum) খাওয়ান। যদি তাতে কাজ না হয়, তবে পোডোফাইলাম (Podophyllium) ঔষধটি খাওয়াতে পারেন।

☆ শিশুর হাঁটা শিখতে বা দাঁত ওঠতে দেরী হলে Calcarea carb (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২, ৩০) সপ্তায় একমাত্রা করে তিনমাস খাওয়ান।

☆ পক্ষান্তরে কথা শিখতে বা পড়াশোনা শিখতে দেরী হলে Natrum mur সপ্তায় একমাত্রা করে তিনমাস খাওয়ান (বিশেষত যাদের পা মোটা কিন্তু ঘাড় চিকন এবং লবণযুক্ত খাবার বেশী খায়)।

☆ শিশু জন্ম থেকেই বোকা হলে Calcarea phos এক সপ্তাহ পরপর একমাত্রা- এভাবে তিনমাস খাওয়ান। এতে কাজ না হলে বিশেষজ্ঞ হোমিও ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

☆ পক্ষান্তরে শিশু গোঁয়ার্তুমী এবং দুষ্টুমিতে ওস্তাদ হলে Medorrhinum (শক্তি ১০,০০০) একমাত্রা খাওয়ান। পরবর্তীতে শক্তি বাড়িয়ে খাওয়াতে পারেন।

☆ যে-সব শিশুরা ঘরের ভেতর স্বৈরাচার কিন্তু বাইরে গেলে ভদ্রলোক তাদেরকে Lycopodium (শক্তি ১০,০০০) মাসে একমাত্রা করে তিনমাস খাওয়ান। পরবর্তীতে শক্তি বাড়িয়ে খাওয়াতে পারেন।

☆ পক্ষান্তরে যে-সব শিশু ঘরে-বাইরে সর্বত্র সমান দুষ্টুমি এবং শয়তানী করে, তাদেরকে Bacillinum (শক্তি ১০,০০০) দুইমাস পরপর একমাত্রা করে ছয়মাস খাওয়ান। পরবর্তীতে শক্তি বাড়িয়ে খাওয়াতে পারেন।

☆ যে-সব শিশু সর্বদা মায়ের আচঁল ধরে থাকে অর্থাৎ হাত ধরে থাকে, তাদের যে-কোন পেটের রোগে Bismuthum ঔষধটি খাওয়াতে ভুলবেন না।

☆ যে-সব শিশু দেখতে বৃদ্ধদের মতো দেখায়, তাদের চিকিৎসায় প্রায়ই Argentum nitricum (মিষ্টি খাবার বেশী পছন্দ), Calcarea carbonica (থলথলে স্বাস্থ্য) অথবা Natrum muriaticum (লবণ বেশী পছন্দ) দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে হয় (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২, ৩০)।

☆ যে-সব শিশু অপরিচিত মানুষের সামনে পায়খানা করতে পারে না, তাদের অধিকাংশ রোগ-ব্যাধি Ambra grisea ঔষধটি ব্যবহারে সেরে যাবে। এমনকি তাদের এই অদ্ভুত স্বভাবটি পর্যন্ত দূর হয়ে যাবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব শিশুদের মধ্যে কোষ্টকাঠিন্য, পাইলস প্রভৃতি রোগের উৎপাত বেশী দেখা যায়।

☆ শিশুর দুধ সহ্য হয় না , খেলেই বমি করে দেয় লক্ষণে Silicea বা Aethusa cynapium (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২, ৩০) তিনবেলা করে খাওয়ান।

☆ যে শিশু সারাক্ষণ ঘ্যান ঘ্যান করে আর কোলে ওঠে থাকতে চায়, তাকে Chamomilla (শক্তি ৩০, ২০০) পাঁচ/দশটি বড়ি রোজ দুইবেলা করে এক সপ্তাহ খাওয়ান।

☆ মায়ের দুগ্ধ গাঢ়, নোনতা, বিস্বাদ প্রভৃতি হওয়ার কারণে শিশু না খেতে চাইলে Calcarea carb অথবা Calcarea phos অথবা Phytolacca (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২,৩০) তিনবেলা করে পনেরদিন খাওয়ান।

☆ শিশু ক্রমশ শুকিয়ে গেলে কিংবা ভাল খেয়েও শুকিয়ে গেলে Calcarea phos (শক্তি ২০০) চারদিন পরপর একমাত্রা করে দুইমাস খাওয়ান।

☆ শিশু অন্ধকারকে ভয় পেলে Medorrhinum (শক্তি ১০,০০০) একমাত্রা খাওয়ান।

☆ শিশু সর্বদাই ক্রুদ্ধ থাকে, মাত্রাতিরিক্ত ক্ষুধা লক্ষণে Staphisagria (শক্তি ২০০) রোজ দুইবেলা চারদিন খাওয়ান।

☆ গোসল করানোর সময় শিশু কান্নাকাটি করলে Sulphur (শক্তি ২০০) সপ্তাহে একমাত্রা করে একমাস খাওয়ান।

☆ শিশু ঘুমের মধ্যে দাঁত কটমট করলে Argentum nitricum অথবা Calcarea carbonicum (শক্তি ২০০) সপ্তাহে একমাত্রা করে একমাস খাওয়ান।

☆ শিশুদের শরীর থেকে টক গন্ধ বের হলে Magnesium carbonium (শক্তি ২০০) আর দুর্গন্ধ বের হলে Psorinum (শক্তি ২০০) সপ্তাহে একমাত্রা করে একমাস খাওয়ান।

☆ শিশু বা বয়স্ক যে কোনো লোক কুকুরকে খুব ভয় পেলে Bacillinum (শক্তি ১০,০০০) দুইমাস পরপর একমাত্রা করে ছয়মাসে তিন মাত্রা খাওয়ান।

Night pollution (স্বপ্নদোষ) ঃ - মাত্রাতিরিক্ত স্বপ্নদোষ নিরাময়ে Natrum phos অথবা Acidum phosphoricum (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২,৩০) রোজ দুইবার করে এক সপ্তাহ বা আরও বেশী দিন খেতে পারেন।

**Plant diseases (গাছপালার রোগ) :** হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মাধ্যমে গাছপালার রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা করতে হলে আপনাকে অনেক মাথা খাটাতে হবে। কেননা মানুষ তার কষ্টের কথা বলতে পারে, পশুরা বলতে না পারলেও ঈঙ্গিতে অনেক কিছু বুঝাতে পারে কিন্তু গাছপালা তার কোনটাই পারে না। লক্ষণ দেখে, চিন্তা করে, যুক্তি খাটিয়ে গাছের রোগ লক্ষণ আপনাকে বের করতে হবে। গাছকে ঔষধ খাওয়ানোর নিয়ম হলো নিম্নশক্তির ১০ ফোটা ঔষধ এক লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫০টি ঝাঁকি দিবেন এবং সেই পানিকে আবার ২০ লিটার পানির সাথে ভালো করে মিশিয়ে রোজ ১ বার করে গাছের গোড়ায় ঢালবেন। অবশ্য অনেক গাছকে (যেমন- ধান ক্ষেত) একত্রে ঔষধ খাওয়াতে হলে তাতে সেচ কাজের সময় সেচের পানির সাথে যতটা সম্ভব ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে । গাছের পাতায় ঔষধ ছিটিয়ে দিলে কোন কাজ হবে না , যেমনি ভাবে মানুষের চামড়ায় ঔষধ ছিটিয়ে দিলে কোন কাজ হয় না। মানুষ যেমন মুখ দিয়ে ঔষধ খায়, তেমনি গাছকেও মুখ (শিকর) দিয়ে ঔষধ খাওয়াতে হবে। একই দিনে একই সময়ে একাধিক ঔষধ ব্যবহার নিষিদ্ধ, ঠিক মানুষের বেলায় যেমন নিষিদ্ধ। তবে প্রয়োজন হলে দুয়েক দিন বিরতি দিয়ে সমধর্মী (complimentary) ঔষধ খাওয়াতে হবে। নীচে আমি গাছপালার রোগব্যাধির চিকিৎসার কিছু কৌশল বর্ণনা করেছি যা আপনাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে –

☆ মনে করুন একটি গাছে ফুল ধরে কিন্তু ফল ধরে না। এতে বুঝা যায় যে, গাছটি অপুষ্টিতে ভোগছে । তাই এখানে ভিটামিন / টনিক / শক্তিবর্ধক জাতীয় ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে । এক্ষেত্রে পরবর্তী বছর যখন ফুল ধরবে তখন ফেরাম ফস (Ferrum phosphoricum) প্রয়োগ করুন । পাশাপাশি সিলিশিয়া (silicea) ঔষধটিও ফুলের ওপর প্রয়োগ করতে পারেন । সিলিশিয়া উদ্ভিদ বা প্রাণীর সাহস / আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয় এবং ব্যর্থতা দূর করতে সাহায্য করে। তবে সিলিশিয়া একবারের বেশী ব্যবহার করবেন না ; তাতে উল্টা ফল (মানে ক্ষতি) হতে পারে। হ্যাঁ, সিলিশিয়া অনেকবার ব্যবহার করে যদি কোন ক্ষতি হয়ে যায়, তাতে ফসফরাস (phosphorus) ব্যবহার করে মুক্তি পেতে পারেন।

☆ পাশের চিত্রের মতো পোকা দূর করতে ফেসিওলাস (Phaseolus) অথবা এলিয়াম সেপা (Allium cepa) নামক ঔষধগুলো ব্যবহার করতে পারেন।

☆ গোলআলু গাছের পোকা দমন করতে Thuja occidentalis অথবা Ledum palustre ব্যবহার করতে পারেন।

☆ মনে করুন, আপনি তুলা বীজ বা ভুট্টা বীজ বপন করলে তার সবগুলো গজায় না। তাহলে সেগুলো বপন করার পূর্বে পানিতে সিলিশিয়া (silicea) মিশিয়ে তাতে সারা রাত ভিজিয়ে রাখুন। তারপর পরেরদিন সেগুলো বপন করুন।

☆ পাট ক্ষেতের পোকা বা বিছা (জাতীয় বড় পোকা) দমনে স্যাম্বুকাস নাইগ্রা (Sambucus nigra) ব্যবহার করে ভাল ফল পেতে পারেন। তবে পোকার আক্রমণ শুরু হওয়ার আগেই দিতে পারলে ভাল ফল পাওয়া যাবে ।

☆ পাশের ছবিতে দেখা পোকার (caterpillars) জন্য স্যাম্বুকাস নাইগ্রা (Sambucus nigra) ঔষধটি প্রয়োগ করুন।

☆ মনে করুন, আপনি গাছের মধ্যে দস্তা সার (Copper) বেশী দিয়ে ফেলেছেন, ফলে গাছের পাতা রঙ হলদে হয়ে গেছে, আবার মাঝে মাঝে বাদামী স্পট / দাগ পড়ে গেছে। এখন কপার / দস্তার ক্রিয়ানাশক (Antidote) ঔষধ হিপার সালফ (Hepar sulph) ব্যবহার করে এই সমস্যার হাত থেকে নিস্তার পেতে পারেন। কেউ কেউ বলেন যে, যেই ঔষধের দ্বারা বিষক্রিয়া (poisoning) হয়েছে সেটিকে উচ্চশক্তিতে ব্যবহার করলে সেই সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। যেমন - ফসফরাসের জন্য উচ্চশক্তির ফসফরাস, পটাশিয়ামের জন্য উচ্চ শক্তির ক্যালি কার্ব (Kali carbonicum) ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আসলে এই পদ্ধতিতে খুব কম ক্ষেত্রেই ভাল ফল পাওয়া যায়, বরং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সমস্যা আরো বেড়ে যায়।

☆ মনে করুন, আপনার জমিতে লবণের পরিমান বেশী, সেই কারণে ফসল ভাল উৎপন্ন হয় না। (সাধারণত যে-সব জায়গায় লাফিয়ে লাফিয়ে চলা ফড়িং (mole crickets) জাতীয় পোকা বেশী থাকে, সেই মাটিতে লবণ বেশী আছে বলে ধরে নেওয়া যায়।) তো এই সমস্যা সমাধানে আপনি সরাসরি নেট্রাম মিউর (Natrum muriaticum) ব্যবহারের বদলে বরং একটু ঘুরিয়ে নেট্রাম কার্ব (Natrum carbonicum) ব্যবহার করবেন। কেননা এসব ক্ষেত্রে একেবারে হুবহু মিলিয়ে ব্যবহার করলে অনেক সময় সুফলের চাইতে কুফলই বেশী পাওয়া যায়।

☆ পাশের চিত্রের গোল আলু পোকা (Potato beetle) দমনের জন্য ফেসিওলাস (Phaseolus) ঔষধটি প্রয়োগ করুন। তাতে কাজ না হলে থুজা (Thuja occidentalis) ঔষধটি ব্যবহার করতে হবে।

☆ সাধারণত ফসলের জমিতে যে-সব ঘাস জন্মে, তাদের অধিকাংশই জুগল্যান্স নাইগ্রা (Juglans nigra) ঔষধটি প্রয়োগের মাধ্যমে অনেকদিন পর্যন্ত ছোট করে রাখা যায়।

☆ পাশের চিত্রের কমলার রোগের মতো সমস্যায় কার্বো ভেজ (Carbo vegetabilis) অথবা স্যালিসাইলিক এসডি (Salicylicum Acidum) ঔষধের যে-কোনটি প্রয়োগে সুফল পাবেন।

☆ বৃক্ষের চামড়া ওঠা রোগে বা নরম শরীর বিশিষ্ট পোকাদের দমনে (Coccinella) ঔষধটি অনেক উপকারে আসতে দেখা গেছে।
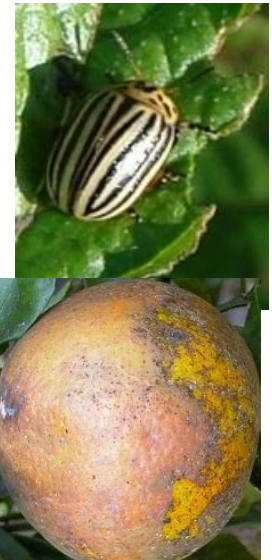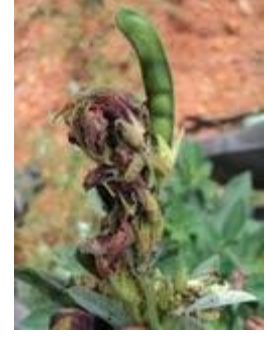
☆ কেউ যদি হোমিও ঔষধের পরিবর্তে বায়োক্যামিক ঔষধ / টিসু সল্ট ব্যবহার করতে চান, তবে তাকে এই ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হবে সেগুলো কাজ করে কিনা ?
কেননা বায়োক্যামিক ঔষধ নিয়ে গাছপালার ওপর কোন গবেষণা হয়নি।

☆ মনে করুন, প্রচণ্ড শীতের পর অথবা তুষারপাতের পর একটি গাছ অসুস্থ হয়ে ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে, তবে একোনাইট (Aconite nap) ঔষধটি প্রয়োগে তাকে বাচাতে পারেন। পাশাপাশি ভিটামিন হিসাবে ফসফরাস (Phosphorus) এবং ক্যালি ফস (Kali phosphoricum) খাওয়াতে পারেন। সার হিসাবে দুই বছরের পুরনো গোবর দিতে পারেন। নতুন গোবর দিবেন না, তাতে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

☆ পাশের চিত্রের মতো মল্ড, ফাংগাস, ছত্রাক ইত্যাদি দমনের জন্য দুইটি ভালো ঔষধ হলো সিলিশিয়া (silicea) এবং সালফার (Sulphur)। লক্ষণ অনুযায়ী যে-কোন একটা ব্যবহার করবেন এক সাথে বা একটার পর আরেকটা ; ।হিসাবে দুটো ঔষধ কখনও ব্যবহার করবেন না

☆ আপনার গাছে যদি ঝাকে ঝাকে পিপঁড়া আক্রমণ করে তবে মেনথা পিপারেটা (Mentha piperita) এবং ক্যালেন্ডুলা (Calendula) ঔষধ দুটির যে-কোনটি ব্যবহার করতে পারেন।

☆ পাশের চিত্রের পামরী পোকা (sqaush bugs) দমনের জন্য ক্যালেন্ডুলা (Calendula) অথবা ওরিগ্যানাম (Origanum) ঔষধ দুটি কার্যকরী ।

☆ তরমুজ, শশা ইত্যাদির ভেতরে ছিদ্র করে ঢুকে রস খেয়ে ফেলে এবং এক গাছ থেকে আরেক গাছে উড়ে যায়, এই জাতীয় পোকা দমনের জন্য কক্কিনেলা (Coccinella) প্রয়োগ করুন। কক্কিনেলা ব্যর্থ হলে রিসিনাস (Ricinus communis) ব্যবহার করতে পারেন।

☆ ধানকে পোকামুক্ত রাখতে লিডাম (Ledum palustre) অথবা থুজা (Thuja occidentalis) ঔষধ দুইটি প্রয়োগ করতে পারেন। পানিতে মিশিয়ে গোড়ায় দিন অথবা লাগানোর পূর্বে ধান ঔষধ মেশানো পানিতে সারা রাত ভিজিয়ে তারপর বপন করুন।

☆ গাছের কান্ড ছিদ্র করে ভেতরে ঢুকে (stem borers) গাছ মেরে ফেলে এই জাতীয় পোকা দমনের জন্য লিডাম (Ledum palustre) অথবা থুজা (Thuja occidentalis) ঔষধ দুইটি প্রয়োগ করতে হবে ।

☆ খরা অর্থাৎ অনাবৃষ্টির কারণে কোন রোগ হলে তাতে কার্বো ভেজ (Carbo vegetabilis) ঔষধটি উপকারী প্রমাণিত হয়ে থাকে।

☆ গাঢ় লাল থেকে গাঢ় কমলা রঙের ছত্রাক (Rust / fungus) দমনের জন্য বেলেডোনা (Belladonna) সবচেয়ে কার্যকরী ঔষধ । পক্ষান্তরে উজ্জ্বল লাল, হালকা কমলা এবং হলুদ রঙের ছত্রাক হলে তার ঔষধ হলো একোনাইট (Aconite) । আর একেবারে হালকা রঙের ছত্রাকের জন্য হলো ফেরাম ফস (Ferrum phos) ।

## Sexual disorders (যৌন সমস্যা) ঃ -

☆ যৌনশক্তি বৃদ্ধির জন্য Origanum, Acidum picricum, kali bromatum, Nux vomica, Calcarea carbonica, Lycopodium অথবা Diamina (শক্তি Q,৩,৬) প্রতিদিন দশ ফোটা করে দুইবার হিসাবে কয়েক মাস খেতে পারেন (মাঝে মাঝে দুয়েক সপ্তাহ গ্যাপ দিয়ে নিবেন)।

☆ যারা যৌনমিলনে কোন আনন্দ পান না বা যৌনমিলনের পর বীর্য নির্গত হয় না, তারা Caladium, calcarea carbonica অথবা selenium (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২,৩০) খান প্রতিদিন তিনবেলা করে এক সপ্তাহ।

☆ পুরুষাঙ্গ বড় করার জন্য Staphisagria (অতীতে যৌন অনাচার), Lycopodium (যাদের পেটে গ্যাস হয়) অথবা Argentum nitricum (মিষ্টি খাবার বেশী পছন্দ করে) [শক্তি ২০০] সপ্তাহে একমাত্রা করে কয়েক মাস খান।

☆ মহিলাদের মাত্রাতিরিক্ত যৌন উত্তেজনা দমনের জন্য Platina, baryta muriaticum অথবা Salix nigra (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২,৩০) প্রতিদিন দশ ফোটা করে দুই বেলা করে পনের দিন খান।

☆ পুরুষদের অতিরিক্ত যৌন উত্তেজনা দমনের জন্য Salix nigra অথবা baryta muriaticum (শক্তি ২০০) দুই বেলা করে পনের দিন খান।

☆ অবিবাহিত মেয়েদের অতিরিক্ত যৌন উত্তেজনা দমনের জন্য Platina (শক্তি ৩০,২০০) দুই বেলা করে কিছুদিন খেয়ে পরে শক্তি বাড়িয়ে খেতে পারেন।

☆ যৌনকর্ম আর ব্যায়াম একই ফল দিয়ে থাকে। যারা বিয়ে করতে পারছেন না অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছ দূরে আছেন, তারা ব্যায়াম করুন। এতে যৌন উত্তেজনার হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, এমনভাবে ব্যায়াম করুন যাতে আধা লিটার ঘাম বের হয় ।

☆ মহিলাদের যৌন মিলনে বিতৃষ্ণা দূর করতে Ignatia অথবা Lycopodium (শক্তি কিউ,৩,৬, ১২,৩০) পাঁচ ফোটা করে দুইবেলা করে পনের দিন খান।

☆ যে-সব নারীরা পুরুষদের আলিঙ্গন করলেই বীর্যপাত হয়ে যায় (সহবাস ছাড়াই) অর্থাৎ অল্পতেই তাদের তৃপ্তি ঘটে যায় এবং পরে আর সঙ্গমে আগ্রহ থাকে না, তাদের জন্য উৎকৃষ্ট ঔষধ হলো Natrum carbonicum . এই কারণে যদি তাদের সন্তানাদি না হয় (অর্থাৎ বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়), তবে নেট্রাম কার্বে সেই বন্ধ্যাত্বও সেরে যাবে।

☆ বিয়ের প্রথম কিছুদিনে মেয়েদের প্রস্রাব সম্পর্কিত অথবা যৌনাঙ্গ সম্পর্কিত কোন সমস্যা হলে নিশ্চিন্তে Staphisagria নামক ঔষধটি খেতে পারেন। কারণ স্টেফিসেগ্রিয়া একই সাথে যৌনাঙ্গ সম্পর্কিত রোগে এবং আঘাতজনিত রোগে সমান কাযর্কর।

## Tonic / Vitamin (টনিক, ভিটামিন, শক্তিবর্দ্ধক, পুষ্টি বর্দ্ধক, বল বর্দ্ধক) ঃ -

রোগীর সমস্ত লক্ষণের উপর ভিত্তি করে প্রদত্ত যে-কোন হোমিও ঔষধই রোগীর রোগ নিরাময়ের পাশাপাশি একই সাথে রোগীর জন্য ভিটামিনেরও কাজ করে থাকে। তবে কিছু ঔষধ আছে, যাদেরকে ডাক্তাররা ভিটামিন হিসাবে বেশী ব্যবহার করে থাকেন।

Alfalfa : অকাল বার্ধ্যক্য ঠেকাতে, যৌবন বা বয়স ধরে রাখার জন্য কিংবা মোটাতাজা হওয়ার জন্য Alfalfa খান। আলফালফা ঔষধটি নিয়মিত অনেকদিন খেলে ক্ষুধা, ঘুম, ওজন, হজমশক্তি ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। নিম্নশক্তিতে (Q) দশ

ফোটা করে রোজ তিনবার করে খেতে পারেন। দ্রুত ওজন বাড়াতে চাইলে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ-ষাট ফোটা করে রোজ কয়েকবার খেতে পারেন। তবে কোন সমস্যা হলে মাত্রা কমিয়ে খাওয়া উচিত। ইহার স্বাদ যেহেতু খারাপ সেহেতু শিশুদেরকে চিনি বা গুড়ের সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে পারেন। আমেরিকার ডাঃ বেন ব্র্যাডলিকে এক মহিলা বলেছিলেন যে, তার সাতটি ছেলে-মেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে জন্মেছে এবং আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত তারা সুস্বাসে'্যর অধিকারী থাকে। ইহার পরই তারা ধীরে ধীরে শুকিয়ে মারা যায় এবং এভাবে সাতটি সন্তানই মারা গেছে। কোন চিকিৎসাই তাদের বাচাঁতে পারেনি। পরের বাচ্চাটি যখন আঠারোতে পৌঁছে শুকাতে শুরু করেছে, তখন ডাঃ ব্র্যাডলি তাকে দশ ফোটা করে রোজ চার মাত্রা করে আলফালফা খাইয়ে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

Senecio aureus : শরীরে রক্ত কম থাকলে অর্থাৎ যারা রক্তশূণ্যতায় ভোগছেন, তাদের জন্য সিনিসিও অরিয়াস ভালো কাজ করে। এদের হাত-পা সব সময় ঠান্ডা এবং ঘামে ভিজা ভিজা থাকে।

Ferrum phosphoricum : দুর্বলতা, সাদাটে মুখ, **বুক ধড়ফড়ানি, মুখ-চোখ ফোলা ফোলা**, চোখের চারদিকে কালি পড়ে গেছে, দেখতেই মনে হয় অসুস্থ ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে ফরাম ফস, ফেরাম মেট, ফেরাম আর্স, ফেরাম পিক্রিক ইত্যাদি তাদের জন্য শ্রেষ্ট ভিটামিন হবে।

Kali phosphoricum : অসুখ-বিসুখে ভুগে যাদের শরীরের অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে গেছে, ভীষণ বদমেজাজী, অতিরিক্ত শারীরিক-মানসিক পরিশ্রমে যাদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে ইত্যাদি অবস্থায় ফেরাম ফস (শক্তি 3x, 6x) খেতে হবে।

Natrum muriaticum : যাদের মুখ হয় সাদাটে / ফ্যাকাসে এবং ফোলা ফোলা এবং বেশী বেশী লবণ বা লবণযুক্ত খাবার খাওয়ার প্রতি তীব্র আকর্ষণ থাকে ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে তাদের জন্য নেট্রাম মিউর হলো সেরা ভিটামিন।

Calcarea carbonica : শিশুদের জন্য শ্রেষ্ট টনিক বা ভিটামিন হলো ক্যালকেরিয়া কার্ব। শিশুরা গর্ভে আসার পরই মাসে এক মাত্রা করে মোট তিন মাত্রা ক্যালকেরিয়া কার্ব (শক্তি ২০০) গর্ভবতী মাকে খাওয়ানো উচিত। এতে মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় শিশুর হাড়-মাংস-দাঁত-ব্রেন-চোখ ইত্যাদির গঠন ভালো হবে। পাশাপাশি ঠোঁক কাটা, তালু কাটা, পিঠ বাঁকা, একুশ-বাইশ আঙুল, শারীরিক প্রতিবন্ধি, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধি প্রভৃতি রোগ থেকে শিশু মুক্ত থাকবে। আবার শিশুর জন্মের প্রথম তিন মাসে তিন মাত্রা ক্যালকেরিয়া কার্ব খাওয়াতে পারলে তার দাঁত ওঠবে ভালোভাবে, ব্রেন ভালো হবে, স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, অসুখ-বিসুখ কম হবে, হাঁটা শিখতে এবং কথা শিখতে কোন সমস্যা হবে না। এভাবে শিশুর দশ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি বছরের শুরুতে অন্তত দুই-তিন মাত্রা ক্যালকেরিয়া কার্ব খাওয়ানো উচিত। শিশুদের ক্যালকেরিয়া খাওয়াতে পারলে আর টিকা নেওয়ার প্রয়োজন নাই; কেননা ক্যালকেরিয়া কার্ব হলো শিশুদের শ্রেষ্ট টিকা।

Carbo animalis : কারবো এনি মারাত্মক কোন রোগের কারণে সৃষ্ট দুর্বলতার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ ।

Vanadium : সাধারণত বয়স চল্লিশের দিকে আসলে মানুষ নানা রকমের রক্তনালী সংক্রান্ত রোগে বা হৃদরোগে আক্রান্ত হতে শুরু করে। এজন্য এই বয়স থেকে প্রত্যকেরই (নিম্নশক্তিতে বছরে অন্তত একমাস) ভ্যানাডিয়াম খাওয়া উচিত। তাহলে হৃদরোগ ধারেকাছে আসতে পারবে না।

Aletris farinosa : জরায়ু সংক্রান্ত যে-কোন সমস্যার জন্য (ব্যথাযুক্ত ঋতুস্রাব , সাদাস্রাব , জরায়ুর স্থানচ্যুতি , বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি) লেট্রিস ফেরিনোসা একটি শ্রেষ্ট ভিটামিন। এটি পাঁচফোটা করে প্রতিদিন তিনবেলা করে দীর্ঘদিন খান।

Crataegus oxyacantha : হৃদপিন্ডের দুর্বলতায় একটি শ্রেষ্ট টনিক হলো ক্রেটেগাস (শক্তি কিউ,৩,৬) পাঁচ ফোটা করে রোজ দুইবেলা বা চারবেলা করে দীর্ঘদিন খান। হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, এই একটা ঔষধেই মোটামুটি

Carduus Marianus : লিভারের একটি উৎকৃষ্ট টনিক হলো কার্ডুয়াস মেরিনাস (শক্তি কিউ,৩,৬)। ইহা ছাড়াও চেলিডোনিয়াম (Chelidonium), চিলোন (Chelone glabra), চিওনেথাস (Chionathus virginica) ইত্যাদিও লিভারের সেরা টনিক / ভিটামিন।

Ambra grisea : বেশী বয়স্ক লোকদের জন্য একটি আদর্শ টনিক হলো এমব্রা গ্রেসিয়া (শক্তি কিউ, ৩,৬)।

Nux vomica : যারা অধিকাংশ সময় চেয়ারে বসে কাটান, সর্বদা শীতে কাপতে থাকেন এবং পেটের অসুখ বেশী, তাদের জন্য আদর্শ টনিক হলো নাক্স ভমিকা (শক্তি কিউ,৩,৬) ; এটি তিনবেলা করে অনেক দিন খান।

**Dental disease (দাঁতের রোগ) ঃ** - শিশুদের দাঁত ওঠতে দেরী হলে কিংবা দাঁত ঠিকমতো না ওঠলে Calcarea phos (শক্তি ১০,০০০) মাসে একমাত্রা খাওয়ান। শিশুদের দাঁত ওঠার সময় কোন অসুখ হলে Calcarea phos (শক্তি কিউ, ৩,৬) তিন/চার বেলা করে খাওয়াতে থাকুন। দাঁতের ব্যথা ঠান্ডায় কমলে Bryonia (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২,৩০) আর গরমে কমলে Nux vomica (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২,৩০) ঘনঘন খেতে থাকুন। পোকা খাওয়া দাতের যনতণায় Kreosote (শক্তি কিউ) তুলায় ভিজিয়ে বাহ্য প্রয়োগ করুন।

**উঁকুন (Lice)ঃ**- উঁকুনের জন্য Sabadilla অথবা Ledum দিনে দুইবেলা করে খান চারদিন আর (শক্তি কিউ) তেলের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করুন।

**বন্ধ্যাত্ব (Sterility) ঃ**- অধিকাংশ ক্ষেত্রে কলোফাইলাম (শক্তি কিউ, ৩,৬) দুইবেলা করে দীর্ঘদিন খাওয়াতে সন্তান লাভ হয়। যাদের স্বামী বা স্ত্রীর কিংবা পিতা-মাতার সিফিলিস/গনোরিয়া হয়েছিল (চরিত্রহীন ছিল) তারা মেডোরিনাম (MedorrhinumMedorrhinum) (শক্তি ১০০০) একমাস পরপর একমাত্রা করে চারমাত্রা খান। অরাম মেট (Aurum metallicummetallicum) (শক্তি ২০০) ঔষধটি সপ্তায় একমাত্রা করে এবং পরবর্তীতে শক্তি বাড়িয়ে খেতে পারেন। যারা মৃত সন্তান প্রসব করে তাদের গর্ভাবস্থার শেষের দিকে একটিয়া রেসি (Actea racemosa) (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২,৩০) দু'য়েক মাস খাওয়ান।

**Laryngitis, Hoarseness (স্বরভঙ্গ এবং তজ্জনিত কাশি) :-**

ধুমপান, সর্দি-কাশি, হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তন, উচ্চস্বরে বেশী কথা বলা, নিঃশ্বাসের সাথে বিষাক্ত ধোয়া গ্রহন করা প্রভৃতি কারণে ল্যারিঞ্জাইটিস হয়ে থাকে। কাজেই ঔষধ খাওয়ার সাথে সাথে কথা বলা বন্ধ রাখতে হবে, গরম চা-কফি খাওয়া উচিত এবং সিগারেট বা অন্যান্য ধোয়া থেকে দুরে থাকতে হবে। ভাত রান্না বা পানি সিদ্ধ করার সময় যে গরম বাষপ উঠে সেগুলো নিঃশ্বাসের সাথে টেনে নিলে উপকার পাওয়া যাবে। তবে কাগজ বাঁকা করে এমনভাবে নিতে হবে যাতে গরম বাষপ চোখের মধ্যে না লাগে।

Causticum :-

গলাভাঙ্গার এক নাম্বার ঔষধ হলো কষ্টিকাম। কষ্টিকামের লক্ষণ হলো সর্দি লেগে বা আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হওয়া গলাভাঙা। এতে শুকনো কাশি থাকতে পারে এবং মুখের ভেতরটা লাল হয়ে যায়। গলাভাঙ্গার সাথে যদি একটু জ্বালা-পোড়া ভাব থাকে তবে নিশ্চিনেত কষ্টিকাম খেতে পারেন। কষ্টিকামের কাশি ঠান্ডা পানি খেলে কমে যায়। কষ্টিকামের গলাভাঙা সাধারণত সকালে শুরু হয়।

Spongia tosta : গলাভাঙার সাথে যদি কাশি থাকে এবং কাশিতে যদি ঢোলের মতো আওয়াজ হয় কিংবা কুকুরের ঘেউ ঘেউয়ের মতো শব্দ হয়, তবে সপঞ্জিয়া টোস্টা ঔষধটি আপনাকে মুক্তি দেবে।

Hepar Sulphur :-

স্বরভঙ্গের সাথে যদি কাশি থাকে এবং কাশির সাথে কফ বের হয়, তবে হিপার সালফার ঔষধটি খেতে পারেন। হিপারের কাশি ঠান্ডা বাতাসে বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ ঠান্ডা বাতাস লাগলে যদি কাশি বৃদ্ধি পায় তবে হিপার সালফারই হবে আপনার সেরা ঔষধ।

Aconitum napellus :-

যে-কোন রোগই হউক (জ্বর-কাশি-ডায়েরিয়া-আমাশয়-পেট ব্যথা-মাথা-ব্যথা প্রভৃতি), যদি হঠাৎ করে মারাত্মক রূপে দেখা দেয়, তবে একোনাইট হলো তার এক নাম্বার ঔষধ। গলাভাঙাও যদি তেমনি হঠাৎ করে মারাত্মকরূপে দেখা দেয়, তবে একোনাইট সেবন করুন।

Phosphorus :-

গলাভাঙার সাথে যদি কথা বললে বা কাশি দিলে গলায় প্রচণ্ড ব্যথা হয় অথবা জ্বলে-পুড়ে যায়, তবে ফসফরাস খেতে হবে।

Argentum metallicum :-

কয়েকদিনের পুরনো গলাভাঙ্গায় আর্জেন্টাম মেটালিকাম খেতে পারেন। বিশেষত গায়ক-গায়িকা-ক্যানভাসার এবং বক্তৃতা-ভাষণ দিয়ে বেড়ানো লোকদের স্বরভঙ্গে এটি বিশেষ উপকারী।

Thuja occidentalis : যে-কোন টিকা (বিসিজি, ডিপিটি, হাম, পোলিও ইত্যাদি) নেওয়ার কারণে স্বরভঙ্গ হলে তাতে থুজা একটি অতুলনীয় ঔষধ।

Ammonium causticum : এমোন কষ্ট স্বরভঙ্গের অথবা কথা একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়ার আরেকটি উৎকৃষ্ঠ ঔষধ। গলায় জ্বালাপোড়া, পায়খানার রাস্তায় জ্বালাপোড়া, অত্যধিক পিপাসা ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে এমোন কষ্ট খেতে হবে।

**Allergy (এলার্জি) ঃ -** এলার্জির আরেকটি সেরা ঔষধ হইল রাস টক্স ()। সাধারণত কোন কিছু লেগে অথবা কোন পোকা বা জীবজন্তুর কামড়ের ফলে অথবা কোন খাবার থেকে এলার্জি হয়ে যদি সারা শরীর বা শরীরের কোন একটি অংশ ফোলে চাকা চাকা হয়ে যায়, তবে রাস টক্সের কথা ভুলবেন না। ফোলে লাল হোক

বা নীল হোক, ব্যথা-চুলকানি থাক বা না থাক, সেটা কোন বিষয় নয়। এলার্জির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ হইল এপিস মেল ()। এপিসের লক্ষণ রাস টক্সের মতোই তবে এতে মৌমাছির হুল ফোটানোর মতো ব্যথা থাকে (যেহেতু এই ঔষধটি মৌমাছি বিষ থেকে তৈরী হয়ে থাকে)। এলার্জির সবচেয়ে ভালো ঔষধ হলো ফেরাম । যারা শীতকাতর (chilly) তাদেরকে ফেরাম ফস (Ferrum phosphoricum) দিবেন এবং যারা গরম কাতর তাদেরকে দিবেন ফেরাম মেট (Ferrum metallicum)। নেট্রাম ফস এবং নেট্রাম মিউর (শক্তি ৩০) দুয়েক ঘন্টা পরপর অদলবদল করে খান। যে কোন ধরনের দুর্দান্ত চুলকানি দমন করতে Merc sol (শক্তি ৩০) এবং Sulphur (শক্তি ৩০) একত্রে মিশিয়ে দুয়েক ঘন্টা পরপর খেতে থাকুন। টিকা নেওয়ার পর থেকে চুলকানির উৎপত্তি হলে Thuja এবং Bacillinum (শক্তি ২০০) সপ্তায় একমাত্রা করে অদল-বদল করে খান দু'মাস।

**Bite (দংশন)** ঃ- ☆ ইঁদুর , বিড়ালে বা কুকুরে কামড়াইলে লিডাম (শক্তি ২০০) ছয় ঘণ্টা পরপর একমাত্রা করে সাতদিন খান এবং পরে হাইড্রোফোবিনাম (শক্তি ২০০) চারদিন পরপর একমাত্রা করে একমাস খান। পাশাপাশি ক্ষতে ক্যালেন্ডুলা (শক্তি কিউ) বাহ্য প্রয়োগ করুন যতদিন ঘা না শুকায়। ভিমরুল, বোলতা, মৌমাছি প্রভৃতি পোঁকায় কামড়ালে যতক্ষন ব্যথা বা ফুলা থাকে লিডাম অথবা ক্রোটেলাস (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২,৩০) খেতে থাকুন। লিডামে ব্যথা না কমলে এপিস (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২,৩০) খেতে থাকুন।

☆ মৌমাছি বা বোলতায় কামড়ালে আর্টিকা ইউরেন্স বা আর্নিকা (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২,৩০ ,২০০) ঘনঘন খান এবং সাথে মালিশ করুন।

☆ বিষাক্ত পোকায় বা সাপে কামড়ালে Cedron (শক্তি ৩০ ,২০০) দশ মিনিট ঘণ্টা পরপর খাওয়াতে থাকুন। সর্প দংশনের ক্ষেত্রে দংশিত স্থানের কিছুটা ওপরে শক্ত করে বেঁধে রক্ত মোক্ষম করবে। অতঃপর Ammonium carbonicum (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২,৩০,২০০) আধঘণ্টা পরপর রোগীর অবস্থা বুঝে কয়েক বার খাওয়ান। ল্যাকেসিস বা ন্যাজা (শক্তি ৩০, ২০০) ঔষধ দুইটির কথাও মনে রাখতে পারেন।

**Anemia (রক্তশূণ্যতা)**ঃ- যে কোন ধরনের রক্তশূণ্যতায় ক্যালি ফস, ক্যাল্কে ফস , ফেরাম ফস (শক্তি ৩ ,৬) ঔষধ তিনটি দুইবেলা করে তিন মাস খান। গর্ভাবস্থায় গর্ভস্থ শিশুর অতিরিক্ত চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রেও একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করুন। রক্তক্ষরণের কারণে রক্তশূণ্যতায় চায়না (শক্তি কিউ, ৩,৬) একই নিয়মে খান।

**কোকাকোলা (Coca-cola)** ঃ- পোলাও-কোরমা-বিরিয়ানী প্রভৃতি চর্বি জাতীয় খাবার খাওয়ার পর যদি পালসেটিলা (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২,৩০) একমাত্রা খান , তবে তাতে এক বোতল কোকাকোলা খাওয়ার সমান ফল পাবেন।

**গলগন্ড, ঘ্যাগ (Goitre, Hypothyroidism)**ঃ- গলগন্ড বা গ্যাঘ রোগ নির্মূল করার জন্য Iodium অথবা Calcarea carbonicum (শক্তি ৫০,০০০) একফোটা বা দশটি বড়ি মাত্র একবার খান। প্রয়োজনে দুই / তিন মাস পর আবার একমাত্রা খেতে পারেন।

**ঘামাচি (itch)ঃ-** শীতকাতর লোকদের জন্য Rhus tox (শক্তি ৩০) আর গরমকাতরদের জন্য Natrum muriaticum (শক্তি ৩০) তিনবেলা করে কয়েকদিন খান।

## Conjunctivitis (চোখউঠা) ঃ-

Euphrasia, Belladonna অথবা Hamamellis (শক্তি ৩০,২০০) তিনবেলা করে খান।

## Stye (তেলেঙ্গা বা অঞ্জনী) :

চোখের তেলেঙ্গা বা অঞ্জনীতে (Stye) ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া (Staphisagria) অথবা ক্যামোমিলা (Chamomilla) (শক্তি ১০০০) পনেরদিন পরপর একমাত্রা করে খেতে থাকুন। হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, মানুষ অপমান হজম করে ফেললে অর্থাৎ রাগ মনের মধ্যে চেপে রাখলে মানুষ তেলেঙ্গা বা অঞ্জনীতে (Stye) আক্রান্ত হয়। আর ষ্টেফিসেগ্রিয়া হলো অপমানজনিত রোগের সেরা ঔষধ। কাজেই চোখের তেলেঙ্গা বা অঞ্জনীতে (Stye) প্রথমেই ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া (Staphisagria) খেয়ে দেখুন। চোখের ছানিতে (cataract) ক্যাল্কে ফ্লোর (Calcarea fluoricum) (শক্তি কিউ,৩,৬,১২,৩০) দুইবেলা করে দুই-তিন মাস খান।

## Uterine bleeding (জরায়ু থেকে রক্তক্ষরণ) :-

কবি-সাহিত্যিকরা যেমন নারীর মন বুঝতে পারেন না ; তেমনি এলোপ্যাথিক ডাক্তাররাও (নারীদের প্রধান অঙ্গ) জরায়ুর মতিগতি বুঝতে পারেন না। শেষে ব্যর্থ হয়ে কবি-সাহিত্যিকরা ঘোষণা করেন "নারী ছলনাময়ী" এবং এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা ঘোষণা করেন "বেয়াদব জরায়ুটাকে কেটে ফেলে দাও" (hysterectomy)। সে যাক, জরায়ুর (uterus) যত রোগ আছে, ক্যানসারের পরে তাদের মধ্যে মাত্রাতিরিক্তি রক্তক্ষরণই (metrorrhagia, menorrhagia) বলা যায় সবচেয়ে বিপজ্জনক রোগ। অবশ্য জরায়ুর প্রধান কাজই হলো মাসে মাসে, সময়ে অসময়ে, কারণে অকারণে রক্ত ক্ষরণ করা। কিন্তু যখনই এই রক্তক্ষরণের পরিমাণ আশংকাজনকভাবে বেড়ে যায়, তখন রোগী, রোগীর আত্মীয়-স্বজন, ডাক্তার-নার্স সকলেই একটা অজানা আশংকায় শংকিত হয়ে পড়েন। এই পরিস্থিতিতে এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা নানা রকমের ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, ইনজেকশান দিতে থাকেন, ব্যাগের পর ব্যাগ রক্ত দিতে থাকেন। তারপরও যখন রক্তক্ষরণ বন্ধ না হয়, তখন তাদের শেষ চিকিৎসা হলো জুরায়ু কেটে ফেলে দেওয়া।
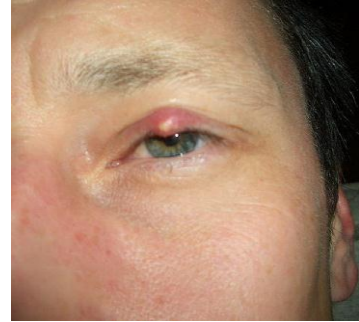
কিন্তু জরায়ু কেটে ফেলে দেওয়াতে আপনি অনেক জটিল সমস্যায় পড়বেন। যেমন - রক্তচাপ বেড়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া, শরীরে জ্বালা-পোড়া বৃদ্ধি পাওয়া, হাড় পাতলা হয়ে সহজে ভেঙ্গে যাওয়া, স্তন ক্যানসার ইত্যাদি ইত্যাদি। সে যাক, আমেরিকান হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানী প্রফেসর ডাঃ জে. টি. কেন্ট (এম.ডি.)-এর মতে, মাত্র ৪ টি হোমিও ঔষধের মাধ্যমে এমন কোন জরায়ু রক্তক্ষরণ নাই যা সারানো যায় না। হ্যাঁ, শুধুমাত্র ঔষধের মাধ্যমেই, কোন প্রকার যন্ত্রপাতির ব্যবহার বা অপারেশান ছাড়াই। ঔষধ ৪ টি হলো Ipecac, Aconitum napellus,

Phosphorus এবং Secale cornutum. যদি লক্ষণ মিলিয়ে এই ঔষধগুলি ব্যবহার করতে পারেন, তবে রক্তক্ষরণ এত তাড়াতাড়ি বন্ধ হবে যে, আপনার বিশ্বাস করতেই কষ্ট হবে যে, রক্তক্ষরণ ঔষধে বন্ধ হলো নাকি এমনি এমনিই বন্ধ হয়েছে।

Ipecac : যখন জরায়ু থেকে বিরতিহীনভাবে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত ঝরছে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরপরই রক্তের স্রোত / প্রবাহ বেড়ে যায়, উজ্জ্বল লাল রক্তের দমকা একটু বেড়ে গেলেই রোগীর মনে হয় সে অজ্ঞান হয়ে যাবে, তার দম নিতে কষ্ট হয়, যতটা রক্তক্ষরণ হয়েছে সেই তুলনায় রোগীর ক্লান্তি / দুরবলতা / অবসন্নতা / বমিবমি ভাব / বেহুঁশ হওয়া / মুখ ফ্যাকাসে হওয়া ইত্যাদিকে অনেক বেশী মনে হয়, এই ধরনের রোগীর ক্ষেত্রে ইপিকাক হয় উপযুক্ত ঔষধ।

Aconitum napellus : উজ্জ্বল লাল রক্তের স্রোত / প্রবাহ / দমকার সাথে থাকে অতিরিক্ত মৃত্যু ভয়, (রোগী মনে করে এখনই সে নিঘার্ত মরে যাবে) তবে একোনাইট হলো এই ধরনের রোগীর উপযুক্ত ঔষধ।

Phosphorus : রোগীর যদি গর্ভবতী কালীন সময়ে বা প্রসব পরবর্তী সময়ে মাথা গরম থাকে, বরফের মতো ঠান্ডা পানি খাওয়ার জন্য পাগল থাকে, প্রসব এবং গর্ভফুল (placenta) নির্গমণ সব কিছু ঠিকঠাক মতো হয়ে থাকে, এবং আপনি বুঝতে পারছেন না কি কারণে এতো বেশী বেশী রক্তপাত হচ্ছে, তবে ফসফরাস হলো তার একমাত্র ঔষধ।

Secale cornutum : রোগী যদি হয় পাতলা, চিকন, শীর্ণ অর্থাৎ ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী, যে সারাবছরই গরমে কষ্ট পায় (অর্থাৎ গরম সহ্য করতে পারে না), শরীর থেকে কাপড়-চোপড় খুলে ফেলতে চায় এবং ঠান্ডা হতে চায়, যার ঘনঘন জুরায়ু থেকে রক্তক্ষরণের অভ্যাস আছে এবং বর্তমানে তার রক্তক্ষরণের মাত্রা বিপদজনকভাবে বেড়ে গেছে, হতে পারে তা চাকা চাকা অথবা কালচে পাতলা রক্ত, সিকেলি ছাড়া তাকে সুস্থ করার কোন উপায় নাই।

**অপারেশন (Operation)ঃ-** অপারেশনের পূর্বে আর্নিকা (শক্তি ৩০,২০০) কয়েকমাত্রা খেয়ে নিলে অপারেশনের পরে কোন জটিলতা দেখা দিবে না। অপারেশনের পরে যদি রোগীর খিচুঁনি শুরু হয় অথবা রোগী শকে চলে যায়, তবে Strontium carbonicum রোগীর জীবন বাচাঁবে। এটি সার্জনদের জন্য একটি অতি জরুরি ঔষধ ; সার্জনদের ব্যাগে অবশ্যই সবর্দা সংরক্ষণ করে রাখা উচিত।

**Skin complexion (রঙ ফর্সাকরণ)ঃ-** Berberis aquifolium (শক্তি ৩, ৬) স্নো/ক্রিমের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করুন।

**দুর্গন্ধ (Bad odor)ঃ-** নাকে-মুখে, ঘামে কিংবা পায়খানা-প্রস্রাবে ভীষণ দুর্গন্ধের জন্য Baptisia অথবা Merc cor (শক্তি ৩০, ২০০) রোজ তিনবার করে এক সপ্তাহ খান।

**ভীরুতা (Cowardice) ঃ-** শীর্ণদের ক্ষেত্রে Lycopodium clavatum (শক্তি ১০০০) আর মোটাদের ক্ষেত্রে Calcarea carbonica (শক্তি ১০০০) মাসে একমাত্রা করে কয়েক মাস খান। পরীক্ষার বা ইন্টারভিউর পূর্বে বেশী উৎকণ্ঠিত হলে Argentum nitricum অথবা Gelsemium (শক্তি কিউ, ৩,৬, ১২,৩০) দুয়েক মাত্রা খেয়ে নিন।

**শীতকাতরতা (Chilly)ঃ-** যারা সামান্য শীতও সহ্য করতে পারে না তারা রোজ সকালে এবং সন্ধ্যায় Iodium (শক্তি কিউ, ৩,৬) দশ ফোটা করে কয়েক মাস খান।

**ভ্রমণ (Travel)ঃ-** স্থলপথে, নদী, সমুদ্র বা আকাশপথে ভ্রমণের কারণে কোনো সমস্যা দেখা দিলে Cocculus indicus দুই ঘন্টা পরপর খেতে থাকুন।

**আঁচিল/মেঞ্জ (Wart)ঃ-** হাতের তালুর আঁচিলের জন্য নেট্রাম মিউর ১০০০ সপ্তাহে একমাত্রা করে খান। দলে দলে আঁচিল ওঠলে Thuja occidentalis অথবা Causticum (শক্তি ২০০) সপ্তাহে একমাত্রা করে খান। আঁচিল ওঠা প্রতিরোধের জন্যও Thuja occidentalis একই নিয়মে খেতে পারেন।

## অতিরিক্ত ঋতুস্রাব (Menorrhagia)ঃ-

☆ মাসিকে বেদনাহীন এবং উজ্জ্বল লাল রঙের অতিরিক্ত রক্তস্রাবের জন্য Millefolium (শক্তি ৩০) তিনবেলা করে খেতে থাকুন।

☆ রোগী যদি শীর্ণ এবং ঠান্ডাপ্রিয় হয় তবে Secale cornatum (শক্তি ৩০,২০০) তিনবেলা করে কিছুদিন খান।

☆ অতিরিক্ত স্রাবের সাথে তলপেটে ব্যথা থাকলে Sabina (শক্তি ৩০, ২০০) চারবেলা করে যতদিন বন্ধ না হয় খেতে থাকুন।

☆ অতিরিক্ত স্রাবের সাথে বমিবমি ভাব থাকলে Ipecac (শক্তি কিউ, ৩,৬) দুই/তিন ঘণ্টা পরপর খেয়ে যান।

☆ রোগিনী মোটা এবং শীতকাতর হলে Calcarea carb (শক্তি ৩০,২০০) তিনবেলা করে খান এবং পরবর্তীতে শক্তি বাড়িয়ে খেতে থাকুন।

☆ মারাত্মক ধরনের রক্তস্রাব দ্রূত বন্ধ করার জন্য একবার Millefolium (শক্তি কিউ, ৩,৬) এবং একবার China officinalis (শক্তি কিউ, ৩,৬, ১২,৩০,২০০) এভাবে অদলবদল করে ঘনঘন খেতে থাকুন।

## ঋতুস্রাব বন্ধ (Amenorrhoea)ঃ-

মাসিক বন্ধ থাকলে Gossipium, Pulsatilla (গরমকাতর এবং কান্নাকাটির স্বভাব), Natrum mur (বেশী লবণ খাওয়ার অভ্যাস) কিংবা Kali carb (শক্তি কিউ, ৩,৬, ১২,৩০,২০০) পাঁচ ফোটা করে দুবেলা খেয়ে যান যতদিন মাসিক শুরু না হচ্ছে। প্রয়োজনে শক্তি বাড়িয়ে শক্তি বাড়িয়ে খান।

## ঋতুস্রাব (Menstruation)ঃ-

☆ ঋতুস্রাবের পরিবর্তে নাক থেকে রক্তস্রাব হলে Bryonia কিংবা Phosphorus (শক্তি কিউ, ৩,৬,১২,৩০,২০০) তিনবেলা করে কিছু দিন খান।

☆ ঋতুস্রাবের পরিবর্তে বরং সতনে দুধ আসলে Merc sol (শক্তি ৩০,২০০) খান দুইতিন বেলা করে এক সপ্তাহ।

☆ ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার বয়সেও যে-সব মেয়ের ঋতুস্রাব শুরু হয় নাই, সতনের বৃদ্ধি হয় নাই, শরীরে যৌবনের প্রকাশ নাই তাদের Lycopodium (শক্তি ১০০০) মাস একমাত্রা করে দুইতিন মাস খান। পরবর্তীতে শক্তি বাড়িয়ে খান। কিন্তু যাদের শরীরে যৌবনের সব লক্ষণই আছে কিন্তু মাসিক শুর হইতেছে না সেক্ষেত্রে Calcarea carbonica (শক্তি ৩০,২০০) একবেলা করে দুই সপ্তাহ খান এবং পরবর্তীতে শক্তি বৃদ্ধি করে খেয়ে যান।

☆ ঋতুস্রাবের সাথে তলপেটে ব্যথা থাকলে Belledonna এবং Colocynthis (শক্তি ৩,৬,১২,৩০,২০০) একত্রে মিশিয়ে তিন/চার বেলা করে খান।

☆ স্ত্রী যৌনাঙ্গের চুলকানির জন্য Caladium, Merc sol, বা Lapis alba (শক্তি ৩০,২০০) তিন/চারবেলা করে খেতে পারেন।

☆ স্ত্রী যৌনাঙ্গ থেকে বাতাস বের হয় লক্ষণে Lycopodium (শক্তি ৩০,২০০) দুইবেলা করে কিছুদিন খান।

## Leucorrhoea, Whites, Vaginal discharge (সাদাস্রাব, শ্বেতস্রাব) :-

প্রথম কথা হলো শ্বেতস্রাব বা সাদাস্রাব কোন রোগ নয় এবং এটি শরীরের কোন ক্ষতিও করে না। সাধারণত ইহার মাত্রা বা উৎপাত অনেক বেড়ে গেলেই একে রোগের পর্যায়ে ফেলা হয়ে থাকে। প্রধানত মোটা, অলস স্বভাবের, অন্যকোন যৌনরোগ, শারীরিক ত্রুটি, নোংরা অপরিচ্ছন্ন স্বভাব, জরায়ু বা ডিম্বাশয়ের রোগ এবং যাদের স্বামী দূর দেশে থাকেন, এসব মহিলাদের মধ্যে সাদাস্রাবের সমস্যা বেশী দেখা যায়। যদিও সাদাস্রাব বলা হয় কিন্তু ইহার রঙ সাদা, হলদে বা সবুজও হতে পারে। হতে পারে পাতলা অথবা আঠালো । কারো কারো স্রাব এতো ঝাঝালো হয় যে, যোনীমুখে ঘা হয়ে যায়।

Sepia officinalis : **পেশা এবং পরিবারের লোকজনদের প্রতিও উদাসীনতা**, রোগের গতি শরীরের নীচে থেকে উপরের দিকে, রোগী সবর্দা শীতে কাঁপতে থাকে, **পেটের ভিতরে চাকার মতো কিছু একটা নড়াচড়া করছে মনে হওয়া, পাইলস, পায়খানার রাস্তা বা জরায়ু ঝুলে পড়া (prolapse),** খাওয়া-দাওয়া ভালো লাগে না, **পায়খানার রাস্তা ভারী মনে হয়**, মুখের মেছতা (Chloasma), ঘনঘন গর্ভপাত (abortion), **যৌনাঙ্গে এবং পায়খানার রাস্তায় ভীষণ চুলকানি,** দীর্ঘদিনের পুরনো সর্দি, অল্পতেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে, দুধ হজম করতে পারে না, স্বভাবে কৃপন-লোভী, একলা থাকতে ভয় পায় ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে সিপিয়া খান। সাধারণত দশ হাজার শক্তিতে সপ্তাহে এক মাত্রা করে খান।

Pulsatilla pratensis : **গলা শুকিয়ে থাকে কিন্তু কোন পানি পিপাসা থাকে না,** ঠান্ডা বাতাস-ঠান্ডা খাবার-ঠান্ডা পানি পছন্দ করে, **গরম-আলো-বাতাসহীন বদ্ধ ঘরে রোগীনী বিরক্ত বোধ করে, আবেগপ্রবন, অল্পতেই কেঁদে ফেলে** এবং যত দিন যায় ততই মোটা হতে থাকে ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে পালসেটিলা ভালো কাজ করে।

Calcarea Carbonica : মোটা থলথলে শারীরিক গঠন, পা সব সময় ঠান্ডা থাকে, শিশুকালে দাঁত উঠতে বা হাঁটা শিখতে দেরী হয় থাকে, **শরীরের চাইতে পেট বেশী মোটা, খুব সহজে মোটা হয়ে যায়, প্রস্রাব-পায়খানা-ঘাম সব কিছু থেকে টক গন্ধ আসে, হাতের তালু মেয়েদের হাতের মতো নরম** (মনে হবে হাতে কোন হাড়ই নেই), মাথার ঘামে বালিশ ভিজে যায়, মুখমন্ডল ফোলাফোলা, সিদ্ধ ডিম খেতে খুব পছন্দ করে ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে ক্যালকেরিয়া কার্ব হবে তার সবচেয়ে উত্তম ঔষধ।

Iodium : **প্রচুর খায় কিন্তু তারপরও দিনদিন শুকিয়ে যেতে থাকে,** গরম সহ্য করতে পারে না, **ক্ষুধা খুব বেশী, দ্রুত হাঁটার অভ্যাস,** দৌড়াতে ইচ্ছা হয়, লালাগ্রন্থি ও প্যানক্রিয়াসের রোগ, যে-সব রোগ অমাবশ্যা-পূর্ণমায় বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে আয়োডিয়াম খেতে হবে।

Sulphur : **গোসল করা অপছন্দ করে, গরম লাগে বেশী, শরীরে চুলকানী বেশী,** সকাল ১১টার দিকে ভীষণ খিদে পাওয়া, **পায়ের তালু-মাথার তালুতে জ্বালাপোড়া, মাথা গরম কিন্তু পা ঠান্ডা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে কোন খেয়াল নাই** ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে রোগীকে সালফার খাওয়াতে পারেন।

Mercurius solubilis : মার্ক সল ঔষধটির প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **প্রচুর ঘাম হয় কিন্তু রোগী আরাম পায় না,** ঘামে দুর্গন্ধ বা মিষ্টি গন্ধ থাকে, **কথার বিরোধীতা সহ্য করতে পারে না,** ঘুমের মধ্যে মুখ থেকে লালা ঝরে,

পায়খানা করার সময় কোথানি, পায়খানা করেও মনে হয় আরো রয়ে গেছে, **অধিকাংশ রোগ রাতের বেলা বেড়ে যায়,** রোগী ঠান্ডা পানির জন্য পাগল, ঘামের কারণে কাপড়ে হলুদ দাগ পড়ে যায় ইত্যাদি। উপরের লক্ষণগুলো থাকলে সাদাস্রাবেও মার্ক সল প্রয়োগ করতে পারেন।

Cinchona / China officinalis : অত্যধিক সাদাস্রাবের কারণে দুর্বলতা দেখা দিলে চায়না খাওয়াতে হবে। চায়নার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো মাথা ভারী ভারী লাগে, চোখের পাওয়ার কমে যায়, অল্পতেই বেহুঁশ হয়ে পড়া, কানের ভেতরে ভো ভো শব্দ হওয়া, মেজাজ **ভীষণ খিটখিটে, আলো-গোলমাল-গন্ধ সহ্য করতে পারে না,** হজমশক্তি কমে যাওয়া, **পেটে প্রচুর গ্যাস হওয়া** ইত্যাদি ইত্যাদি।

Hamamelis virginiana : **আক্রান্ত স্থানে তীব্র ব্যথা,** স্পর্শ করা যায় না, কালচে রঙের রক্তক্ষরণ, রক্তনালী রোগ, পাইলস, মাসিকের অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, দুই মাসিকের মধ্যবর্তী সময়ে রক্তক্ষরণ, অন্ডকোষে ব্যথা, **ডিম্বাশয়ে ব্যথা,** নাক থেকে রক্তক্ষরণ, দপদপানি মাথাব্যথা, বাতের ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে হেমামেলিস খেতে হবে।

☆ ইহা ছাড়াও Alumina (কোষ্টকাঠিন্য স্বভাব), Borax (নীচে নামতে ভয় পায়), Ammonium muriaticum (বুক ধড়ফড়ানি) প্রভৃতি ঔষধ খেতে পারেন।

**Contraception (জন্মনিয়ন্ত্রণ)ঃ-** সন্তান না চাইলে নিরাপদ সময় (safe period) মেনে সহবাস করুন যার পরিধি হলো মধ্যবর্তী এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট দিনগুলি। যেমন কারো যদি ৩০ দিন পরপর মাসিক হয়, তবে মধ্যবর্তী ১০ দিন হলো বিপজ্জনক সময়। এসময় সহবাস করলে গর্ভে সন্তান এসে যেতে পারে। পক্ষান্তরে মাসিক শুরু হওয়ার দিন থেকে প্রথম ১০ দিন এবং পরবর্তী মাসিক আরম্ভ হওয়ার পূর্ববর্তী ১০ দিন নিরাপদ সময়। তবে সতর্কতার জন্য প্রথম দিকের ৭ দিন এবং শেষের দিকের ৭ দিনকে নিরাপদ সময় ধরে নিতে পারেন। সেইফ পিরিয়ড পদ্ধতিটি কেবল তাদের জন্যই প্রযোজ্য যাদের মাসিক নিয়মিত হয়ে থাকে। হোমিওপ্যাথিতে জন্মনিয়নত্রণ করার জন্য Natrum muriaticum (শক্তি ২০০) ঔষধটি মাসিক শেষ হওয়ার পর মহিলারা রোজ একবার করে তিনদিন খান। তবে সপ্তাহখানেক কাঁচা লবণ, এবং টকজাতীয় খাবার বন্ধ রাখতে হবে। দুটো পদ্ধতিরই ৯৯% গ্যারান্টি আছে।

**Prostate gland Enlargement (প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধি) :** পুরুষদের পুরুষাঙ্গের গোড়ায় একটি গ্ল্যান্ড থাকে যাকে প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড বলে। সাধারণত বয়স চল্লিশ-পঞ্চাশ হলে এটি বড় হয়ে যায় এবং প্রস্রাব বের হতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। অনেক কোথানি দিয়ে প্রস্রাব করার পরও মনে হয় আরো প্রস্রাব রয়ে গেছে।

Sabal serrulata : হোমিওপ্যাথিতে প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের সবচেয়ে সেরা ঔষধ হরো এই সেবাল সেরু। এই ঔষধটিকে বলা হয় হোমিওপ্যাথিক ক্যাথিটার (catheter)। মোটামুটি প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের যে-কোন রোগই হোক না কেন, সেবাল সেরু তাকে নির্মূল করতে সক্ষম। সাধারণত নিম্নশক্তিতে ২০ ফোটা করে রোজ ২-৩ বার খান যত মাস দরকার।

Ferrum Picricum : ফেরাম পিক্রিক প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের আরেকটি চমৎকার ঔষধ। উপরের নিয়মে যত দিন প্রয়োজন খেতে পারেন।

☆ তাছাড়া কোনায়াম (Conium maculatum), সিমিসিফিউগা (Cimicifuga), চিমাফিলা (Chimaphila umbellata), থুজা (Thuja occidentalis) ইত্যাদি ঔষধও খেতে পারেন।

**Uterine prolapsus, Falling of the womb, prolapsed uterus (জরায়ু স্থানচ্যুতি, বিচ্যুতি, পতন) :** সাধারণত দুর্বলতা, অপারেশান, ডেলিভারীর সময় অত্যধিক চাপ পড়া ইত্যাদি কারণে নারীদের জরায়ু তলপেট থেকে বেরিয়ে বাইরে পড়ার রোগ হয়। তারপর দেখা যায়, কারো জরায়ু সারাক্ষণই বেরিয়ে থাকে আবার কারোটা পায়খানার সময় কোথানি দিলে বেরিয়ে পড়ে। তারপর ঠেলে ঠেলে ভেতরে ঢুকাতে হয়। মোটকথা এটা নারীদের জন্য একটা বিরাট বিরক্তিকর রোগ। এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা প্রথমে এই রোগ সারানোর জন্য ঠেস (pessaries) দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এই ঠেস দেওয়াতে আসলে এই রোগ সারে না এবং সারার সম্ভাবনাও খুব কম। ফলে তাদের শেষ সম্বল হলো অপারেশান / জরায়ু কেটে ফেলে দেওয়া। কিন্তু জরায়ু কেটে ফেলে দেওয়াতে আপনি অনেক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হবেন। অথচ হোমিওপ্যাথিতে কোন প্রকার ঠেস ছাড়া এবং অপারেশান ছাড়াই স্রেফ ঔষধেই এই রোগ সারানো যায়। হ্যাঁ, হোমিও ঔষধ খাওয়ার সময় অবশ্যই ঠেস (pessaries) খুলে রাখবেন।

Sepia officinalis : সিপিয়াকে বলা হয় ইউটেরাইন প্রলেপসের এক নাম্বার ঔষধ। সিপিয়ার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **পেশা এবং পরিবারের লোকজনদের প্রতিও উদাসীনতা**, রোগের গতি শরীরের নীচে থেকে উপরের দিকে, রোগী সবর্দা শীতে কাঁপতে থাকে, **পেটের ভিতরে চাকার মতো কিছু একটা নড়াচড়া করছে মনে হওয়া, পাইলস, পায়খানার রাস্তা বা জরায়ু ঝুলে পড়া (prolapse),** খাওয়া-দাওয়া ভালো লাগে না, **পায়খানার রাস্তা ভারী মনে হয়**, শিশুরা ঘুমানোর সাথে সাথেই বিছানায় প্রস্রাব করে দেয়, মুখের মেছতা (Chloasma), পুরুষাঙ্গের মাথার চারদিকে গোটা (condylomata), ঘনঘন গর্ভপাত (abortion), **যৌনাঙ্গে এবং পায়খানার রাস্তায় ভীষণ চুলকানি,** দীর্ঘদিনের পুরনো সর্দি, অল্পতেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে, দুধ হজম করতে পারে না, স্বভাবে কৃপন-লোভী, একলা থাকতে ভয় পায় ইত্যাদি ইত্যাদি। সাধারণত দশ হাজার শক্তিতে সপ্তাহে এক মাত্রা করে খান।

Platinum metallicum : অহংকারী সুন্দরী নারী, নিজেকে খুব বড় মনে করা, নিজেকে ব্যতীত সবকিছু তুচ্ছ মনে করা, সাংঘাতিক রকমের যৌন উন্মাদ, ঘনঘন পুরুষ সঙ্গী পাল্টায়, কেউ কেউ দৈনিক বিশ-পঞ্চাশবার যৌনকর্ম করে ইত্যাদি লক্ষণে প্লাটিনাম (Platinum metallicum) খাওয়াতে হবে।

Lilium tigrinum : লিলিয়াম টিগের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো যৌন শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া, মাথার মধ্যে পাগলের মতো উদ্ভট চিন্তা, আত্মহত্যার ইচ্ছা, শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নীচের দিকে টানতে থাকে, মনে **হয় পেটের সব কিছু যোনী দিয়ে বেরিয়ে যাবে, সারাক্ষণ তাড়াহুড়ার ভাব কিন্তু কেন তা জানে না,** ডিম্বাশয়ের ওপর মনোযোগ পড়ে থাকে (consciousness of the ovaries) , বুক ধড়ফড়ানি (fluttering), মনে **হয় শরীরের ভেতরের সবকিছু বের হওয়ার জন্য ঠেলতেছে,** মনে হয় মাথার মগজ চোখ এবং কানের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

Palladium : প্যালাডিয়ামের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো ডান ডিম্বাশয়ে (right ovary) ব্যথা, ব্যথা ঘন ঘন স্থান বদলায় এবং অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়, **মানুষের প্রশংসার জন্য পাগল,** মানুষের প্রশংসা পাওয়ার জন্য অনেক পরিশ্রম করেন, কাপড় খুলে ফেললে সারা শরীর চুলকাতে থাকে ইত্যাদি ।

☆ ইহা ছাড়াও আর্জেন্টাম মেটালিকাম (Argentum metallicum), আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম (Argentum nitricum), অরাম মেটালিকাম (Aurum metallicum), পালসেটিলা (Pulsatilla), রাস টক্স (Rhus toxicodendron) ইত্যাদি ঔষধের লক্ষণ থাকলে সেগুলোও খেতে পারেন।

## Varicose veins, varicosis, varices, Spider vein (রক্তনালী ফোলে যাওয়া) :-

সাধারণত রক্তনালীর প্রাচীরের / দেয়ালের স্থিতিস্থাপকতা কমে গেলে রক্তনালী ফুলে যায়, যাতে পরে ইনফেকশান হয়, ব্যথা হয় এবং পায়খানার রাস্তার রক্তনালী ফোলে গেলে পাইলসও হয়ে থাকে । এই রোগটি সাধারণত পায়ে, তলপেটে, পায়খানার রাস্তায় বেশী হয়ে থাকে । এই রোগের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো রোগী বেশী হাঁটলে বা ব্যায়াল করলেই ব্যথা শুরু হয় এবং রোগী অচল হয়ে পড়ে এবং বিশ্রাম নিতে বাধ্য হয় । এলোপ্যাথিতে এই রোগের কোন চিকিৎসা নাই ; ফোলা রগ ফেলে প্লাস্টিকের রগ লাগিয়ে দেওয়া হয় । কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে বেশ কিছু ভালো ঔষধ আছে কয়েক মাস খেলে ফোলা রগ ধীরে ধীরে আগের অবস্থায় চলে আসে ।

Ferrum phosphoricum (ফেরাম ফস) :-
ভেরিকজ ভেইনের সবচেয়ে ভালো ঔষধ হলো ফেরাম ফস । বার্নেটের মতে, এই ঔষধটি বয়স্ক / বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করে ।

Acidum fluoricum (এসিড ফ্লোর ) :-
এসিড ফ্লোর ভেরিকজ ভেইনের আরেকটি সেরা ঔষধ। বার্নেটের মতে, এই ঔষধটি যুবকদের ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করে ।

Hamamelis virginiana (হেমামেলিস) :-
হেমামেলিস নামক ঔষধটিও রক্তনালী ফোলার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ । বিশেষত যদি ইনফেকশান থাকে (প্রচণ্ড ব্যথা, লাল হয়ে যাওয়া, কালো হয়ে যাওয়া, স্পর্শ করতে না পারা ইত্যাদি), তবে প্রথমেই কিছু দিন হেমামেলিস খেয়ে নিবেন ।

## Vertigo, dizziness, giddiness (মাথা ঘুরানি) :-

মাথা ঘুরানি আসলে কোন রোগ নয় বরং এটি অন্যকোন রোগের একটি লক্ষণ মাত্র। মাথা ঘুরানি বলা হয় এমন অনুভুতিকে যাতে মনে হয় চারপাশের সবকিছু ঘুরছে এবং শরীরের ব্যালেন্স ঠিক থাকেনা। দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না এবং কখনও কখনও বসেও থাকা যায় না। কারো মাথা ঘুরালে সাথে সাথে বিছানায়, চেয়ারে অথবা ফ্লোরে বসে বা শুয়ে থাকা উচিত; অন্যথায় হঠাৎ পড়ে গিয়ে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

Conium maculatum : কোনায়ম হলো হোমিওপ্যাথিতে মাথা ঘুরানির এক নাম্বার ঔষধ। ইহার লক্ষণ হলো মনে হবে বিছানা এবং বাড়ি-ঘর সবকিছু বৃত্তাকারে ঘুরছে। এমনকি বিছানায় শোয়া অবস্থায়ও যদি মাথা একটু নাড়ায়, তাতেও ভীষণভাবে মাথা ঘুরতে থাকে।

Ambra grisea : এমব্রা গ্রিসিয়া ঔষধটি বৃদ্ধদের অথবা যারা অকাল বৃদ্ধদের মাথা ঘুরানিতে উপকার করে থাকে।

Iodium : আয়োডিয়াম ঔষধটি যারা অনেকদিন যাবত মাথাঘুরানিতে ভোগছেন অথবা ঘনঘন মাথাঘুরানিতে আক্রান্ত হন, তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বৃদ্ধদের মাথাঘুরানির ক্ষেত্রেও এটি একটি শ্রেষ্ট ঔষধ।

Ferrum metallicum : সাধারণত রক্তশূণ্যতার কারণে মাথা ঘুরালে ফেরাম মেট ঔষধটি ব্যবহৃত হয়। যেমন শোয়া থেকে হঠাৎ বসলে অথবা বসা থেকে হঠাৎ দাড়াঁলে মাথা ঘুরানো।

Cocculus indicus : সাধারণত পেটের কোন গোলমালের কারণে যদি মাথা ঘুরায়, তবে ককুলাস ইন্ডিকাস প্রযোজ্য। সাথে বমিবমি ভাব এবং মাথা ব্যথা থাকতে পারে। সমুদ্র ভ্রমণ এবং রাত্রি জাগরণের কারণে মাথা ঘুরানিতে এটি উপকারী।

## Weight, increasing (ওজন বৃদ্ধি করা) :-

যারা তাদের শারীরিক ওজন বৃদ্ধি করতে চান, তারা আমার নির্দেশনা মতো নীচের তিনটি ঔষধ সেবন করুন।

(1) Alfalfa Q

(এই হোমিও ঔষধটি প্রতিদিন সকালে ২০ ফোটা করে ৩ মাস অথবা আরো বেশী দিন খান- আধা গ্লাস পানির সাথে মিশিয়ে)।

(2) Kali phos 3x

(এই হোমিও ঔষধটি প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ বড়ি করে ৩ মাস অথবা আরো বেশী দিন খান)।

(3) Zincum metallicum 200

(এই হোমিও ঔষধটি ১ ফোটা / ১০ বড়ি করে দুই মাস পরপর একবার খান এবং এই নিয়মে ৪ মাসে ২ বার খান। )

**Worm, helminth (কৃমি, চিড়) :** সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ক্রিমি একটি বড় বাধা। ক্রিমির কারণে এলার্জি বা চুলকানি, রক্তশূণ্যতা, কোষ্টকাঠিন্য বা শক্ত পায়খানা, পেট ব্যথা, দুর্বলতা, পেট ফাঁপা, বদমেজাজ প্রভৃতি রোগ হয়ে থাকে। শিশুরা যখন পায়খানার রাস্তায় আঙুল দিয়ে খোচাতে থাকে, তখন তাকে ক্রিমির ঔষধ খাওয়ানো উচিত। ক্রিমি থাক বা না থাক, শিশুদের প্রতি ছয়মাস পরপর অবশ্যই ক্রিমির ঔষধ খাওয়ানো উচিত। ক্রিমির ঔষধ এক বা দুই মাত্রা খাওয়ানোই যথেষ্ট, তবে প্রয়োজনে আরো কয়েক মাত্রা খাওয়ানো যেতে পারে।

সমপ্রতি এলোপ্যাথিক কৃমির ঔষধ খেয়ে আমাদের দেশের অনেকগুলি নিষপাপ শিশুর করুণ মৃত্যু হয়েছে মর্মে জাতীয় দৈনিকগুলোতে সংবাদ বেড়িয়েছে। এলোপ্যাথিক কৃমির ঔষধ খেলে কেনো প্রায়ই শিশুদের মৃত্যু ঘটতে দেখা যায়, তার কারণ আমাদের অনেকেই জানি না। প্রথম কথা হলো কৃমিও একটি প্রাণী, আবার শিশুরাও প্রাণী। কাজেই যে ঔষধের কৃমি হত্যা করার ক্ষমতা আছে, সে ঔষধ শিশুদেরকেও হত্যা করার ক্ষমতা রাখে। সুস্থ-সবল শিশুকে না পারলেও অসুস্থ-দুর্বল শিশুকে খুন করার ক্ষমতা তার আছে। এই সহজ সত্যটি আমাদের বুঝতে হবে। দ্বিতীয় কথা হলো আসলে ঔষধ মাত্রই বিষ। ঔষধ এবং বিষের মধ্যে পার্থক্য হলো মাত্রা। মাত্রার মধ্যে থাকলেই ঔষধ আর মাত্রার চাইতে বেশী হলেই সেটি হয়ে যায় বিষ। আবার মাত্রা নিয়েও আছে মানুষ ভেদে পার্থক্য। একই মাত্রার ঔষধে একজন মানুষের রোগ সারাতে পারে আরেকজনের উল্টো ক্ষতি করতে পারে। এটা হয়ে থাকে ঔষধের প্রতি মানুষের সেনসিটিভিটির তারতম্য অনুযায়ী। একটি ঔষধের প্রতি কোন একজন মানুষ কম সেনসেটিভ হতে পারে আবার অন্য একজন বেশী সেনসিটিভ হতে পারে। এক্ষেত্রে যে ঔষধের প্রতি একজন মানুষ বেশী সেনসেটিভ, সেই ঔষধ সঠিক মাত্রায় খেলেও সেই ব্যক্তির বড় ধরণের সর্বনাশ হতে পারে ; এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। অধিকাংশ মানুষের ঔষধ খাওয়ার বদভ্যাস দেখলে মনে হয়, এ যেন ঔষধ নয় বরং পহেলা বৈশাখের পান্তা ভাত। এমনভাবে তারা ঔষধ খায় যেন, মনে হয় ঔষধ কেবল উপকারই করে ; কস্মিনকালেও ক্ষতি করে না। ঔষধ যে ক্ষতি করতে পারে, এ যেন তাদের কল্পনার বাইরে। আর বিশেষ করে মাগনা পেলে তো কথাই নাই।

এলোপ্যাথিক কৃমির ঔষধগুলি কিভাবে কৃমি হত্যা করে ? এসব ঔষধকে বলা হয় বলা হয় স্পিন্ডল বিষ (spindle poison) । এগুলো কৃমির শরীরকে অবশ বা প্যারালাইজড করে দেয়। ফলে কৃমিরা নড়াচড়া করতে পারে না। এমনকি তারা কিছু খেতে পারে না এবং যা খেয়েছে তাও হজম করতে পারে না। ফলে কৃমিগুলো মরে পায়খানার সাথে বেরিয়ে যায়। একইভাবে এই ঔষধগুলো শিশুদের হৃৎপিন্ড এবং মস্তিষ্ককে প্যারালাইজড করে হত্যা করতে পারে। এজন্য ডাক্তাররা গর্ভবতী মহিলাদেরকে কৃমির ঔষধ খেতে নিষেধ করেন। কেননা এগুলো গর্ভস্থ শিশুকে হত্যা করতে পারে।

পরিশেষে সকলের প্রতি আমার পরামর্শ থাকবে, কৃমির হাত থেকে নিজেকে এবং আপনার সন্তানকে বাঁচানোর জন্য হোমিও ঔষধ খান। টিউক্রিয়াম (teucrium), স্যাবাডিলা (Sabadilla), নেট্রাম ফস (Natrum phos) প্রভৃতি হোমিও ঔষধগুলো কৃমি দূর করতে খুবই কার্যকরী এবং নিরাপদ ঔষধ। এমনকি এগুলো গর্ভবতীদেরকেও খাওয়ানো যায় ; কোনো বিপদের সম্ভাবনা নাই। হোমিও ঔষধগুলো কৃমিকে প্যারালাইজড করে না, তাই আপনার শিশুকেও প্যারালাইজড করে মেরে ফেলার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই। হোমিও ঔষধে সম্ভবত কৃমিদের শরীরে জ্বালা-পোড়ার সৃষ্টি হয়ে থাকে ; ফলে কৃমিরা মারা পড়ে না বরং জীবিতই পায়খানার সাথে বেরিয়ে যায়। এই ঔষধগুলোর যে-কোন একটিকে ৩০ (ত্রিশ) শক্তিতে খেতে পারেন এবং প্রতিবার এক ফোটা করে অথবা বড়িতে খেলে ১০ (দশ) টি বড়ি করে খাওয়া উচিত। প্রয়োজনে রোজ দুইবেলা করে দুই-তিন দিন খেতে পারেন। সাধারণত একমাত্রাই যথেষ্ট। হ্যাঁ, এই হোমিও ঔষধগুলোর তেমন কোন ক্ষতিকর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নাই ; কারণ এগুলোতে ঔষধের পরিমাণ থাকে খুবই কম। এমনটি ভুলবশত যদি নির্দিষ্ট মাত্রার চাইতে দশ গুণ বেশীও কেউ খেয়ে ফেলেন, তাতেও কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই। আবার অনেকে এমন আছেন যে, তাদের সারাজীবনই কৃমির সমস্যা লেগে থাকে এবং কিছুদিন পরপরই তাদের কৃমির ঔষধ খেতে হয়। এসব ক্ষেত্রে একজন হোমিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। কেননা কিছু হোমিও ঔষধ আছে, যেগুলো রোগীর শারীরিক-মানসিক গঠন বুঝে প্রয়োগ করলে বেশী বেশী কৃমি হওয়ার টেনডেন্সী সারাজীবনের জন্য চলে যায়।

Teucrium Marum verum : গুড়া ক্রিমি বা সুতা ক্রিমির সবচেয়ে ভালো এবং নিরাপদ ঔষধ হলো টিউক্রিয়াম। পায়খানার রাস্তায় ভীষণ চুলকানি থাকে।

Spigelia anthelmia : হ্যানিম্যানের সময় স্পাইজেলিয়া কৃমির এলোপ্যাথিক এবং কবিরাজি ঔষধরূপে পরিচিত ছিল। হ্যানিম্যান যখন এটি দিয়ে হোমিও ঔষধ তৈরী করে পরীক্ষা করলেন, তখন দেখলেন যে কৃমির ঔষধ হিসাবে তার সুনামের বিষয়টি সঠিক। এটি সব ধরনের কৃমি, এমনকি ফিতাকৃমি পর্যন্ত নির্মূল করতে পারে। অবশ্য কৃমির সমস্যা ছাড়াও হোমিওপ্যাথিতে এটি আরও অনেক রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। তার মধ্যে একটি বড় রোগ হলো মাইগ্রেন বা অর্ধেক মাথা ব্যথা।

Sabadilla officinarum : স্যাবাডিলাকে বলা যায় ক্রিমির সবচেয়ে উৎকৃষ্ট একটি ঔষধ। স্যাবাডিলা ঔষধটি ছোট মেয়ে শিশুদের খাওয়ানো উচিত নয়; কেননা সেবাডিলা ঔষধটি খাওয়ার পরে কৃমিরা পাগলের মতো দৌঁড়াতে শুরু করে এবং এসময় তারা মেয়েদের যোনী এবং জরায়ুতে ঢুকে পড়ে মারাত্মক বিপদের সৃষ্টি করতে পারে।

Natrum Phosphoricum : নেট্রাম ফস শিশুদের কৃমির জন্য সেরা ঔষধগুলোর অন্যতম। পাশাপাশি এটি শিশুদের অজীর্ণ, বদহজম, এলার্জি, চুলকানি, পেটে ব্যথা, সর্দি, চোখ ওঠা ইত্যাদি সমস্যার জন্যও একটি সেরা ঔষধ। এটি শিশুদের জন্য একটি ভিটামিন হিসেবেও কাজ করে থাকে। (এই ঔষধটিও ছোট মেয়ে শিশুদের খাওয়ানো উচিত নয়।)

Cina : বদমেজাজী শিশুদের ক্রিমির সমস্যায় সিনা একটি শ্রেষ্ট ঔষধ। শিশুরা আঙুল দিয়ে নাক খোচাতে থাকে এবং ঘুমের মধ্যে দাঁত কটমট করে।

Santoninum : সেন্টোনিনাম গুড়া ক্রিমি এবং সুতা ক্রিমির সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত ঔষধ।

Caladium seguinum : গুড়া ক্রিমি ছোট মেয়েদের যৌনাঙ্গে ঢুকে উৎপাত সৃষ্টি করলে ক্যালাডিয়াম খাওয়াতে ভুলবেন না।

Indigo : ইন্ডিগো কৃমির উৎপাতের ক্ষেত্রে একটি ভালো ঔষধ। কৃমির কারণে মৃগীর আক্রমণ, খিচুঁনি অথবা জ্বর হলে ইন্ডিগো ব্যবহার করতে পারেন।

Carcinosinum : যাদের ঘনঘন কৃমি হয় অর্থাৎ যাদের কৃমির সমস্যা খুব বেশী, তাদের কৃমি প্রবনতা দূর করার জন্য কার্সিনোসিন (শক্তি ২০০) পনের দিনে একমাত্রা করে চার বার খান। ক্যান্সারের ঔষধ কার্সিনোসিনে যেহেতু কৃমি নিরাময় হয়, সেহেতু বলা যায় মাত্রাতিরিক্ত কৃমির উৎপাত ক্যান্সারের একটি পূর্ব লক্ষণ।

Calcarea Carbonica : মোটা থলথলে শারীরিক গঠন, পা সব সময় ঠান্ডা থাকে, শিশুকালে দাঁত উঠতে বা হাঁটা শিখতে দেরী হয় থাকে, **শরীরের চাইতে পেট বেশী মোটা, খুব সহজে মোটা হয়ে যায়, প্রস্রাব-পায়খানা-ঘাম সব কিছু থেকে টক গন্ধ আসে, হাতের তালু মেয়েদের হাতের মতো নরম** (মনে হবে হাতে কোন হাড়ই নেই), মাথার ঘামে বালিশ ভিজে যায়, মুখমন্ডল ফোলাফোলা, ডিম খেতে খুব পছন্দ করে ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে ক্যালকেরিয়া কাব হবে তার সবচেয়ে উত্তম ক্রিমির ঔষধ।

Sulphur : সালফার একটি বহুমুখী ক্ষমতা সম্পন্ন ঔষধ। **গোসল করা অপছন্দ করে, গরম লাগে বেশী, শরীরে চুলকানী বেশী,** সকাল ১১টার দিকে ভীষণ খিদে পাওয়া, **পায়ের তালু-মাথার তালুতে জ্বালাপোড়া, মাথা গরম কিন্তু পা ঠান্ডা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে কোন খেয়াল নাই** ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে রোগীকে সালফার খাওয়াতে পারেন।

Terebinthina : টেরিবিনথিনা ক্রিমির একটি সেরা ঔষধ। পাশাপাশি এটি সর্দি, গ্যাসট্রিক আলসার এবং লো প্রেসারেরও চিকিৎসায় সফলতার সাথে ব্যবহৃত হয়।

## Over-nursing (স্তন্যদান জনিত অসুখ) :-

শিশুকে দীর্ঘদিন যাবত বুকের দুধ খাওয়ার কারণে স্তন্যদানকারী মায়েদের বেশ কিছু সমস্যা হতে পারে। যেমন- পিঠে খিল ধরা ব্যথা, ক্লান্তি বা দুর্বলতা, মাথা ঘুরানি, আরামহীন ঘুম, চোখে ঝাপসা দেখা, ক্ষুধাহীনতা, শ্বাসকষ্ট, বুক ধড়ফড়ানি ইত্যাদি। এই সব সমস্যার সাথেও স্তন্যদান চালিয়ে যেতে থাকলে এক সময় সে ফ্যাকাসে হয়ে পড়ে, শীণ বা চিকন হয়ে পড়ে, রাতে ঘাম দেয়, হাটু ফুলে যায় এবং নার্ভাসনেস দেখা দেয়। সাধারণত ঘনঘন বা বেশী বেশী বুকের দুধ খাওয়ানো, জন্মগত শারীরিক দুর্বলতা, অপুষ্টি, রক্তক্ষরণ, গর্ভপাত, সাদাস্রাব, অতিরিক্ত পরিশ্রম ইত্যাদি নানা কারণে এই সমস্যাগুলো হতে পারে।

**China officinalis :** চায়না বা সিনকোনা নামক ঔষধটি ক্ষয়জনিত দুর্বলতা বা যে-কোন রোগ নিরাময়ে একটি শ্রেষ্ট ঔষধ। যেমন - অত্যধিক স্তন্যদান, অত্যধিক রক্তক্ষরণ, অত্যধিক বীর্যপাত, অত্যধিক ঋতুস্রাব, অত্যধিক পাতলা পায়খানা, অত্যধিক সাদাস্রাব, অত্যধিক বমি ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে দুর্বলতা দেখা দিলে বা অন্য যে-কোন রোগ দেখা তাতে প্রথমেই চায়নার কথা মনে রাখবেন।

**Alfalfa :** আলফালফা ঔষধটি নিয়মিত অনেকদিন খেলে ক্ষুধা, ঘুম, ওজন, হজমশক্তি ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। নিম্নশক্তিতে (Q) দশ ফোটা করে রোজ তিনবার করে খেতে পারেন। দ্রুত ওজন বাড়াতে চাইলে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ-ষাট ফোটা করে খেতে পারেন। তবে কোন সমস্যা হলে কমিয়ে খাওয়া উচিত। ইহার স্বাদ যেহেতু খারাপ সেহেতু শিশুদেরকে চিনি বা গুড়ের সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে পারেন।

**Phosphoricum acidum : শোক, দুঃখ, বিরহ, প্রেমে ব্যর্থতা, মারাত্মক ধরণের অসুখে (যেমন-টাইফয়েড) ভোগে শরীরের বারোটা বেজে যাওয়া, মাত্রাতিরিক্ত যৌনকর্ম, হস্তমৈথুন, স্বপ্নদোষ** ইত্যাদি কারণে যে-কোন রোগ হলে, তাতে ফসফরিক এসিড ঔষধটি খেতে হয়। ফসফরিক এসিডের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো নির্বোধের মতো অর্থাৎ বোধশক্তিহীনের মতো পড়ে থাকে, মনে হয় গভীর ঘুমে অচেতন কিন্তু ডাকলে সে হুশ ফিরে পায়, প্রচুর পাতলা পায়খানায়ও শরীর দুর্বল হয় না, রাতের বেলা ঘনঘন প্রস্রাব, গলা শুকিয়ে থাকে, কথা বললে-কাশলে-অনেকক্ষণ বসে থাকলে বুকে দুর্বল লাগে, মাথার তালুতে-কপালে-বুকের ওপর ভারী ভারী লাগে, অত্যধিক গ্যাস জমে পেট ফেঁপে থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি।

**Kali phosphoricum :** ক্যালি ফস দুর্বলতার একটি সেরা ঔষধ। বিভিন্ন কঠিন রোগ ভোগ, অত্যধিক শারীরিক-মানসিক পরিশ্রম, অপুষ্টি, দীর্ঘদিন যাবত স্তন্যদান করা ইত্যাদির মাধ্যমে সৃষ্ট দুর্বলতায় (বা অন্যকোন রোগে) ক্যালি ফস খেতে হয়। মাঝে মাঝে সপ্তাহ খানেক বিরতি দিয়ে দীর্ঘদিন খান। হৃদপিন্ড, স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের উপর ইহার প্রশান্তিকারক ক্রিয়া বিদ্যমান। তাছাড়া যেহেতু এটি একটি ভিটামিন জাতীয় ঔষধ, তাই ইহার কোন ক্ষতিকর সাইড-ইফেক্ট নাই বললেই চলে।

**Ferrum phosphoricum :** ফেরাম ফসের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো সাধারণত জ্বর, ব্যথা, থেতলানো, মচকানো, বাতের ব্যথা, কাধেরঁ জয়েন্টের ব্যথা, ব্যথা শরীরের নীচ থেকে উপরের দিকে যায়, রক্তশূণ্যতা, টকটকে লাল রঙের রক্তক্ষরণ, যে-কোন ইনফেকশান / প্রদাহের শুরুতে, রক্তনালীর রোগ, যক্ষা, হজমশক্তি দুর্বলতা, ঘনঘন ডায়েরিয়ার আক্রমণ, রোগীর শারীরিক গঠন মোটা-থলথলে, রাতের বেলা রোগের মাত্রা বেড়ে যায়, বিশ্রাম করলে রোগের মাত্রা কমে যায়, নড়াচড়া করলে রোগের মাত্রা বেড়ে কিন্তু আস্তে নড়াচড়া করলে আরাম লাগে ইত্যাদি ইত্যাদি।

Helonias dioica : হেলোনিয়াস ডাইওইকার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো মনটা সর্বদা জরায়ুর উপর পড়ে থাকে, জরায়ু টনিক / ভিটামিন, জরায়ু পেশী ঢিলেঢালা ভাব, জরায়ুর স্থানচ্যুতি (uterine misplacements), জরায়ুর পতন (uterine prolapse), ভীষণ মনখারাপ, সাংঘাতিক বদমেজাজ ইত্যাদি ইত্যাদি।

## Mastitis, Gathered breast, mammary abscess (স্তনে প্রদাহ, স্তনে ফোড়া) :

স্তনে প্রদাহ বা ইনফেকশান বা ফোড়া একটি মারাত্মক ইমারজেন্সী সমস্যা বিশেষত যদি দুগ্ধপোষ্য শিশু থাকে। তাছাড়া এতে যে রকম মারাত্মক ব্যথা হয়, সেই কারণেও একে একটি ইমারজেন্সী সমস্যারূপে ট্রিট করা উচিত। ব্যথার পাশাপাশি তীব্র জ্বর, মাথা ঘুরানি ইত্যাদিও থাকতে পারে। সে যাক, এই রোগে ঔষধ যতটা সম্ভব উচ্চ শক্তিতে এবং ঘনঘন খাওয়ানো উচিত, যাতে ফোড়া হতে না পারে। অর্থাৎ পাকতে না পারে।

Phytolacca decandra : ফাইটোলেক্কা ঔষধটি স্তন প্রদাহের একটি সেরা ঔষধ। এটি যতটা সম্ভব উচ্চ শক্তিতে দুয়েক ঘন্টা পরপর খান যত বার অথবা যত দিন লাগে।

Bryonia alba : ব্রায়োনিয়া স্তন প্রদাহের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ। ব্রায়োনিয়ার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো **রোগীর ঠোট-জিহ্বা-গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে,** প্রচুর পানি পিপাসা থাকে, রোগী অনেকক্ষণ পরপর একসাথে প্রচুর ঠান্ডা পানি পান করে, **নড়াচড়া করলে রোগীর ব্যথা-কষ্ট বৃদ্ধি পায়,** রোগীর মেজাজ খুবই বিগড়ে থাকে, **কোষ্টকাঠিন্য দেখা দেয় অর্থাৎ পায়খানা শক্ত হয়ে যায়,** প্রলাপ বকার সময় তারা সারাদিনের পেশাগত কাজের কথা বলতে থাকে অথবা বিছানা থেকে নেমে বাড়ি যাওয়ার কথা বলে, শিশুদের কোলে নিলে তারা বিরক্ত হয়, মুখে সবকিছু তিতা লাগে ইত্যাদি ইত্যাদি।

☆ এই দুইটি ঔষধ ছাড়াও অন্য কোন ঔষধের লক্ষণ পাওয়া গেলেও সেটি খাওয়াতে পারেন।

## Yellow fever (ইয়েলো ফিভার, পীত জ্বর) :

এটি একটি ভাইরাস ঘটিত (RNA virus) রক্তক্ষরণজনিত মারাত্মক রোগ। আমাদের দেশের কয়েকটি জেলায় এই রোগের উৎপাত । অগণিত লোক এই রোগে আক্রান্ত হয়ে ভবলীলা সাঙ্গ করে। কেননা এলোপ্যাথিতে এই রোগের ভাল চিকিৎসা নাই । না জানার কারণে অনেকেই হোমিও চিকিৎসা নিতে আসেন না। অথচ হোমিও চিকিৎসায় এই রোগ খুব সহজেই নিরাময় করা যায়। সাধারণত এডিস মশার (Aedes aegypti) কামড়ের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়। অধিকাংশ কেইস হালকা ইনফেকশান নিয়ে প্রকাশ পায়, জ্বর, মাথাব্যথা, শীতবোধ, পিঠব্যথা, বমিবমি ভাব, খাবারে অরুচি ইত্যাদি সাধারণত তিন-চার দিনের মধ্যেই চলে যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে শতকরা ১৫ ভাগ ক্ষেত্রে কিছুদিনের মধ্যে পুণরায় জ্বর ফিরে আসে এবং লিভার নষ্ট হওয়ার কারণে সাথে থাকে জন্ডিস এবং পেট ব্যথাও থাকে। তারপর মুখ থেকে, চোখ থেকে এবং পাকস্থলী-খাদ্যনালী থেকে রক্তক্ষরণ হয়। পেটের রক্ত সাধারণত খাবারের সাথে মিশে বমির সাথে বের হয়, ফলে বমির রঙ হয় কালো (black vomit)। আর পীত জ্বরের প্রধান লক্ষণই হলো কালো বমি (black vomit)।

Cadmium Sulphuratum : পাকস্থলীর ওপর এই ঔষধটির একশান দারুন, জ্বালাপোড়া, ছুরিমারা, কেটে ফেলার মতো ব্যথা, সাংঘাতিক ঢেকুর, হেচকি, দম আটকে আসা, মুখ দিয় আঠালো মিউকাস বের হওয়া, রোগী চুপচাপ থাকতে চায়, মারাত্মক বমিবমি ভাব এবং বমি ইত্যাদি লক্ষণ থাকার কারণে এটি ইয়েলো ফিভারে সাফল্যের সাথে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

Aconitum napellus : রোগ **যদি হঠাৎ শুরু হয় এবং শুরু থেকেই মারাত্মকরূপে দেখা দেয় অথবা দুয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেটি মারাত্মক আকার ধারণ করে**, রোগী রোগের যন্ত্রণায় একেবারে অস্থির হয়ে পড়ে, রোগের উৎপাত এত বেশী হয় যে তাতে **রোগী মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে,** রোগী ভাবে সে এখনই মরে যাবে।

Arsenicum album : রোগীর মধ্যে **প্রচণ্ড অস্থিরতা (অর্থাৎ রোগী এক জায়গায় বা এক পজিশনে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। এমনকি গভীর ঘুমের মধ্যেও সে নড়াচড়া করতে থাকে।**), **শরীরের বিভিন্ন স্থানে ভীষণ জ্বালা-পোড়া ভাব, অল্প সময়ের মধ্যেই রোগী দুর্বল-কাহিল-নিস্তেজ হয়ে পড়ে,** রোগীর বাইরে থাকে ঠান্ডা কিন্তু ভেতরে থাকে জ্বালা-পোড়া, অতিমাত্রায় মৃতুভয়, **রোগী মনে করে ঔষধ খেয়ে কোন লাভ নেই- তার মৃত্যু নিশ্চিত**, গরম পানি খাওয়ার জন্য পাগল কিন্তু খাওয়ার সময় খাবে দুয়েক চুমুক ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে আর্সেনিক খাওয়াতে হবে।

Bryonia alba : **রোগীর ঠোট-জিহ্বা-গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে,** প্রচুর পানি পিপাসা থাকে, রোগী অনেকক্ষণ পরপর একসাথে প্রচুর ঠান্ডা পানি পান করে, **নড়াচড়া করলে রোগীর কষ্ট বৃদ্ধি পায়,** রোগীর মেজাজ খুবই বিগড়ে থাকে, **কোষ্টকাঠিন্য দেখা দেয় অর্থাৎ পায়খানা শক্ত হয়ে যায়,** প্রলাপ বকার সময় তারা সারাদিনের পেশাগত কাজের কথা বলতে থাকে অথবা বিছানা থেকে নেমে বাড়ি যাওয়ার কথা বলে, শিশুদের কোলে নিলে তারা বিরক্ত হয়, মুখে সবকিছু তিতা লাগে ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে ব্রায়োনিয়া খাওয়াতে হবে।

Carbo vegetabilis : খাবার পেটের মধ্যে পচেঁ যায় (মানে হজম হয় না), মারাত্মক ইনফেকশান বা সেপটিক অবস্থা, আলসার, রক্তে অক্সিজেনের ঘাটতিজনিত অবস্থা, সাংঘাতিক দুর্বলতা, জ্বালাপোড়া, পেটে এতো গ্যাস হয় যে মনে হয় পেট ফেটে যাবে, গ্যাসের কারণে পেটব্যথা, খুব জোরে ফ্যানের বাতাস চায় ইত্যাদি ইত্যাদি লক্ষণে কার্বো ভেজ প্রযোজ্য।

Crotalus horridus : পানির মতো একেবারে পাতলা রক্তক্ষরণ এবং হলুদ চামড়া - এই দুইটি লক্ষণ থাকলে ক্রোটেলাস খাওয়াতে পারেন। ক্রোটেলাস পীতজ্বরের একটি সেরা ঔষধ । আবার ইয়েলো ফিভার থেকে বাঁচার জন্যও (prophylactic) প্রতিষেধকক্রোটেলাস খেতে পারেন। আপনার মহল্লায় ইয়েলো ফিভার দেখা দিলে সপ্তাহে এক মাত্রা করে খান, তাহলে আর তাতে আক্রান্ত হবেন না।

Phosphorus : এই রোগীরা খুব দ্রুত লম্বা হয়ে যায় (এবং এই কারণে হাঁটার সময় সামনের দিকে বেঁকে যায়), অধিকাংশ সময় রক্তশূণ্যতায় ভোগে, রক্তক্ষরণ হয় বেশী, অল্প একটু কেটে গেলেই তা থেকে অনেকক্ষণ রক্ত ঝরতে থাকে, **রোগী বরফের মতো কড়া ঠান্ডা পানি খেতে চায়,** মেরুদন্ড থেকে মনে হয় তাপ বেরুচ্ছে, একা থাকতে ভয় পায়, **হাতের তালুতে জ্বালাপোড়া** ইত্যাদি ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে ইয়েলো ফিভারে ফসফরাস প্রয়োগ করতে হবে।

# স্যামুয়েল হ্যানিম্যান

## আজ পযর্ন্ত পযর্ন্ত জন্ম নেওয়া পৃথিবীর সবর্শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞানী (Samuel Hahnemann - the greatest medical scientist ever born) :-

রোগ-
ব্যাধিতে আক্রান্ত অসুস্থ মানুষের মর্মান্তিক বেদনাকে যিনি নিজের হৃদয় দিয়ে সবচেয়ে বেশী উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাঁর নাম স্যামুয়েল হ্যানিম্যান। প্রচলিত চিকিৎসা বিজ্ঞানসমূহের ইতিহাস নিয়ে যারা ব্যাপক পড়াশুনা করেছেন, তারা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, তিনি ছিঁলেন পৃথিবীতে আজ পযর্ন্ত জন্ম নেওয়া সর্বশ্রেষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানী। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কারক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান কেবল একজন শ্রেষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানীই ছিলেন না; একই সাথে তিনি ছিলেন মানব দরদী একজন বিশাল হৃদয়ের মানুষ, একজন মহাপুরুষ, একজন শ্রেষ্ট কেমিষ্ট, একজন পরমাণু বিজ্ঞানী, একজন শ্রেষ্ট চিকিৎসক, একজন অণুজীব বিজ্ঞানী, একজন শ্রেষ্ট ফার্মাসিষ্ট, একজন সংস্কারক, একজন বহুভাষাবিদ, একজন দুঃসাহসী সংগঠক, একজন অসাধারণ অনুবাদক, একজন নেতৃপুরুষ, একজন বিদগ্ধ লেখক, একজন সত্যিকারের ধার্মিক ব্যক্তি, একজন পরোপকারী-
ত্যাগী মানব, একজন সুযোগ্য শিক্ষক, একজন আদর্শ পিতা, একজন রোমান্টিক প্রেমিক। আজ থেকে দুশ বছর পূর্বে হ্যানিম্যানের সময় এলোপ্যাথিক চিকিৎসা ছিল চরম বর্বরতার সমতুল্য। তখনকার দিনের এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা উচ্চ রক্তচাপসহ
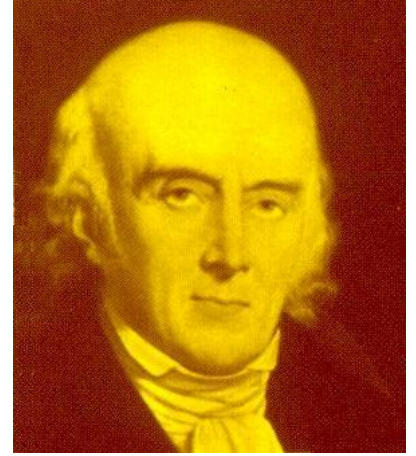
অধিকাংশ রোগের চিকিৎসার জন্যই রোগীর শরীরে অনেকগুলো জোঁক লাগিয়ে দিতো রক্ত কমানোর জন্য অথবা রগ কেটে রক্ত বের করত, মানসিক রোগীকে ভুতে ধরেছে মনে করে পিটিয়ে লাশ বানিয়ে ফেলত, একটি রোগের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে পনের থেকে বিশটি ঔষধ রোগীকে একত্রে খাওয়ানো হতো, সামান্য থেকে সামান্য ব্যাপারেও শরীরে ছুরি চালানো হতো ইত্যাদি ইত্যাদি।

হ্যানিম্যান কিন্তু অন্যান্য ডাক্তারদের মতো ডাক্তারী পাশ করে অর্থ উপার্জনের পেছনে লেগে যান নাই; বরং চিকিৎসার নামে এসব বর্বরতা থেকে মানবজাতিকে কিভাবে মুক্ত করা যায় তা নিয়ে যুগের পর যুগ গবেষণা করেছেন। এজন্য তাকে অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট, অপমান-লাঞ্ছনা, হুমকি-
ধামকি, দেশ থেকে বহিষ্কার প্রভৃতি অনেক অনেক ভোগানি- সহ্য করতে হয়েছে কিন্তু তারপরও তিনি পিছপা হননি। ফলে রোগের উৎপত্তি, রোগের বিকাশ, রোগের চিকিৎসা, ঔষধ আবিষ্কার, ঔষধ পরীক্ষাকরণ, ঔষধ প্রস'ত প্রণালী, ঔষধের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে তিনি এমন অনেকগুলো বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হন

; গত দুইশ বছরেও যার চাই উৎকৃষ্ট কিছু আবিষ্কার করা কোন চিকিৎসা বিজ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তিনি এমন এ কটি চিকিৎসা বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছিলেন যাতে বাদশা থেকে ভিক্ষুক কাউকেই টাকার অভাবে বিনা চিকিৎসায় মরতে না হয়। ডাক্তারদের মধ্যে পেশাগত অহমিকা, লোভ, হিংসা ইত্যাদি যে কত বেশী মাত্রায় আছে, তার প্রমাণ হলো হোমিওপ্যাথি ক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কার। রোগীকে কম কষ্ট দিয়ে, কম খরচে এবং কম সময়ের মধ্যে রোগ নিরাময়ের স্বার্থে চিকি ৎসা বিজ্ঞানের এই অমূল্য আবিষ্কারকে যেখানে সকল চিকিৎসকের সাদরে গ্রহন করা উচিত ছিল, সেখানে দেখা গেছে বে শীর ভাগ ডাক্তারই হ্যানিম্যানের এই অমূল্য আবিষ্কারকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞান এলোপ্যাথি এবং হোমি ওপ্যাথি নামে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, ইউরোপে এবং আমেরিকায় এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা প্রথম যখন সমিতি গঠন করেছিল, তখন তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর বুক থেকে
(একটি মানবতাবাদী চিকিৎসা বিজ্ঞান) হোমিওপ্যাথিকে নিশ্চিহ্ন করা। বাণিজ্যের কাছে সেবাধর্ম কিভাবে পরাজিত হয়, এসব ইতিহাস সবারই জানা থাকা উচিত।

মহাত্মা স্যামুয়েল হ্যানিম্যান ১৭৫৫ সালের ১১ই এপ্রিল জার্মানীর স্যাক্সোনি প্রদেশের মেইসেন শহরে জন্মগ্রহন করে ন, যার অবস্থান ড্রিসডেন শহরের বিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে
(পোল্যান্ড এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার বর্ডারের কাছে)। তাঁর পুরো নাম ছিল ক্রিস্টিয়ান ফ্রেডরিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান
(Christian Friedrich Samuel
Hahnemann)। তাঁর পিতার নাম ছিল ক্রিস্টিয়ান গটফ্রাইড হ্যানিম্যান এবং মাতার নাম ছিল জোহান্না ক্রিস্টিয়ানা। তৎকা লে মেইসেন শহরটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর কেননা ইহার চার হাজার অধিবাসীর অধিকাংশই ছিল দক্ষ শিল্পী, রসায়ন বিদ এবং চিত্রকর। তাছাড়া এই শহরে ছিল একটি বিজ্ঞান একাডেমী, অনেকগুলো কাপড়ের কারখানা এবং ছিল তখনকার দিনের নতুন আবিষ্কার চীনা মাটির আসবাপত্রের একটি ফ্যাক্টরী। সিরামিকের এই কারখানাটি ছিল পুরনো পরিত্যক্ত একটি রাজ প্রসাদে অবসি'ত। হ্যানিম্যানের পিতা চীনা মাটির থালা-
বাসনের ওপর ছবি এঁকে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সেই সব দিনে সিরামিকের তৈজষপত্রে রঙ এবং স্বর্ণ দিয়ে নক্সা করা এবং ছবি আঁকা ছিল একটি নতুন আবিষ্কৃত প্রযুক্তি এবং এই কাজে যাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হতো তাদেরকে ভালোভাব ে যাচাই-
বাছাই করে গোপনীয়তা রক্ষার অঙ্গীকার করানো হতো। হ্যানিম্যানের পিতা ছিলেন একজন সৎ, বিচক্ষণ এবং ধার্মিক ব্যক্তি । ফলে ভালো এবং মন্দ, পাপ এবং পুণ্য, সরলতা এবং কুটিলতা ইত্যাদি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা তিনি বাল্যকালেই হ্যানি ম্যানের মনে দৃঢ়ভাবে গেথে দিয়েছিলেন। হ্যানিম্যান ছিলেন তাঁর পিতা-
মাতার পাঁচ সনতানের মধ্যে তৃতীয় এবং পুত্রদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। শিশুকাল থেকেই তিনি পড়াশুনায় অসাধারণ মেধার পরিচয় দেন বিশেষত ভাষা এবং বিজ্ঞানে। তিনি ইংরেজী, ফরাসী, গ্রিক, ল্যাটিন, সপ্যানিশ এবং আরবী ভাষায় পান্ডিত্য অ র্জন করেন। সেকালে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আরব দেশীয় মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের
(ইবনে সীনা, ফারাবী, আল কিন্দি প্রভৃতি) লেখা পুস্তকসমূহ পড়ানো হতো; ফলে কারো পক্ষে সত্যিকারের চিকিৎসক বা চি কিৎসা বিজ্ঞানী হওয়ার জন্য আরবী ভাষা শেখা ব্যতীত কোন উপায় ছিল না। এমনকি মাত্র বারো বছর বয়সে তাঁর ওসত াদের নির্দেশে হ্যানিম্যান তাঁর সহপাঠিদের গ্রীক ভাষা শিক্ষা দিতেন।

বলা হয়েছে বিজ্ঞান এবং গবেষণার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল জন্মগত
; একেবারে মজ্জাগত। পাবলিক স্কুলে পড়াকালীন সময়ে মাস্টার মুলার নামক একজন যথার্থ যোগ্য শিক্ষকের স্নেহ লাভে ধন্য হন যিনি তাকে দৈনন্দিন পাঠ মুখসত না করে হজম করার পরামর্শ দিতেন। যোগ্যতা এবং দক্ষতার কারণে তিনি হ্য ানিম্যানকে গ্রিক ভাষার ক্লাশ নিতে অনুমতি দিতেন। ফলে সহপাঠিরা হ্যানিম্যানকে ভালোবাসতো। অতিরিক্ত পড়াশোনার ক

ারণে হ্যানিম্যান মাঝেমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়তেন এবং তখন এই মহান শিক্ষক তাঁর হোমওয়ার্ক, টিউটোরিয়াল ইত্যাদি মাফ করে দিতেন। হ্যানিম্যানের জন্য তাঁর দরজা ছিল সারাক্ষণ খোলা ; যে-
কোন সময় তিনি শিক্ষকের সাহায্য লাভ করতে পারতেন। হ্যানিম্যানের পিতা প্রায়ই তাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিতেন, তা ড়াতাড়ি আয়-
রোজগার করা যায় এমন কোন পেশায় নিযুক্ত করার জন্য। মাস্টার মুলার তাঁর পড়াশোনা অব্যাহত রাখার জন্য বিদ্যালয়ের ফি পযর্ন্ত মওকুফ করে দিয়েছিলেন প্রায় আট বছর এবং নানানভাবে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে-
অনুরোধ করে হ্যানিম্যানকে রেখে তাঁর পিতাকে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। ১৭৭৫ সালে হ্যানিম্যান পিতার কাছ থেকে কুড়িটি মুদ্রা
(thalers) নিয়ে লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পিতার হাত থেকে নেওয়া এটাই ছিল তাঁ র সর্বশেষ টাকা-পয়সা। এজন্য তাকে দোষ দেওয়া যায় না
; কেননা তার আরো অনেক সন্তানাদি ছিল এবং তার যৎসামান্য আয়-
রোজগার দিয়ে সকলের জন্য শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

১৭৭৫ সালে তিনি লিপজিগ ইউনিভার্সিটিতে চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুষদে ভর্তি হন। কিন্তু সেখানকার অপ্রতুল সুযোগ-
সুবিধার কারণে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন
; কেননা সেই ডিপার্টমেন্টের অধীনে না ছিল কোন ক্লিনিক, না ছিল কোন হাসপাতাল। সেখানে অধ্যয়নরত অবস্থায় নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য তিনি অর্থের বিনিময়ে ইংরেজী থেকে জার্মানীতে পুস্তক অনুবাদের খন্ডকালীন কাজ হাতে নেন এব ং একজন ধনী গ্রীক ব্যক্তিকে ফরাসী ভাষা শেখাতেন। ফলে অন্যান্য ছাত্রদের সাথে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পার তেন না। ১৭৭৭ সালের প্রথমার্ধে চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে এবং বাসতব অভিজ্ঞতা লাভের নিমিত্তে তিনি ভিয়েনা গমণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আর্থিক অনটন এবং ডাকাতদের হাতে লুন্ঠিত হওয়ার কারণে নয় মাসে র মাথায় কোর্স অসমাপ্ত রেখে ফিরে আসতে বাধ্য হন। তবে রয়েল কলেজের একজন অধ্যাপক হ্যানিম্যানের প্রতিভায় এম নই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি তাকে রোমানীয়ার গভর্নরের ব্যক্তিগত চিকিৎসকের একটি চাকুরির ব্যবস্থা করে দেন। গভর্ন রের ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং গ্রন্থাগারের লাইব্রেরীয়ান হিসেবে তিনি গভর্নরের প্রাচীন মুদ্রার কালেকশান, পুরনো পুস্তকসমূহ এবং পান্ডুলিপিসমূহের একটি ক্যাটালগ তৈরী করে দেন, যা ছিল রসায়ন শাসত্র এবং যাদুবিদ্যার উপর ইউরোপের সবচে য়ে বড় এবং দুর্বল পান্ডুলিপির লাইব্রেরী। এখানে অবস্থানকালীন সময়ে তিনি কয়েকটি ভাষা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে সমপর্কিত কয়েকটি বিজ্ঞান বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন করেন।

তিনি আরলেঙ্গেন ইউনির্ভার্সিটিতে তাঁর শেষ সেমিষ্টার অধ্যয়নের পর পেশীর আক্ষেপের
(Cramps) ওপর একটি থিসিস পেপার জমা দেন এবং চিকিৎসক হিসেবে এম.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। আরলেঙ্গেন ইউনির্ভ ার্সিটি থেকে তাঁর রেজিস্ট্রেশন লাভের পেছনের কারণ ছিল একটাই আর তা হলো তিনি জানতে পেরেছিলেন যে আরলে ঙ্গেনের ফি সবচেয়ে কম। ১৭৮১ সালে তিনি ম্যান্সফিল্ডের তামার খনি এলাকার নিকটবর্তী একটি গ্রামের ডাক্তারের চাকুরি নেন। ১৭৮০ থেকে ১৭৮৩ সালের মধ্যে তিনি চিকিৎসক হিসেবে বেশ কয়েকটি চাকুরিতে যোগদান করেন কিন্তু ১৭৮২ স ালে তাঁর বিয়ের পর থেকেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের অপূর্ণতা এবং ব্যর্থতা লক্ষ্য করে ডাক্তারী পেশার প্রতি ধীরে ধীরে আক র্ষণ হারিয়ে ফেলতে থাকেন। কেননা তিনি লক্ষ্য করেন যে, ঔষধের ক্ষতিকর পার্শ্ব-
প্রতিক্রিয়ার ফলে রোগীদের স্বাস্থ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অধিকাংশ রোগই ঔষধে নিরাময় হয় না, যে-
রোগ তিনি সারিয়ে দিচ্ছেন একই রোগ নিয়ে কয়েক মাস অথবা কয়েক বছর পরে রোগীরা পুণরায় ফিরে আসছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে ১৭৮৪ সালে ড্রিসডেন শহরে পৌঁছানোর পর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ডাক্তারী পেশা বর্জ

ন করেন এবং তাঁর ক্রমবর্ধিষ্ণু পরিবারের সৎ উপায়ে ভরণপোষনের জন্য পুণরায় ফুল-
টাইম ভিত্তিতে অনুবাদকের পেশা গ্রহন করেন।

১৭৮২ সালের শেষের দিকে হ্যানিম্যান মিস কাচলারকে (spinster Johanna Henrietta Leopoldina Kuchler) বিয়ে করেন। হ্যানিম্যান তাঁর ঝঞ্ঝা-
বিক্ষুদ্ধ জীবনে আকর্ষণীয়া এই তরুণীর মধ্যে যেন তাঁর অনন্তকালে প্রিয়াকে খুঁজে পান। হ্যানিম্যান তাকে সোহাগ করে ইল
িজ (Elise) নামে ডাকতেন যা সত্রীর নিকট লেখা তাঁর অনেক পত্রে দেখা গেছে। সেইন্ট জন-
এর গীর্জার ম্যারিজ রেজিস্টারে উল্লেখ ছিল, "অদ্য পহেলা ডিসেম্বর ১৭৮২ সালে, সেন্ট জনস চার্চে, মিঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যা
ন, ডক্টর অব মেডিসিন, গুমেরানের
(Gommern) স্থানীয় নির্বাচিত স্যাক্সন গীর্জা পল্লীর ডাক্তার, বয়স ২৮ বছর, মেসেনের সিরামিক ফ্যাক্টরীর চিত্রশিল্পী মিঃ ক্র
িস্টিয়ান গটফ্রাইড হ্যানিম্যান এবং তার সত্রী জোহান্না ক্রিশ্চিয়ানা-
র ঔরসজাত পুত্র, বিবাহসুত্রে আবদ্ধ হন প্রয়াত গটফ্রাইড হেনরী কুচলার এবং তার সত্রী মার্থা সোফিয়া-
র ঔরসজাত কন্যা মিস সিপনস্টার জোহান্না হেনরিয়েটা লিওপোল্ডিনা কাচলার-
এর সাথে"। বিয়ের পর গুমারনেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং ১৭৮৩ সালের শেষের দিকে অথবা ১৭৮৪ সালের প্রথম দিকে তাঁর প্রথম (কন্যা) সন্তান হেনরীয়েটা (Henrietta) জন্মগ্রহন করে।



হ্যানিম্যান কেন এলোপ্যাথিক চিকিৎসক হয়েও এলোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি পরিত্যাগ করেছিলেন, এই সম্পর্কে এ
কটু বিশদ ব্যাখা না করলে তাঁর জীবনী আলোচনা অসমাপ্তই থেকে যাবে। তৎকালে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি এতই জঘন্য এবং বর্বরতায় পূর্ণ ছিল যে, হাসপাতাল বা ডাক্তারের চেম্বারকে কশাইখানা বলাই যুক্তিযুক্ত ছিল। সেখানে রোগীদের
কে রাখা হতো ভিজা এবং গরম কক্ষে, অখাদ্য-
কুখাদ্য খেতে দেওয়া হতো, দৈনিক কয়েকবার রোগীদের শরীর থেকে রক্ত বের করে ফেলে দিয়ে দুর্বল করা হতো, রোগী
দের শরীরে জোঁক লাগিয়ে (Leeching), কাপের মাধ্যমে বা সিঙ্গা লাগিয়ে (cupping) অথবা রক্তনালী কেটে
(venesection) রক্তপাত করা হতো, পায়খানা নরম করার ঔষধ (purgatives)
খাওয়ানোর মাধ্যমে অনেক দিন যাবত রোগীদের পাতলা পায়খানা করানো হতো, বমি করানো হতো ইত্যাদি ইত্যাদি। সিফি
লিসের রোগীদের প্রচুর মার্কারী খাওয়ানোর মাধ্যমে লালা নিঃসরণ
(salivation) করানো হতো এবং এতে অনেক রোগীই কয়েক বালতি লালা থুথু আকারে ফেলতো এবং অনেক রোগীর দাঁ
ত পযর্ন্ত পড়ে যেতো। অধিকাংশ রোগী (চিকিৎসা নামের) এই কুচিকিৎসা চলাকালীন সময়েই মারা
যেতো। শরীরের মাংশ অর্থাৎ টিস্যুকে গরম লোহা অথবা বাষ্প দিয়ে পুড়ানো হতো
(cauterization), গরম সুঁই দিয়ে খুচিয়ে চামড়ায় ফোস্কা ফেলা হতো
(blistering), লাঠি অথবা পাথরের আঘাতে শরীরে কৃত্রিম ফোঁড়া-ঘা-
ক্ষত সৃষ্টি করা হতো এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব ঘা-
ক্ষত মাসের পর মাস বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা হতো। উপরে বর্ণিত সকল কিছুই করা হতো মারাত্মক জটিল রোগে আক্রান্ত সংকটাপন্ন রোগীর চিকিৎসা বা রোগমুক্তির নামে যা আজকের দিনে কোন সুস' মানুষের পক্ষে কল্পনারও বাইরে।
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কোন গুরুত্বই ছিল না
; এমনকি অপারেশনের রুম ছিল অনেকটা গোয়াল ঘরের মতো। এই কারণে ছোট-
খাটো অপারেশনের পরেও শতকরা ৫০ ভাগ রোগী ইনফেকশনের স্বীকার হয়ে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালেই মৃত্যুবরণ

করতো। হাসপাতালের ভেতরের গন্ধ ছিল লাশকাটা ঘরের গন্ধের মতো জঘন্য। মানসিক রোগীদেরকে শিকলে বেধে রাখা হতো, নিষ্টুরভাবে লাঠি দিয়ে তাদেরকে প্রহার করা হতো, বালতি দিয়ে তাদের শরীরে ঠান্ডা নিক্ষেপ করা হতো এবং আত্মীয়-স্বজনরা দেখতে এলে তাদেরকে জংলী-জানোয়ারের মতো শিকলে বেধে টেনে হিচরে এনে দেখানো হতো।

তৎকালে অর্থাৎ হ্যানিম্যানের সময় অষ্টাদশ শতাব্দিতে এলোপ্যাথিক মেডিক্যাল সাইন্সের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। কিন্তু ডাক্তাররা রোগীদের নিকট নিজেদেরকে খুবই জ্ঞানীগুণীরূপে জাহির করার জন্য একে অন্যের সাথে ল্যাটিন ভাষায় কথা বলতো
; এখনকার দিনের ডাক্তাররা যেমন রোগীদের সামনে ইংরেজী ভাষায় জটিল ডাক্তারী শব্দ ব্যবহার করে কথা বলে। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে নানান রকম ফ্যাশন চালু আছে এবং কিছুদিন পরপর নতুন নতুন ফ্যাশন চালু করা হয়। এখনকার দিনের ফ্যাশন হলো মারাত্মক জটিল রোগীদের শরীরে রক্ত দেওয়া কিন্তু হ্যানিম্যানের যুগের ফ্যাশন ছিল উল্টো শরীর থেকে রক্ত বের করা ফেলা। অষ্টাদশ শতাব্দিতে মেডিক্যাল কলেজগুলোতে পড়ানো হতো (এবং সকল ডাক্তাররা বিশ্বাস করতো) যে, অধিকাংশ জটিল মারাত্মক রোগের কারণ হলো শরীরে তরল পদার্থের
(অর্থাৎ খারাপ রক্তের) পরিমাণ বেড়ে যাওয়া
(superfluity/plethora)। ফলে কেউ কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে (রোগীর কল্যাণের স্বার্থে অর্থাৎ রোগমুক্তির জন্য) রগ কেটে (venesection) , শরীরে অনেকগুলো জোঁক লাগিয়ে অথবা সিঙ্গা লাগিয়ে শরীর থেকে (অপ্রয়োজনীয় খারাপ
?) রক্ত বের করে ফেলে (bloodletting) দেওয়া হতো। কোন ডাক্তার যদি মারাত্মক রোগের ক্ষেত্রে রক্ত বের করার চিকিৎসা না দিতো, তবে তাকে গণপিটুনি দেওয়া হতো এবং (বেচেঁ গেলে) অযোগ্যতার অভিযোগে তার সরকারী রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে দেওয়া হতো। এমনকি মেডিকেল কলেজের পাঠ্যপুস্তকে এমন কথাও লেখা ছিল যে, "জটিল সংকটাপন্ন রোগীকে যেই চিকিৎসক রক্ত বের করার চিকিৎসা না দিবে, সেই ডাক্তার চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মহা অপরাধী খুনী। দুনিয়াতে সে আইনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেলেও আখেরাতে আল্লাহর নিকট থেকে নিশ্চয় কঠিন শাস্তি ভোগ করবে"। রোগীর অবস'া যত সিরিয়াস হতো তার শরীর থেকে তত বেশী রক্ত ফেলে দেওয়া হতো। যেমন- একজন একসিডেন্টের রোগী যার শরীর থেকে এমনিতেই প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়ে মরণদশা হয়ে গেছে কিংবা একজন ডায়েরিয়া-
কলেরার রোগী যিনি অনেক দিন পাতলা পায়খানা করে দুর্বল-
রক্তশুণ্য হয়ে পড়েছে, তাদেরকেও (সুস্থ করার জন্য সাথে সাথে) শরীর থেকে রক্ত বের করে ফেলে দেওয়া হতো। অনেক সময় একই রোগীর শরীর থেকে দৈনিক তিন-
চার বার করে রক্ত বের করা হতো। ফলে রক্তের অভাবে শরীর দুর্বল হয়ে অধিকাংশ রোগী মারা যেতো। রক্ত কমে গেলে যে শরীর দুর্বল হয়, রোগীর মৃত্যু আরো তাড়াতাড়ি হবে
; এতটুকু কাণ্ডজ্ঞানও ডাক্তারদের ছিল না কিংবা বলা যায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছিল না। এভাবে ঘনঘন রক্ত বের করে ফেলে দেওয়ার ফলে কতো রাজা, বাদশা, নবার, সম্রাট, পোপ, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী যে ডাক্তারদের হাতে খুন হয়েছে, তার কোন সীমা নাই।

চিকিৎসার নামে এসব অবৈজ্ঞানিক-অমানবিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে হ্যানিম্যান তাঁর অর্গানন
(Organon of Medicine) নামক পুস্তকে ১৮১০ সালে লিখেছিলেন, "(রোগীর) শরীরকে অত্যাচার করে দুর্বল করার মাধ্যমে (রোগীকে) মৃত্যুর দুয়ারে পৌছেঁ দিয়ে আমরা কোন রোগমুক্তি আশা করতে পারি না। আর এখনও এই প্রাচীনপন্থী
(এলোপ্যাথিক) ডাক্তাররা জানেন না জটিল রোগে আক্রান্ত রোগীদের রোগমুক্ত করার জন্য কি করতে হবে
; কেবল তাদেরকে নিযার্তন করা, শক্তি ক্ষয় করা, তাদের জীবনবাহী (অতিপ্রয়োজনীয়) তরল পদার্থ
(রক্ত) নষ্ট করা এবং আয়ু হ্রাস করা ছাড়া"। ১৭৯২ সালে জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় লিওপোল্ড চিকিৎসার নামে একই দিনে চা

র বার রক্তপাত করার কারণে ডাক্তারদের হাতে খুন হন। সম্রাট উচ্চ মাত্রার জ্বর এবং পেট ফোলা রোগে ভোগছিলেন। সে সময় হ্যানিম্যান ছিলেন ৩৭ বছরের একজন তরুণ এলোপ্যাথিক ডাক্তার। তা সত্ত্বেও হ্যানিম্যান নির্দিধায় সম্রাটের ব্যক্তি গত চিকিৎসককে সমালোচনা করে পত্রিকায় লিখে পাঠান যে, "একবার রক্ত বের করার পরে যেহেতু সম্রাটের শারীরিক অবস'ার উন্নতি হয়নি, সেহেতু দ্বিতীয়বার রক্তপাত করা যুক্তিসঙ্গত হয়নি। এমনকি দ্বিতীয়বার রক্তক্ষরণ করার পরও যেহে তু সম্রাটের কোন উন্নতি হয়নি, সেহেতু তৃতীয়বার এবং চতুর্থবার কেন সম্রাটের শরীর থেকে রক্তপাত করা হলো চিকিৎসা বিজ্ঞান অবশ্যই সেই প্রশ্ন করবে। চিকিৎসার নামে এটি ঠান্ডা মাথায় খুন ছাড়া কিছুই নয়"। এমনকি ১৮৩২ সালে সারা ইউরোপজুড়ে যে ঐতিহাসিক কলেরার মহামারী দেখা দিয়েছিল, তখন হ্যানিম্যান (পাতলা পায়খানা এবং বমি করতে করতে) মরণাপন্ন দশায় পৌঁছে যাওয়া এসব কলেরা রোগীদের শরীর থেকে রক্ত বের না করার আহবান জানিয়ে একটি লিফলেট ছেড়ে ছিলেন। এবং ইহার প্রতিবাদে সারা ইউরোপের একশত বিখ্যাত এলোপ্যাথিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তাদের স্বাক্ষর সম্বল িত একটি লিফলেট ছাড়েন যাতে বলা হয়েছিল যে, "রক্তপাতই (bloodletting) কলেরার শ্রেষ্ট চিকিৎসা"।

এসময় ড্রিসডেনেও তিনি একটু-
আধটু ডাক্তারী করতেন, তবে তা জীবিকা অর্জনের জন্য ছিলো না বরং তা ছিলো প্রচলিত এলোপ্যাথিক চিকিৎসার অকার্ যকারীতা এবং ক্ষতিকারক দিক নিয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে। ১৭৮৪ সালে তিনি *Demarchy*-র *The Art of Manufacturing Chemical Products* বইটি ফরাসী ভাষা থেকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। এটি ছিল দুই খন্ডের একটি বিশাল অনুবাদ কর্ম যাত ে তিনি নিজে থেকে অনেক কিছু যোগ করেছেন। এই কাজের জন্য স্বেচ্ছায় তাকে অনেক অভাব-
অনটন সহ্য করতে হয়েছে এবং দারিদ্রের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে হয়েছে। কেননা অনুবাদের কাজে তিনি খুবই সামান্য অ র্থ উপার্জন করতে পারতেন। ডিমারকি ছিলেন সেকালের একজন শ্রেষ্ট রসায়নবিদ
(chemists)। ফ্রেঞ্চ একাডেমী তার বইটি ছাপিয়েছিল যাতে জনগণ কেমিক্যাল দ্রব্যাদির উৎপাদন কৌশল আয়ত্ত করতে প ারে। কেননা তৎকালে অধিকাংশ ক্যামিকেলের উৎপাদনকারী ছিল ওলন্দাজরা
(Dutch) এবং বাণিজ্যিক কারণে তারা এসব ব্যাপারে খুবই গোপণীয়তা বজায় রাখতো। হ্যানিম্যানও বইটিকে জার্মান ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে দেশবাসীর বিরাট উপকার করেছিলেন। বইটি অনুবাদের পাশাপাশি এতে তিনি নিজে থেকে অনেক ত থ্য পাদটিকা আকারে সংযুক্ত করে দিয়েছেন, ত্রুটিগুলি সংশোধন করে দিয়েছেন, অসম্পূর্ণ তথ্যকে সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন ; যা পড়লে রসায়ন শাস্ত্রে এই তরুণ চিকিৎসকের অসাধারণ পান্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। antimonials, lead, quicksilver, camphor, succinic acid,
borax ইত্যাদির ব্যাপারে তিনি দশজন লেখকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ডিমারকি যেখানে বলেছেন যে, carbonification of t urf-এর ওপর কোন গবেষণার কথা তার জানা
নেই, হ্যানিম্যান সেখানে ছয়টি গবেষণার উল্লেখ করেছেন। ডিমারকি একজন বিখ্যাত জার্মান চিকিৎসকের কথা উল্লেখ করে ছিলেন
; হ্যানিম্যান তার নাম, বইয়ের নাম এবং সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছদেরও উল্লেখ করেছেন। মোটামুটি বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠাতেই তার ফুট নোট চোখে পড়ে। ক্যামিকেল ছাঁকন বা উত্তপ্ত করার পাত্র (retorts) তৈরীতে হ্যানিম্যান নতুন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন ; যাতে মনে হয় বিভিন্ন দেশে কেমিকেল উৎপাদনের পদ্ধতির সাথে তাঁর পরিচয় ছিল। রাশিয়া, সুইডেন, জার্মানী, ইটালি, সিসিলি প্রভৃতি দেশে এলুমিনিয়ামের
(alum) ব্যবহারের বিষয়ে ডিমারকি'র ভুল তথ্যকে হ্যানিম্যান সংশোধন করে দেন। *Annalen* নামক একটি বিখ্যাত কেমি কেল সাময়িকীর সম্পাদক Crell লিখেছিলেন যে, "আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, রসায়ন শাস্ত্রের ওপর ইহার চাইত

ে উন্নত, পুর্ণাঙ্গ এবং প্রামান্য গ্রন্থ আর দ্বিতীয়টি নেই"। ১৭৮৫ সালে ডিমারকির Art of Distilling Liquor নামক বই টিও হ্যানিম্যান অনুবাদ করে দুই খন্ডে প্রকাশ করেন।

১৭৮৪ সালে দুরারোগ্য ক্ষতের
(scrofulous sores) চিকিৎসার ওপর তাঁর একটি মৌলিক গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এতে তিনি লিখেন যে, "একটি খুবই সত্য কথা (এবং যা আমাদেরকে বিনয়ী হতে সাহায্য করে) যে, সাধারণ, প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম যে-
সব বস্তু ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়, তাদের অধিকাংশেরই গুণাগুণ জানা গেছে সাধারণ মানুষের প্রাত্যাহিক ব্যবহার থেকে (অর্থাৎ দাদী-
নানীদের কাছ থেকে)। আর এই কারণে বিজ্ঞ চিকিৎসকদের নিকট এসব গৃহ ব্যবহৃত ঔষধের গুরুত্ব অপরিসীম"। এই ব ইটি ছিল প্রধানত ট্রান্সসিলভানিয়ায় বসবাস কালীন সময়কার তাঁর অভিজ্ঞতার ফসল। সেই সময়কার ডাক্তাররা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে কোন গুরুত্ব দিতেন না। এই কারণে হ্যানিম্যান তাঁর এই পুস্তকে পরিষ্কার-
পরিচ্ছন্নতা, ব্যায়াম, মুক্ত বায়ু সেবন, স'ান পরিবর্তন, ঠান্ডা পানির ঔষধি গুণ, সমূদ্র সৈকতে গমণ ইত্যাদির গুরুত্ব বুঝাত ে অনেকগুলো পৃষ্টা ব্যয় করেন। তাঁর এই বইটি সমকালীন চিকিৎসক সমাজে বেশ সমাদর লাভ করে। লেখালেখি এবং অনুবাদে সাধারণত আয়-
রোজগার খুবই কম হয়। এই কারণে ১৭৯০ সালের দিকে তিনি ভয়ানক দরিদ্রে পরিণত হন এবং দারিদ্র তাকে লিপজিগ ছেড়ে স্টোটারিজ শহরে গমণ করতে বাধ্য করে। এসময় ড্রিসডেন ইকোনোমিক্যাল সোসাইটি তাকে ফরাসী এবং ইংরেজী থেকে জার্মান ভাষায় বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তক অনুবাদে প্রশংসনীয় অবদানের জন্য বিশেষভাবে সম্মাণনা প্রদান করে। ফলে চিকিৎসক হিসেবে তাঁর পরিচিতি ঢাকা পড়ে গিয়েছিল এবং (বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিষয়ক গ্রনে'র) অনুবাদক ও লেখক হিসেবে তাঁর সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। ফলে লিপজিগ থেকে তাঁর কাছে একটার পর একটা অনুবাদের অর্ডার মুষলধারে বৃষ্টির মতো আসতে লাগল। যদিও প্রাগ্য-বিদগ্ধ সমাজের পক্ষ থেকে প্রচুর স্বীকৃতি-
সম্মানণা স'পাকারে তাঁর ওপর বর্ষিত হচ্ছিল, তথাপি এই প্রতিভাশালী এবং উচ্চাকাংখী ব্যক্তির আত্মাকে তা কি তৃপ্ত করত ে পারছিল ?
এই সমপর্কে হ্যানিম্যান নিজে লিখেছেন যে, "ড্রিসডেন শহরে অবস্থানকালীন সময়ে আমি উল্লেখযোগ্য কোন কাজ সম্পাদন করিনি"। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন যে, তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নয়ণে এসময় কোন অবদান রাখতে পারেননি ; কেননা তিনি কেবল প্রচলিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করেছেন এবং পরিবারের ভরণ-পোষণ করেছেন।

কিংবদন্তীতুল্য প্রতিভাসমপন্ন এই লোকটি ছিল ভবঘুরে স্বভাবের। ১৭৯২ থেকে ১৮০৪ সাল পযর্ন্ত বার বছরে তিনি তাঁ র গোটা পরিবার নিয়ে মোট চৌদ্দটি শহরে বসবাস করেছেন
; প্রতিটি শহরে গড়পড়তা কয়েক মাস করে। তাঁর এই ক্লানিতহীন পরিভ্রমণ কালে তিনি ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই নিঃসঙ্গ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি অতিশয় ত্যক্ত-
বিরক্ত। এসময় তাঁর একমাত্র উপার্জন ছিল অনুবাদ কর্ম। তাঁর জীবনী লেখক হেল-
এর মতে, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমই তাকে অসি'রভাবে শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য করেছিল এবং যখনই চি নতার সাথে তাঁর বিরামহীন কুস্তি খেলার সমাপ্তি ঘটে, সাথে সাথে তাঁর বাসস্থান পরিবর্তনের অভ্যাসও বন্ধ হয়। তাঁর এই বিরামহীন ভ্রমণের শেষ পযার্য়ে তিনি টরগাউ
(Torgau) শহরে আসন গাড়েন এবং এই শহরে সুদীর্ঘ চৌদ্দ বছর অবস'ান করেন। তাঁর লেখালেখির সবচেয়ে বড় অং শটি এই শহরে রচিত হয়। ১৭৭৭ থেকে ১৮০৬ সালের মধ্যে তিনি মেগাসাইজের ২৪
টি পান্ডুলিপি এবং অগণিত গবেষণা প্রবন্ধ অনুবাদ করেন। প্রতিটি অনুবাদেই তিনি নিজ থেকে অগণিত পাদটিকা সংযুক্ত

করতেন এবং পুস্তকের ভুলত্রুটিও সংশোধন করে দিতেন। যতক্ষণ আঙ্গুল ব্যথা না হচ্ছে ততক্ষণ তিনি লেখার টেবিল থেকে ওঠতেন না। ডাক্তারী পেশার কথা তিনি এমনভাবে ভুলে গিয়েছিলেন, যেন মনে হতো তিনি কোনকালে ডাক্তারই ছিলেন না। বরং তিনি পাখির পালকের তৈরী কলমের একজন অন্ধ সাগরেদে পরিণত হয়েছিলেন। চিকিৎসকের পেশাকে মনে হতো তিনি কালির সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছেন। এই সময় তিনি তাঁর পড়াশুনা এবং গবেষণায় প্রাপ্ত চিকিৎসাবিজ্ঞানের ওপর নতুন আইডিয়া নিয়ে পত্রিকায় প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখতেন। অনেকগুলো বছরের ছন্নছাড়া জীবন এবং চিকিৎসা বিষয়ক বই-পুস্তক অনুবাদের ফলে হ্যানিম্যান চিকিৎসা বিজ্ঞানের সবচেয়ে অগ্রসর দিকগুলো সমপর্কে জানতে পারছিলেন এবং সেগুলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যাচাই-
বাছাই করার সুযোগ পেয়েছিলেন। হ্যানিম্যানের জীবনে এই সময়টি ছিল একটি চরম সন্ধিক্ষণ
; কেননা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর বৈপ্লবিক সব থিওরী এবং ফিলোসোফির প্রমাণ তাঁর হাতে আসার কারণে তাঁর ভেতরে আলোড়ণের সৃষ্টি হয় এবং ভেতরে ভেতরে তিনি নিজের ভবিষ্যত কর্মপদ্ধতি স্থির করে ফেলেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর তিনি যেই বৈপ্লবিক আবিষ্কার সমপন্ন করেন তা প্রথম তাঁর মাথায় আসে ১৯৭০ সালে উইলিয়াম কালেন (William Cullen)-এর মেটেরিয়া মেডিকা অনুবাদ করার সময়। উক্ত পুস্তকে লেখা ছিল যে, কুইনাইন (Cinchona) মেলেরিয়া জ্বরের সুনির্দিষ্ট ঔষধ, কেননা এটি সুস্থ মানুষ খেলে তার শরীরের ম্যালেরিয়া জ্বর উৎপন্ন করতে পারে। বিষয়টি হ্যানিম্যানের বিশ্বাস হয় নাই
; ফলে তিনি সুস্থ শরীরে অল্পমাত্রায় কয়েকদিন সিনকোনা খেয়ে শরীরের তার ক্রিয়া পরীক্ষা করেন। তিনি বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করেন যে, সত্যিসত্যি ম্যালেরিয়ার মতো কাঁপুনি দিয়ে শুরু হওয়া সবিরাম জ্বর তাঁর শরীরে সৃষ্টি হয়েছে। এই সময় তিনি যেই এলাকায় বসবাস করতেন, তা ছিল ম্যালেরিয়া উপদ্রুত অঞ্চল। ফলে তিনি নিশ্চিত হওয়ার জন্য ম্যালেরিয়ামুক্ত এলাকায় গিয়ে পুণরায় সুস' শরীরে সিনকোনা খেয়ে একই ফল পেলেন। ইহার পর তিনি আরো অনেকবার একই পরীক্ষা করে একই রেজাল্ট পান। তিনি তাঁর এই নতুন আবিষ্কারকে নাম দেন সদৃশ বিধান বা হোমিওপ্যাথি
(homeopathy)। ল্যাটিন শব্দ homeo -
এর অর্থ সদৃশ বা একই রকম এবং pathy অর্থ ভোগান্তি বা অসুখ। তিনি তাঁর এই বৈজ্ঞানিক সুত্রকে সংজ্ঞায়িত করেন এভাবে যে, "সদৃশ সদৃশকে নিরাময় করে"
(Like cures like)। ল্যাটিন ভাষায় বলা হয় similia similibus curentur. অর্থাৎ যে ঔষধ সুস' শরীরে যে-
রোগ সৃষ্টি করতে পারে, সেই ঔষধ অল্প মাত্রায় খাওয়ালে তা একই রোগ নিরাময় করতে পারে। আবার উল্টো করে বললে বলা যায় যে, যে ঔষধ যে রোগ সারাতে পারে, সেই ঔষধ সুস' শরীরে খেলে একই রোগ তৈরীও করতে পারবে। হোমিওপ্যাথির বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে রোগী পর্যবেক্ষণের (observation of the
sick) ওপর ভিত্তি করে।

আমরা অনেকেই জানি না যে, এলোপ্যাথি (Allopathy) নামটিও হ্যানিম্যানের দেওয়া। ল্যাটিন শব্দ allos -
এর অর্থ বিসদৃশ বা বিপরীত এবং pathy অর্থ ভোগান্তি বা অসুখ। যদিও এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা এই নামটি পছন্দ করে নাই এবং গ্রহনও করেন নাই। তারা নিজেদেরকে আগেও সমকালীন চিকিৎসা বিজ্ঞান
(conventional medicine), অরথোডক্স মেডিসিন (orthodox medicine), স্কুল অব মেডিসিন
(school of medicine) বা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান (modern medicine) ইত্যাদি ইত্যাদিবলত
; এখনও তাই বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে এলোপ্যাথি নামটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং তারা এলোপ্যাথি নামেই তাদেরকে চিনে থাকে। সে যাক, হোমিওপ্যাথির শত্রুরা দুইশ বছর পুর্বেও হোমিওপ্যাথিকে বিজ্ঞান বলে স্বীকার করত না এবং এখনও করে না। কারণ নিম্নশক্তির হোমিও ঔষধে যদিও ঔষধ পাওয়া যায় কিন্তু ৩০ শক্তি

বা তার চাইতে উচ্চ শক্তির হোমিও ঔষধে মুল ঔষধের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকি এ যুগের সর্বাধুনিক কো
ন ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা-
নিরীক্ষা করেও তাতে মুল ঔষধের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। তারপরও এসব ঔষধে কিভাবে কঠিন কঠিন সব রোগ সেরে যায়, প্রচলিত বিজ্ঞান তা ব্যাখ্যা করতে পারেন না। হয়ত ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের আরো উন্নতি হলে সেই রহস্য জানা যাবে। বতর্মানে জাপানী বিজ্ঞানীদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, পানিরও স্মরণ শক্তি বিদ্যমান বর্তমানে ক্লাসিক্যাল হোমি
ওপ্যাথি
(classical homeopathy) নামে আমরা যে কথা শুনি, তার প্রচলন হয়েছে হ্যানিম্যানের মৃত্যুর একশ বছর পর থেকে। হ্যানিম্যান কিন্তু হোমিওপ্যাথি আবিষ্কার করে নিষ্ক্রিয় হয়ে যান নাই
; যতদিন বেঁচে ছিলেন ক্রমাগত গবেষণা করে তার মানোন্নয়ন করে গেছেন। অথচ তাঁর মৃত্যুর পর থেকে আজ পযর্ন্ত দু
ইশ বছর হলো হোমিওপ্যাথির ওপর সকল গবেষণা এবং উন্নয়ন বন্ধ হয়ে গেছে। তারপরও বিশেষজ্ঞদের মতে, হোমিওপ্যা
থি এখনও প্রচলিত যে-কোন চিকিৎসা পদ্ধতির চাইতে অনেক অ-নে-
ক উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি। এমনকি কেউ কেউ মনে করেন, হোমিওপ্যাথি দুইশ বছর পুর্বে আবিষ্কৃত না হয়ে যদি আরো দুইশ বছর পরে আবিষ্কার হতো তবে তা যুগের সাথে সবচেয়ে ভালো মানাসই হতো।

হ্যানিম্যানের আরেকটি যুগানতকারী আবিষ্কার হলো সুস' মানুষের শরীরে ঔষধের গুণাগুণ পরীক্ষা করা। কেননা প্রচ
লিত এলোপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইঁদুর-বিড়াল-বানর-গিনিপিগ-
খরগোস ইত্যাদি বোবা জানোয়ারের ওপর ঔষধ পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। বোবা জন'রা যেহেতু তাদের কষ্টের কথা বলতে পারে না, ফলে ঔষধ তাদের শরীর-মনে যে-
সব রোগ সৃষ্টি করে, তার অনেকগুলোই জানা সম্ভব হয় না। কেননা এলোপ্যাথিক বিজ্ঞানিরা কেবল শরীরিক পরিবর্তন, পা
য়খানা, প্রস্রাব, রক্ত ইত্যাদির পরিবর্তনসমূহ পরীক্ষা করে ঔষধের একশান-
রিয়েকশান জানার চেষ্টা করেন। এজন্য হ্যানিম্যান এবং তাঁর অনুসারী হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা, হোমিও চিকিৎসকরা এব
ং হোমিও কলেজের নিবেদিতপ্রাণ ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিটি হোমিও ঔষধ নিজেরা দীর্ঘদিন খেয়ে তাদের দেহ-মনে সে-
সব ঔষধে গুণাগুণ পরীক্ষা-
নিরীক্ষা করেছেন। হ্যানিম্যান তাঁর জীবনকালে ৯০টি ঔষধ নিজের শরীরে পরীক্ষা করে তার বিসতারিত গুণাগুণ তাঁর রচি
ত "মেটেরিয়া মেডিকা পিউরা"
(Materia medica pura) নামক গ্রনে' লিপিবদ্ধ করে গেছেন এবং বলতে হয় সিনকোনা ছিল তাঁর জীবনে তাঁর নিজের শরীরে পরীক্ষা করা ঔষধগুলোর মধ্যে প্রথম ঔষধ। প্রাসঙ্গিকভাবে বলতে হয় যে, ঔষধের মতো মারাত্মক বিষাক্ত পদার্থকে নিজের শরীরে পরীক্ষা করার মধ্যে কতো অপরিসীম ত্যাগের মানসিকতা কাজ করে, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কেননা এসব ঔষধের মধ্যে আছে হৃদরোগ, যক্ষ্মা, ক্যানসারের ঔষধ যা দীর্ঘদিন খেয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে হার্ট এটাক, য
ক্ষ্মা, ক্যান্সার প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঝুঁকি আছে। এমন অকাল মৃত্যুর ঘটনা খোজঁলে অনেক পাওয়া যেতে পার
ে। হ্যানিম্যানের অনুসারী একজন ব্রিটিশ হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানী ছিলেন ডাঃ জে. সি. বার্নেট। এই বার্নেট ক্যান্সারের অ
নেকগুলো হোমিও ঔষধ আবিষ্কার করেছিলেন এবং দীর্ঘদিন সেগুলো খেয়ে নিজের শরীরে পরীক্ষা-
নিরীক্ষা করেছিলেন। হ্যানিম্যান এবং তাঁর অনুসারী অধিকাংশ হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানী যেখানে গড়ে ৮০ বছরের বেশী আ
যু পেয়েছেন, সেখানে বার্নেট মৃত্যুবরণ করেন মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে। আজ সবাই একমত যে, ক্যান্সারের অনেকগুলো ঔষধ নিজের শরীরে পরীক্ষা করাই ছিল তাঁর অকালমৃত্যুর মুল কারণ। মানবজাতিকে রোগ-
ব্যাধির কড়ালগ্রাস থেকে মুক্ত করতে হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা যেভাবে হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন, এই রকম ত্যাগের ঘটনা সত্যি আমাদের জন্য গর্বের বিষয়।

দিনের পর দিন হ্যানিম্যান নিজের শরীরে একের পর এক ঔষধ পরীক্ষা করে গেছেন। সাথে সাথে পরিবারের সদস্য এবং চিকিৎসক বন্ধুদের ওপরও ঔষধ পরীক্ষা করেছেন যারা মানব কল্যাণে যে-কোন ত্যাগ স্বীকারে ছিল সদা প্রস'ত। পরিবারের সদস্যরা এবং বন্ধু-বান্ধবরাই তাঁর গবেষণায় মুল ভূমিকা পালন করত। হ্যানিম্যান তাঁর সনতানদের মাঠে পাঠিয়ে দিতেন ঔষধি গাছপালার পাতা, ফুল এবং শিকড় সংগ্রহ করে আনার জন্য ; যেগুলো তৎকালে এলোপ্যাথিক এবং কবিরাজি চিকিৎসাতে ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হতো এবং যেগুলো ব্যবহৃত হতো না, তাদের সবই। এভাবে তিনি তাঁর গবেষণার কাজে অনেক মানুষকে জড়িত করতেন; কেননা তিনি যে টাইটানিক পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন বিপুল সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহন ছাড়া তাহা বাসতবায়ন করা সম্ভব ছিল না। অবসর সময়ে তিনি ঔষধের ক্রিয়ার ফলে প্রত্যেকের শরীরে ও মনে কি কি পরিবর্তন সুচিত হয়েছে বা রোগ লক্ষণের সৃষ্টি হয়েছে, তা শুনে (মাথা, মন, নাক, কান, পাকস'লী, হৃৎপিন্ড, যৌনাঙ্গ প্রভৃতি শিরোনাম অনুযায়ী) শ্রেণীবিন্যাস করে বিসতারিতভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। নিজের ও আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবদের শরীরে ঔষধ পরীক্ষার পাশাপাশি ঔষধের বিষক্রিয়ার (poisoning) রেকর্ডও তিনি সংগ্রহ করতেন। অর্থাৎ কোন একটি ঔষধ ভুলবশত অথবা আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে কেউ প্রচুর পরিমাণে খাওয়ার ফলে তার শরীরে যে-সব লক্ষণ দেখা দিয়েছিল, সে-সব লক্ষণ তিনি সংগ্রহ করে সবিসতারে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। কেননা এসব লক্ষণ স্বাভাবিকভাবে যদি কারো শরীরে দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে ঐ ঔষধটি অল্পমাত্রায় শক্তিকৃত করে খেলে সেই সে-সব রোগ লক্ষণ চলে যাবে। ঔষধ নিয়ে এই ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ঔষধের সত্যিকার ক্রিয়া ক্ষমতা সমপর্কে নিশ্চিত তথ্য সংগ্রহ করা ; কেননা তখনকার দিনে (এমনকি এখনও) প্রচলিত (এলোপ্যাথিক/ কবিরাজি প্রভৃতি) ঔষধের গুণাগুণ সমপর্কিত যাবতীয় তথ্যই ছিল ব্যক্তিগত (অপ্রমাণিত) মতামত এবং (ঔষধটি সমপর্কে) ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সংগৃহীত। এভাবে আরো পনের বছর চলে গেছে তিনি তাঁর চিনতা-ভাবনা, অভিজ্ঞতা এবং আবিষ্কারকে গুছিয়ে পরিপূর্ণ রূপ দেওয়ার পুর্বেই।

১৭৯৬ সালে তাঁর রচিত Essay on a New Principle প্রবন্ধে তাঁর নতুন আবিষ্কৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মুল বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছিল। এসময় তিনি পুণরায় চিকিৎসা পেশা গ্রহন করেন। তবে তিনি রোগীদেরকে দিতেন তাঁর আবিষ্কৃত নতুন ধরণের (হোমিও) ঔষধ যার জন্য তিনি রোগীদের নিকট থেকে ফি রাখতেন না। এসময় তাঁর চিকিৎসানীতি ছিল প্রতি রোগীর জন্য একবারে একটি মাত্র ঔষধ এবং অবশ্যই তা সুস' মানুষের শরীরে পরীক্ষা করা ঔষধ। এখানে উল্লেখ করা কর্তব্য যে, তৎকালে (এমনকি এখনও) এলোপ্যাথিক চিকিৎসকরা একটি রোগী একসাথে পনের থেকে বিশটি পযর্ন্ত ঔষধ দিতো যার ফলে দেখা যায় একটি রোগ চাপা পড়ে (ঔষধের প্রতিক্রিয়ায়) আরো একাধিক মারাত্মক রোগের জন্ম হতো। এসময় ল্যাটিন ভাষায় তাঁর Fragmenta de viribus medicamentorum positivis নামক গ্রন্থটি প্রকাশ হয়, যাতে Pulsatilla, Ignatia, Aconite, Drosera, Belladonna ইত্যাদিসহ ২৭টি ঔষধের পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ (proving) বিসতারিত বিবরণ ছিল। এই বইটি এবং তাতে উল্লেখিত ঔষধ পরীক্ষার নতুন পদ্ধতিটি ছিল চিকিৎসক সমাজের নিকট একেবারেই আনকোরা, বিস্ময়কর, অভিনব। তিনি এমন একটি চিকিৎসা বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে চেষ্টা করছিলেন যাতে রোগীদেরকে একবারে মাত্র একটি ঔষধ দেওয়া হবে, ক্ষতি করতে না পারে এমন অল্পমাত্রায় ঔষধ দেওয়া হবে

এবং আন্দাজ-
অনুমাণ নয় বরং সুস' মানুষের শরীরে পরীক্ষা করে ঔষধের গুণাগুণ সমপর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে এমন ঔষধ রোগীদের দেওয়া হবে। তিনি ছিলেন মিকচার ঔষধের জানি দুষমণ অর্থাৎ রোগীদেরকে এক সাথে গন্ডায় গন্ডায় ঔষধ দেওয়া সমর্থন করতে না। কেননা এতে এক ঔষধের সাথে অন্য ঔষধের রিয়েকশনের ফলে রোগীদের কি কি ক্ষতি হতে পারে, তা জানার কোন উপায় ছিল না। তিনি মনে করতেন ডাক্তারদের তাদের নিজের ঔষধ নিজেই তৈরী করে নেওয়া উচিত; কে ননা এভাবেই ঔষধের বিশুদ্ধতা সমপর্কে ডাক্তার সাহেব নিশ্চিত হতে পারেন। অনেকে মনে করেন, হ্যানিম্যান ঔষধ কোম পানীর ঘোর বিরোধী ছিলেন। কেননা (এলোপ্যাথিতে যেমনটা দেখা যায়) ঔষধ কোমপানীগুলো ঔষধ আবিষ্কার, ঔষধ তৈরী এবং ঔষধ ব্যবসায় একচেটিয়া কর্তৃত্ব লাভ করলে চিকিৎসকরা তাদের কাছে অসহায় (পুতুল) হয়ে পড়েন।

১৮০৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর The Medicine of
Experience নামক বইটি যা ছিল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মুলনীতি বিষয়ক গ্রন্থ অর্গাননের (Organon of Medicine) পুর্বসুরী। ১৮০৫, ১৮০৮ এবং ১৮০৯ সালে প্রকাশিত অন্যান্য প্রবন্ধমালার আলোচ্য বিষয় ছিল প্রচলিত সকল চিকিৎসা পদ্ধতিসমূহের যুক্তিসঙ্গত সমালোচনা এবং সদৃশ বিধান (similia) এবং এক রোগী এক ঔষধ (single
drug) নীতি কেন সর্বকালের শ্রেষ্ট তার ব্যাখা সম্বলিত। ইহার পরপরই ১৮১০ সালে প্রকাশিত তাঁর কিংবদনতীতুল্য গ্রন্থ অর্গানন অব দ্যা আর্ট অব হিলিং আর্ট (*Organon of the Art of
Healing*) যাতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মুলনীতিগুলোকে আইনের ধারার মতো একে একে সজ্জিত করে লিপিব দ্ধ করা হয়েছে। ইহা ছিল একটি সমপূর্ণ নতুন এবং অন্যগুলোর চাইতে আলাদা চিকিৎসা বিজ্ঞান হিসেবে হোমিওপ্যাথির য াত্রাপথের একটি মাইলফলক
(landmarks) স্বরূপ। অর্গাননের প্রতিটি সুত্রকে লেখা হয়েছে আইনের ধারার মতো সংক্ষিপ্ত আকারে, কঠিন কঠিন শব্দ ব্ যবহার করে, কঠিন কঠিন ভাবের সমন্বয়ে যাদেরকে পাশাপাশি পাদটিকা দিয়ে ব্যাখ্যা করা না হলে বুঝা মুশকিল হতো। বাঁধ-ভাঙা স্রোতস্বিনীর মতো এরকম একটি মৌলিক কৃতিত্বের পেছনে ছিল তাঁর দুই যুগের অধ্যয়ন, পরীক্ষা-
নিরীক্ষা এবং গভীর চিনতা-গবেষণা। ১৮০৬ সালে তিনি তাঁর সর্বশেষ অনুবাদ করেন Albrecht von Haller -
এর মেটেরিয়া মেডিকা লেটিন ভাষা থেকে জার্মান ভাষায়। ইহার পর তিনি নিজের গবেষণা কর্মকে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ দ েওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। জীবনের এই সুদীর্ঘ সময় জুড়ে অধ্যয়ন এবং অনুবাদের মাধ্যমে কেবলমই অন্যদের ক র্মের সাথেই পরিচিত হয়েছেন। এখন থেকে আর অন্যদের কাজ নয় ; কেবল নিজের (চিনতা-গবেষণা-
আবিষ্কারকে বাসতবে রূপ দেওয়ার) কাজ নিয়ে ব্যসত থাকা। আজ থেকে দুইশ বছর পুর্বের একটি অগ্রসর সমাজ এবং সময়ে দারুণ বৈপ্লবিক কিছু আবিষ্কার করলেই আবিষ্কারকে দ্বায়িত্ব শেষ হয়ে যেতো। মানবতার কল্যাণের জন্য সেই আবিষ্কা রকে প্রচার-
প্রসার করা এবং শত্রুদের জিংঘাসা থেকে তাকে রক্ষা করার কঠিন দ্বায়িত্বও আবিষ্কারককেই পালন করতে হতো। মানবজা তিকে কুচিকিৎসার হাত থেকে রক্ষার জন্য সারা বিশ্বে হোমিওপ্যাথিকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং রক্ষা করার জন্য হ্যানিম্যানকে আমৃত্যু কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে।

তাছাড়া হোমিওপ্যাথির জন্মটা ছিল একটি দীর্ঘ জনম
; ১৭৯০ সাল থেকে ১৮৫৫ সালে হ্যানিম্যানের মৃত্যু পযর্ন্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয়েছে টুকরা টুকর া, অংশ খন্ডাংশ রূপে। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি হোমিওপ্যাথির মুল সুত্রগুলি
(aphorism) আবিষ্কার করেছেন, আরো গবেষণা-পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পর্যায়ক্রয়ে তাদেরকে সংশোধন-পরিবধন-
পরিবর্তন করেছেন, ঔষধ আবিষ্কার করেছেন, ঔষধের মাত্রাতত্ত্ব (posology) আবিষ্কার করেছেন, ঔষধের শক্তিবৃদ্ধি

(potentization) করার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছেন, জটিল
(chronic) রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, রোগীদের শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি
(miasm theory) আবিষ্কার করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁর সমসত আবিষ্কারকে তিনটি মৌলিক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে গে ছেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় তিনি বিভিন্ন সংশোধনীর পর অনেকগুলি এডিশন বের করেছেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞা নের পাঠ্যপুস্তকরূপে বিবেচ্য এই বইগুলো হলো- অর্গানন অব মেডিসিন
(Organon of Medicine), মেটেরিয়া মেডিকা পিউরা (Materia Medica Pura) এবং ক্রনিক ডিজিজ
(Chronic disease)। তাছাড়া লেসার রাইটিংস
(Lesser writings) নামে তাঁর আরেকটি মৌলিক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে যাতে তাঁর ছোট ছোট সমসত গবেষণা প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়েছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, টরগাউ অবস'ান কালে সিস্টেমেটিক গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে একবারে একটি ঔষধ প্রয়োগের বিধান (single
drugs) এবং সদৃশ বিধানের মাধ্যমে ঔষধ নির্বাচনের পদ্ধতি
(similia) ছাড়া তৎকালে প্রচলিত এবং মধ্যযুগের সমসত চিকিৎসা পদ্ধতিকে অগ্রহযোগ্য-বাতিল ঘোষণা করেন।

১৮১২ সালে হ্যানিম্যান পুণরায় লিপজিগ শহরে ফিরে যান
; মুল উদ্দেশ্য ছিল এলোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতিকে চ্যালেঞ্জ করা। তিনি ফিরে এসেছিলেন শিক্ষক হিসেবে........প্রকাশ্যে ঘো ষণা দেওয়ার জন্য..........তাঁর আবিষ্কৃত নতুন চিকিৎসা বিজ্ঞান সমপর্কে। হেলিবোরের (Hellebore) ওপর একটি অভিসন্দর্ভ (thesis) জমা দিয়ে তিনি ইউনিভার্সিটিতে মেডিক্যাল ফেকাল্টির একটি অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। তাঁর এই থিসিসে প্রা চীনকাল থেকে সমকালীন অনতত পঞ্চাশজন ডাক্তার, দার্শনিক ও প্রকৃতি বিজ্ঞানীর উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন ইউরোপে প্রচলিত ব িভিন্ন ভাষায়। সমকালীন চিকিৎসা বিজ্ঞান আর ভাষার ওপর হ্যানিম্যানের জ্ঞান ছিল এতই গভীর আর বিসতৃত
! জার্মান, ফ্রেন্স, ইংরেজী, ইটালীয়ান, ল্যাটিন, গ্রিক, হিব্রু এবং এরাবিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ভাষা র ওপর তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করেছিলেন যা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলকে বিমুগ্ধ করেছিল। তারপরও ক্লাশে ছাত্রদের প্রতি তাঁর লেকচার শুরু হতো ভালোভাবেই কিন্তু শেষ হতো ব্যাঙ্গাত্মক সুরে। কেননা তার বেশীর ভাগ জু ড়ে থাকতো সমকালীন এলোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর আক্রমণ, তিক্ত সমালোচনা যা টর্নেডোর গতিতে প্রবাহিত হতে থাকতো। এসব দেখে-শুনে তাঁর ছাত্ররা সঙ্কুচিত-জড়সড় হয়ে পড়তো। সমকালীন চিকিৎসা পদ্ধতির বলগাহীন, তিক্ত-কটু সমালোচনার কারণে তাঁর ক্লাশে ছাত্রদের সংখ্যা কমতে লাগলো এবং ১৮২০-
১৮২১ সালের শীতকালীন সেমিষ্টারে ছাত্র সংখ্যা ছিল মাত্র সাত জন। এই পরিসি'তিতে অনিবার্যভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অবস'ান দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে তাঁর প্রশিক্ষণ কোর্সটি যদি ছাত্রদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করত এবং তাঁর ফ্যাকাল্ টিতে ছাত্রদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেত, তবে অন্যান্য এলোপ্যাথি পন'ী অধ্যাপকদের পক্ষে তাঁর বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগা এতো সহজ হতো না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাসতবে তেমনটি হয়নি। তাঁর ওপর এবং হোমিওপ্যাথির ওপর এলোপ্যাথি পন'ীদের বেদনাদায়ক আক্রমণ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, অনেকটা নির্মুল অভিযানের মতো। বিরুদ্ধবাদীদের উৎপীড়ন এত ই বৃদ্ধি পায় যে, লিপজিগ শহরে তাঁর জীবন ধারণই অসম্ভব হয়ে পড়ে। ছাত্রদের অবহেলা এবং এড়িয়ে চলার কারণে তি নি লিপজিগ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। আরেকটি বড় কারণ ছিল এলোপ্যাথিক ডাক্তারদের প্ররোচনায় একটি সরকারী আইন পাশ হয় যে, নিজে নিজে ঔষধ প্রস'ত করে রোগীদের মধ্যে বিতরণ করা যাবে না। যেহেতু হোমিওপ্যাথি ছিল তখন এক টি নতুন আবিষ্কৃত চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং হোমিও ঔষধ প্রস'তকারী কোন ঔষধ কোমপানী তখনও প্রতিষ্টিত হয়নি, ফলে লিপজিগে হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করতে হ্যানিম্যান আইনগত বাঁধার সম্মুখীন হন। হ্যানিম্যান সেখানে নিজেকে অপাঙতেয় ভ াবতে থাকেন এবং দেশ ত্যাগ করাকেই ইহার একমাত্র সম্মানজনক সমাধান হিসেবে সিদ্ধানত গ্রহন করেন।

কোহেনের অনতর্গত আলটোনার মহান ডিউক ফারডিন্যাণ্ডে সাথে দীর্ঘ আলাপ-
আলোচনা ও দরকষাকষির মাধ্যমে তাঁর লিপজিগ ত্যাগ করার পথ প্রশসত হয়। কোহেনের ডিউক তাকে একটি সরকারী চিকিৎসকের পদ এবং স্বাধীনভাবে গবেষণা আর নিজের আবিষ্কৃত নতুন ধরণের (হোমিওপ্যাথিক) ঔষধ তৈরী করা ও রোগ ীদের প্রদানের আইনগত অধিকার প্রদান করেন। ফলে ১৮২১ সালের জুন মাসে তিনি লিপজিগ ত্যাগ করে কোহেন গমন করেন। কোহেনে তিনি সব ধরণের সুযোগ-সুবিধাই পেয়েছেন
; ফলে এটি তাঁর নিকট আল্লাহর বিশেষ রহমতের মতোই মনে হচ্ছিল। এখানে তিনি সত্রী ও দুই কন্যা (চার্লোট ও লুই সা)-
কে নিয়ে "স্বর্গীয় নিঃসঙ্গতায়" কাটিয়েছেন চৌদ্দটি বছর। এই সময়গুলোতে তিনি তাঁর গবেষণা প্রবদ্ধগুলি এবং (অর্গানন, মেটেরিয়া মেডিকা পিউরা ইত্যাদি) বই-পুস্তকগুলো ক্রমাগত ছাপিয়েছেন এবং বিভিন্ন সংশোধন-
সংস্কারের মাধ্যমে নতুন নতুন এডিশন বের করেছেন। ১৮২৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর যুগানতকারী গ্রন্থ ক্রনিক ডিজিজ (The Chronic Diseases) যাতে জটিল রোগের (Chronic Diseases) অনতর্নিহিত কারণগুলোকে
(dyscrasia, susceptibility) তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ঃ সোরা (Psora-
skin diseases with itching), সাইকোসিস (Sycosis- gonorrhoea- diseases with growth) এবং সিফিলিস (Syphilis- diseases with decay)। এগুলোকে তিনি নামকরণ করেন শারীরিক-মানসিক গঠনগত ত্রুটি বা মায়াজম (miasm) নামে। অন্যভাবে বললে মায়াজমকে বলা যায় রোগ প্রবণতা
(*disposition or disease tendency*) অর্থাৎ ব্যক্তি ভেদে বিশেষ ধরণের রোগ বেশী বেশী হওয়ার প্রবণতা। অগণিত দী র্ঘ গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণে তিনি আবিষ্কার করেন যে, অধিকাংশ পুরাতন জটিল রোগের সাথে পুর্বকালে ছড়িয়ে পড়া সোর ার সমপর্ক আছে। হ্যানিম্যানের মতে, সোরা হলো ক্রনিক রোগের মুল কারণ যা হাজার হাজার বছর ধরে এক প্রজন্ম থ েকে আরেক প্রজন্মে বংশগতভাবে চলে আসে।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিত যে, এলোপ্যাথিক চিকিৎসার অসারতা এবং বর্বরতার কারণে হতাশ হয়ে হ্যানিম্যান এলোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতিকে বর্জন করেছিলেন এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। পরবর্তীতে ত িনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতিকেও বর্জন করার সিদ্ধানত নিয়েছিলেন। কেননা এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় সে যুগে অধি কাংশ রোগই সারানো যেতো না এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে চিকিৎসার কারণে রোগী তার চাইতে আরো বেশী মারাত্মক রো গে আক্রান্ত হতো। পক্ষানতরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অধিকাংশ রোগই খুব সহজে নিরাময় করা যেতো কিন্তু হ্যানিম্যান লক্ষ্য করে দেখলেন যে, যে-
রোগ তিনি সারিয়ে দিলেন, দু'চার বছর পর একই রোগে আক্রান্ত হয়ে সেই রোগী আবার তাঁর নিকট ফেরত আসছে। ত িনি দেখলেন যে-
রোগীর ফোড়াঁ, পাইলস, হাঁপানি ইত্যাদি জটিল রোগ তিনি সারিয়ে দিচ্ছেন, সেই রোগী দু'চার বছর পরপর একই রোগে আক্রান্ত পুণরায় হয়ে তাঁর নিকট ফেরত আসছে। তখন তিনি পারলেন যে, রোগের মুল কারণটি দুর না হওয়ার কারণেই জটিল রোগ পুরোপুরি নির্মুল হচ্ছে না এবং রোগীরা একই রোগে কিছুদিন পরপর আক্রান্ত হচ্ছে। ইহার পর তিনি মুল ক ারণসমূহ আবিষ্কার করার জন্য দীর্ঘ বারো বৎসর গবেষণা করে এই মায়াজম থিওরী আবিষ্কার করেন। আজ থেকে দুইশ বছর পুর্বে বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনগ্রসরতার যুগে তাঁর এই মায়াজম থিওরীকে
(Miasm theory) এতই জটিল এবং রহস্যময় মনে হতো যে, প্রথম দিকে তাঁর অধিকাংশ অনুসারী এটিকে গ্রহন করতে অস্বীকার করেন (এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরেও অনেকদিন পযর্ন্ত) এবং এ নিয়ে ঠাট্টা-
বিদ্রুপ করতে থাকেন। কিন্তু তারপর আসেত আসেত সবার নিকটই তাঁর মায়াজম থিওরী বাসতব সমমত এবং সত্য বিবে চিত হতে থাকে এবং গ্রহনযোগ্য হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাঃ বার্নেট লিখেছেন যে, "হ্যানিম্যানের সোর

া

(Psora) ভালোভাবে পড়ে আমি এতটুকু বুঝতে পারছিলাম যে, আমি আসলে কিছুই বুঝতে পারি নাই। তবে আমি এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে, তিনি যা লিখেছেন তা সত্য"। একইভাবে তিনি ৩০ (ত্রিশ) শক্তির ঔষধকে আদর্শ শক্তি (standard potency) হিসেবে প্রতিষ্টা করার চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁর অনুসারীরা এটিকে গ্রহন করেনি। তাঁর অর্ধেক অনুসারী ১, ৩, ৬ ইত্যাদি নিম্নশক্তির ভক্ত হয়ে যায় এবং বাকী অর্ধেক অনুসারী দশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার, এক লক্ষ ইত্যাদি উচ্চ শক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে (যা ছিল হ্যানিম্যানের সময়ে অকল্পনীয়)।

প্রথম সত্রীর মৃত্যুর চার বছর ছয় মাস পর ১৮৩৫ সালের ১৮ই জানুয়ারী হ্যানিম্যান দ্বিতীয় বিয়ে করেন মেলানি'কে (Melanie D'Hervilly Gohier)। সে ছিল ফ্রান্সের এক সুন্দরী, আকর্ষণীয়া তরুণী আর্টিস্ট। মেলানী প্রথমে ছিলেন হ্যানিম্যানের রোগী, তারপরে ছিলেন হোমিওপ্যাথির ছাত্রী এবং শেষে ছিলেন প্রেমিকা এবং সত্রী। মেলানী বয়সে ছিলেন হ্যানিম্যানের চাইতে চল্লিশ বছরের ছোট। মেলানী ১৮৩৪ সালের ৮ই অক্টোবর প্রথম যখন চিকিৎসার জন্য ফ্রান্স থেকে জার্মানীর কোহেন নগরে হ্যানিম্যানের চেম্বারে এসে উপসি'ত হন, তখন তিনি যারপর নাই বিস্মিত হয়েছিলেন এই তরুণীর কর্মকাণ্ড দেখে। জার্মানীর কোহেন নগরীতেই তাদের বিয়ে হয় এবং জানুয়ারীতে বিয়ের পর জুন মাসের ৭ তারিখে তিনি দেশত্যাগ করে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে বসবাস শুরু করেন। মানবজাতিকে রোগমুক্ত করার মানসে তাঁর এই হিজরত ছিল অনেকটা আরব্য রজনীর রূপকথার মতো। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, ব্যতিক্রমধর্মী অসাধারণ প্রতিভাসমপন্ন ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার সবচেয়ে বেশী স্বাধীনতা দেওয়া হয়ে থাকে প্যারিসে। তাদের এই অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর প্রেম এবং বিয়ের ঘটনা জার্মানীর পত্র-পত্রিকায় ব্যাপক প্রচার পাওয়ায় অভদ্র প্রতিবেশী এবং বৈরী ভাবাপন্ন চিকিৎসক সমাজের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি বৃষ্টির মতো অপমানজনক ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ নাজিল হতে লাগলো। হ্যানিম্যানের প্যারিস গমণের পর তাঁর কন্যারা এসে পিত্রালয়ে বসবাস করা শুরু করে এবং মৃত্যু পযর্ন্ত তারা সেখানেই বসবাস করেছে। তারা তাদের সৎমা মেলানীকে তেমন পছন্দ করতো না। মেলানীর কর্মকাণ্ড বা উদ্দেশ্য সমপর্কে আমরা যাহাই বলি না কেন, হ্যানিম্যান তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের নিকট অনেক চিঠিতেই লিখেছিলেন যে, মেলানীর ভালবাসা এবং সেবা-যত্নে তিনি বর্তমানে খুবই সুখী জীবন-যাপন করছেন। প্যারিসে হ্যানিম্যানের জীবনের এই শেষ আট বছরে তিনি ছিলেন একজন বিশ্বখ্যাত মহাব্যসত ডাক্তার এবং তাঁর তরুণী সত্রী ছিল তাঁর সহকারী চিকিৎসক। এসময় ধনী, বিত্তশালী এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের সবচেয়ে পছন্দের ডাক্তার ছিলেন হ্যানিম্যান। বর্ণনামতে, এই আট বছরে হ্যানিম্যান ও মেলানী দুইজনে মিলে আয় করেছিলেন আট লক্ষ ফ্রাঙ্ক। পাশাপাশি দরিদ্র রোগীদের তিনি চিকিৎসা করতেন বিনা পয়সায়; তাদের নিকট থেকে ফি এবং ঔষধের মুল্য কোনটাই রাখতেন না। মেলানী তাঁর কর্মকাণ্ডের জন্য চিরকালই একজন রহস্যময় নারী হিসেবেই থেকে যাবেন। তাঁর শত্রুদের মতে, "মেলানী একজন উচ্চাভিলাসী, স্বার্থপর, সুযোগসন্ধানী এবং ধান্ধাবাজ বুদ্ধিজীবি মহিলা ছিলেন......বিশেষত সেই ভদ্র, দুরদৃষ্টিসমপন্ন এবং রোমান্টিক পুরুষটির (হ্যানিম্যান) জন্য যে তাকে ভালবাসত"। মেলানী কখনও হ্যানিম্যানের পাশ ছাড়তেন না। তিনি হ্যানিম্যানের রোগীলিপিগুলি (*casebooks*) মুখসত করেছিলেন। মেটেরিয়া মেডিকা পিউরা'র (*Materia Medica Pura*) অনেক জটিল লক্ষণ এবং দুর্লভ নোট ছিল তাঁর নখদর্পণে যা হ্যানিম্যানের অন্যকোন ছাত্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে তিনি হোমিওপ্যাথির একজন জীবনত বিশ্বকোষে (encyclopaedia) পরিণত হন। মেলানী সবচেয়ে বেশী বিতর্কিত হন দুটি কাজের মাধ্যমে; একটি হলো হ্যানিম্যানের মৃত্যুর পর কাউকে না জানিয়ে তাড়াতাড়ি অতি গোপনীয়তার সাথে হ্যানিম্যানকে দাফন করা এ

বং দ্বিতীয়ত হ্যানিম্যান রচিত অর্গাননের ষষ্ট সংস্করণ প্রকাশ না করে প্রায় সত্তর বছর লুকিয়ে রাখা। গবেষকদের মতে, মৃত্যুর পুর্বে হ্যানিম্যান ইসলাম গ্রহন করে মুসলিম হয়েছিলেন
; হয়ত হ্যানিম্যানের ইচ্ছা অনুযায়ী তাকে খ্রিষ্টান ধর্ম মতে দাফন না করার জন্যই মেলানী তড়িগড়ি করে গোপনে (মুসলিম কায়দায়) সমাহিত করে থাকতে পারেন। কিন্তু অর্গাননের ষষ্ট সংস্করণ প্রকাশ না করে কেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তার কারণ আজও অজানা। (উল্লেখ্য, হ্যানিম্যান অর্গাননের ষষ্ট সংস্করণ সমপূর্ণ রচনা করা সত্ত্বেও হঠাৎ মৃত্যুবরণ করায় নিজে তা প্রকাশ করে যেতে পারেন নাই।)

হ্যানিম্যান যদিও নিঃশ্বাস নেওয়ার মাধ্যমে (অর্থাৎ ঔষধের গন্ধ শুঁকার মাধ্যমে) রোগীদের শরীরে ঔষধ প্রয়োগের পদ্ধতি
(Olfaction) চালু করেছিলেন, কিন্তু তা ছিল তাঁর দীর্ঘ জীবনের শেষের দিকের (প্যারিসে অবস'ানকালীন সময়ের) আবিষ্কার। তাছাড়া ঔষধের পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তিকরণ পদ্ধতিও
(LM potency) তাঁর শেষ জীবনের আবিষ্কার যা অর্গাননের ষষ্ট সংস্করণে তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ১৮৪২ সালে প্যারিসে তিনি অর্গাননের পঞ্চম সংস্করণের সর্বশেষ পুণঃলিখন সমপন্ন করেন, যদিও তা কখনও প্রকাশকের নিকট পাঠানো হয়নি। এটা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, প্যারিসে অবস'ানকালীন হ্যানিম্যানের জীবনের শেষ আটটি বছর ঔষধের মাত্রা, শক্তি ও ঔষধের প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা-
নিরীক্ষায় কেটেছে। এই সময়ে তিনি ঔষধের তরল মাত্রা এবং পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তিকরণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, যা হোমিও চিকিৎসকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেনি।

শেষ বয়সে হ্যানিম্যানের শরীর পাতলা (চিকন) এবং বেটে-
খাটো হয়ে গিয়েছিল। হাঁটু সামান্য বেঁকে গিয়েছিল এবং তাঁর শরীরের মধ্যাংশও কিছুটা সামনের দিকে বেঁকে গিয়েছিল যার ফলে পুরোপুরি খাড়া-
সোজা হয়ে দাঁড়াতে তাঁর কোন অসুবিধা হতো না। ১৮৪৩ সালের ২রা জুলাই প্যারিসে হ্যানিম্যান ইনেতকাল করেন ব্রঙ্কাইটিস রোগে (ইন্নালিল্লাহে......রাজেউন) এবং মন্টমার্ট্রিতে
(Montmartre) তাকে সমাহিত করা হয়। পরে আমেরিকান হোমিও ডাক্তাররা অর্থ ব্যয় করে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আরেকটি অভিজাত গোরস'ানে (Cimitiêre Pere
Lachaise) পুণরায় দাফন করেন, যেখানে অনেক বিখ্যাত লোকদের কবর ছিল। ইউরোপ, রাশিয়া, ইন্ডিয়া এবং আমেরিকাতে অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়েছিল প্রধানত (অর্ধেকটা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচারের জন্য এবং বাকীটা হোমিও চিকিৎসার যাদুকরী রোগ নিরাময় ক্ষমতার কারণে)। হোমিওপ্যাথির প্রচার-প্রসারে প্রতিটি দেশেরই ধনী এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা সক্রিয় সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন।

# Dr. Bashir Mahmud Ellias

Design specialist, Islamic researcher, Homeo consultant

E-mail : Bashirmahmudellias@hotmail.com

Website : http://bashirmahmudellias.blogspot.com